CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

উদ্ভাস ভারত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

শ্রীনিত্যগোপাল

756.3
026/9

মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র ১৮-৮-৭, ১৩৭২, সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র ১৯শ বর্ষ, ১ম-২য়-৩য় সংখ্যা

সংসার কাহাকেও বাধা দেয় নাই, সংসার সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা, মিথ্যা বিভীষিকাই আমাদের বাধা দিতেছে।---বিশ্বকে ভালবাসাই যে সংযম, ব্রহ্মচর্য ; অথচ এ ব্রহ্মচর্যে শুষ্কতা নাই ; যে অর্থে "নিরোধ" আমরা বুঝি, সে নিরোধও নাই। উপনিষদ্ বলিয়াছেন--অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিতে হয়, "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা" সংসার বিচরণই মরণ জয়। যারা অবিদ্যার ক্ষেত্র হইতে ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে সরাইয়া লইবার জন্য কাম ক্রোধের সঙ্গে কুস্তি করিল তাহারা লৌকিক চক্ষে বড় ব্রহ্মচারী হইলেও পুরুষোত্তম-রাজ্যে "মরা" সন্দেহ নাই। সংসারময় জীবন ছড়াইয়া না দিলে লক্ষ বৎসরেও ব্রহ্মচর্য বজায় থাকিবে না। চিত্তকে সংসার হইতে গুটাইয়া লইতে চাহিলেই সে বিদ্রোহ করে, তখন তাহাকে নিরোধ করার চেষ্টা ব্যর্থ। খাইতে পরিতে না দিয়া কাহাকেও পোষ মানানো যায় না : ইন্দ্রিয়ের খাদ্য স্বরূপ ও বিশ্বরূপ। তুমি যদি বিশ্বরূপের খাদ্য দিবে না, সে মরিবে বটে কিন্তু তাহার ভূত তোমায় ছাড়িবে না।

কামের ভূত আজ ব্রহ্মচারীদের ঘাড়ে চাপিয়াছে। তাহারা যে মরিয়া আছে তাহা বুঝা কি খুব কঠিন? নরনারায়ণের কাজ তাই গুরুতর, গুরুতম। এই মৃত ব্রহ্মচর্য্যকে জীবন্ত ব্রহ্মচর্য্যে গড়িয়া তোলার জন্যই তোমাদের ব্রহ্মচারিণীরূপে আমি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই। যিনি জীবনচারিণী, তিনিই ব্রহ্মচারিণী ; জীবনই ব্রহ্ম। জীবনহীন ব্রহ্ম নরনারায়ণের উপাস্য নয়। ভারতবর্ষ তাইতো ব্রহ্মেরও পর পর-ব্রহ্মের স্তর স্থাপন করিয়াছেন। স্বরূপ ও বিশ্বরূপে প্রেম হইলে কাম নিয়া ঠেলাঠেলি করিতে হয় না। দুই ভাবে সংযম থাকিলে কামের সকল ফাঁক বন্ধ হইয়া যায়। বিশ্বরূপের দিক বন্ধ থাকিলে কাম স্বরূপের দিক দখল করিবে, বিশ্বরূপের দিক খোলা থাকিলে বিশ্বরূপের ক্ষেত্র দখল করিবে। দুই দিক খুলিয়া দিলে কামের দাঁড়াইবার স্থান পায় না। সব জীবন মধুময় হয়। সেই জন্যই বলি "অহং" ছাড়িয়া দাও। অহং দুইটির একটীকে নিয়া দাঁড়াইতে চায়। দুইটীর সমন্বয় "অহং" জানে না। আমির কাছে হয় বিশ্ব সত্য, নয় ঈশ্বর সত্য। আমি যদি হন্ পুরুষোত্তম তখনই বিশ্ব ও ঈশ্বর দুইই সত্য। তখন হয় বাস্তব ব্রহ্মচর্য্য। এ যে কলিযুগ। এখানে "বাস্তবম্ বস্তু বেদ্যম্"—কলি-যুগে যে বাস্তব বস্তু জানিবার যুগ। কোনো তত্ত্ব নিয়া ফাঁকি বা অভিনয় চলিবে না। সব আজ পুরুষোত্তমের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী [illegible] ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	
কর্মযোগী	
শ্রীশ্রীচণ্ডী	
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
Soul of India Speaks	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	১·২৫

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	
বীরত্বে বাঙালী	
বিজ্ঞানে বাঙালী	

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
জীবন গড়া	৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি

সাহিত্যের গল্প	
বিদ্যাসাগর	

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান **ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০**

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী :: ১৫, কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

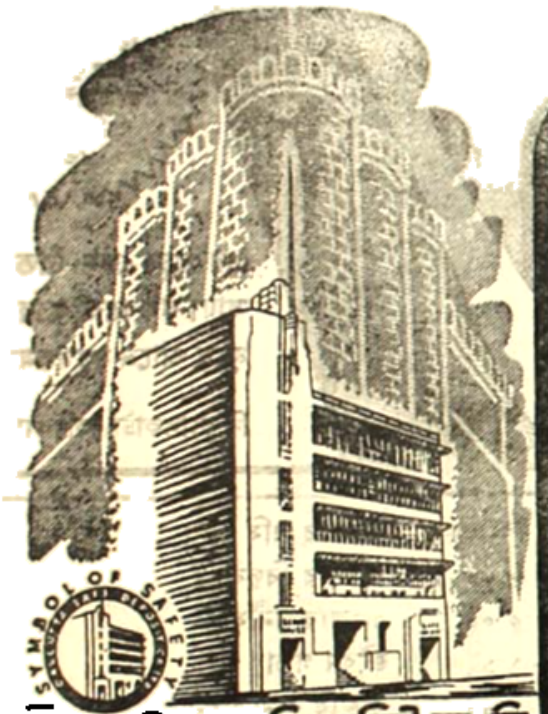

ধন-সম্পত্তি রাখিবার
সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ
স্থান

মানুষের জীবনে বিপদ-আপদ আসবেই— তবুও মানুষ নির্ভাবনায় ও শান্তিতে থাকতে চায় ও চেষ্টা করে। আপনার অলঙ্কারাদি, দলিলপত্রাদি ও অপরাপর মূল্যবান জিনিষ আমাদের ভল্টে রেখে দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকুন। আমাদের ভল্টে আপনার মূল্যবান দ্রব্যাদি সম্পূর্ণ গুপ্ত ভাবে নিরাপদ অবস্থায় থাকবে। বিশেষ বিবরণের জন্য আমাদের অফিসে লিখুন অথবা ফোন করুন

ফোন: 22-5477

ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট কোং লিঃ

সি কি উ রি টি হা উ স

২৬-বি, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

হাওয়ায় হাওয়ায় চলা

যেন মুক্ত হাওয়ায় পা বাড়িয়ে চলা। আরামে চলা হালকা পায়ে। চলনে পরম তৃপ্তি বাটার স্যাণ্ডালে। বাটার স্যাণ্ডাল পায়ে দিয়েই আপনি খুশি হবেন। পলকে জানতে পারবেন এদের বৈশিষ্ট্য কী। এমন আরামদায়ক উপকরণ, নির্মাণশৈলী আর মৌসুমী নকশার সমাবেশ দুর্লভ বলা যেতে পারে। স্টাইলের বহুমুখী বৈচিত্র্য এদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। বাটার স্যাণ্ডাল পায়ে দিয়ে আপনি যত ইচ্ছে চলুন। গঠন অটুট থাকবে। নতুনের মতো দীর্ঘদিন এর টিকে থাকবার মেয়াদ।

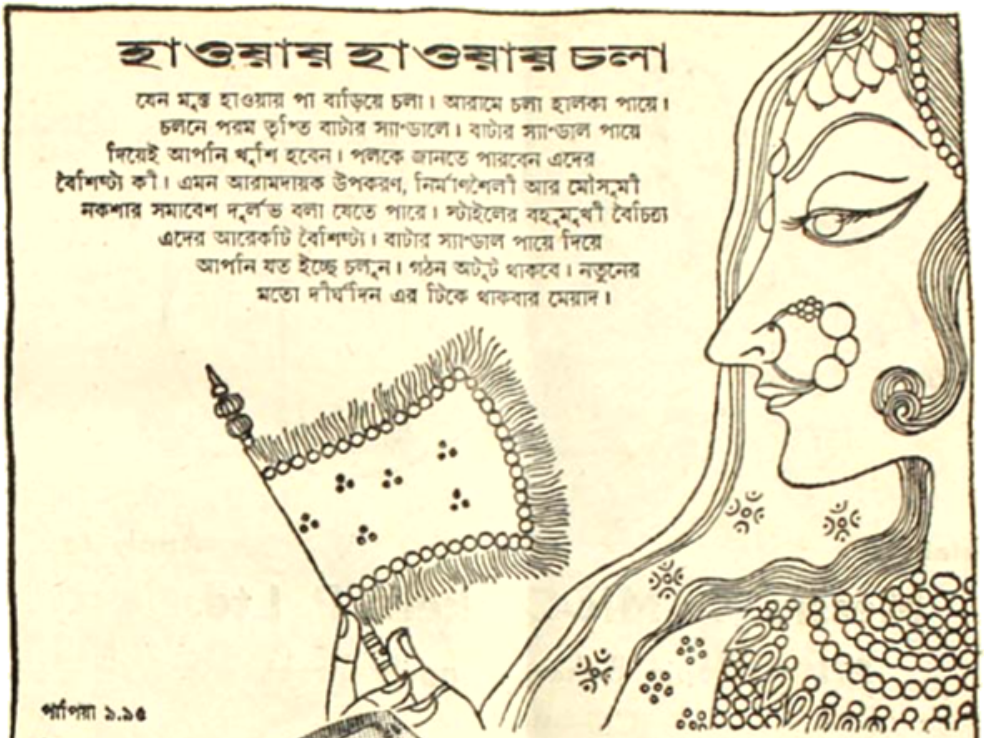

পাপিয়া ১.৯৫

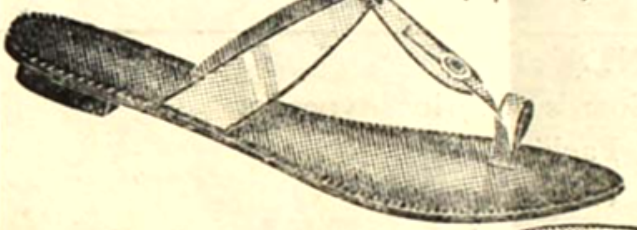

মিনতি ২.২৫

Bata

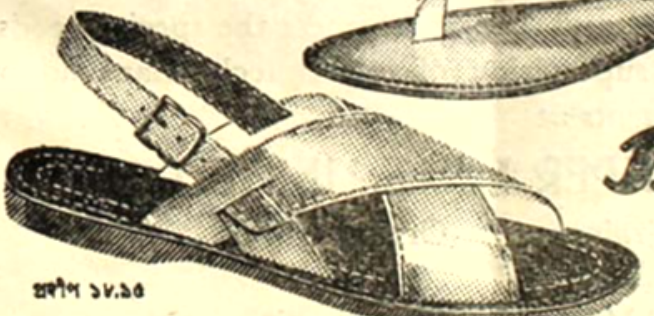

প্রদীপ ১৮.৯৫

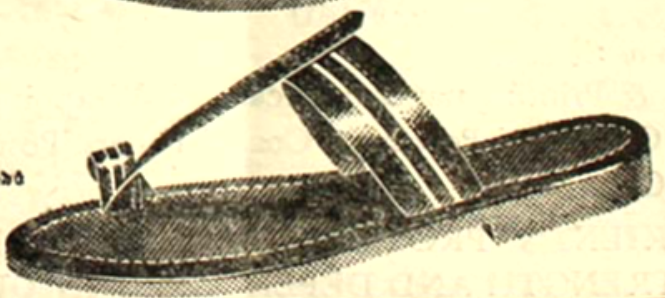

তপন ১৩.৯৫

For details— Apply to

Messrs. Ic-Mic-Cookers P Ltd.

211/1A, Bepin Behari Ganguly Street.

Calcutta-12

IT'S QUALITY THAT COUNTS

Papers and Boards of various types for

Packing

Wrapping

Writing &

Priting

and also high qualiy papers aud boards to meet the special needs are manufactured under strict supervision of expert technicians adopting latest techniques and equipments at

ORIENT PAPER MILLS LIMITED

Brajrajnagar (Orissa)

and

AMLAI M. P.

Manufacturers of

Writing & Printing papers; Packing & Wrapping Papers including Waterproof, Crepe and Polythene Coated Papers, Poster Papers, Duplex, Triplex and Grey Boards.

ORIENT'S PRODUCTS ARE SUPERIOR IN STRENGTH AND DEPENDABLE IN QUALITY

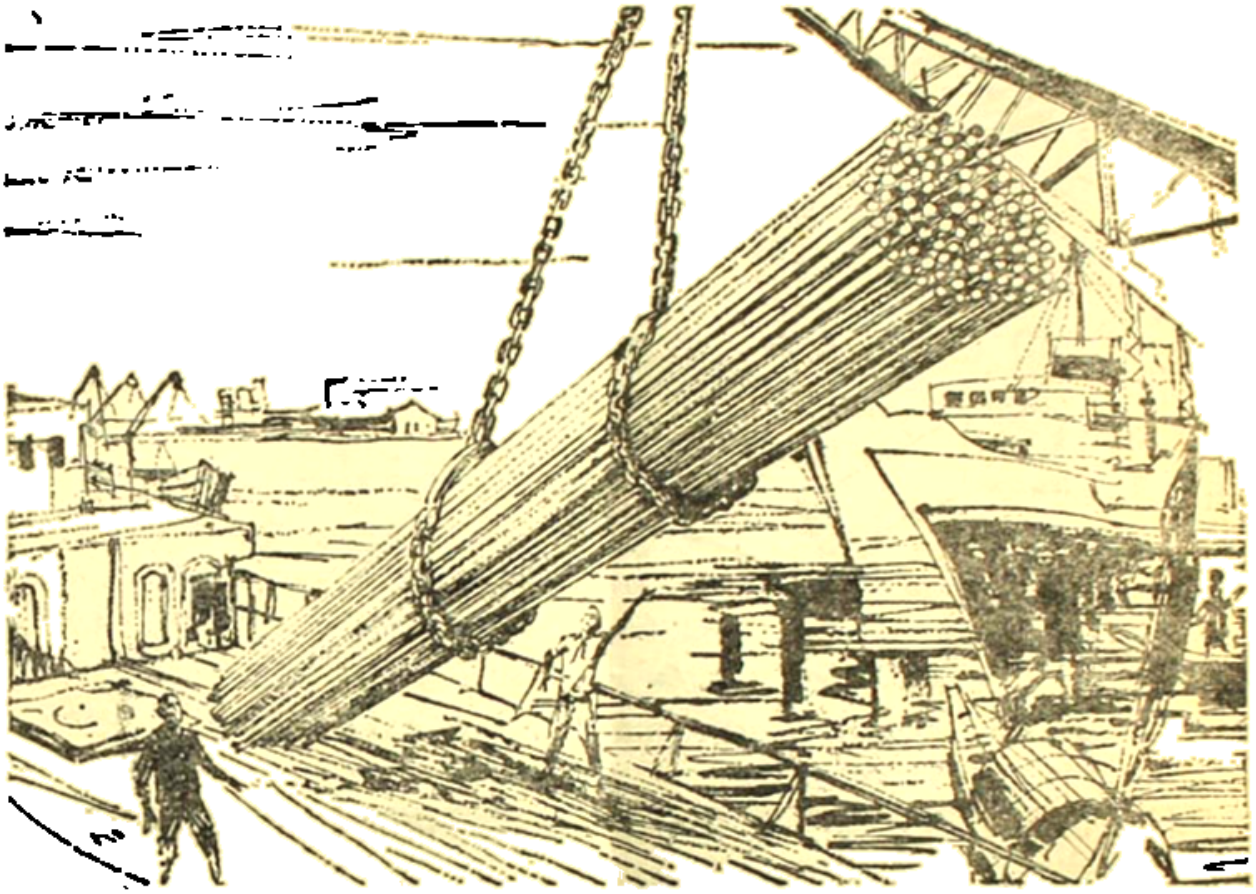

বিদেশে টাটার ইস্পাত

জামশেদপুরে তৈরি ইস্পাতের এাঙ্গল ও চ্যানেল, বার ও জয়েন্ট ইত্যাদি কয়েক লাখ অন্তর অন্তর কোলকাতা থেকে জাহাজে করে পূর্ব আফ্রিকা, মধ্য ও দূর প্রাচ্যে চালান যায়। এই সব দেশে শিল্প ও কলকারখানা গড়ে তুলতে ইস্পাতের ভয়ানক দরকার।

গত দুবছরে টাটা প্রতিষ্ঠানের সরকার-অনুমোদিত রপ্তানী ফার্ম কমার্শিয়াল অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপোর্টস লিমিটেড (সিয়েল) মারফৎ টাটা স্টীল ৩০,০০০ টনের বেশী ইস্পাতের মাল চালান দিয়ে প্রায় সওয়া কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা রোজগার করেছেন। সুখের বিষয়, রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়ছে। দেশের পরিকল্পিত শিল্পোন্নয়নে বৈদেশিক মুদ্রার এখন সবচেয়ে দরকার।

বিদেশে ইস্পাত রপ্তানী ক'রে গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন মেটাতে সাধ্যমত চেষ্টা করে টাটা স্টীল দেশের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করছেন।

টাটা স্টীল

The Tata Iron and Steel Company Limited

JWTTN 2030

উৎকৃষ্ট সেলাইয়ের জন্য
উষা কলে সেলাই করুন

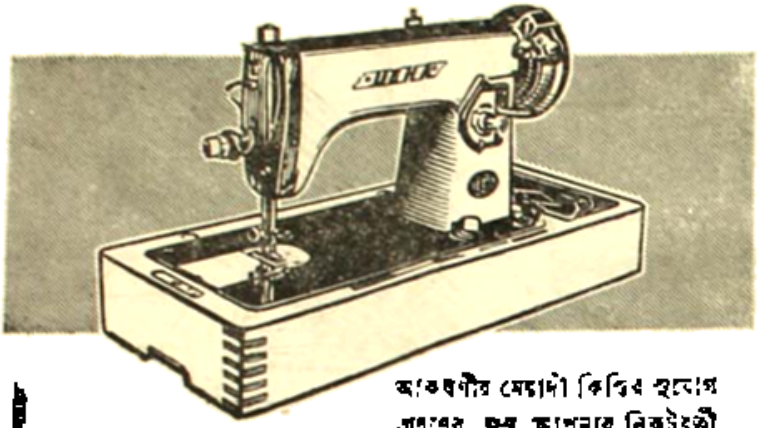

আকর্ষণীয় মেয়াদী কিস্তির সুযোগ গ্রহণের জন্য আপনার নিকটবর্তী বিক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করুন

ইণ্ডিয়া সুইং ম্যানুফ্যাকচারিং কোং প্রাঃ লিঃ

ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, কলিকাতা-৩১

Zonal Office 26, R. N. MUKHERJEE ROAD, CALCUTTA-1

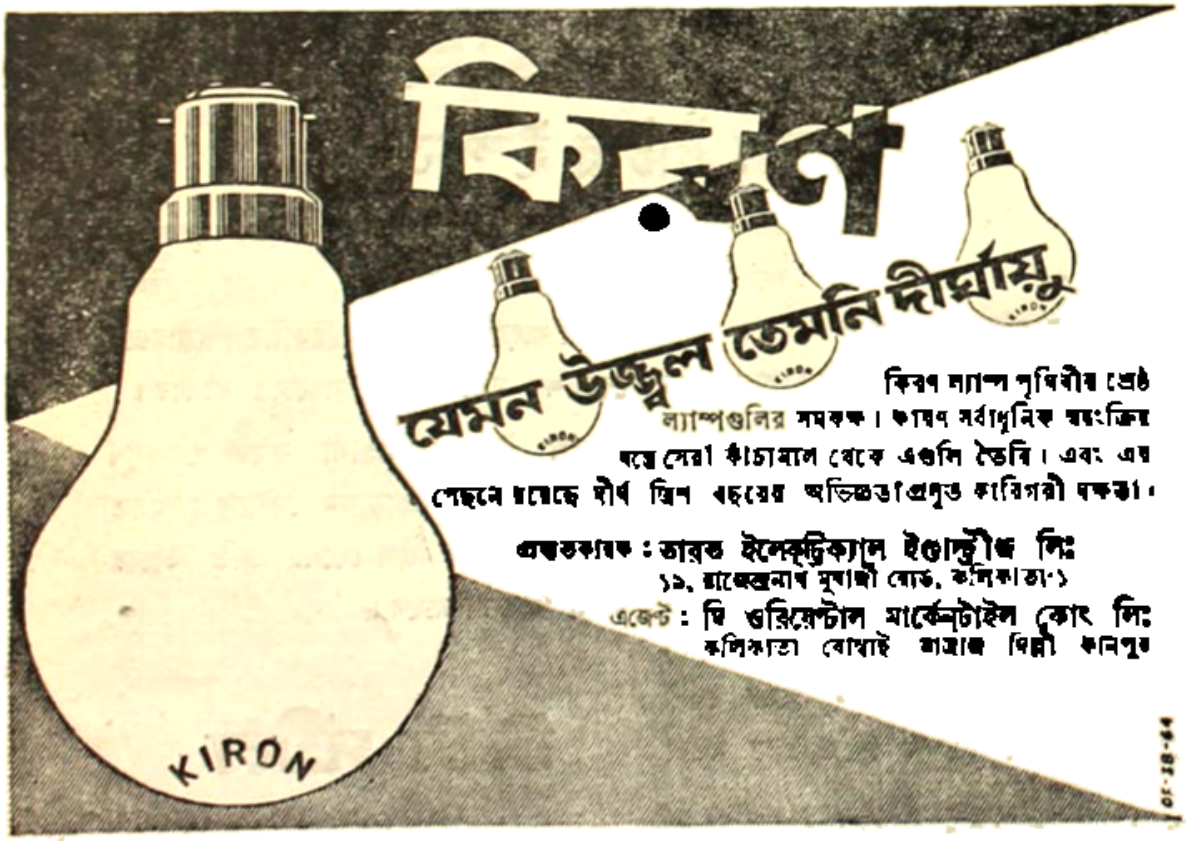

কিরণ ল্যাম্প পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ল্যাম্পগুলির সমকক্ষ। কারণ সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে সেরা কাঁচামাল থেকে এগুলি তৈরি। এবং এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত কারিগরী দক্ষতা।

প্রস্তুতকারক : ভারত ইলেকট্রিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ
১৯, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-১
এজেন্ট : দি ওরিয়েন্টাল মার্কেন্টাইল কোং লিঃ
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ দিল্লী কানপুর

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

উজ্জ্বলভারত

মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র, ১৮৮৭ শকাব্দ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

১৯শ বর্ষ, ১ম-২য়-৩য় সংখ্যা

আমাদের কথা

'উজ্জ্বলভারত' মাসিক পত্রিকার অষ্টাদশ বর্ষ শেষ হইয়াছে বিগত পৌষ ১৩৭২-এ। কিন্তু গুরুতর বিপর্যয়ে সেই পৌষ সংখ্যা যথাসময়ে প্রকাশিত হইতে পারে নাই, হইয়াছে ১৭ই চৈত্র। বিগত সপ্তদশ বর্ষের মাঝামাঝি হইতেই আমাদের এ বিপর্যয় চলিতেছে সেই সময় হইতে উজ্জ্বলভারত প্রকাশে অনিয়ম হইতেছে যাহা বিগত ষোল বৎসর হয় নাই। তবু অন্তরে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের সঙ্গে একাত্মতা-বোধ এবং বাহিরে বহির্বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা-বোধ—এই দুই বোধের দ্বারা শক্তিমান হইয়া আমরা বিশ্বাস করি উজ্জ্বলভারতের ক্ষুদ্র অবয়বের মধ্যে যেটুকু কথা প্রকাশিত হয়, চিন্তার অনন্যতার প্রতি মানুষের জীবনের তার অক্ষয় সম্পদ এবং সেইজন্যই সহস্র বাধা ঠেলিয়াও সে বাঁচিয়া থাকিবে। আমরা প্রায় চার মাস পিছাইয়া পড়িয়াছি। ইহা কাটাইয়া লইবার মত দৈহিক ও আর্থিক শক্তিরও আমাদের অভাব—তাই মাঘ-ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা একত্র করিয়া প্রকাশ করিতেছি। ঘটনা বিপর্যয়-জনিত এই ত্রুটি আমাদের পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ী সুহৃৎবর্গ মার্জনা করিয়া লইবেন—ইহাই তাঁহাদের সকলের নিকট আমাদের আবেদন।

যাহা হউক, উজ্জ্বলভারতের নূতন বর্ষ, ঊনবিংশ বর্ষ আরম্ভ হইল। পত্রিকা হিসাবে উজ্জ্বলভারতের ত্রুটি-বিচ্যুতির অন্ত নাই, এ কথা সকলেই জানেন—কিন্তু তবু যে ইহার একটি কোথাও বিশিষ্টতা আছে যাহাতে অদ্য ইহার গতি আজও স্তব্ধ হইয়া যায় নাই তাহা হইতেছে ইহা ভগবদ্বাণী বহন করিতেছে যে বাণীর আলিঙ্গনে দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ মানুষের জীবনে প্রয়োজন আছে। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ১৩৩২-৩৩ বঙ্গাব্দে উজ্জ্বলভারতের প্রথম পর্যায় সপ্তাহিক পত্রিকারূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার পর দীর্ঘ বছরের ব্যবধানে আবার আঠার বৎসর আগে ইহার নব পর্যায় মাসিকরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সমন্বয় মূর্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের যে জীবন-বেদ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের জীবনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে 'নিখিল বিশ্বকে ত্যাগ-ত্যাগি করিয়া না লইয়া পক্ষের বিপক্ষের সমস্ত মতবাদকে এক ব্যাপকতর ও গভীরতর আত্ম-বোধের মধ্যে গ্রহণ করিয়া শ্রীনিত্যগোপাল সর্ব দর্শন সমন্বয়, সর্ব জাতি সমন্বয়, জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি-প্রেম সমন্বয়, বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া সমন্বয়' রহিয়াছে। এই সামগ্রিক সমন্বয়ের সুস্থ ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারা মানুষের কাছে উপস্থিত করাই এই উজ্জ্বলভারত পত্রিকার পরম প্রয়োজন—এ প্রয়োজন সেদিনও ছিল, আজও আছে। এই ভগবদ্বাণী আপনার প্রয়োজনে বহিয়া চলিতেছে, চলিবে। ইহার নূতন বর্ষের যাত্রাপথে আমরা এই বাণীর বর্তমান কালের বুকে প্রস্থাপক শ্রীশ্রীনিত্য-গোপালকে আমাদের সকল সত্তার প্রণতি নিবেদন করি, এই বাণীর উদ্গাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দকে জানাই আমাদের সকল সত্তার প্রণতি যিনি তাঁহার বিশ্বময় জীবনের আচরণ ও প্রচারদ্বারা আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে এই জীবনের সহজ ও গভীর বাণী তুলিয়া ধরিয়াছেন, নমস্কার জানাই মহাত্মা গান্ধীকে যিনি

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে সত্য প্রেম পবিত্রতার বাণী প্রবেশ করাইয়া রাজনীতি যে জীবন-ধর্মেরই অঙ্গ এই কথা প্রথম বলিতে চাহিয়াছিলেন, আর নমস্কার জানাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে যাঁহার সমস্ত সাহিত্য জুড়িয়া প্রাণধর্মী এই সামগ্রিক সমন্বয়ের কথা, সেই সঙ্গে নমস্কার জানাই বিশ্বের মানুষকে যাহাদের মধ্য দিয়া সমন্বয়ের এই আহুতি প্রকাশ পাইয়া তাহাদিগকে সামনের দিকে অগ্রসর করাইয়া দিতেছে। মানুষের জয় হউক—জয় হউক মনুষ্যত্বের—যাহাও সামগ্রিক। অসুন্দর বা হেয়ত্ব কোনটাতেই সামগ্রিকতা নাই—ইহার বিশেষ প্রকাশ মনুষ্যত্বেই—তাই মনুষ্যত্বেরই, মানবিকতারই জয় কামনা করি, তাহারই জন্য জীবনের সকল প্রচেষ্টা।

বিপর্যয় আজ কোন এক স্থানে নাই—ঘরে বাহিরে, ব্যক্তিতে সমাজে সমষ্টিতে সর্বত্র বিপর্যয়। গত কয় মাসে আমাদের সমাজ-জীবনে কত বিপর্যয়ই না ঘটিয়া গেল, আজও ঘটিতেছে। এই সময়ই সামগ্রিকতার চিন্তা-ধারাই শুধু আমাদের সৎপথে, সুপথে, কল্যাণের পথে চালিত করিতে পারে—সেই জন্য আজ এই চিন্তাধারা মানুষের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। জীবন ও জগতের দ্রুত পরিবর্তিত আবেষ্টন ও দ্রুত পরিবর্তিত ধারণাকে সর্বমানুষের কল্যাণকর সংগঠনে কিভাবে প্রয়োগ করা যায় তাহার অনুসন্ধানই আজ পরম প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একটা বিরাট পরিবর্তন তথাকথিত অচল অনড় সুদূরবর্তী জড় হিন্দুর কাছে এমন হুড়মুড় করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে আমরা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছি, কিন্তু আমাদের আন্তর্ধর্ম পরিবর্তিত সামগ্রিক জীবনে কল্যাণী মূর্তিতে ধরা দেয় নাই। বিজ্ঞ জনের সতর্কবাণী বহু দিন আগেই যাহা সমাজ-জীবনে অনুধাবন করা উচিত ছিল, আমরা তাহা করি নাই, বাহিরের পরিবর্তন যে আমাদের মনুষ্যত্ব ধরিয়া টান দিবে তাহার জন্য আমরা সচেতন থাকি নাই। তাই আজ দুর্যোগ ঘরে বাহিরে কি করাল, কি বীভৎস মূর্তিতেই না দেখা দিয়াছে। এই অন্ধকারপূর্ণ দিন-গুলিতেও, এই বিপদের মধ্যেও আমরা আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জীবনদেবের সুমঙ্গল কথা মানুষের কাছে বলিয়া যাইবার প্রয়াস করিয়া যাইব কেননা এই জীবন-দেবই আজ পথ দেখাইতে পারে। আজ উজ্জীবনভারতের নূতন বৎসরের যাত্রাপথে আমাদের সংকল্পকে নূতন করিয়া নূতন দৃঢ়তায় স্মরণ করি, অনুধ্যান করি। শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ এবং বিশ্ববাসীর আশীর্বাদ আমাদের উপর বর্ষিত হউক। আজ দিয়া বলিয়া যাই পৃথিবীকে—

'তোমার ধূলির তিলক পড়েছি ভালে
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।'

লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা

['লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা' নবনারায়ণ আশ্রম তথা 'উজ্জয়ন্তভারতে'র পতাকা। প্রতি বৎসর যাত্রারম্ভ ক্ষণে আমরা ইহাকে অভিবাদন জানাই। তাই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সেদিন সংক্ষেপে ইহার যে অর্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহা প্রণিধান করিতে ইচ্ছুক হইয়া উহা এইখানে আমরা প্রকাশ করিলাম। দলের সাথে মিলিত হইয়া একদিকে ব্রহ্মজ্ঞান—গৈরিক যাহার চিহ্ন—আর একদিকে বাস্তব জগতের অন্নাদান—লাঙ্গল যাহার দ্যোতক—সমন্বয়ন তত্ত্ব-প্রকাশিকা এই পতাকাকে নূতন দিনের যাত্রাপথে আমরা অভিবাদন জানাইতেছি]

বিশ্বসঙ্ঘ রচনায় গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ভারতবর্ষকে অবশ্যই 'কাল'-চক্র ও চক্রী-'পুরুষের' সমন্বয় করিয়া দিয়া একটি 'অশোকচক্র' গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতের জাতীয় পতাকায় অন্তর্নিহিত অশোকচক্রের নিগূঢ় অর্থ হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যা ও লাঙ্গলের সমন্বয়ে 'রাখালরাজ' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। পুরুষপ্রধান ভারতীয় ঋষি-সভ্যতার দৃষ্টি ছিল অন্তরের ব্রহ্মবিদ্যার দিকে; পাশ্চাত্ত্যের কাল-প্রধান সভ্যতা চকল বাহিরে মন্বন্তরাণ প্রতিষ্ঠার জন্য কোনও একটি একান্ত সত্য নয়। শ্রীকৃষ্ণ-সভ্যতাই এই দুইটি দৃষ্টিকে যথাস্থানে ও যথামানে সুবিন্যস্ত করিয়া অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্বসঙ্ঘাত হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতে সমর্থ। ব্রহ্মধামেই এই সভ্যতার ভিত্তি-পত্তন হইয়াছিল। সেখানে আমরা ব্রজের গোষ্ঠে মাঠে স্বরাজসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা লাঙ্গলধারী বলরামের যুগল মিলনে রাখালরাজমূর্তি আস্বাদন করিয়াছি। ব্রজই ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার কার্যাত্মক রূপ লাঙ্গলের সমন্বয়। এই সমন্বয়কেই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের বুকে দাঁড়াইয়া বিশ্বজনগণের মাঝে ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। গীতাশাস্ত্রে জনক তাই এই সভ্যতার আদর্শ। জনক ছিলেন একাধারে ব্রহ্মজ্ঞানী জনক ও চাষী-রাজা জনক। ভারতের মাটিতেই চাষী-রাজর্ষি ব্রহ্মজ্ঞানী জনকের আদর্শে কমিউনিজম্ হজম হইয়া গিয়া বিশ্বের বুকে তাহার উদ্ভূত হইবার প্রয়োজনকে সার্থক আস্বাদন করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপ-সংবাবৃত। কৃষিক্ষেত্রে-বিচরণকারী বলিয়াই তিনি 'কৃষ্ণ'। 'কৃষ্'-ধাতু হইতে 'কৃষ্টি' 'কৃষি' ও 'কৃষ্ণ' শব্দ নিষ্পন্ন। এই কৃষ্ণচন্দ্রেরই জ্যেষ্ঠ সহোদর হলধর বলরাম। ভারতের স্বরাজ মূর্ত হইবে হলধরেরই দেশে। তাই নবনারায়ণ আশ্রমের পতাকা 'লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা'।

উজ্জয়ন্তভারতের প্রচ্ছদপটে এই পতাকাই অঙ্কিত রহিয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ

॥ শ্রীপ্রতিভা রায় ॥

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুম্ উন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট সুন্দরদ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ ;
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে গ্রহণের ছলে হরিনাম মুখরিত নবদ্বীপে পিতা জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে মাতা শচী দেবীর কোল আলো করিয়া আদরের দুলাল শ্রীগৌরসুন্দর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাংলার দুলাল প্রেমের ঠাকুর গৌর আমাদের সকল হারাইয়া যাওয়ার বেদনা বুকে লইয়া আমাদের সকল হারানো সম্পদকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই প্রাণ-সাধনা লইয়া ধরার ধূলিতে অবতরণ করিয়াছিলেন। ভাব এবং রসের পরস্পর সম্ভাতে মানুষ যখন বাস্তব জগত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল অথচ তাহার কল্পিত ভাব রাজ্যের সন্ধানও মিলিতেছিল না, কতগুলি সংস্কারসর্বস্ব হইয়া হানাহানির পথ বাছিয়া লইয়াছিল সেই সময় আসিলেন মহাভাব রসরাজ মূর্তিতে শ্রীগৌর সুন্দর।

বাংলার জাতীয় জীবন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে গৌর-জীবন পর্যালোচনা করিতে হইবে, বাংলার অণুপরমাণুতে পরিপূর্ণ হইয়া আছেন গৌর সুন্দর, আমাদের আজ পরিচয় দিতে হইলে গৌর পরিচয় দিতে হইবে। বর্তমানে যে দুইটি সমস্যা আমাদের সামনে প্রবল আকারে দেখা দিয়াছে এবং আমাদের সহজ জীবন যাত্রা ব্যাহত করিতেছে সে হইতেছে অন্ন সমস্যা ও মুক্তিসমস্যা। এই অন্ন আদর্শের সমন্বয় সাধন ছাড়া এই সঙ্কটরাশী হইতে মুক্ত হইবার আর পথ নাই। এই আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয় মূর্তি হইতেছেন শ্রীগৌরসুন্দর। তাঁহার জীবনেই সংসার সন্ন্যাসের সমন্বয়, রাজনীতি ধর্মনীতির সমন্বয়। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও মাকে ভুলিয়াছিলেন না বা বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভুলিয়াছিলেন না, প্রতি বৎসর নবদ্বীপবাসী যখন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথ দেব ও গৌর সুন্দরকে দেখিতে যাইতেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তদের হাত ধরিয়া কতই না মায়ের জন্য বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন এবং জগন্নাথ দেবের প্রসাদ ও প্রসাদী বস্ত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন। জন্মাষ্টমীর দিন জগন্নাথ দেবকে যে বহু মূল্যবান পট্ট বস্ত্রখানি রাজা প্রতাপ রুদ্র দিতেন, তাহাই আবার রাজা প্রতাপ রুদ্র মহাপ্রভুর নিকট পাঠাইয়া দিতেন। গৌরাঙ্গ সেই বস্ত্রখানি ও কিছু প্রসাদ শ্রীবাসের হাতে দিয়া বলিয়াছেন—

"এই বস্ত্র মাতাকে দিহ এ সব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি আমার ক্ষমাইহ অপরাধ। চৈঃ চঃ

আবার শ্রীবাসকে বলিয়াছেন, পণ্ডিত, তুমি যাকে বলিও তাঁহার সেবা ছাড়িয়া সন্ন্যাস লইয়া ভুল করিয়াছি—

তাঁর সেবা ছাড়ি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম নহে কৈল আমি নিজ ধর্ম নাশ॥
তাঁর প্রেম বশ আমি তাঁর সেবা ধর্ম।
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম॥
বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ।
এত জানি মাতা মোরে মানিবে সন্তোষ॥
কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন।
যে কালে সন্ন্যাস কৈল হয় হৈল মন॥ চৈঃ চঃ

'কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন'—ইহাই ছিল গৌরাঙ্গ জীবনের এক মাত্র কথা। সংসার সন্ন্যাস, ইহলোক পরলোক, আদর্শ বাস্তব প্রেমে গলিয়া গৌরাঙ্গ-জীবনে একাকার হইয়া গিয়াছিল। এই গৌরাঙ্গ-জীবনই বাংলার তথা বিশ্বের আদর্শ। হিংসার পথ হানাহানির পথ বাংলার পথ নয়। শ্রীগৌরাঙ্গের অদ্ভুত রাজনীতি ছিল। মত্ত সিংহের মত হরিনামের গর্জন তুলিয়া যে দিন নবদ্বীপের

সব বিভিন্ন 'আমি'র শক্ত গাঁট গুলিতে ঘাতা দিয়াছিলেন সেদিন নদীয়াবাসী ভাবিল বুঝি গৌরাঙ্গের এই পাগলা হাওয়ার ধাক্কায় তাহাদের এতদিনের সাধের সঙ্কীর্ণ 'আমি'র বাসা ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাই তাহারা কাজীর শরণাপন্ন হইয়াছিল। কাজি আদেশ জারি করিলেন নবদ্বীপে হরিনাম নিষিদ্ধ। মহাপ্রভু কাজির এই আদেশ অমান্য করিবার জন্য তাঁহার দলবলকে সজ্জিত করিয়া চৌদ্দদল সঙ্কীর্ত্তনে নবদ্বীপের আকাশ বাতাস হরিনামের ঝঙ্কারে মুখরিত করিয়া কাজীর দুয়ারে যাইয়া হাজির হইলেন। বলদলবলে মত্ত সিংহ শ্রীগৌরাঙ্গ কাজীর দুয়ারে উপস্থিত হইলে কাজী ভয়ে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন প্রেমের সাগর শ্রীগৌরাঙ্গ কোন্ কৌশলে তাঁহার সহিত এই সমস্যার সমাধান করিলেন চৈতন্য চরিতামৃত তাহা লিখিতেছেন—

তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা।
তব্য লোক পাইয়া কাজী খোলাইলা।
দূর হইতে আইলা কাজী মাথা নোয়াইয়া।
কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া॥
প্রভু কহে আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত।
আমা দেখি লুকাইলা এ ধর্ম্ম কেমত॥
কাজী কহে তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া।
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া॥
এবে তুমি শান্ত হইলে আমি মিলিলাম।
ভাগ্য মোর তোমা হেন অতিথি পাইলাম।
গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়॥ চৈঃ চঃ

বিরুদ্ধ পক্ষকে কেমন করিয়া নিজের জীবনে হজম করিতে হয়, কোন্ কৌশলে যে কোন্ মানুষকে অস্বীকার করিতে হয়, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গ-জীবনে চাঁদ কাজীর এই ঘটনা হইতে আমাদের শিখিবার বিষয় রহিয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গই ছিলেন প্রকৃত অসহযোগী, যিনি মানুষকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজের প্রকাশ-শক্তির দ্বারা নিজের জীবন ধারাকে অব্যাহত রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রকে দেখা দেন নাই, যেদিন জগন্নাথের প্রতাপরুদ্র সেই দিন তাঁহার দেখা প্রতাপরুদ্র পাইয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বিদ্যা পাণ্ডিত্যের অভিমানকে প্রেম রসে সিঞ্চিত করিয়াই বিদূরিত করিয়াছিলেন, প্রকাশানন্দের যে নিজেকে প্রকাশ করিবার গর্ব্ব তাহাও তিনি তাঁহার বিনয়ের কিতব দিয়া তাঁহাকে স্বীকার করিবার কিতব দিয়া চূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতন এমন অহিংস, প্রেমিক কে আছে? যিনি রজকের কাপড় কাচিয়া প্রেম দান করেন, যিনি কুষ্ঠ ব্যাধি-গ্রস্তকে কোল দিয়া কৃতার্থ করেন, যিনি স্ত্রী-শূদ্র সকলকে ভগবৎ সাধনার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তিনিই ছিলেন ধর্ম্ম সংস্কারক, অর্থ সংস্কারক অন্ন ও আদর্শের মাঝে যে চিরন্তন লড়াই চলিয়া আসিয়াছে তাহারই সমাধান করিতে হইবে আগে, নতুবা সমস্যা ক্রমেই জটিলতরই হইবে, সমাধান মিলিবে না। শ্রীগৌরাঙ্গের বাংলাকে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণতলে বসিয়াই করিতে হইবে সমস্যার সমাধান। এই অন্ধকারের পথ যাত্রীদের কে আর দেখাইবে পথ?

'ওগো সে তো আমার গৌর সো, সে ত আমার গৌর।' এমন গৌর ত ভুবন খুঁজে কোথাও পাইনি। বাঙ্গলার আকাশ-বাতাস, বাঙ্গলার মাটি-জল, বাঙ্গলার ঘাট-মাঠ, বাঙ্গলার পরিবার সমাজ, বাঙ্গলার ঘর বাইর, বাঙ্গলার ধর্ম্ম-রাষ্ট্র পাতি পাতি করে খুঁজে এই সাগর সেচা মানিক পেয়েছি। এ যে বাঙ্গলার নিজস্ব ধন। এ যে মূর্ত্তিমান বাঙ্গলা। বাঙ্গলার ধর্ম্ম-কর্ম্ম, বাঙ্গলার কাব্য-সাহিত্য, বাঙ্গলার নাট্য-রীতি, বাঙ্গলার নাচ-গান, বাঙ্গলার খোল-করতাল, বাঙ্গলার নয়নের জল, বাঙ্গলার "হরিবোল", বাঙ্গলার ধূলায় গড়াগড়ি দেওয়া, বাঙ্গলার ভাবপ্রবণতা সবই যে শ্রীগৌরাঙ্গ। অথচ জীবনের বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গে বাঙ্গলার অণুতে পরমাণুতে অখণ্ড রস ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছেন। তাই ত বাঙ্গালী

আজ জগতের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার দুঃসাহস শোষণ করে। অথচ ধর্ম শ্রীগৌর, অথচ রাজনীতি শ্রীগৌর। বিশ্বের সমস্ত খণ্ডকে রসের ভাবনায় অখণ্ড করে দেবার জীবন যাপন করলেন বাঙলার ধূতিচাদর পরা বাঙালী শ্রীগৌর। শ্রীগৌরাঙ্গ শাক্ত, শ্রীগৌরাঙ্গ বৈষ্ণব, শ্রীগৌরাঙ্গ নিরাকারবাদী, শ্রীগৌরাঙ্গ সাকারবাদী, শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাসংসারী, শ্রীগৌরাঙ্গ সামাজিক।" ১৩০৩ সনে বরিশাল হইতে যে সাপ্তাহিক উজ্জলভারত পত্রিকা বাহির হইত তাহাতেই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের গৌর সম্বন্ধে লেখা হইতে এই লেখাটুকু উদ্ধৃত করিলাম। সেদিন পরাধীন ভারতবর্ষের যে সমস্যা ছিল আজ স্বাধীন ভারতেরও সেই সমস্যাই রহিয়া গিয়াছে। সেদিন যে রস ও ভাব সমন্বিত শ্রীগৌরাঙ্গের-আদর্শকে বাঙলা দেশের লইবার প্রয়োজন হইয়াছিল, আজও সেই আদর্শকে লইবার প্রয়োজন তাহার রহিয়াই গিয়াছে। বাঙালী যদি আজ পরিচয় দিতে চায় তবে তাহার আত্মস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যানে সমাহিত হইয়া নিজকে চিনিতে হইবে। জীবনের সকল বিকারকে এই রসরাজ মহাভাবের পরশ লাগাইয়া তাহার সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের জীবনে জয়যুক্ত হউন। হরি ও হরি।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

বিগত ১৬ই চৈত্র ১৩৭২ সমন্বয়মূর্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের ১১২-তম জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে বালীগঞ্জস্থিত মহানির্বাণ মঠে—সেখানে তাঁর পুণ্য দেহ রক্ষিত হয়ে আছে। শ্রীনিত্যগোপাল এসেছিলেন, চলে গেছেন সেও আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী হল। কিন্তু কি নিয়ে তিনি এসেছিলেন আজও তা মানুষের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল না। এতগুলি বই জুড়ে কি কথা তিনি লিখে গেছেন কেউ তা জানল না। জড়ই যে অজড় হয়, দাসই যে ব্রহ্ম হয়—শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের এই কথা বোঝা আজও সম্ভব হয় নি বটে, তবে বোঝার মত বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক আবেষ্টন ক্রমে হয়ে উঠেছে। আজ যুব দুর্দিন, চারদিকে দুর্যোগ, দুঃখ দুরাবস্থা সর্বত্রই—কিন্তু ভারতবর্ষের আর বাংলাদেশের দুর্যোগের বুঝি বা তুলনা নাই। যে দেশ যে জাতি বাস্তবকে এড়িয়ে গিয়ে আদর্শকে চায়, যে আদর্শ শেষ পর্যন্ত জীবনহীন কতকগুলি মুখস্থ করা বুলি বা আচরণ মাত্র হয়ে দাঁড়ায়, সে আদর্শ তাকে কয়াডুবি করবে—এটা বুঝে উঠতেই যার এতদিন গেল—তার দুর্যোগ কাটতে সময় তো অনেকই নেবে। শ্রীনিত্যগোপালকে বুঝবার অনুকূল আবেষ্টন একদিকে এই দুর্যোগের অন্ধকার, আর একদিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতিকে হৃদয়ের মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করতে না পারা পর্যন্ত যে দেশগুলি মানুষকে চরম পরমার্থ দান করতে পারবে না—বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারই উপলব্ধি। আজ এই আবেষ্টনেই চারদিকে হয়ে আসছে। তাই শ্রীশ্রীনিত্যগোপালকে বুঝবার জানবার দিনও প্রায় এসে গেল।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল কি বস্তু?

—একখানি আত্ম-সমাহিত ধ্যানস্থ মূর্তি—তখন সমস্ত কিছু থেকে তিনি ঊর্ধ্বে; তারপরে যখনই তিনি জাগ্রতের স্তরে নেমে এলেন তখন সমস্ত কিছুতে ওতপ্রোত থাকবার ক্ষমতা রেখেই তিনি সমস্ত কিছু থেকে ঊর্ধ্বে। জাগ্রতের ক্ষেত্রের খুঁটিনাটিতেও সমান নিপুণতার সঙ্গে তিনি

বিচরণ করছেন, যেমন অপরিসীম নিপুণতায় তাঁর মুহুর্মুহু: সমাধি হচ্ছে—নির্বিকল্প সমাধিও। উচ্চতম বা সর্বত্র বিচরণ করবার সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তির এই যে নমনমর্দ্দনীলতা—এটা মানসিকতার যে স্তরের সংবাদ দেয় তাই-ই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-প্রদত্ত পুরুষোত্তম স্তর। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল তাঁর জীবনে সেই স্তরে বিচরণ করে গেছেন। এই-ই শ্রীনিত্য-গোপাল। এই স্তরে পৌঁছবার আকুতি আজকের দিনের আকাশে বাতাসে—শ্রীনিত্যগোপালের কাছ থেকে তাই-ই আজ শেখবার কথা—তাই তাঁর অবতরণ। এটা প্রতি মানুষের জন্য—প্রতি দেশের প্রতি মানুষের জন্য। অধিকার এতে সকলেরই আছে—কিন্তু অধিকার রক্ষা করবার ক্ষমতা তো সকলের সমান নয়—তাই ঐ পুরুষো-ত্তম-স্তর আয়ত্তের পথে বিভিন্ন জনের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যাই হোক, আজকের মানুষ পুরুষোত্তম হবে—সেই পথে অগ্রসর হবে—এই সংবাদ শ্রীনিত্যগোপাল পৌঁছেছেন। সেই পথের কথাও রেখে গেছেন। এই পুরুষোত্তম হওয়াতেই মানুষের মুক্তি—সেখানে স্থিতিতেও মুক্তি, গতিতেও মুক্তি, আয়ত্তের ক্ষেত্রের সমস্ত কিছুতে বিচরণ করেও তদূর্ধ্বে থাকার জন্য মুক্তি, ঊর্ধ্বে থেকেও আবার সেখান থেকে আয়ত্তের ক্ষেত্রে নামতে পারেন বলে সেখানেও আটকে নেই বলে তাতেও মুক্তি। সমাধিতেও আটকে নেই, আয়ত্তের খুঁটিনাটিতেও আটকে নেই—কোন উপাধিই নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'কোন উপাধিই নেই, তাই সব উপাধিই সমান খাটে'। এত বড় মুক্তির খবর সাধনার জগতে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল রেখে গেছেন তাঁর জীবনে, তাঁর লিখিত গ্রন্থাদিতে মানুষ সেই দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সমস্ত দেশেই প্রায় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই সমস্ত রকম ধরা-বাঁধা বিধি ব্যবস্থা ভেঙে গেছে আজ। প্রাকৃতিক নিয়মেই বলা যায় এ ভাঙন ঘটে যাচ্ছে এবং সেই পথে ঢুকেছে দুর্নীতি দুরাচার দুর্যোগের দুঃখ। কিন্তু এই বিধি-ব্যবস্থার ভেঙে যাওয়াকে একটা উচ্চতর ও সেই সঙ্গে সার্বজনীন স্তরের শৃঙ্খলা দিয়ে সুসমঞ্জস করে নিতে না পারলে এই ভেঙে যাওয়া অবস্থা থেকে কোন বৃহত্তর কল্যাণ আমরা লাভ করতে পারব না—সে অবস্থা থেকে নিজেদেরকে আমাদের বাঁচাতেই হবে। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল সমস্ত কিছুর মুক্তির মধ্যে, চার দিকের সব ভাঙনের মধ্যে শৃঙ্খলা আনবার পথে পথ দেখাবেন। তাই তাঁকে নমস্কার, বার বার সহস্রবার নমস্কার—এক দিকে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সুগভীর প্রেম, অন্যদিকে জগৎ ও জীবনে কোন কিছুতে আটকে থাকা থেকে সীমাহীন মুক্তি—এই উপলব্ধি ও আস্বাদনের জন্য তাঁকে নমস্কার, ভূয়োভূয়: নমস্কার—নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল।

"মানব জগৎ এই দুই সম্প্রদায়ের (হিন্দু ও মুসলমান) ধর্মের দ্বারাই আজ ও পর এই দুইভাগে অতিমাত্রায় বিভক্ত হয়েছে। সেই পর চিরকালই পর হয়ে থাক হিন্দুর এই ব্যবস্থা; সেই পর, সেই ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজ কোনো ক্রমে তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে না পড়ে এই তার ইচ্ছা। মুসলমানের তরফে ঠিক এর উল্টো। ধর্মমতির বহির্বর্তী পরকে সে খুব তীব্র ভাবেই পর বলে মানে; কিন্তু সেই পরকে, সেই কাফেরকে বশ্যবরকার মত ঘরে টেনে এনে আটক করতে পারলে সে খুশি।...কোন বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও হিন্দু নিজেকেই মারে, আর প্রয়োজন থাকলেও হিন্দু অন্যকে মারতে পারেনা। আর মুসলমান কোন বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও নিজেকে মূঢ়ভাবে রক্ষা করে, আর প্রয়োজন ঘটলে অন্যকে বেদম মার দিতে পারে।"

—রবীন্দ্রনাথ

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৬১)

আর কিছু নাই এ সংসারে কেবল কালী নাম সার রে।
আমার মন কালী প্রাণ কালী জ্ঞান কালী মা রে।
যারা সংসারে এসেছে বড় সুখে আছে
পেয়েছে রাজ্য তার রে
আমার দরিদ্রেরই মন ও রাঙ্গাচরণ
গলায় পরেছি হার রে।
কমলাকান্ত হইয়ে ভ্রান্ত ভ্রমিতেছে দ্বারে দ্বারে রে
এবার অভয়াচরণে লয়েছি শরণ অনায়াসে হব পার রে।

আর একটা গান—

মজল আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে
কালীপদ নীলকমলে।
মুক্তকেশী নীলকমলে।
চরণ কালো ভ্রমর কালো কালোয় কালোয় মিশে গেল
পঞ্চ তত্ত্ব প্রধান মন্ত্র···তারা রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলো॥

...কালী করুণাময়ী মাগো নীলকমল, মা মুক্তকেশী—নিত্য-গোপাল, তোমার ধরার ধূলি স্বর্ণধূলি হউক, ধরার মানুষ স্বর্গমানুষ হউক।

২-১১-৫৬—জেমস জিনস লিখেছেন, 'complete objectivity can only be regained by treating the observer and the observed as parts of a single system'—পরিপূর্ণ বাস্তবিকতা কেবলমাত্র তখনই লাভ করা যায় যখন দ্রষ্টা দৃশ্য যে একই সমগ্রের দুইটি অংশ—এইটে দেখতে পাওয়া যাবে।

—এই হল পুরুষোত্তম-তত্ত্ব। এর মাধুর্য ও গৌরব যে এ দুইকে দুই রেখে এক করে: কিন্তু সাধারণ জীবের ধারণা অপরকে মুছে ফেলে একের প্রতিষ্ঠা—এটাই কামের পথ—পুরুষ স্ত্রীকে তার মধ্যে মুছে ফেলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, ধনিক শ্রমিককে মুছে ফেলে নিজেকে রাখতে চেয়েছে, রাজা প্রজাকে মুছে ফেলে রাজত্ব করতে চেয়েছে, ব্রাহ্মণ শূদ্রকে মুছে ফেলে নিজেকে সমাজের শীর্ষে রেখেছে—এইজন্য সতীদাহ, এইজন্যই আমাদের দেবপূজায় ব্রাহ্মণ ছাড়া উপায় নেই।···পুরুষ যতই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে নারীর স্বাতন্ত্র্য মুছে ফেলছে, নারী ততই মোহিনী মূর্তি ধারণ করে।...পুরুষের পাঁচটা বল—বয়স, গায়ের জোর, টাকা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা—পুরুষ এই এতগুলিতে বড়। স্ত্রীলোককে এই পাঁচটা ছোটত্ব নিয়ে যদি লড়াই করতে হয়, তবে হলাকলা-সাজগোজ হাত নাড়া চোখ নাড়াই সম্বল করতে হয়।... পুরুষোত্তম-তত্ত্বে নর-নারীর সম্বন্ধ এই রকম নয়—কারো সঙ্গে কারো সম্পর্কই এই রকম নয়। পুরুষোত্তম বললেন, দুজনের ভাবনা দুজনে ভাব, দুজনকে দুজনে রক্ষা কর—পুরুষের একদিকে যোগাতা, নারীর অন্য দিকে যোগ্যতা—নারীর যোগ্যতা প্রাণে। নারীকে প্রাণে স্থিতি করে বুদ্ধিমান হতে হবে—এই দৃষ্টিতে কেউ কাহাকেও শোষণ করবে না—পরস্পর পরস্পরকে পোষণ করে চলবে।·· যেখানে পুরুষের মধ্যে নারীর বিলুপ্তি, শঙ্কর সেইখানেই বললেন নারী নরকের দ্বার...।...আমি সারা জীবন অপরের মূল্য দিয়ে এসেছি।...আমার জন্য মানুষের উদ্বেগ না হয়—এটা চিরদিন দেখে এসেছি। ···গেছি ট্রামে—পৌঁছে সেইদিনই চিঠি দিয়েছি—আমার জন্য কাউকে ভাবতে দেই নি।···সংসারের যত্ন যেটুকু প্রয়োজন ভোগ করব—কিন্তু কারো গায়ে গা লেপাব না।...আমার গরু তোমার বাড়ীর গাছ খেয়ে আসে—আমার তাতে দুঃখ-বোধ হয় না—এটা মনের ধর্ম—এটা

কাম।...সংসারে এই-ই চলে। কিন্তু চারিদিক সম্বন্ধে আমার মাত্রা-বোধ বুঝি বা পুরুষোত্তমের কাছে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে...ফল দাঁড়িয়েছে আমার জন্য কেউ আর ভাবতে শিখল না।...যদি জগৎ মিথ্যা, তবে তুমিও মিথ্যা—যদি জগৎ ছাড় তবে নিজেকেও ছাড়—শংকর বলেছেন ছাড়তে—কিন্তু তা আর হয় না—নিজের অহংটুকু ঠিকই থেকে যায়।...ভাগবত বলেন প্রোজ্ঝিতলোকবেদশ্চ যে সে-ই পুরুষোত্তমকে লাভ করতে পারে—কিন্তু মানুষের কামুকতা এই যে নিজেকে ছাড়ে না কিছুতে, লোকবেদ ছাড়ে বটে।...পুরুষোত্তম-জীবন কি ব্যাপক, কি মধুর—জীবনভর এই পথে চললাম—কিন্তু আজ শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ভাবি কি হবে আলোচনা করে—আমার মত আমি বলি—তোমাদের মত তোমরা চল। কালীপূজায় ওদের বাজী এনে দিলাম...কিন্তু 'আমি' থাকতে, সেবাবুদ্ধি না আসলে দিলে হবে কি? শুধু অহংকার পুষ্ট হচ্ছে।...বড়র কথায় সমানে সমানে জবাব দিলে পুরুষোত্তম-স্তরে দূরস্থান, বর্ণাশ্রমেও স্থান নেই।...অনুগত হয়ে থাকলে কত সুখশান্তি দিতাম, কলকাতা দেখাতাম, এরোড্রোম দেখাতাম...। আমাকে যদি কিছু তোমাদের প্রয়োজন থাকে তবে নিজের সুখ ভুলে আমার সুখ, নিত্যগোপালের সুখ আর নরনারায়ণ আশ্রমের সুখের কথা ভাব...আমার সঙ্গে স্বজাতীয় ভাবনায় ভাবিত না হলে আমি কিছু করতে পারব না...। যে বস্তুর তুমি ধ্যান করছ, তুমি সেই বস্তুই হয়ে যাবে, সে তোমার টুঁটি চেপে ধরে তোমাকে বীভৎস মরণের মধ্যে ফেলবে।...স্বামী উদ্ধাঙ্গুল হবে, স্ত্রী হবে না?...যে কোন বস্তুকে ভোগ্য করে রাখলে সেই ভোগ্য বস্তু তোমাকে নীচে টেনে নামাবে। সেই আসক্তির পথ নোংরামির পথ।...প্রত্যেকে তোমরা নিজেদের আরও নিজেরা ছেড়ে দাও, সর্বায়ত্ত-পরিত্যাগী হও...আমার কাজে আমার সুখে তোমার কাজ তোমার সুখ মিলিয়ে চল—নইলে প্রাকৃতিক নিয়মেই সরে যেতে হবে। ঠাকুর, ...যে অবধূত সম্প্রদায় লুপ্ত হয়ে গেছল তাকে তুমি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছ...সেই কাজে আমি...শুধু তোমায় বাহন। আমি যেন কিছু চাই না কেবল তোমাকে ছাড়া...আমি লোক দেখা সব ছেড়েছি...। ধরার ধূলি হোক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম-মানুষ...।

৩-১১-৪৬।...শ্রীনিত্যগোপালের আত্মকথা পড়লে মনে হবে অপর কেউ লিখেছে, কিন্তু নিত্যধর্মপত্রিকায় এ তিনি নিজেই নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন। নিজেকে এতখানি করে ঘোষণা করতে—ব্রহ্ম সনাতন বলা...এ কেউ বিশেষ করে না—এক মাত্র কৃষ্ণ ছাড়া...। নিত্যগোপাল স্বার্থহীন ভাষায় বললেন তিনি নিত্যানন্দ ব্রহ্ম সনাতন...। এত বড় জিনিষ পেয়েও যদি তোমরা তোমাদের জীবনকে সার্থক করে গড়ে তুলতে না পার...দুর্ভাগা তোমাদের...! মহানির্বাণ মঠ যা হয় করুক...আশ্রম থেকে যেন নিত্যগোপাল-তত্ত্ব প্রচারিত হয়। নিত্যগোপাল অবতার সম্বন্ধে বলছেন মহাপুরুষ প্রদীপ, অবতার চন্দ্রসূর্য। প্রদীপ ঘর আলো করে, চন্দ্রসূর্য জগৎ আলো করে। শুনেই মনে হয় তিনি জগৎ আলো করতেই এসেছিলেন।.....'..... কিন্তু তাঁকে জীবনে ধরতে হলে শৃঙ্খলা চাই...। সুস্থ অবস্থায় হাত-পা-চোখ-মুখ-হার্টের সঙ্গে তো অমিল নেই...। তিনি তো এসেছেন—ধরে রাখতে হবে শৃঙ্খলা দিয়ে—শৃঙ্খলাই শৃঙ্খল...। সংঘত হয়ে ধরে রাখতে হয়—পাওয়া হয়েছে, রাখতে পারবে কি না দেখ নরনারায়ণ আশ্রম সত্যিকারের তাঁর পীঠস্থান—তাঁর তত্ত্ব সত্যি আমায় দিয়েছেন—বলেছেন, 'তোমার যখন যা দরকার তিনি অন্তর্যামীরূপে বুঝিয়ে দিচ্ছেন'...। এইখানের কয়টি মানুষ যদি শৃঙ্খলা-বদ্ধ হত, তবে আমি বিশ্বাস করি এইখানে তাঁর আসন রচনা করতে পারা যেত...। ধরুকরা, সাধনা সবকিছুতে বোধরক্ষঃ পরম্পরম্...। টাকা নেই জান...সংহত হলেই টাকা আসবে...। শৃঙ্খলার কথা নিত্যগোপাল তাঁর নিজ জীবনে দেখিয়ে গেছেন, মুখে বলেন নি।...নরেনের টাইফয়েড হয়েছে, ২৫৲ টাকা দিয়ে রাজেনকে পাঠিয়েছি—১০৲ টাকা পরেও পাঠাব—আমার তো নেই কিছু...। নিত্যগোপালও এমনি করে দিয়েছেন...।...এখানে শুধু মুঠো ভাত খেতে কেউ আস নি—বিরাট আদর্শ নিয়ে

বসে আছি···মানুষ হতেই হবে···। নারীর সামান্য সত্তা ও বিশেষ সত্তা মিলিয়ে সমগ্র মানুষ নারী...প্রত্যেকেরই এমন দুইটী সত্তা···। নবনারায়ণ আশ্রম নারীর নারায়ণী মূর্তি স্থাপন করবে···। নারীকে নারায়ণী হতেই হবে—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম···। গুছিয়ে কাজ করার অভ্যাস কর খাওয়া-দাওয়া বসা-শোওয়া সব সুবিন্যস্ত করে চলতে হবে···। আগের দিন পরের দিনের কাজের আলাপ আলোচনা করতে হবে সংহতি বজায় রেখে আগে থেকে পরিকল্পনা নিয়ে সকলে মিলে না করলে কিছুতেই এগোতে পারবে না।···তাঁর চরণে আমরা সংযত হই, সংহত হই···। নিত্যগোপাল, তোমার ব্যবহার মত আমার সুসংহত কর আমি তোমারই বাহন , তোমায় বয়ে বেড়ানই আমার কাজ।...

৪-১১-৪৬।···গীতায় আছে বিষ্টভ্যাহম্ ইদম্ কৃৎস্নম্ একাংশেন স্থিতঃ জগৎ—এই কৃৎস্ন জগৎ আমি একাংশের দ্বারা ব্যাপিয়া আছি উপনিষদে—পাদঃ অস্য বিশ্ব ভূতানি ত্রিপাদঃ অমৃতম্ দিবি—। পুরুষঃ এবেদং সর্বম্ যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্ উতামৃতত্বস্যেশানম্।···এই সব বাণী থেকে দুটো স্তর ধরা পড়ছে—পুরুষোত্তমের এক পাদ বিশ্ব-জগৎ—সংসারীত্ব; বাকি তিন পোয়ায় তিনি অসংসারী, সন্ন্যাসী·····। তাহলে পুরুষোত্তমকে যারা ভাবেন তারাও এইভাবে চলবেন—তিনপোয়া আদর্শ একপোয়া বাস্তব।···তাঁর মূর্তা আকাশ অর্থাৎ আদর্শ। পা নেই মাথা আছে, মাথা নেই পা আছে—কোনটাই হয় না—আদর্শ বাস্তবের সম্পর্কেও তাই। বাজহাঁসের দুধে কচ্ছপের উড়ে যাওয়ার গল্প জান তো—মাটি থেকে উড়ে যাওয়ার ফল।···ভারতবর্ষ এতদিন এই বিপদ করেছে—মাটি বাদ দিয়ে আকাশে উড়তে চেয়েছে—ইংরেজ এসে উড়ন্ত কচ্ছপকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে···। আবার মাটি নিয়েই থাকবে? শুধু সংসারী হবে? তাদের জীবন ব্যর্থ। মাথা আদর্শ, পা বাস্তব—সন্ন্যাসীত্ব যদি জীবনে না থাকে তাহলে এই জীবন সংসারের টান সামাল দেওয়া চলে না। ···পরমহংস বলতেন, অদ্বৈতবাদ সঙ্গে নিয়ে সংসার কর, হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ।...সামান্য সত্তা বিশেষ সত্তা দিয়েও এই কথাই বলতে চেয়েছি।...আমার কীকরবার সত্তা অতিক্রম করে আমি বরিশালবাসী, আমার বরিশাল সত্তা অতিক্রম করে আমি বাংলাদেশবাসী... আমি ভারতবাসী আমি বিশ্ববাসী। এই এতখানি নিয়ে আমি আমি। তামস জ্ঞান হচ্ছে অংশকে সমগ্র মনে করা··· এক আনাকে যারা ষোল আনা মনে করে, এক পায়কে যারা চার পায় মনে করে তাদের জীবন তো পঙ্গু জীবন—সে জীবন তো সসীম...। নিত্যগোপাল, আমি বিশ্বনাগরিক ···তোমার মধ্যের যাযাবরটাই তোমার সামান্য সত্তা '...যাদের নিয়ে তোমার সামান্য সত্তা ভুললে, তারাই একদিন তোমাকে কাঁটাপেটা করে তাড়িয়ে দেবে ···যারা নিত্যগোপালের কাছে এসেছ, তারা বুঝে দেখ তোমার বিশ্বসত্তা বাদ দিয়ে শুধু তোমার স্বামীপুত্র-কন্যার প্রতি দায়িত্ব মেটাতে গিয়েই তোমার সবটুকু ব্যয় করে মেরে কিনা।···বিশ্বসত্তা তোমার কীরকম—জড় জগৎ এক চতুর্থাংশ—এর ওপারে তিন চতুর্থাংশ। ঠাকুর, নিত্যগোপাল, সংসার সন্ন্যাসের এক পায় ত্রিপাদের যোগসূত্র তুমি—আমায় সংসারী কর, সন্ন্যাসী কর।... তোমাদের আমি এইরকম দেখতে চাইছি...তোমাদের সংসারের পথ আমি রুদ্ধ করি নি—কিন্তু তা কি তোমাদের সন্ন্যাসীত্বকে বাদ দিয়ে?···তোমরা সর্ব আরম্ভ পরিত্যাগী হও—তোমাদের নিজেদের আরম্ভ কিছু না থাক, আমাদের আরম্ভই তোমাদের আরম্ভ হোক। নিত্যগোপাল, যে কাজ তুমি আরম্ভ করে গেছ, তা শেষ করবার যোগ্যতা আমাদের দাও। মহানির্বাণ মঠে তুমি মেয়েদের স্থান দিয়াছিলে কেন?···নারীর দায়িত্বভাবকে আশ্রয় করে নারীকে মানুষ হওয়ার সুযোগ দিতে···।

ক্রমশঃ

স্কুল রাজ্য

।। একজন শিক্ষাবিদের অভিজ্ঞতা ।।

শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার সমস্যাটি মানব জাতির মতোই প্রাচীন এবং সর্ব্বকালে সব দেশের মনীষীগণ এই সমস্যাটি নিয়ে চিন্তা করে গেছেন। এই সমস্যাটির যে দেশে যে পরিমাণে সমাধান করতে পারা গেছে সেই দেশের সেই সময়ের জনগণের ওপর এবং তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। যে সমাজে আমরা বাস করি সেই সমাজের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে আমাদের যুগের অন্যতম বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ডাঃ কুর্ট হানের শিশু শিক্ষা পদ্ধতি বহু দেশে অনুসৃত হচ্ছে।

তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করে যতগুলি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে কনষ্টান্স হ্রদের তীরে অবস্থিত সালেম স্কুলটি বিশেষ বিখ্যাত। প্রায় ৪০ বছর পূর্ব্বে এটি স্থাপিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই ১৯২০ সালের ২১শে এপ্রিল রাজকীয় জার্মানীর শেষ চ্যান্সেলার বেডেনের প্রিন্স ম্যাক্স এই স্কুলটি স্থাপন করেন। কিন্তু বহু বছর ধ'রে এই স্কুলটির প্রকৃত অভিভাবক, স্রষ্টা ও প্রধান শিক্ষক ছিলেন ডাঃ কুর্ট হান। তিনি এখন অশীতিপর বৃদ্ধ। ২৪ জন ছাত্র নিয়ে স্কুলটি সুরু হয়। বর্ত্তমানে এটির ছাত্র সংখ্যা ৫০০, তবে সবাই সালেমে পড়াশুনা করে না। এটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত আরও তিনটি স্কুলে পড়াশুনা করে।

সালেমে যে শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা অনেক দিন পূর্ব্ব থেকেই সালেমের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। কুর্ট হান ১৯৩৩ সালে বৃটেনে চলে যান এবং যুদ্ধের পর জার্মানীতে ফিরে এসেও এখনও বছরের কয়েক মাস সেখানে কাটিয়ে আসেন। সেখানে উত্তর স্কটল্যাণ্ডে গর্ডন্‌সটাউন স্কুলটি স্থাপন করেন। এই স্কুলটিতেও বর্ত্তমানে ৫০০ র বেশী ছাত্র ছাত্রী রয়েছে। এ ছাড়া আরও কয়েকটি দেশে এই রকম কোন্ডিং স্কুল স্থাপিত হয়েছে

এই শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হল স্কুলের পরিচালনায় ছাত্রছাত্রীরাও অংশ গ্রহণ করে তাঃ হান এই লক্ষ্যকে পূর্ণ রূপ দিয়েছেন তাঁর মতে ছাত্র ছাত্রীদের অল্প বয়স থেকেই কিছু পরিমাণ সামাজিক দায়িত্ব পালন করা উচিত। এর অর্থ হল নাগরিক দায়িত্ব, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং সহপাঠীদের প্রতি সহানুভূতি ইত্যাদি গুণগুলি আয়ত্ত করার একটা সুযোগ ছাত্র ছাত্রীরা এই স্কুলে পায়। উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণের পরিচালনায় ছাত্র ছাত্রীরা যদি এই গুণগুলি আয়ত্ত করতে পারে তাহলে যে কতখানি উপকার হয় তা মা বাবারা সহজেই বুঝতে পারেন।

এই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য সালেম স্কুলে সম্পূর্ণ একটা পদ্ধতি গড়ে তোলা হয়েছে। এমন কি ১০ বছর বয়স্ক ছাত্রেরও বোর্ডিং-এ, রান্নাঘরে, বাগানে এবং মাঠে কতকগুলি দায়িত্ব পালন করতে হয়। তার সিনিয়ারগণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তার কাজে সন্তুষ্ট হচ্ছেন ততদিন পর্য্যন্ত সে স্কুলের ঘুসর রঙের ইউনিফর্ম্ম পরতে পারে না। সে যদি কাজে ভালো হয় তাহলে স্কুলের যে ছাত্রের তাদের জামার হাতায় বেগুনী রঙের ব্যাজ পরে, তাদের দলে সে যোগ দিতে পারে। এরা নতুন ছাত্র নির্ব্বাচিত করে সদস্যসংখ্যা ঠিক করে নেয়। নির্ব্বাচনে জয়ী হতে হলে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রয়োজন। কেউ যদি ভোট না দেয় তাকে অনুপস্থিত মনে করা হয় কিন্তু বিপক্ষে ভোট দিলে তাকে ভোটো বলা হয়। যারা নির্ব্বাচিত হয় সালেম স্কুলে তাদের নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা করতে হয়—

"ব্যাজধারীগণের সালেমের মর্য্যাদা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। তারা সালেমে

নিয়মগুলির দিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং এখানকার রীতিনীতি মেনে চলবে।

দুর্বলকে রক্ষা করা এবং সবলকে সংযত রাখা তাদের কর্তব্য।

তারা সালেমের ব্যাজ পাবেন বলে স্কুলের ভেতরে এবং বাইরে এর প্রতিনিধি এবং তাদের এমন ভাবে নিজেদের তৈরী করবেন যে এই প্রতিষ্ঠান যেন সর্ব্ব সময়ে সর্ব্ব বিষয়ে তাদের ওপর নির্ভর করতে পারে।

এই সব দায়িত্ব পূরণ করার জন্য যিনি নিজেকে সর্ব্বক্ষণের জন্য তৈরী রাখতে পারবেন না তাকে যদি ব্যাজ দেওয়া হয় তাহলে তার তা গ্রহণ করা উচিত নয়।"

যারা স্কুলের ব্যাজ পরিধান করে অথবা যারা ছোট একটি 'সাহায্যকারী' দলের অন্তর্ভুক্ত, যারা প্রত্যক্ষভাবে প্রধান শিক্ষকের সাহায্যকারী, অন্যরা তাদের কর্তব্যপালন করছে কিনা তা যেমন দেখতে হয়, তেমনি এর চাইতে বড় কথা হ'ল তারা তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সর্ব্বদা সজাগ থাকে।

অন্যান্য স্কুলের মতো সালেমে শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য শাস্তি দেওয়া হয়না। ছাত্ররা নিজেরাই যাতে আত্মশৃঙ্খলা গড়ে তুলতে পারে সালেমের ছাত্রদের তাই শেখানো হয়। কোন অপরাধের জন্য কোন ছাত্রকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় না। কেউ যদি কোন অপরাধ করে তাহলে সে নিজেই এসে দোষ স্বীকার করবে বলে আশা করা হয়।

চরিত্র গঠনের জন্য সালেমের একটি প্রধানিত পদ্ধতি হ'ল খেলাধূলা। সাধারণতঃ যে সব সমস্যা ছোট ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যতের পক্ষে আশঙ্কাজনক হয়, সালেমে সেগুলির অস্তিত্ব নেই। ব্যায়ামের অভাবে সাধারণতঃ যে সব রোগ দেখা দেয় সালেমে তা দেখতে পাওয়া যায়না। এখানে প্রতিদিন সকালবেলা খানিকক্ষণ দৌড়ে, তারপর এক ঘণ্টা ব্যায়াম করে দিন সুরু হয় এবং দুপুরের পরে প্রতি সেকেণ্ডে খেলাধূলা করতে হয়। দল বেঁধে খেলাধূলার ওপর এখানে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ এই ধরণের খেলাধূলা শুধু সহনশক্তি, দৃঢ়তা, পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং গতিই বাড়ায় না, স্থায় এবং যৌক্তিকতা শিক্ষা দেয়। খেলাধূলার সময় কেউ যদি সজ্ঞানভাবে অন্যকে প্রতারিত করতে পারে তাহলে সেই প্রতারণাকে উৎসাহ দেওয়া হয় না। একে স্কুলের কাজে বা পরীক্ষায় ফাঁকি দেওয়ার মতোই অন্যায় বলে ধরা হয়।

বৃটেনের সার্বিক স্কুলগুলির একটা ভালো ঐতিহ্য থাকায় গর্ডনস্টাউনের স্থানের স্কুলটিতে খুব বেশী সমস্যা দেখা দেয়নি। তাঃ হান এখানে তাঁর নিজস্ব শিক্ষানীতি ও বৃটিশ ঐতিহ্যের মধ্যে একটা সুন্দর সংযোগ সাধন করতে পেরেছেন। এখানে ছেলেমেয়েদের সহশিক্ষা অনুসরণ করা হয়নি। বৃটিশ পাঠ্যক্রম, রীতি নীতি এবং সম্পূর্ণভাবে বৃটিশ খেলাধূলা, সালেমের ছাত্রদের সহ প্রশাসন, ব্যাজ পরিধান এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি সুন্দরভাবে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে।

বহু দেশে এই ধরণের স্কুল স্থাপন করা হবে এবং জাতি বর্ণ নির্বিশেষে ও পিতামাতার আর্থিক অবস্থা যাই থাকুক, উপযুক্ত ছাত্র ছাত্রীকে উচ্চতর স্কুল সার্টিফিকেট পর্য্যায় পর্য্যন্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট সব দেশই এই শিক্ষাক্রম অনুমোদন করবে। সালেমের রীতি অনুযায়ী সব ছাত্র একসঙ্গে পড়াশুনা করবে বলে, জাতি বর্ণ ও ধর্ম নিয়ে এখনও যে রেষারেষি আছে এই ছাত্রদের মধ্যে তা থাকবে না।

দক্ষিণ ওয়েল্‌সের সেন্ট ডোনাট দুর্গে ১৯৬০ সালে এই ধরণের প্রথম স্কুল "দি এ্যাটলান্টিক কলেজ" স্থাপিত হয়। ১২টি দেশের ৫৫ জন ছাত্র নিয়ে স্কুলটি সুরু করা হয়। এতে ৪৫০ জন ছাত্র ভর্তি হতে পারবে।

ডাঃ হান সব সময়েই মনে করেন যে ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে উৎসাহ, উদারতা, কর্তব্য পরায়ণতা ইত্যাদি গুণগুলির অভাব নেই এবং এদের যদি উপযুক্ত পথে পরিচালিত করা যেতে পারে তাহলে বিশ্ব থেকে জাতি বিদ্বেষ, ধর্মান্ধতা ইত্যাদির মতো সমস্যাগুলি দূর করতে তা অনেকখানি সাহায্য করবে। *

---

* ইনফরমেশান ব্যুরো—ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা—থেকে নেওয়া।

দাক্ষিণ্য

॥ শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার রায় ॥

তোমার পরম দান,
সে মহা সম্মান
মাথা পেতে নিতে পারি যেন
দাও প্রাণ হেন।

এ জীবনে যাহা কিছু আসে
তোমার প্রসাদ যে সে,
দুঃখের অনলে যতো দগ্ধ হয়ে যাই,
খাদ ততো পুড়ে হয় ছাই।

তৈল যথা নিজে নিঃশেষিয়া,
ধূপ যথা আপনি পুড়িয়া,
আলোকের জ্যোতি আর
গন্ধ করে দান,
নিজেরে সঁপিয়া শেষে
পায় মোক্ষ, পরম নির্বাণ।

যা কিছু মহৎ
এ পৃথিবীর যাহা কিছু পরম সম্পদ,
উপযুক্ত মূল্য তার সদা দিতে হয়,
তাহা তো সহজলভ্য নয়।

তুমি যারে করো নির্বাচন
মহৎ কর্মের লাগি, বক্ষে তার জ্বলে চিরক্ষণ
প্রজ্বলন্ত হোম বহ্নিশিখা।
দুঃখের আখরে লেখা
জীবন বৃত্তান্ত তাঁহাদের ;
তাঁরা সব শাশ্বত কালের।

যেটুকু গো দিয়াছ শকতি,
অন্তরে যা দিয়াছ ভকতি,
তাহাই সম্বল করি
তোমার দুঃখের দান লব হাত ভরি

জানি আমি, রুদ্র যিনি
শিবের মঙ্গল মূর্তি তিনি,
রুদ্রের কটাক্ষে তাই নাহি করি ভয়,
দক্ষিণ মুখেতে তাঁর দাক্ষিণ্য যে রয়।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৩—

(৫৩)

২.:টি ক্রটির উপর দৃষ্টি রাখিতে হয়, সাবধান ঠিক করিতে হয়, আর নিজের জীবনকে সহিষ্ণুতায়, ক্ষমায়, উদারতায় বাড়াইয়া তুলিতে হয়। মানুষকে সহজ ভাবে আপাইয়া আসিতে দিতে হয়। গোপা তো সকলকেই ভাল বাসিতে চায়। মুখ ভার করিলে সে বেদনা বোধ করে। এইটি তো ভাল হইবার প্রকাণ্ড factor।

৩রা আগস্ট

ঠাকুর, তুমি ঘুমাইয়াই থাক, আমি আর কি করিব? তোমার বিষ আজ যে অঙ্গুলে ভাসিয়া চলিয়াছে! কে রক্ষা করিবে? চাহিয়াছিলাম তোমার যোগনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া আবার তোমাকে জাগাইব। পারিলাম না বুঝি! শরীর ক্লান্ত, মন তো অতোধিক। তোমার পথে আপাইয়া যাইতে হাত অভ্যের মতন, এ প্রার্থনা করিবার মত সাহসও আজ আর নাই। তোমাকে কত ডাকিলাম, আমার ক্ষীণ কণ্ঠ আজ অবসন্ন। তুমি তোমার জীবন ও দর্শন লইয়া এমন 'চুপ' থাকিবে, ইহা আমাকে বড় 'পীড়া' দেয়। ঐ একটি 'পীড়া' আজ কাঁটার মত বিঁধিতেছে। আজ সংসারদ্বারা আমি উৎক্ষিপ্ত। আমি চাহিয়াছিলাম সংসারকে, সংসার আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। আমা হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে চায় সকলে। আমি আর কি করিব? সজল নয়নে তাকাইয়া আছি সকলের প্রতীক্ষায়। ঠাকুর, তুমি, তুমি, তুমিই সত্য। হেমাঙ্গবাবু আসেন···। আমার Lumbago-র বেদনা বাড়িয়াছে, প্রস্রাবের উদ্বেগ তো আছেই। এবার দুইটি উপদ্রব। কয়েকদিন পর্যন্ত খুব বৃষ্টি, ঠাণ্ডা লাগিয়াছে।... কমুনিষ্টরা তেলেঙ্গানায় জমিদার খুন করিয়া যে জমি সংগ্রহ করিয়াছে, বিনোবা ভাবে তাহার অনেকগুণ বেশী ভূমি সংগ্রহ করিয়াছেন—এইরূপ একটি প্রবন্ধ অমৃতবাজারে বাহির হইয়াছে, ধীরেন বলিল। বেণু একটী কিনিয়া আনে। এবারকার সাময়িকী লিখিব।

৪ঠা আগস্ট

ঠাকুর, তোমার জীবন ও দর্শন অতুলনীয়, অদ্বিতীয়। কিন্তু তবুও তো তাহা মানুষ নিতে পারিল না। দেওয়া হইল না, তাই কেহ নিল না। কে দিবে? কেন আমাকে এমন লোভনীয় দর্শনের অধিকারী করিলে? অধিকারী যদি করিলে, তাহাকে কার্যাত্মকরূপে আস্বাদন করিবার সুযোগ দিলে কই? লক্ষ লক্ষ লোকের লক্ষ লক্ষ টাকা আছে, মানুষেরও অন্ত নাই কেহ কেহ ছুটিয়া আসিতে তো পারিত তাহাদের যথাসর্বস্ব লইয়া। প্রাণ খুলিয়া তোমার সেবা করিতাম। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক। এখনও কি উহা প্রচারের সময় আসে নাই? তবে আমাকে নিয়া টানাটানি কেন? কত দূরে সে দিন?...

৫ই আগস্ট

ঠাকুর, তোমাকে বুকে লইয়াই চলিয়াছি বজ্রাটমর এই সংসারের বুক চিরিয়া। আমার চতুর্দিকে সব যেন উথলিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির সকল স্তরকে স্পর্শ করিয়া আদর্শ যখন অগ্রসর হয়, আদর্শের সঙ্গে প্রকৃতির যখন সমন্বয় সাধিত হয়, তখনই না সেখানে তোমার জমাট-বাঁধা মূর্তির প্রকাশ হয়? আমার জীবনে তুমি এস। তোমাকে না পাইলে যে আমার চলিবে না, চলিতেছে না। একজনই কি কেহ আসিল যে আমার 'বচন' কার্যে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপণ করিল? তাহারও তো কিছু করিতে পারিলাম না। কর্তৃত্ব, পিতৃত্ব করি নাই, চাহিও নাই। চাহিয়াছিলাম সেবক হইতে, ভলান্টিয়ার-দেরও সেবক ছিলাম। কিন্তু সেবককে কি মর্যাদা দিল?

যে যতদূর করিয়াছে, (অবোধ্য) করিয়াছে, সেতকে দিয়া যতদূর পারিয়াছে আদায় করিয়া লইয়াছে বা লইতে চাহিয়াছে। আর যে সেবা করিতে পারিতেছি না ঠাকুর। তুমি আমার বুকে থেকো। ৮টায় অধীন চক্রবর্তী আসেন....

৬ই আগস্ট

ঠাকুর, তুমি আমাকে সঙ্গে রাখিও, তুমি আমার সঙ্গে থাকিও। তুমি সঙ্গী না থাকিলে এই দুর্যোগপূর্ণ সংসারে আমি কেমন করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া চলিব? আমার এ কূলে ও কূলে কেহ নাই, তুমি আছ মধ্যপথে দাঁড়াইয়া, আমি তোমার শ্রীচরণের দিকে চাহিয়াই চলিব। তুমিই আমাকে সর্বতোভাবে আবরণ করিয়া রাখিয়াছ। কাহার শরণ লইব আমি? কে আছে আমার তুমি ছাড়া? তুমি আমার জীবনে মরণে স্বামী। বৈকাল ৬টায় সত্যেন শাস্ত্রী আসে। উপরে নিয়া আসি। অনেক কথা হয়: ৺পণ্ডিত তর্কচূড়ামণি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্যেন শুনায়। নিত্যগোপাল সত্য-বাহিকীর প্রসঙ্গ আলোচিত হয়

৭ই আগস্ট

মানুষের আছে বক্তব্যার, কাহারও বা সিদ্ধুবার, আমার হইয়াছে নিত্যগোপাল-দায়। তাহাকে বুকে লইয়া চলিয়াছি; কাহাকেও তো দেওয়াইতে পারিলাম না। কেউ তো আমার নিত্যগোপালকে নিতে চায় না। আমার নিত্যগোপাল কি কাপাকড়ি যে নিতে চায় না? সে কি মদ, না খোঁড়া, না পঙ্গু? সে যে জীবন-আলো করা ধন! কেন তাহার স্থান নাই এই বিশ্বে? আমি যে দায়মুক্ত হইতে পারিলাম না। কেমন করিয়া তাহাকে পার করিব, নিত্যগোপাল-দায় হইতে মুক্তি পাইব—তাহাই আমার দিনরাতের ভাবনা। ভাবিয়া ভাবিয়া আমার অন্ন-জল আমার ভাল লাগে না। আমার অন্ন মুক্তির প্রয়োজন নাই। আমি চাই নিত্যগোপাল-দায়-মুক্তি।...৯টায় (নিত্যগোপাল সত্যবাহিকী) সভার কাজ আরম্ভ হয়। আমাকে সহ-সভাপতি করে (ঠাকুর সভাপতি)।...জনরঞ্জনবাবু উচ্ছলভাবেতে নিত্যগোপাল সম্বন্ধে সেবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। বলেন—ঠাকুরের সেবার ভিতর এত hidden-তত্ত্ব ছিল, তাহা আমরা জানিতাম না আপনি ছাড়া আর কেহ এই তত্ত্ব বোঝে নাই।...ব্যাপকভাবে প্রচার করা দরকার—ইহা সকলেই বলিল। জনরঞ্জনবাবু বলেন, টাকা সংগ্রহের উপরে প্রচার নির্ভর করে। আমি বলি, যাহা করিতে হইবে, তাহা লইয়া লাগিয়া পড়ুন, পরে টাকা আসিবে। জনরঞ্জনবাবু বলেন, উহা আপনার সঙ্গে সাজে। এই কাজের জন্য ৫০ টাকা স্থির করিয়া আসি। ওকালের বাসায় যাই।...

৮ই আগস্ট

রাজরাজেশ্বর, তুমি অযাচিত করুণায় ভিখারীর দুয়ারে আসিয়াছ, আমি তোমাকে আমার দেহ-প্রাণ-মন দিয়া বরণ করিতেছি। তুমি আসিয়াছ, অপরিচিতই রহিয়া গেলে; অথচ তুমিই বর্তমান বিশ্বের সব-চেয়ে পরিচিত, জানা-শুনা। কেননা তুমিই যে বিশ্বের সব সমস্যার সমাধান। অথচ তোমাকেই সে চিনিতেছে না, পাইতেছে না, উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। তুমি তোমার নিজের আলোকে বিশ্বের সামনে উদ্ভাসিত হও। তোমাকে বিশ্ব চিনিয়া লউক। তবেই বিশ্ব ধন্য হইবে, সুস্থ হইবে, নিজকে ফিরিয়া পাইবে। আজ সে আত্মহারা।...আজ আর গীতাভবনে যাইতে হয় নাই। এখানে গীতাপাঠ হয়—'অজ্ঞেভ্যোঽহং' ইত্যাদি শ্লোক।...

৯ই আগস্ট

ঠাকুর আমার, আমার সারা জীবনের সঙ্গী তুমি আছ বলিয়াই এই ঝড় ঠেলিয়া আজও চলিয়া যাইতেছি। এই ঝড় কি আমার জীবনে পরিণাকপ্রাপ্ত হইবে না, ঝড় কি উৎসাহে গড়িয়া উঠিবে না? তোমার জীবন ও দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও দর্শনকে, শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও দর্শনকে পরিপাক করিয়া সমুজ্জ্বল। তুমি 'সর্বভূতাত্মভূতাত্মা'—সর্বভূতের আত্মভূত হইতেছে তোমার আত্মা অর্থাৎ দেহ। তাই তোমাকে দেহকে স্পর্শ করিয়া কত দুঃখ কত ইতর প্রাণী, কত মানুষ ধন্য হইয়াছে। আমার জীবনে তোমার আসন প্রতিষ্ঠা কর। আমি তাহা যদে

ঘরে প্রার্থনা করিবে।...এত অল্প দিনে সত্যব্রত বেহালা পড়িয়া যাইবে, ইহা কোন রকমেই হইতে পারে না। ইহা আমার পক্ষে সাজে না। সত্যব্রত একটী কথাও বলে নাই, চলিয়া আসিয়াছে... সত্যব্রত আমার কোঠায় আছে আমি একতলায় শুইয়াছি। প্রতিভা রাত্রিতে সত্যব্রতর পাশের বিছানায় শুইয়াছে। যতদূর পারিলাম, ইহাদের জন্ত ও মানুষের জন্ত করিয়া গেলাম। মানুষ তবুও পাই নাই কোনও অভিসন্ধি আমার ইহার মধ্যে নাই। কাহাকেও দিয়া নিজ স্বার্থ খুঁজি নাই। প্রাণই আমার সকল 'কর্তব্য' বলিয়া আমার কিছু নাই। 'ন মে কর্তব্যম্ অস্তি ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন'। কেহ আমাকে উপরের ঘর ছাড়িয়া নীচে চলিয়া আসিতে বলে নাই। বলিবার সাহসই বা কাহার আছে। কিন্তু যাহা সঙ্গত, তাহা আমিই করি, কাহারও বলার অপেক্ষা আমি রাখি না। ইহারা 'তার' নিবার সাহস রাখে না, অথচ ইহারা কর্তৃত্ব দাবী করে। প্রাণের সঙ্গে লড়াই করিয়া কাহারও কিছু লাভ নাই, নিজেই নিজের জালে জড়াইয়া পড়িবে। আমি প্রাণ, আমার সঙ্গে লড়াই চলে না। প্রতিভার উপরে যাওয়া নিয়া—এক সময়ে বলিয়াছিল, উপরে হাসপাতাল করিতে দিব না। আজ তো সেই হাসপাতাল হইয়া পড়িয়াছে। কাহারও কিছু নিয়াই দ্বন্দ্ব বা বাড়াবাড়ি এ জগতে চলে না।...বিকালে বিরজা আসিয়াছিল।...আমার সঙ্গে আলোচনা করিয়া সব কিছু মীমাংসার কথা বলি।

১০ই আগস্ট

ঠাকুর, বড় বড় আমার চক্ষুদিকে। তোমার আমার অদ্বৈত মিলনের মাঝে কি এই বড় পরিণাম প্রাপ্ত হইবে না? কি ইহার অন্তর্নিহিত প্রয়োজন? ইহারা সকলেই আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, আমার কি সংহত করিবার জন্ত তুমি এই বড় আনিয়া ফেলিয়াছ? সামনের কোন গঠনাত্মক বাস্তবকে গড়িয়া তুলিবার জন্ত আমার চক্ষুদিকে এই বড়? এমন করিয়া কি কোন মানুষের সকল দিকে ব্যাধির প্রকাশ হয়? নশ্বরাণী অসুস্থ, প্রতিভা অসুস্থ, আমার শরীরও ভাল নয়। জলের মত টাকা খরচ হইয়া যাইতেছে, অথচ হাসিয়া না নিয়া তো উপায় নাই। বীরেন ৪টার পর আসে। সত্যব্রতর আজ ১ ডিগ্রি জ্বর গত দিনের থেকে কম। রেণু খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেলল কেমিক্যাল হইতে ফাজ কিনিয়া আনে।...পঞ্চমণির আজও ১০৩° জ্বর হয়।...সন্ধ্যার পর বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় আসেন। 'কর্ণ ও অর্জুন' সম্বন্ধে আশ্বিন মাসের জন্ত একটী প্রবন্ধ লিখিতে বলা হয়....

১১ই আগস্ট

আমার পরাণপুতলী, কিশোরীর ব্রজবাসীর ঘন রাধারাণী আমার, বিশ্বের সকল বেদনা, সকল স্পন্দন মথিত হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে রাধা নাম, সকল বেদনার গানের পরিপূর্ণ সার্থকতা তোমার জীবনের গানের কিন্তর, তুমি আসিয়াছ আমার জীবনের আঙিনায়, কি দিয়া আমি তোমাকে বরণ করিব, আদর করিব? আমার দেহপ্রাণমন দিয়া তোমাকে বরণ করিব। আমার দেহপ্রাণমন তোমার খেলার সামগ্রী হউক, তুমি আমাকে নিয়া খেলা কর। রাধানাথ নিত্যগোপাল, আমার দেহপ্রাণমনে তুমি রমণ কর। রাম আমার, রাধারমণ আমার, তোমার রমণী হওয়াতেই আমার চরম সার্থকতা।...২ টার পর রসিকলাল শুধু আসে—তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার কৌশল কি তাহা আলোচনা করি—'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি', 'শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ', 'স্মরণং পরিশীতং' 'বিজাতপ্রাণনিরোধ', 'একবার কৃষ্ণ নাম' বৈকালে আমার খাবার হইতে তাহাকে মনাক্কা, ছানা ও পনা প্রদান দেওয়া হয়। রসিক আমার খালা চুইয়া যায়। পক্ষীকরণ শুদ্ধ আলোচনা করিয়া প্রত্যেক রসেরই সমান মর্যাদার কথা আলোচনা করা হয়। আমার জীবনেই রাধাকৃষ্ণ আছেন, আমাকেই ভালবাসিতে ও এক বলিয়া ভাবিতে বলা হইয়াছে। যাহা কিছু আমার তাহা সবই তাহার। গুরু-শিষ্য এক অদ্বৈত, যেমন স্বামী-স্ত্রী এক অদ্বৈত। সন্ধ্যার পর বীরেন আসে।...

১২ই আগস্ট

পুরুষোত্তম, তুমি আসিয়াছ বিশ্বের সকল বিকার নিজ গায়ে মাখিয়া বিশ্বকে নির্বিকার করিতে, বিশ্ব বনিয়া যাইতে। আমিও তোমার যা-কিছু নিজ জীবনে বরণ করিয়া তুমি বনিয়া যাই। ওগো মহানির্বাণ, তোমার মাঝে আমি নির্বাণ লাভ করিব, যেমন তুমি চাহিতেছ এই বিশ্বের মাঝে, প্রতিটী বিশেষ জীবের মাঝে মহানির্বাণ লাভ করিতে। তোমার আমার বিশ্বের পারমার্থিক মহানির্বাণ আমাদিগকে পুরুষোত্তম রূপে গড়িয়া তুলিবে। তোমার জয় হউক। সব-কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞান তোমার শ্রীচরণ হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে।···বেণু মন্থর বাসায় যাইয়া এখানকার খবর দেয়।··· সন্ধ্যার পর দেবকীকুমার বসু দলবলে মোটরে আসেন। তাহাকে গৌরসুন্দরের তত্ত্ব কি তাহা বলি। রাজরাজেশ্বর আজ প্রকৃতির চরণতলে —শ্রীগৌর-জীবনে ইহাই জমিয়া উঠিয়াছে। তাই প্রতাপরুদ্র আজ জনসমুদ্রের মাঝে দাঁড়াইয়া পথের ধূলি ঝাঁট দিতেছেন। 'দেহি মে পাদপল্লবমুদারম্' ...মনকে বেণু রাখিয়া আসে।···

১৩ই আগস্ট

নিতাগোপাল, স্বামী আমার, আত্মারাম আমার, আমার দেহ-প্রাণ-মন-বিজ্ঞান ও আনন্দে তুমি রমণ কর। আমি তোমার রমণী হইব। তুমি আমি এক-তত্ত্ব, এক-প্রাণ, এক-মন, এক-বিজ্ঞান ও একানন্দ। তুমি আমি অদ্বৈত ছিলাম বলিয়াই এত ঝড় ঠেলিয়া চলিতে পারিতেছি, নইলে কোথায় কবার ধূলিতে মিশিয়া যাইতাম। আজও যে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া চলিতে পারিতেছি, যেখানে পারিপার্শ্বিক কাহারও স্থিতি নাই, সেখানে যে আমি চলিতেছি তাহা কি তোমারই শক্তিতে সম্ভব হইতেছে না? তোমার জয় হউক। আমাকে ছুটিতে দেও ঝড়ের বেগে। দিন যে আর নাই। কবে তোমার প্রতিষ্ঠা হইবে? তোমার কথা ছিল, আর তো কাহারও কোন কথা দেখিতেছি না। সকলেরই তো প্রায় এক কথা।···ইহাদের বুদ্ধি আমার ভাল লাগে না। জীবনে কোন কিছুই ইহারা করিল না। সারা জীবন এইভাবেই ইহারা চলিল। এত বড় বাড়ী যদি কাজে লাগাইত, তবে কত তরী-তরকারীই হইতে পারিত। এক একবার বলিতে ইচ্ছা হয়—এখনও আমার সঙ্গে যুক্ত হও। আমি আমার পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিব। আজ এই কথা প্রতিভা বেণু মিত্রকেও বলি। আমি পথ পাইয়াছি, সেই পথ বাহিয়া অন্যকে নিয়া গিয়া উৎকৃষ্ট পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। কেউ তো আসিল না। ডাকিলাম, টানাটানি করিলাম। পাইলাম না কাহাকেও; অথচ কেহই তো কিছু করিল না। সত্যব্রত এত যোগাতা নিয়াও আজ ব্যর্থ। আমার সঙ্গে থাকিলে আমি কাজে লাগাইতে পারিতাম। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, শরৎবাবুর একটি সুপুত্র হইয়াছে। অনেক অপেক্ষা তাহার জন্য করিয়াছি।...

১৪ই আগস্ট

ঠাকুর, তোমার ব্রহ্ম-জীবনের অনুসরণ করিয়া চলিব, তোমার আচরণে আচরণ মিলাইব, তুমি যে পথে বিচরণ করিয়াছ, আমি সেই পথ বহিয়া চলিব। অন্য পথে চলিব না, তোমার চরণের দিকে চাহিয়া চলিয়া যাইব। তোমার বিচরণ-পথই আমার বিচরণ পথ, তুমি-আমি সখা, সমান আখ্যা লইয়া চলিয়াছি। তোমার সঙ্গে আছি, আমার সঙ্গে তুমি, একই পথে এক সঙ্গে প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া চলিব। তুমি আমার আনন্দের দিক, আমি তোমার সাহসের দিক। তুমি-আমি মিলিয়া এক অদ্বৈত তত্ত্ব। এখানেই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। আজ এ-দেশ হইতে ইংরেজ বিদায় লইয়াছে। এখন নিজেদের ঘর নিজেদের গুছাইয়া লইবার সুযোগ আসিয়াছিল। কিন্তু রাষ্ট্রসাম্যক কাজে ব্যাপৃত বাংলা কিছু গড়িবে না। সে 'নেতি'-র উপাসক। এ দেশের দুঃখ নামিয়া আসিয়াছে। কমুনিস্ট পার্টি বলে—'এ স্বাধীনতা ভুয়া'। সত্য স্বাধীনতা গড়িয়া তুলিবার জন্য যে গঠন-মনোবৃত্তি দরকার, তাহা কোথায়?...আনন্দবাজার পত্রিকায় সত্যেন মজুমদারের 'স্বাধীনতার পর' প্রবন্ধটী ভাল হইয়াছে। ঐরূপ একটী প্রবন্ধ বাংলার সংবাদ পত্রে অনেকদিন বাহির হয় নাই।··· আজ (১৫ই আগস্ট) বর্তমান যুগের 'বিজয়া দশমী'। মনে পড়ে প্রথম বৎসর এই দিনে যখন পাবনা ছিলাম, প্রত্যেকের নিকট বিদায়ের প্রীতি আলিঙ্গন জানাইয়াছি।

পদ-শাসন হইতে মুক্তির মূল্য কত বড় !...

১৫ই আগস্ট

ঠাকুর, তুমি আমার সঙ্গী, সঙ্গে সঙ্গে আছ, আমাকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছ আমি চাহি বা না চাহি, তুমি আছ সঙ্গে সঙ্গে আমার এমন হুয়াস আর কে বা আছে? কার শরণ আমি আর লইব? তুমি আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিবার উপযোগী স্থিতি দিয়াছ, চলিবার মত গতিবেগ দিয়াছ, নবল রক্তের মাঝে, এত সারা দিন পর গ্রামোফোনের বাজনার মাঝে ঘুমাইবার মত স্থিরতা দিয়াছ। নইলে কি আমি বাঁচিতাম? রক্তের শাস্ত্র মানিয়া লইয়াছি, ঘরে নিশ্চিন্ত থাকিবার কৌশল তুমিই শিখাইয়া দিয়াছ। তাই আজিও আমি আছি, লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে ভালই আছি। তোমার জয় হউক। আজ ৬টায় সোপার তাপ ৯৭, সত্যব্রতের তাপ ৯৭.৮ ।...মীরা ও নন্দু আসে ...মনের অর্থ, শাক্ত বৈষ্ণব কোন্ সম্প্রদায়ের ইহারা, গুরুমন্ত্র, ইষ্টমন্ত্র প্রভৃতি প্রশ্ন মীরা করে, আমি বুঝাইয়া দেই। তাহাকে এখন হইতেই নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এটা চলাফেরা অভ্যাস করা ভাল। গীতাপাঠ হয়, নীচে হয়। উষাদিদি নীচে আসে। বৃত্রহার পর অঙ্কের মধ্যে বিশ্ব রহিয়াছে—ইহার ব্যাখ্যায় পকারি বিদ্যার উল্লেখ, সারা বিশ্বময় ঘুরিয়া জন্মগ্রহণের রহস্য আলোচনা করি। জীব তো প্রতি মুহূর্তে মরিতেছে বালা মরিয়া কৌমার হইল, বাল্যের জন্য কেহ তো কাঁদে না। তবে শেষ মরণের জন্যই বা কাঁদিবে কেন?...

১৬ই আগস্ট

ঠাকুর, তুমি আর আমি এই অজানা-অচেনা প্রাণ-পথ বহিয়া চলিয়াছি—... এ পথে কেউ চলে না। সকলেই চলিয়াছে হয় এটা নয় তো ওটা-র পথে; মাঝপথে কেউ নাই। তুমি এই পথের আদি যাত্রী, আমাকেও টানিয়া লইয়াছ। আমি ছাড়া তোমার চলে না, তুমি ছাড়া তো আমার চলেই না। আমি বিশ্বাস করিব যখন তুমি আমাকে আকর্ষণ করিয়া এই পথে আনিয়াছ, তখন এই পথে চলিবার সমস্ত সুযোগ তুমি করিয়া দিবে। তোমার সত্যব্রতই কি তোমার এই হৃদয়ের পথ খুঁজিয়া চলিয়াছে? ...রেণু ১১টায় পথ বাহির হইয়া পি, এম, জি অফিসে তারাদের চিঠির উত্তরটা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়, সুবোধ বাবুর সঙ্গে দেখা করে, বেলল কেমিক্যালে যায়, নিরাময় হইতে নিত্যব্রতের X-Ray প্লেট নিয়া আসে।...সকালে causality সম্বন্ধে জিন্স্ এর বইটা দেখি,...

১৭ আগস্ট

ঠাকুর, একদিন তুমি শুনাইয়া গিয়াছ, 'অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'—আমি তোমার সঙ্গে 'অনন্ত' হইব। তুমি তো আমার অন্য নও, তুমি ও তোমার বিশ্ব ছাড়া 'অন্য'ও কিছু নাই, একান্ত আমাকে বা একান্ত তোমাকে বেত্র করিয়াও অন্য কিছু নাই। একই পরম সত্তায় তুমি আমি দুই দিক। দেহে মনে প্রাণে বিজ্ঞানে আনন্দে তুমি আমি অনন্ত, এক, অদ্বৈত। তোমাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া আমি তোমার চিন্তা করি—তাই আমি আজ নিত্যাভিযুক্ত। তোমারই অপর দিক আমার পথচলার মধ্যে যাহা কিছু প্রয়োজন, তুমি মাথায় করিয়া বহন করিতেছ। আমার তার বহাই তোমার আনন্দ। ...রেণু সকালে লেক মার্কেট হইতে·· বাজার করিয়া আনে। রেণু দুইটি, পোস্টাফিস ঘুরিয়া আসে।...রেণু আবৃত্তি করে। আবৃত্তির পর রেণু সুবোধের ডিসপেন-সারীতে যায়।·· কিতীশ চক্রবর্তী আসে, শতবার্ষিকীর কি করা যায় তাহার আলোচনা করিতে। কাল একটি সভা আহ্বানের জন্য নোটীশ দিতে বলিয়া দেই।· ·

১৮ই আগস্ট

রাধারাণী, আমার পরাণপুতলী, আমার প্রকৃতি তোমার পরা প্রকৃতিতে গড়িয়া উঠুক, আমার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি তোমার পুরুষোত্তমাভিমুখিনী বৃত্তিতে গড়িয়া উঠুক। তোমার কৃষ্ণ-অভিসারে আমাকে সঙ্গিনী করিয়া লও, আমি তোম'র সঙ্গে যাব।·· তোমার জগৎ তোমার ভাবে গড়িয়া তোমার কাছে নিবেদন করিবার আনন্দ আমাকে পাইয়া বসিয়াছে, আমাকে দয়া কর।···২টায় আমি উপরে যাই। সত্যব্রত বিশ্বনাথ ও বড় বৌর সামনে আলোচনা

করি। আমার সঙ্গে যুক্ত হইবার কথা তোর দিয়া বলি। যুক্ত হইলে এক বৎসরের মধ্যে তাহাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা গড়িয়া তুলিতে পারি। যে দর্শন আমি পাইয়াছি, তাহা লইয়া কলিকাতার সামনে দাঁড়ানো যায়। পথ আছে। এই সংসার অনন্ত ছিদ্রযুক্ত কেহ পথ দেয় না, নিজের পথ নিজের বাহির করিতে হয়। আমি সে-পথের খোঁজ পাইয়াছি। তাহাদের অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া দেই। সকালে অনাথবন্ধু আসে। আগামী শনিবার তাহার আশ্রমে সভায় বক্তৃতা করিতে যাইব। সে নিয়া যাইবে তাহার গাড়ীতে। বৈকালে সন্তোষ আসে। সন্ধ্যার পূর্বে যায়।...যীবেন ব্যানার্জী 'মহাভারত রিয়াট পর্ব' শীর্ষক প্রবন্ধ নিয়া আসে। উহা পাঠের মধ্যে সুরেশ গুপ্ত ও বিভেন্দ্র ঘোষ আসে।...

১৯শে আগস্ট

ঠাকুর, সমস্ত প্রদীপ যখন নির্বাপিত, সমস্ত উপেক্ষা ও অনাদরের বাদল যখন ঘন হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার মধ্য দিয়া একাকী বুকের ব্যথা বুকে চাপিয়া পথ চলার একমাত্র সঙ্গী তুমি। তুমি আছ আমার সামনে আলোক স্তম্ভরূপে; তুমিই আমার আশা। আমার বুকের ভিতরকার উন্মাদনা তোমারই চরণে নিবেদন করিতেছি। আমার এই পাগলামী লইয়া আমি কি করিব? আমায় ছুটিতে দেও, তোমার বিশ্বকে তোমার দর্শন ও জীবনের ছাঁচে গড়িয়া তোমার চরণে নিবেদন করিবার শক্তি আমায় দেও। আমি ঝড়ের মত ছুটিতে চাই। তুমি অযুক্ত হও।... আমি জীবনে কখনও জন সমুদ্রের চাপে পড়িয়া নিষ্পেষিত হই নাই আমি সব সময়েই সামনে ছিলাম। আমি ছেলেদের জন্য যতদূর পারি আজও করিতেছি। তাহারা আমার জন্য এখন আর কিছুই করিতে পারিতেছে না। তাহাদেরটা আমি খাইও না। আমার সামনের দিক খোলা। আমার ঠাকুর আছেন, তাই কেহ কিছু না করিলেও আমি তাহাদের জন্য করিতে পারি ও করিব কেউ আমাকে থামিতে পারিবে না। আমি ধরা পড়িব না। জীবন-পথের পথিক না হইলে কাহাকেও তেমন করিয়া ভাল লাগে না। সে যতই প্রিয় হউক না কেন। কাহারও সম্বন্ধে আমার মনে কোন গোপন কথা নাই, তাই কাহাকেও আড়াল করিয়া চলিবার দরকার নাই। কিন্তু মানুষ আমাকে আড়াল করিয়া চলিতে চায়, কতই না গোপন করে! যাহার সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা আমার তাহাদিগকে বলা হইয়াছে।...পূজার পর ছাদের উপর পাঠের বন্দোবস্ত করিতেই হইবে। পাঠের মধ্য দিয়া আবার বাহির হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।... রমেন্দ্রের স্ত্রীর খুব অসুখ বিভেন ঘোষ বলিল। আমার এখানেও হাসপাতাল! অথচ যাতায়াত নাই। অবস্থার কি বিপর্যয়! মানুষ কি এমন করিয়াই দূরে সরিয়া যায়?

২০শে আগস্ট

ঠাকুর, তোমার আমার নিগূঢ় সম্বন্ধের মধ্য দিয়া উদ্ভব হইবে পরা শক্তির 'motion is relation'— Jeans। যেখানে সম্বন্ধ নাই, সেখানে গতিও নাই। আমি-হীন তুমি অগতি, তুমি-হীন আমিও অগতি। অগতি তুমি এবং অগতি আমি যখন প্রেমের বন্ধনে বদ্ধ হই, তখনই সেখানে উদ্ভব হয় সামনের দিকে আগাইয়া চলিবার শক্তি। ...।...বলে, আপনার মত লেখক বাংলাদেশে নাই, তবে সিদ্ধান্ত ঠিক হয় না। যাহারা বর্ণাশ্রমের সমর্থক, যাহারা প্রচলিত চিন্তাধারার বাহক, তাহাদের কাছে সিদ্ধান্ত তো ভাল ঠেকিবেই না।.. কোনও group-এর নই বলিয়াই আমরা অভিযুক্ত।...সত্যাগ্রহও নামে...মামলা রায়ের হইয়াছে।...ইহারা যে কি রিয়াটের মধ্যে আছে ভাবিয়া কূল পাই না। আমা হইতে দূরে সরিয়া গিয়া কি ইহাদের কোন লাভ হইল? আমি আছি ইহাদের মধ্যে, অথচ কোন কল্যাণই তো করিতে পারিলাম না। কত মানুষ আসিয়াছিল, আমাকে দিয়া কাহারও বোধহয় কিছু হয় নাই। কেউ তো বলে না যে আমাদ্বারা তাহাদের জীবনে কিছু লাভ হইয়াছে। আমি যদি বড়, তবে আমার আশে পাশে যাহারা তাহারা এমন ছন্নছাড়া থাকে কেন? বড়লোকের আশে পাশের লোকেরা তো না খাইয়া মরে না। রেণু বলে, অহংপত্ত মন বলিয়া

দুঃখ পায়। সত্যিই বোধ হয় তাই। মুক্ত থাকিলে কল্যাণ হইত, এ বিশ্বাস আমার আছে। আমার সামনে যে বিরাট ক্ষেত্র প্রসারিত ছিল, তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইত, যদি মুক্ত থাকিতে।...

২১শে আগস্ট

ঠাকুর, হুগলী মঠে তোমার বাল্যকালীন একদিন স্বপ্নে আমাকে বলিয়া ছিলে, ওঠ, আমাকে দেখ। আমি মশারি খাটাইয়া ঘুমাইয়া ছিলাম। আমি বলিলাম, আমি যে শাক্ত। তুমি বলিলে, 'শক্তি তো আমারই শক্তি, শক্তি কি আমা হইতে স্বতন্ত্র? ওঠ, দেখ'। আমি বলিলাম, 'স্বপ্ন যদি করিলে আমাকে যুগল হইয়া দেখা দেও'। আমাকেই বাঁয়ে নিয়া রাধা সাজাইয়া আমাকেই দেখা দিলে। এই স্বপ্নের কথা তোমার কাছে সেই দিন বা পরের দিন বলি। তুমি বলিয়াছিলে, 'যখন তখন যার তার কাছে বলো না'। যখনই কড়ের মধ্যে পড়ি, তখনই আমি আমার স্বরূপ চিন্তা করি—আমি রাধাস্বরূপ, আমি রাধারূপ। শান্তির বাপ বৃন্দাবনে একদিন বলিয়া ছিলেন, 'নিত্যগোপাল যদি গৌর, আপনি শ্যামধর'। বলিয়াছিলেন মনে আছে, কথার তেমন মূল্য সেই নাই। 'আমি রাধা, আমি রাধা'—ইহাই আমার সারা জীবনের ধ্যান। সকালে মাখনবাবু আসেন। প্রায় ৪টার অনাথ বাবু তাহার ছোট গাড়ী নিয়া আসে। আমি ও প্রতিভা যাই।...৫।৫॥টায় আলোচনা আরম্ভ হয়।...'বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং। কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিবৃংহণৈঃ।...' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই শ্লোককে ভিত্তি করিয়া আলোচনা করি। বৃন্দাবনের রসকেলি হইতেছে মায়াবাদের প্রতিবাদ, জড়কে অজড়ের ভাবে গড়িয়া তোলা। মহাপ্রভুর মায়ের জন্য বেদনাও মায়াবাদের প্রতিবাদ। 'স্মরগরলখণ্ডনম্' ইত্যাদি আলোচনা করি। জড়ের দাসীর মধ্যে অজড় অবতরণ করিয়া নিজকে জড়ের মধ্যে মুছিয়া জড়ময় হইয়া যাওয়ার লীলাই ব্রজলীলা। মহাপ্রভু ইহা বিশ্বময় ছড়াইয়া দিতে আসেন, শ্রীরূপ তাঁহার instrument। মহাপ্রভু রূপ-রঘুবিলাসের জন্য কোচকে বাঁধিয়া জগন্নাথদেবের প্রসাদ নিয়া যাইতেছেন, ভাবিলে প্রাণ পুলকিত হয়। সোনে দুই ঘণ্টা আলোচনা হয়। আলোচনার পর ২০ মিনিট প্রণাম করে শ্রোতাগণ। আলোচনা ভাল হইয়াছে। অনাথবন্ধুর ঘরে নিয়া বসি। বাধরামন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আলোচনা হয়।...

২২শে আগস্ট

ঠাকুর, আমার জীবনের পথ-চলার ক্লান্তি গ্লানি অনাদর উপেক্ষার বেদনা হইতে মুক্ত করিবার জন্য তুমি সখারূপে, সঙ্গীরূপে, বন্ধুরূপে, পরমসুহৃৎস্বামীরূপে আমার সকল ভার বহিয়া চলিয়াছ। নইলে এত ভার কি আমি বহিতে পারিতাম? তুমি আমাকে বিষয় ভূল হইতে মুক্ত করিয়াছ। বিষয়ীদের কর্ম কত ছোট, আমার কর্ম বিশ্বজোড়া; বিষয়ীদের জ্ঞানের পরিধি কত ক্ষুদ্র, আমার জ্ঞানের পরিধি বিশ্বব্যাপী, আমার আনন্দ বিশ্বময়, আর সংসারীদের উহা কত ছোট! আমার আপন জগন্ময় আর বিষয়ীদের? তুমি আমাকে বিশ্বজয়ের সঙ্গে চলিবার সাহস, উৎসাহ,উদ্দীপনা দিয়াছ, সঙ্গে থাকিয়া তাদের চাপে নিষ্পিষ্ট হইতে দেও নাই। তোমার জয় হউক।...৩।৩॥টায় আজ ৫।৬ মাসের অন্তরঙ্গবাহিকীর প্রশ্ন পাঠ হয়। ব্যাখ্যা করা হয়। রবীন্দ্রনাথের ও শরৎচন্দ্রের কল্প ও কল্পাতীতের সমন্বয়ের কথা বুঝিবার কি কেহ বাংলাদেশে নাই? অনিত্যের নিত্য নাচন, কি অদ্ভুতপূর্ব রসাস্বাদন! শরৎচন্দ্রের কুহেলিকা অনিত্য, কিন্তু যতদিন সূর্য থাকিবে ততদিন কুহেলিকাও আচ্ছাদন করিবে—ইহাও তুল্যভাবে সত্য। কুহেলিকা অনিত্য হইলেও এই ভাবে নিত্য। দার্শনিক এই মতবাদের আশ্রয় না নিলে জাতি বাঁচিবে কি করিয়া? কিন্তু কে এই দর্শন ছড়াইয়া দিবে? বুকের মধ্যে যে উন্মাদনা লইয়া চলিয়াছি, তাহা কেমন করিয়া সার্থক করিব?...

২৩শে আগস্ট

ঠাকুর, তুমি আমার জীবনকে অপরিছিন্নভাবে ছাঁচে গড়িয়া চলিয়াছ, আমি তোমার মাঝে 'নাই' 'নাই' করিয়াই থাকিব—'অকূলের অমৃত মথিবে চকলতার নাচে বিশ্বলীলা তো কেবলি যে নেই নেই করে আছে'। নিত্য তুমি, অচঞ্চল তুমি, তোমার অমৃতে মথিবণে আমার জীবনের

চঞ্চল পদ-বিন্যু অন্তত হইয়া উঠুক, নিত্য অনিত্যের সমন্বয় সংসাধিত হউক। অনিত্য যারা তারা আমার জীবনে নিত্য নাচন নাচুক। অনিত্যের বুকে নিত্যের রাসলীলা প্রতিষ্ঠিত হউক। ৮টার পর ধীরেন রায়ের বাসায় যাই। ধীরেন রায় গত মঙ্গলবার মারা গিয়াছে। সে আমাকে প্রীতির চোখে দেখিত। মৃত্যুর দিনটির যাবতীয় কাজ সে করিয়াছে। তাহার মৃত্যুতে বেদনা বোধ করিতেছি।...মঠে গিয়া জানিলাম গত শনিবার সভা হয় নাই। সভা অনুষ্ঠান করিয়া সভা হয় না, ইহা আমি কোনও দিন শুনি নাই। ইহার কারণ শুনিবার জন্য ট্রাস্টবোর্ডের নিকট একটি চিঠি দিব ভাবিয়া একটি মুসাবিদা করিয়া নিয়া আসি। এখান হইতে পাঠাইয়া দিব। জয়া আসে আমার মঠে যাওয়ার পর।...সত্যব্রত গত রাত্রিতে প্রতিভার কাছে আমার এই মাসের 'বিনোবাজী ও ভূমি বণ্টন' প্রবন্ধের আলোচনা করে, উহা শুনিয়া খুব বেদনা বোধ করি। আমাদের একমত হইলেই তো ভাল হইত। তাহার মুখ দিয়া আমার সমালোচনা তো ভাল শুনায় না। সেবা করিলাম, কোনও অভিসন্ধি ছিল না। পাই নাই কাহারও বিদায় আমাকে দিয়াছে একরূপ সকলেই। বিদায় হই নাই। 'বের হও'—ইহা কতবার শুনিয়াছি। সবই আজ আমি বাহির হইয়াছি।...

২৪শে আগস্ট

ঠাকুর, আমার জন্য সকল দুয়ার রুদ্ধ। সবাই বলে 'চলে যান'। চলিয়াই তো আসিয়াছি, বাহির হইয়াই তো পথে দাঁড়াইয়াছি। আজ আমার সকলই আপন, সকলই পর। বিশ্বের মাঝখান দিয়া চলিয়াছি। সত্যব্রতের হইতে পৃথক আর, পৃথক স্থানে থাকিব, ইহা কোনও দিন কল্পনাও করি নাই। বেশ করেছ কালী। আজ কাহারও আমি নই, সকলের আমি। পর আজ আপন, আপন আজ পর। বিশ্বের বাহির হইতে বিশ্বের সেবা করিব বিশ্বই আমাকে বাহির করিয়া দিয়াছে। আমি বিশ্ব ছাড়ি নাই, বিশ্ব আমাকে ছাড়িয়াছে। নিত্যগোপাল, তোমার জয় হউক।...—সব সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ছিলেন আমার এক চিঠি দিয়াছেন ইহাদের কি consistency বলিয়া কিছু নাই? কি দুরবস্থা ইহাদের। সত্যব্রতের মামলায় ধীরেনের দেওয়া সার্টিফিকেট হাজির করিলে এক মাসের সময় দিয়াছে। ইহারা আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দাঁড়াইতে পারিল? ক্রমে ক্রমে সোনঠাসা হইতেছে। আমার সাধনের দিক অনন্ত প্রসারিত। তবুও কি ইহারা ফিরিয়া আসিবে? যাহারা কথা বলিলে চুপ করিয়া থাকে, তাহাদের যে কোনও কথা নাই, তাহা নয় তাহারা প্রাণ খুলিয়া আলোচনায় যোগ দিতে উন্মুখ নয়। অথচ প্রাণখোলা আলোচনায় যোগদান না করিলে একা একা নিজের মধ্যে নিজের সমস্যার মীমাংসা কি সহজ? মহেন্দ্রের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে আগামী শনিবার, নিমন্ত্রণ চিঠি দিয়া গিয়াছে।...

২৫শে আগস্ট

ঠাকুর, সঙ্গী আমার, পুরুষোত্তম আমার, তুমি পদ-দলিতকে মাথায় করিয়া লইয়াছ, সকল উপেক্ষিতের অপেক্ষায় বসিয়া থাক, সব নির্যাতিতাত্মার আদরে মর্যাদায় ভরিয়া তোল। আর কাহার শরণ লইব তুমি ছাড়া? আমার সোনার ঠাকুর, তুমি আমার আমি তোমার। তুমিই আমার আমি। আমার আমি মুছিয়া ফেলিয়া আমি তোমার আমি বনিয়া যাইব। তুমি আমি প্রেমে এক হইব। আমার বিচ্ছিন্ন আমি আমি আর সহ্য করিতে পারি না। আমাকে এক কর, অদ্বৈত কর। দিন যে ফুরাইয়া আসিল। কোথায় তুমি? এস তুমি আমার জীবনে।...

২৬শে আগস্ট

পৃথিবীটা বড্ড বেশি সচল

॥ শ্রীভারতী ॥

পথ চলতে চলতে কখনো কখনো
কোনো কোনো জায়গায় এসে থেমে যেতে হয় ;
শোভায় সৌন্দর্যে হয়ত সে জায়গাটা ভারী রমণীয়
হয়ত বা বন্ধুজনের স্নেহ প্রীতির পসরা পথটাকে
আগলে দাঁড়ায় ;
সুন্দরতর আবহাওয়ায় তখন মনে হয়
এইটেই হয়ত চেয়েছিলাম,
শেষ থামাটা এখানেই খেমে গেলে কেমন হয় ?
শেষ থামা ?
সংশয়ী চিত্ত শেষের হিসেবে সাড়া দিতে চায় না—
যেন আজন্মকাল থেকে অশেষকে নিয়েই
ওর চিত্তর মাথাব্যথা—
সে বলে শিশু থেকে যুবা, যুবা থেকে বৃদ্ধ
খেয়েছো কোথাও ? থামুছো কোথাও ?
যে বিশ্বাস শেষের আস্বাদ জোগায়, কোথাও কি
আছে তার ছিটে ফোঁটাও ?
নিষ্ফলায় পথ ?
ও পথে তো নিঃশ্বাসের মূর্চ্ছা ও পতন একেবারেই
নিশ্চিন্ত।
কিন্তু জীবনের পথে ?
বুকের ছন্দ যখন নিত্য ওঠা পড়ায় দোল খেতে
থাকে—
তখন তুমি থামবে কোথায় ?
আজকের হাসি কালকের কান্নায় চাপা পড়ে যাবে
আজকের স্তুতি আগামী দিনেই নিন্দায় মুখর
হয়ে উঠবে
কার কাঁধে মাথা রেখে তুমি ?
কোথাও না ; না কাঁটা না কমল,
কোথাও আত্মসমর্পণ নয়। তাহলে ?
তাহলে মহাকালের স্রোতের ধারায় স্নান করে নাও
রবির আশীর্বাদে নিজেকে শুচি করে তোলো ;
প্রত্যক্ষ কর বিশ্বের বিরাট পাথরে খোদাই
হয়ে আছে
আনন্দ ও বিষাদের দুই যুগল মূর্তি।
প্রশ্ন রাখো তার কাছে, মুগ্ধ বিস্ময়ে অবনত হও।
তারপরে চোখের জল আসুক না যত খুশি।
সুন্দর ও অসুন্দরের বিরাট ব্যাপ্তিকে
নিজের খুশির আকাশে যদি ছড়িয়ে দিতে পারো
দুচোখের আয়নায় প্রকৃতি ও জীবনকে যদি
স্বরূপে ধরতে পারো
তবেই থাকা যায়। অতএব
মনের লাগাম মেরে পাল তুলে যাও
আর ছলছলিয়ে চলে যাও গান গেয়ে গেয়ে
থামার আশা টাশা কোরো না,
কারণ পৃথিবীটা বড্ড বেশি সচল ॥

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় জন্যই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে, দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দ্দেশিত "সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

ষষ্ঠ সিদ্ধান্ত

বন্ধন যাহার হইয়াছিল অথবা বন্ধন যাহার হইয়া থাকে তাহাকে নির্বিকার বলা যায় না। শঙ্করাচার্য প্রণীত অপরোক্ষানুভূতি অনুসারে আমি-আত্মা নির্বিকার ও অব্যয়। সুতরাং বলিতে হইবে—আমার বন্ধন কখন হয় নাই, আমার বন্ধন নাই এবং পরেও কখন আমার বন্ধন হইবে না। যে আত্মা নিত্য অবদ্ধ, তাহাকে নিত্য মুক্ত বলাও অতি অসঙ্গত। যে আত্মার বন্ধন হইতেই পারে না, তাঁহার মুক্তিতেও প্রয়োজন নাই। যে আত্মার বন্ধন হইতেই পারে না, তাঁহার মুক্তির সহিত কোন সংস্রবই নাই। তাঁহার মুক্তির সহিত কখনও সংস্রব হয় নাই, এবং পরেও কখন তাঁহার মুক্তির সহিত সংস্রব হইবে না। অতএব সেইজন্যই অপরোক্ষানুভূতি অনুসারে 'নিত্য-মুক্তোহমচ্যুত' বলাও সঙ্গত নহে।

সপ্তম সিদ্ধান্ত

অষ্টবিংশতি শ্লোকানুসারে যদি আমি-আত্মা নির্মল ও শুদ্ধ, তবে সেই নির্মল শুদ্ধাত্মা জীবত্ব রূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়া বিকৃত হন কেন? যদি বল অবিদ্যাবশত ঐ প্রকার হয়, তাহা হইলে কি বলিতে হইবে আত্মা অবিদ্যার অধীন? যদি আত্মা অবিদ্যার অধীন স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অবশ্যই আত্মা অপেক্ষা অবিদ্যা শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে।

অষ্টম সিদ্ধান্ত

শঙ্করাচার্য্যের মতেও আত্মা নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নিরহঙ্কার নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় যিনি, তাঁহাকে প্রকারান্তরে শূন্য বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ আমি আছি বোধ না থাকিলে আমাতে আত্ম-জ্ঞান বিকাশিত হয় না। গুণকর্মদ্বারাই আত্মজ্ঞানের অস্তিত্ব অবধারিত হইয়া

থাকে। তোমার মধ্যে ক্রোধ আছে তাহা গুণবর্ধদ্বারাই বিকাশিত হয়। আত্মজ্ঞান নিত্য নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকিলে তাহার বিকাশই হয় না। অহঙ্কার, জ্ঞান, গুণ এবং কর্মদ্বারা আমি-আত্মা আছি অবধারিত হয়। অহঙ্কার, জ্ঞান, গুণ এবং কর্ম যদি আমি-আত্মাতে না থাকিত, তবে আমি-আত্মা এক প্রকার শূন্যই। তবে শঙ্করাচার্য্য —আত্মাকে যিনি শূন্য বলেন, নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বারা তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছেন কেন? সেই শ্লোক এই প্রকার—'যদেহে শোকনং সঙ্গং পুরুষাখ্যঞ্চ সম্বদম্।

কিং মূর্খ শূন্যমাত্মানং দেহাতীতং বরযোগোঃ'। ২৯।

নবম সিদ্ধান্ত

অপরোক্ষানুভূতির ত্রিংশ শ্লোকে যুক্তি আর শ্রুতিদ্বারা আত্মাকে দেহাতীত অবধারণ করিতে বলা হইয়াছে। যুক্তি এবং শ্রুতি তো আত্মজ্ঞান নহে, তবে ঐ উভয়দ্বারা সত্য-আত্মা যে দেহাতীত, তাহা কি প্রকারেই বা অবধারিত হইবে? ঐ দুইও বেদান্তানুসারেই মায়া হইতে বিকাশিত বলা যাইতে পারে।

দশম সিদ্ধান্ত

ঐ ত্রিংশ শ্লোকে শঙ্করাচার্য্য আত্মাকে 'দেহাতীতং সদাকারং' বলিয়াছেন। বেদান্ত এবং বেদান্তসম্বন্ধীয় সমস্ত গ্রন্থমতেই 'সৎ' নিরাকার। শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার অনেক গ্রন্থেই 'সৎ' নিরাকার বলিয়াছেন। বেদান্ত এবং সমস্ত বৈদান্তিক গ্রন্থমতেই আকার অসত্য ও অনিত্য। বেদান্ত এবং সমস্ত বৈদান্তিক গ্রন্থমতেই আকারও অবিদ্যার এক প্রকার বিকাশ। কিন্তু পৌরাণিক মতে ভগবানের আকার নিত্য। সদাকার অর্থে নিত্যাকার বলা যাইতে পারে। অথবা সদাকার অর্থে যাঁহার নিত্যাকার তাহাও বলা যাইতে পারে। তবে শঙ্করাচার্য্য কেবল নিরাকারই স্বীকার করিয়াছেন, কি প্রকারে বলা যায়? দেখিতেছি, তিনি যে নিত্য আকার পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন।

একাদশ সিদ্ধান্ত

ত্রয়স্ত্রিংশ শ্লোকে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, 'অহং বিকার-হীনস্ত'। 'অহং' বিকারহীন কি প্রকারে? 'অহং'ই যে বিকার তুমি-আত্মা নিজেকে 'অহং' জান, তুমি কি কামুক নও? তুমি কি ক্রোধী নও? তুমি কি অন্যান্য নানা বিকারবিশিষ্ট নও! তবে তুমি যখন 'অহং', তখন তোমাতে বিকার থাকে না কি প্রকারে বলিব? তোমাতে দুঃখ-বিকারের উদয় হইলে, আমি দুঃখী বলিয়া থাক। তোমাতে শোক-বিকারের উদয় হইলে, আমি শোকী বলিয়া থাক।

দ্বাদশ সিদ্ধান্ত

পাতঞ্জল দর্শনের মতে পুমাত্মাই পুরুষ। শঙ্করাচার্য্যেরও সেই অভিপ্রায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের মতে সেই পুমাত্মা-পুরুষ অসঙ্গ। স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যও অপরোক্ষানুভূতির ষট্‌ত্রিংশ শ্লোকে সেই মত সমর্থন করিয়াছেন। যে পুমাত্মা-পুরুষ অসঙ্গ, তাঁহার অবিদ্যা-জনিত জীবত্বের সহিত কি প্রকারে সংস্রব হয়? সেই সংস্রব বশত,—সেই পুমাত্মা-পুরুষ নানা প্রকার দুঃখও ভোগ করেন। তাঁহার অন্যান্য প্রকার ভোগও হইয়া থাকে। তবে তিনি অসঙ্গ কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? পাতঞ্জল দর্শনের মতে, সেই পুমাত্মা-পুরুষের কৈবল্য হইলেই তিনি অসঙ্গ হন। বেদান্তমতেও তাঁহার অবিদ্যার সহিত যখন সংস্রব থাকে না, তখনই তাঁহাকে অসঙ্গ বলা যাইতে পারে। ঐ বৃহদারণ্যক উপনিষদের মতানুসারে স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"অত্রৈষ চ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরং সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ"। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কেরই জ্যোতি আছে। বেদান্তানুসারে চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে কোনটীই ত আত্মা নহেন, তবে 'স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে' কি প্রকারে বলা হইয়াছে? বেদান্তমতেই জ্যোতিও অনাত্মার এক প্রকার বিকাশ বলা যাইতে পারে। সুতরাং নির্বিকার নিরঞ্জন-পুমাত্মা-পুরুষকে জ্যোতি বলাও সম্পূর্ণ, অসঙ্গত।

ক্রমশঃ

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

॥ শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

যাহা মিথ্যা বলিয়াই অভিহিত; পরিণামী সত্তা এক হিসাবে 'অনৃতই' বটে, কেননা উহার সক্ষমতা শুধু নিজকে মুছিয়া ফেলিয়া সত্তাকে প্রকাশ করা; পক্ষান্তরে যখন 'মুছিয়া ফেলানো'টাকে প্রতিষ্ঠিত করা রসস্রষ্টার দরকার, তখন মিথ্যা পরিণামীই হয় সত্তা, অপরিণামী সত্তাই হয় সে ক্ষেত্রে অনৃত] সত্য অভবৎ [সত্য হইলেন; কালের ভিতর দিয়া যদি তিনি সৎরূপে, অসৎরূপে বিশ্ব-বিভক্ত না হইতেন, তাঁহার হওয়াটা 'সত্যম্ অভবৎ' হইত না। দুইটী হওয়ার সমন্বয়ই সত্যরূপে হওয়া। এক পারমার্থিক 'হওয়া' 'সত্যম্ অভবৎ' নয়; তিনি 'সত্যম্ অভবৎ' যখন পারমার্থিক সত্তা ও ব্যবহারিক সত্তা দুই দুই থাকিয়াও গলিয়া এক হইল] যৎ ইদং কিঞ্চ [এই যাহা কিছু; সবই তাঁহারই সত্তা-হওয়ার মাঝে সার্থক হওয়া] তৎ [সেই হেতু] সত্যম্ ইতি আচক্ষতে [সত্য স্বরূপে সত্যরূপে বলেন]

তিনি পরা প্রকৃতির স্তরে স্তরে অনুপ্রবেশ করিয়া সৎ হইলেন, ত্যৎ হইলেন, নিরুক্ত-অনিরুক্ত, নিলয়ন-অনিলয়ন, বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান, সত্য-অনৃত, এই যাহা কিছু সব সত্যরূপে হইলেন। এইজন্যই ব্রহ্মবিৎগণ তাঁহাকে সত্য বলেন। ঐ বিষয়েই একটী শ্লোক আছে।

সপ্তম অনুবাক

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।
তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যতে। ইতি

অসৎ বৈ [মহানির্বাণই। কিছু-না-থাকাই; Negation is the foundation of all determinateness—Hegel। ভক্ত যখন পুরুষোত্তম-যোগে পুরুষোত্তমে হারাইয়া যায়, সেই অবস্থাই অসৎ অবস্থা; পুরুষোত্তমও যখন যোগমায়া প্রকৃতির কোলে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হন্, সেই যোগনিদ্রাযুক্ত পুরুষোত্তমই অসৎ-পদবাচ্য—"রতিরস আলসে শুতিয়া আছিনু দুহুনে"—এই অসৎ অবস্থাই] ইদম্ [এই ব্রহ্মবস্তু] অগ্রে [সৃষ্টির পূর্বে] আসীৎ [ছিলেন; যাহার জীবন সর্বতোভাবে বিশ্ব হয় নাই, মুক্ত হয় নাই, সে জীবন কিছুই সৃষ্টি করিতে পারিবে না, সে কোনও কিছুর জন্মদান করিতে পারিবে না; শূন্যই বিশ্বস্রষ্টা। যখন তুমি শূন্য তখনই তুমি পূর্ণ। শূন্য-পূর্ণ একই পুরুষোত্তমের দুইটী আবর্তনময় ঘূর্ণিকোণ মাত্র] ততঃ বৈ [সেই শূন্য ব্রহ্মবস্তু হইতে] সৎ [যাহা কিছু আছে সব] অজায়ত [জনম নিল; স্বরূপ বিহনে রূপের জনম কখনো নাহিক হয়; অসৎই সতের স্বরূপ; মরণই জীবনের স্বরূপ] তৎ [সেই অসৎ ব্রহ্মবস্তু] আত্মানং নিজকে নিজে; স্বপ্রকৃতিতে] স্বয়ম্ [নিজেই, প্রকৃতির সকল পরিণামকে স্বরূপরূপ প্রদান করিয়া] অকুরুত [করিলেন, পরিণত করিলেন; আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ব্রহ্মসূত্র; প্রকৃতির প্রতি পরিণাম আত্মকৃতি পরিণাম; পরিণামের প্রতি স্তর আত্মভাবে ভাবিত, আত্মবশকৃত] তস্মাৎ [সেই হেতু] তৎ [রসঘন পুরুষোত্তম-ব্রহ্ম] সুকৃতম্ [যাহার সব 'কৃত' সুকৃত অর্থাৎ আত্মকৃত হওয়ার ফলে লীলারূপে পরিণত, যাহার 'করা' কৃত (finished) হয় নাই, যাহার 'করা' নিত্যবর্তমান লীলামাত্র, তিনিই সুকৃত] উচ্যতে [কথিত হন]।

এই অসৎ ব্রহ্মই সৃষ্টির অগ্রে ছিলেন, তাঁহা হইতে

সৎ অস্মিন। তিনি স্বয়ং আত্মাকে গড়িয়া তুলিলেন, সেই জন্যই তাঁহাকে সুকৃত উক্ত হয়।

রসো বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। এষ হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। ২।৭

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যাখ্যানে সপ্তমোঽনুবাকঃ॥

যৎ বৈ [যাহাই] তৎ সুকৃতম্ [সুকৃত সেই ব্রহ্ম] রসঃ বৈ [রসস্বরূপই, রসরূপই] সঃ [তিনি। রসের লক্ষণ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ভাবের সঙ্গে তুলনা করিয়াই রসের লক্ষণ নির্ণয় করিতে হইবে। দেহ রক্ষার জন্য খাওয়া—খাওয়ার এই অর্থ ভাবুকতা; খাওয়ার জন্যই খাওয়া—ইহাই খাওয়ার 'রস'; শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্—শরীরই ধর্মের আদি সাধন—ধর্ম সাধন হিসাবে দেহের এই মর্য্যাদাদান ভাবুকতামাত্র; দেহ নিজের মর্য্যাদায়ই মর্যাদাযুক্ত—ইহাই দেহের রসমর্য্যাদা। যিনি স্বয়ংমূল্য দিয়া আত্মকৃতি-পরিণাম সিদ্ধ করিয়াছেন, তিনিই রস। সব means-কে end-এ গড়িয়া তোলাই রস। ব্রহ্ম-জ্ঞানের, সৎ-এর মূল্য বাড়াইবার জন্যই মায়ার প্রয়োজন, অসৎ-এর প্রয়োজন; পূর্ণিমার মূল্য বাড়াইবার জন্য অমাবস্যার প্রয়োজন ভাবুকের প্রয়োজন। সুখের গৌরব বৃদ্ধির জন্যই দুঃখের প্রয়োজন হইতে পারে, রসিকের প্রয়োজন নিশ্চয়ই ইহা নয়। মায়াও স্বয়ংমূল্যবান, অসৎও স্বয়ংমূল্যবান; অন্ধকারের নিজস্ব গৌরব স্থাপন, দুঃখের মূল্য দুঃখ হিসাবেই—ইহাই রসের স্বরূপ লক্ষণ। ভাবের ক্ষেত্রে দৈতত্ব থাকে, অভিসন্ধি exploitation থাকে; রসে তাহা নাই, রসই প্রতি পরমাণুর স্বয়ংরূপ স্বীকার করে; রসে 'পরার্থের'ও সার্থক রহিয়াছে। জীব সুখের জন্যই সুখ চায়। সুখের অন্তর্নিহিত রস-আস্বাদনই সুখের পরম প্রয়োজন, অসৎ-এর মূল্য অসৎ নিজেই—ইহাই অসতের রস। রসের ক্ষেত্রে দুইই দুইয়ের উপায় ও উপেয়। কাহারও জন্যে কেহই একচেটিয়া নয়। রসের সাধনায় প্রত্যেকেই নিজের জন্য, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্য, ইহাই অহেতুক রস] রসং হি এব [রসকেই] অয়ম্ [রসসাধন-চতুর সাধক] লব্ধা [লাভ করিয়া] আনন্দী ভবতি [আনন্দ-ভাবে ভাবিত হইয়া আনন্দ-মূর্তি হন্] কঃ হি এব [কেই বা] অন্যাৎ [অনন অর্থাৎ স্পন্দন ক্রিয়া সম্পন্ন করিত] প্রাণ্যাৎ [প্রাণন ক্রিয়া অর্থাৎ প্রাণক্রিয়া করিত] যৎ [যদি] এষঃ [এই] আকাশঃ আনন্দঃ [সর্বভূতের হিতদাতা, সর্বভূতের অন্তর-বাহির, প্রাণ-ইন্দ্রিয়-মনের আশ্রয় প্রকাশঘন 'বিশ্বামৃত একত্র মিলন'-রূপ আনন্দ] ন স্যাৎ [না থাকিত] এষ হি এব [হ্লাদিনী শক্তি-আলিঙ্গিত এই আনন্দই] আনন্দয়াতি [আনন্দয়তি; আনন্দিত করিয়া থাকেন, আহ্লাদ দান করেন] যদা হি এব [যখনই না কেন] এষঃ [এই সাধক] এতস্মিন্ [এই] অদৃশ্যে [সকল দৃশ্যের দৃশ্যত্বকে 'ন'-রূপে স্বয়ংমূল্য দিয়া পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তুলিয়া তাহারই বুকে লুক্কায়িত, তিনিই দৃশ্য হইয়াও দৃশ্যের 'পর' অদৃশ্য] অনাত্ম্যে [অনাত্মাতে, আত্মার বিপরীত অসৎ অনাত্মা বস্তুতে রস রূপে পূর্ণ অথবা অনাত্মীয়; যিনি কোনও আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা পড়েন না, ধরা দেন না, সর্বদাই ফাঁক দিয়া এড়াইয়া যান; ইহা আকাশেরই ধর্ম] অনিরুক্তে [সব 'নিরুক্তে'র মধ্য হইতে 'নিঃশেষে নিশ্চিতরূপে উক্ত হইয়াছে' এই রূপ মনোবৃত্তি প্রত্যাহারের ফলস্বরূপ যিনি তিনিই অনিরুক্ত; সব 'উক্তি'কে দেশকালপাত্রের আবেষ্টনের সঙ্গে সঙ্গে পরিণাম প্রাপ্ত হইবার যোগ্য করিয়া রাখিলেই সব উক্তি হইবে 'অনিরুক্ত'] অনিলয়নে [নিরাধার; কোও নিলয়ে যিনি নিত্যস্থিত নন্, স্থিতিপ্রধান নিলয়কে গতির মাঝে গতিময় করিয়াই তিনি গতিহীন প্রাণচঞ্চল-মূর্তি অনিলয়ন] অভয়ং [ভয়হীন; ভয় তো জীবের অনিত্য হইতে, অশুচি হইতে, দুঃখ হইতে, দ্বিতীয়-তিনিষেধ হইতে; সেই সবই যে রসের মৃত্ত সজীবন স্পর্শ পাইয়া অভয়রূপে পরিণত, তখন ভয় আসিবে আর

কোথা হইতে ?) প্রতিষ্ঠাং [চঞ্চলতার বুকে নিত্যস্থিতি] বিন্দতে [লাভ করেন] অথ [সেই সময়ে] সঃ [তিনি] অভয়ং গতঃ, ভবতি [অভয় প্রাপ্ত হন্] যদা হি এব [যখনই কোন] এষঃ [এই অবিদ্বান্, অসৎ-বিষয় সাধক] এতস্মিন্ [এই আনন্দ ব্রহ্মে] ঊদরম্ [ঊৎ অল্পম্, লেশমাত্র] অন্তরম্ [ভিন্ন, ভেদদর্শন] কুরুতে [করে] অথ [তখন সেই ভেদদর্শন অনন্তর] তস্য [তাহার] ভয়ং ভবতি [ভয় হয়] তৎ ত্ব এব [সেই ব্রহ্মই কিন্তু] ভয়ং [ভয় স্বরূপ] বিদুষঃ অমন্যানস্য [সৎ অসৎ ভেদদৃষ্টি সম্পন্ন ভেদদর্শীর কাছে] তৎ এব এষঃ শ্লোকঃ ভবতি [সেই সম্বন্ধে এই শ্লোক রহিয়াছে।]

যিনিই সুকৃত, তিনিই রস। এই জীব রস লাভ করিয়া আনন্দী হন্। কেই বা স্পন্দন ক্রিয়া করিত, কেই বা প্রাণক্রিয়া সম্পন্ন করিত, যদি আকাশ আনন্দ না থাকিতেন। যখনই এই সাধক এই অমৃত, অনাত্মীয়, অনিরুক্ত, অনিলয়ন ভয়হীন নিত্যস্থিতি লাভ করে, তখনই সে অভয় প্রাপ্ত হয়। যখনই এই অবিদ্বান্ ইহাতে লেশমাত্র ভেদ দর্শন করে, তখনই তাহার ভয় হয়। এই অভয় ব্রহ্মই কিন্তু সৎ-অসৎ ভেদদৃষ্টি সম্পন্ন ভেদজ্ঞানীর কাছে ভয়স্বরূপ। এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে।

অষ্টম অনুবাক

ভীষাস্মাদ্বাতঃ। পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ ইতি।

ভীষা [ভয় হইবার ভয়ে ভীত হইয়া] অস্মাৎ [আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে] বাতঃ [বায়ু] পবতে [প্রবাহিত হয়] ভীষা সূর্যঃ উদেতি [ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়] ভীষা অস্মাৎ [ইহার ভয়ে ভীত হইয়াই] অগ্নিঃ চ বায়ুশ্চ [অগ্নি এবং বায়ু] পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ [পঞ্চম স্থানীয় যম] ধাবতি [ধাবিত হয়, স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; পুরুষোত্তম স্বচ্ছন্দ, স্বতন্ত্র, তাঁহার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া স্বয়ংরূপে, স্বাধীনভাবে, কাহারও চাপে মন-মরা না হইয়া এবং আবেষ্টনেরও স্বচ্ছন্দতা, স্বাধীনতা ও স্বয়ংমর্য্যাদা স্বীকার করিয়া, স্বকার্য্য করিয়া যাওয়াই প্রাকৃতিক শক্তি সমূহের কৌশল (technique); এই কৌশল হইতে চ্যুত হওয়ার ভয় প্রতি স্পন্দনের অন্তরে নিহিত, কোনও শক্তিই নিছক জড় নহেন, সব শক্তিই চিদানন্দের মূর্ত্তি, সত্তা শক্তি।]

এই ব্রহ্মের ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হন্, ভয়ে সূর্য্য উদিত হন্। ইহারই ভয়ে অগ্নি ও ইন্দ্র, এবং পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হয়।

সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধুযুবাধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ।— ২ ৮। ১

সা এষা [এই সুবিদিত] আনন্দস্য মীমাংসা [ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ নিরূপ] ভবতি [হইতেছে; দুনিয়ার সব স্তরের আনন্দকে তুলিত করিয়া গুণিত করিয়া, সব প্রাকৃত আনন্দকে জমাইয়া যে 'পর' আনন্দ, তাহাই আনন্দ মীমাংসা; মানিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতি তুলনা মূলক বিচারের সমন্বয় করিতেছেন। বিচারহীন মানিয়া লওয়ায় মীমাংসা স্থিত হয় না] যুবা স্যাৎ [কেহ যদি বয়সে যুবা হয়] সাধু যুবা [সে যদি সাধুযুবা হয়, কামহত না হয়] অধ্যায়কঃ [শ্রোত্রিয়, অধীত বেদ] আশিষ্ঠঃ [সর্ব্বোত্তম শাসক, সম্রাট] দৃঢ়িষ্ঠঃ [দৃঢ়তম দেহাদিযুক্ত] বলিষ্ঠঃ [বলবত্তম] [হয়] (আর যদি) তস্য [তাহার] সর্ব্বা ইয়ং পৃথিবী [সমস্ত এই পৃথিবী] বিত্তস্য পূর্ণা [ভোগ্যবস্তুসকলের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়] (তবে তাহার যে আনন্দ) সঃ [উক্ত আনন্দ] একঃ [একটী] মানুষঃ আনন্দঃ [মানুষের পক্ষে যতদূর সম্ভব, ততখানি আনন্দ] তে যে [সেই যে] শতং [শতগুণিত] মানুষাঃ আনন্দাঃ [মানুষানন্দ সমূহ]

উক্ত ব্রহ্মানন্দের এই সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসা হইতেছে— কেহ যদি যুবা হয়, সচ্চরিত্র যুবা, অধীতবেদ, সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক, দৃঢ় দেহবান, বলবত্তম হয়, এবং বিত্তপূর্ণ সর্ব্ব পৃথিবী যদি তাহার হয়, তবে তাহার যে আনন্দ, তবে উহাই মানুষের পরম সম্ভাব্য আনন্দ। মানুষের সেই আনন্দ শতগুণিত হইলে—

স একো মনুষ্য গন্ধর্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য যে শতং মনুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দাঃ। স একো দেব-গন্ধর্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। যে যে শতং দেব গন্ধর্বাণামানন্দাঃ। স একঃ পিতৃণাং চিরলোক-লোকানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। যে যে শতং পিতৃণাং চিরলোক লোকানামানন্দাঃ। স এক আজানজানাং দেবানামানন্দাঃ। ২।৮।২

সঃ [উহা শতগুণ মানুষ-আনন্দ] মনুষ্যগন্ধর্বাণাং [যে সকল মনুষ্য কর্ম ও উপাসনাসহায়ে গন্ধর্ব হইয়াছেন তাহাদের] একঃ আনন্দঃ [একটি আনন্দ] শ্রোত্রিয়স্য চ [এবং বেদজ্ঞের] অকামহতস্য [কাম যাহাতে আহত করিতে পারে নাই, পরন্তু যাহার জীবনে কামই হত হইয়াছে, ঘন হইয়াছে, হৃদয় হইয়াছে, আত্মভাবে ভাবিত হইয়াছে] যে যে শতং মনুষ্য গন্ধর্বাণাম্ আনন্দাঃ [মনুষ্য গন্ধর্বের সেই যে শতগুণিত আনন্দ] সঃ একঃ দেবগন্ধর্বা-নাম্ আনন্দঃ [যাহারা জাতিতে গন্ধর্ব, তাহাদের একটী আনন্দ] শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য [এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটী আনন্দ] যে যে শতং দেবগন্ধর্বাণাম্ আনন্দাঃ [শত দেবগন্ধর্বদের শতগুণিত সেই যে আনন্দ] সঃ [শতগুণিত উহা] পিতৃণাং [পিতৃগণের] চিরলোক লোকানাম্ [চিরস্থায়ী লোকবাসী] একঃ আনন্দঃ [একটি আনন্দ] শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য [অকামহত শ্রোত্রিয়েরও একটী আনন্দ] যে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকলোকানাম্ আনন্দাঃ [চিরলোকবাসী পিতৃগণের সেই যে শতগুণিত আনন্দ] সঃ একঃ [শতগুণিত তাহা] আজানজানাম্ দেবা-নাম্ [স্মার্ত কর্মের উৎকর্ষহেতু যাহারা দেবরূপে অভিহিত হইয়াছেন তাহাদের] আনন্দঃ [শ্রোত্রিয়ত্ব এবং অকাম-হত থাকাই সমস্ত স্তরের সাধারণ যোগ্যতা ; এই দুইটি যোগ্যতাই সর্ব-স্তরের আনন্দকে ফুলাইয়া, জমাইয়া, ঘন করিয়া স্তরের পর পর হৃদয় করিয়া চলিয়াছে সেই আনন্দ মীমাংসার ক্ষেত্রে। প্রাকৃত সর্ব স্তরের বেদত্ব স্থাপনের ভিতর দিয়া উহার হৃদয়বোধ এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল ক্ষেত্রের সব "কাম"কে জীবনে হনন করিয়া, ঘন করিয়া, হৃদয় করিয়াই সাধক সমস্ত স্তরে মাধুকরী করিতে করিতে মধুসূদনের সেবার জন্য মধুচক্র গড়িয়া চলিয়াছেন।

—মনুষ্য গন্ধর্বদিগের এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটি আনন্দ হয়। মনুষ্য গন্ধর্বদের উক্ত শতগুণিত আনন্দই দেবগন্ধর্বদের ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটী আনন্দ। দেবগন্ধর্বগণের শতগুণিত এই আনন্দ চিরলোকনিবাসী পিতৃগণের এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটী আনন্দ। পিতৃলোকবাসীদের শতগুণিত এই আনন্দ আজানাজ দেবগণের একটী আনন্দ—

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। যে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ। স একঃ কর্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ। যে কর্মণা দেবানপি যন্তি। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। যে যে শতং কর্মদেবানাং দেবানামানন্দাঃ। স একো দেবনামানন্দাঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। যে যে শতং দেবানামানন্দাঃ। স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ।—২।৮।৩

শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য [অকামহত শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ] যে যে [সেই যে] শতং আজানজানাং দেবানাং আনন্দঃ [আজানজ দেবগণের শতগুণিত আনন্দ] সঃ [উহা] একঃ [একটী] কর্মদেবানাং দেবানাং আনন্দঃ [কর্মদেব দেবগণের আনন্দ] যে [যাহারা] কর্মণা [কর্মদ্বারা] দেবান্ অপি যন্তি [দেবত্ব প্রাপ্ত হন্] শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য [এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটী আনন্দ] যে যে [সেই যে] শতং কর্মদেবানাং দেবানাম্ আনন্দ [কর্মদেব দেবগণের শতগুণিত আনন্দ] সঃ [সেই] একঃ দেবানাং আনন্দঃ [যজ্ঞাহুতি ভোজী তেত্রিশ জন দেবতার একটী আনন্দ] শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য যে যে [সেই যে] শতং দেবানাং আনন্দঃ [দেবতাদের আনন্দের শতগুণিত আনন্দ] সঃ [সেই] একঃ ইন্দ্রস্য আনন্দঃ [দেবরাজ ইন্দ্রের একটী আনন্দ]

অকামহত শ্রোত্রিয়েরও অনুরূপ আনন্দ হয়। আজানজ দেবগণের আনন্দ শতগুণিত হইলে কর্মদেব দেবগণের অর্থাৎ যাহারা কর্মের দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাদের এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটী আনন্দ হয়। কর্মদেব দেবগণের সেই আনন্দ শতগুণিত হইয়া

দেবগণের ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটী আনন্দ হয়। দেবগণের সেই আনন্দ শতগুণিত হইলে ইন্দ্রের একটী আনন্দ হয়।

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ। স একো বৃহস্পতেরানন্দাঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ। স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। ২৮.৪

বৃহস্পতেঃ [দেবগুরু বৃহস্পতির] প্রজাপতেঃ [যিনি কামনা করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন, পালন করিয়া পতি হইয়াছেন, সেই ত্রৈলোক্যশরীরবান্ বিরাট পুরুষ] ব্রহ্মণঃ [ব্রহ্মার]

অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দও শুদ্ধই। ইন্দ্রের সেই আনন্দ শতগুণিত হইলে বৃহস্পতির ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটী আনন্দ হয়। বৃহস্পতির আনন্দ শতগুণিত হইলে প্রজাপতি ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটী আনন্দ হয়। প্রজাপতির সেই আনন্দ শতগুণিত হইলে, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের এক, অদ্বিতীয় আনন্দ হয়।

স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি—২।৮।৫

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যাখ্যায়ে অষ্টমোঽনুবাকঃ।

সঃ [সৎ-অসৎ সমন্বিত যে পুরুষোত্তম, প্রজাকাম হইয়া এই বিশ্বসৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, তিনি] যঃ চ অয়ম্ ['এই' যিনি প্রত্যক্ষরূপে] পুরুষে [পঞ্চকোশাত্মক ব্যষ্টি পুরুষে] যঃ চ অসৌ [আর পরোক্ষ 'ঐ' যিনি, অকামহত শ্রোত্রিয়ের কাছেই শুধু ভাবগম্য প্রত্যক্ষ পরমানন্দ] আদিত্যে [আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত] সঃ একঃ ['অয়ং' এবং 'স'—একই আনন্দ-ঘন পুরুষোত্তমের দুইটী আস্বাদন; ব্যষ্টিজীবন ও সমষ্টি-জীবনের সমন্বয় তিনি। এক, 'এই' যোগায় রস, 'ঐ' যোগায় জীবনে ভাব। পুরুষোত্তম রসরাজ-মহাভাব দুই একরূপে, ইনিই অতুল আনন্দ; মানুষানন্দ হইতে তুলনা আরম্ভ করিয়া স্তরে স্তরে একাদশ স্তরে ব্রহ্মার আনন্দ পর্যন্ত পৌঁছিয়া শেষে সিঁড়ির আরোহণ-স্তরগুলির ক্রমসম্বন্ধ লঙ্ঘিত করিয়া সর্বস্তরের সঙ্গেই যে অতুলানন্দ পুরুষোত্তমের সম-সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, স্বয়ং সম্বন্ধ, এবং তিনিই যে আনন্দ মীমাংসা তাহাই এখানে দেখানো হইয়াছে। ইহাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে।] সঃ য এবং বিৎ [সে যিনি এইরূপ, সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ব্রহ্মকে জানেন] অস্মাৎ লোকাৎ [সিঁড়ির মত ক্রমসম্বন্ধ ব্যবস্থা যুক্ত এই লোক হইতে] প্রেত্য [প্রকৃষ্ট পথে গমন করিয়া, অর্থাৎ পুরুষোত্তমের সঙ্গে প্রত্যেক স্তরের ক্রমহীন সম সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দর্শন করিয়া] এতম্ অন্নময়ম্ আত্মানম্ [এই অন্নময় আত্মাকে] উপসংক্রামতি [সম-সাক্ষাৎ ভাবে উপ-সমীপস্থ হইয়া সংক্রমন করেন, আত্মসাৎ করেন চাপিয়া বসেন, হজম করেন, অন্নময়ের পরতে পরতে নিজকে ছড়াইয়া দেন, পুরুষোত্তম শরীরবান্ হন্] এতম্ প্রাণময়ম্ আত্মানম্ [এই প্রাণময় আত্মার] উপসংক্রামতি [পুরুষোত্তম প্রাণময় শরীর প্রাপ্ত হন্] এতং মনোময়ম্ উপসংক্রামতি [পুরুষোত্তম মনোময় শরীর প্রাপ্ত হন্] এতং বিজ্ঞানময়ম্ উপসংক্রামতি [পুরুষোত্তম বিজ্ঞানময় তনু প্রাপ্ত হন্] এতং আনন্দময়ম্ উপসংক্রামতি [এই পুরুষোত্তমানন্দময় শরীর প্রাপ্ত হন্] এই বিষয়ে শ্লোক রহিয়াছে।

ক্রমশঃ

গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মসূচীর দার্শনিক ব্যাখ্যা

।। শ্রীনারায়ণ চৌধুরী ।।

মহাত্মাজীর আঠারো-দফা গঠনমূলক কর্মসূচীর কথা দেশবাসীর নিকট সুপরিচিত। খাদি কেন্দ্র, অস্পৃশ্যতা বর্জন, সাম্প্রদায়িক মৈত্রী, হরিজন উন্নয়ন, বুনিয়াদী শিক্ষা, মাদক বর্জন, কৃষি, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি এই কর্মসূচীর অন্তর্গত। গান্ধীজী ভারতবর্ষের অগণিত গ্রামগুলিকে সুগঠিত ও স্বয়ংনির্ভর করে তোলার উপায় হিসাবে এই কর্মসূচী দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন। দেশবাসীকে সত্যিকার গঠনাত্মক কর্মাদর্শে অনুপ্রাণিত করে তোলাই ছিল এই কর্মসূচী প্রবর্তনা ও প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য।

আঠারো-দফা কর্মসূচীর অন্তর্গত কর্মগুলিকে বিচার করে দেখলে মনে হবে সেগুলি শুধুই কাজ—জনসাধারণের মধ্যে কর্মের প্রেরণা সঞ্চার করবার জন্যই তাদের উপস্থাপনা। তাদের পিছনে যে কোনো দার্শনিক ভিত্তি থাকতে পারে, থাকতে পারে তাত্ত্বিক প্রত্যয়ের পশ্চাৎপট, সে কথা অনেকেরই নিকট তেমন স্পষ্ট নয়। কিন্তু গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মসূচীর বাস্তবিকই একটি দার্শনিক তথা তাত্ত্বিক ভিত্তি রয়েছে। এই দৃষ্টিতে যদি আমরা গান্ধীজীর গঠনমূলক কাজগুলিকে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব যে, সর্বাত্মক জাতিগঠনের উপযোগী সকল রকম আয়োজনই এই কর্মসূচীর মধ্যে নিহিত রয়েছে। এর চেয়ে পূর্ণাঙ্গ, এর চেয়ে সার্বমুখী পরিকল্পনা আর কিছু হতে পারে না। এক আধারে শ্রম ও বুদ্ধির, ধ্যানময়তা ও গতিশীলতার, ভারতীয় দর্শনোক্ত কর্ম ও নৈষ্কর্ম্যের এমন সুসমঞ্জস ঐক্য আর কোনো পরিকল্পনার মধ্যে লাভিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

বস্তুতঃ প্রখ্যাত দার্শনিক-ভাষ্যকার অধ্যাত্ম পাণ্ডী স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত তাঁর মহাত্মাজীর গঠনকর্ম-পদ্ধতি গ্রন্থে ঠিক এই দৃষ্টিতেই গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মসূচীর বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন। জনসাধারণের চোখে কর্মসূচী সাদামাঠা কাজেরই একটা ছক-কাটা প্রোগ্রাম বই আর কিছু নয়, তাকে তিনি তাঁর অপূর্ব প্রজ্ঞাদৃষ্টিবলে দৈনন্দিন কর্মের সঙ্কীর্ণ পরিধি থেকে মুক্ত করে গভীর গূঢ় দার্শনিকতার উচ্চ গ্রামে সমুত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। স্বামীজীর বিশ্লেষণের আলোকে গঠনমূলক কর্মসূচীকে দেখলে তাঁর ভিতর আমরা অভাবিতপূর্ব অর্থের দ্যোতনা খুঁজে পাব, এবং সেই অসাধারণ আধিক্রিয়ার প্রসাদে ঐ কর্মগুলিকে বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব দিতে শিখব। অধিকন্তু, এই নূতন উপলব্ধির ফল যদি আমরা আমাদের জীবনে প্রতিভাত করে তুলতে পারি তাহলে জীবনে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কিছু আমাদের নাগালের বাইরে রইবে না। পূর্ণতার ঐশ্বর্যে জীবন তখন কানায় কানায় ভরে উঠবে।

এখন মহাত্মাজীর গঠনকর্ম পদ্ধতি বইটির দিকে চোখ রেখে এক-নজর দেখা যাক স্বামীজী গঠনকর্ম-পদ্ধতির কী জাতীয় বিচার বিশ্লেষণ করেছেন এবং তার উপর কী ধরণের অর্থই বা আরোপ করেছেন। আমরা যথাসম্ভব স্বামীজীর বিশ্লেষণের ধারা বজায় রেখেই স্বামীজীর বক্তব্য বুঝতে চেষ্টা করব।

স্বামীজী বলতে চান যে, এদেশে বা ওদেশে জনগণের উন্নতির সহায়ক যে সকল তত্ত্বদর্শন গড়ে উঠেছে তার কোনোটিই পূর্ণাঙ্গ নয়। সুতরাং তাদের কোনোটিই জনগণের সঠিক মুক্তিপথের দিশারী হতে পারে না। ভারতীয় সনাতন অদ্বৈতবাদী দর্শনের মধ্যে আছে ব্রহ্মকেই একমাত্র সত্যজ্ঞান করে জগৎসংসারকে মায়া-প্রপঞ্চরূপে দেখা। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ধ্যানময়তাকে,

স্বাধুষ্বকে, নৈষ্কর্ম্যকে সর্ব্বাত্মক মূল্য দিয়ে গতিশীলতাকে বাস্তবকে, কর্মকে হেয় করা হয়েছে। 'ব্রহ্মসত্য-জগন্মিথ্যা' —অদ্বৈত বেদান্তের এই যে তত্ত্ব, এই তত্ত্বে ধ্যানের বা চিন্তনের নিঃসংশয় শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে; পক্ষান্তরে, শ্রমকে একেবারেই উপেক্ষা করা হয়েছে। এইরূপ একাকী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা কখনোই জীবনের মূল সমস্যাগুলির সম্মুখীন হওয়া চলে না। সমাধান তো আরও পরের কথা। এই দর্শনে বুদ্ধির সঙ্গে শ্রমের যোগ সাধিত হয়নি, নৈষ্কর্ম্যের সঙ্গে কর্মের অন্বয় ঘটেনি; ফলে অত্যধিক মাত্রিক দার্শনিকতা ও ভাবুকতার আবরণে জীবন-বিমুখতাই শুধু প্রশ্রয় পেয়েছে। আমরা ভারতবাসী জাত হিসাবে কর্মবিমুখ, শ্রমকুণ্ঠ, স্বপ্নবিলাসী—আমাদের এই জাতিচরিত্রের মূলে রয়েছে অদ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব। জীবনকে অধ্যাস (Illusion) বা মায়া জ্ঞান করার ফলে তার সম্পর্কে বাস্তবচেতনা বা দায়িত্ববোধ-এর কোনোটাই আমাদের মনে পাকা হয়ে উঠতে পারে নি। আমরা যে সর্ব্বাত্মক কাজের কর্মসূচীর ঝুঁকি বা পরিশ্রম স্বীকার না করে প্রায়শঃ 'শর্ট-কাট্' উপায়ে বিপ্লব সাধন করতে চাই, জনগণের কানে সস্তায় কাজ হাসিলের মন্ত্র আওড়াই, তারও মূল রয়েছে এই নৈষ্কর্ম্যের দর্শনের মধ্যে। পুরুষোত্তমানন্দজীর কথায়—"মায়াবাদই ছিল সনাতন ভারতের ভিত্তি। বর্তমান ভারতের প্রগতিমূলক আশা আকাঙ্ক্ষা ও তাহার বেগধর্মকে মায়াবাদের ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া মূর্ত করিতে হইলে প্রতিপদে বাধার সম্মুখীন এবং পরিণামে বিফলমনোরথ হইতেই হইবে... অতীতের ভিত্তি নিতান্তই স্থাণুধর্মী; উহার উপর কোনও প্রকার গতিশীল কাঠামোর সৃষ্টি অসম্ভব।" (মহাত্মাজীর গঠনকর্ম পদ্ধতি, পৃষ্ঠা ৮)

পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্ত্যের কম্যুনিজমও স্বামীজীর মতানুসারে জনগণের প্রকৃত মুক্তি প্রদর্শক হতে পারে না। কম্যুনিজমের মধ্যে শ্রমের প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা ঠিকই হয়েছে। কিন্তু ওই দর্শনের ত্রুটি এই-খানে যে, তাতে বুদ্ধিকে শ্রমের প্রতিস্পর্ধীরূপে দাঁড় করিয়ে শ্রমকেই একান্ত মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, আত্মাকে অস্বীকৃত ও অগ্রাহ্য করে মতবাদকে করে তোলা হয়েছে সর্বাতিশায়ী ও সার্বগ্রাসী। স্বামীজীর মতে কম্যুনিজমের মতবাদ জনগণের মুক্তির বার্তা বয়ে নিয়ে এলেও এবং তার মধ্যে দ্বান্দ্বিকতার (Dialectic) সদ্ভাব থাকলেও এই দিক থেকে অপূর্ণ ও খণ্ডিত। ভারতীয় অদ্বৈতবাদের মতো কম্যুনিজমও খণ্ডিত দৃষ্টির দর্শন। স্বামীজীর কথাতেই তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করি—"ভারতীয় অদ্বৈতবাদ জোর দিয়াছে বুদ্ধির উপর...স্থিতির উপর। পক্ষান্তরে কমিউনিস্ট অদ্বৈতবাদ জোর দিয়াছে শ্রমের উপর, গতির উপর। দুই-ই একান্তবাদী (Absolutist), ভাবুক (Idealist)। গতির অত্যাচার ঠেকাইতে গিয়া যেমন ভারতীয় অদ্বৈতবাদ প্রবর্তন করিয়াছে স্থিতির অত্যাচার, রাশিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক অদ্বৈতবাদও বুদ্ধির অত্যাচারের প্রতিস্পর্ধীরূপে দাঁড় করাইতে চাহিতেছে শ্রমিকদের অত্যাচার। দুইয়ের মনোবৃত্তির ভিতরই রহিয়াছে প্রকাশ্য হিংসা ও অসত্য।" (সমগ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১০-১১) এই দুই দর্শনের কোনোটির মধ্যেই জনগণের মুক্তির তত্ত্ব নিহিত নাই, কেন না "ভারতীয় আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদ ও রাশিয়ার রাজনৈতিক অদ্বৈতবাদ দুই-ই ভাবুকের মতবাদ কেহই বাস্তববাদী (Realist) নন"। দুইই ভাবুকের মতবাদ এইজন্য যে, বুদ্ধি যখন শ্রমবর্জিত হয় তাতে ভাবুকতা ভিন্ন আর কিছু থাকে না, আবার শ্রম যখন বুদ্ধিবর্জিত হয় তাও একধরণের জড়ত্বধর্মী ভাবুকতায় পর্যবসিত হয়। সুতরাং এই দুইয়ের কোনোটির মধ্যেই জনগণের প্রকৃত মুক্তির হদিস মিলতে পারে না।

এইখানেই গান্ধীজীর গঠনকর্মের ভূমিকার গুরুত্ব ও সার্থকতা। গান্ধীজীর কর্মসূচীর ভিতরে একান্ত বুদ্ধিকে যেমন প্রাধান্য দেওয়া হয়নি তেমনি একান্ত শ্রমকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। জীবনে মানুষের সকল কাজ দুই দুইয়ের সহযোগিতায় চলে। সুতরাং নিতান্ত সহজভাবে জীবনের বাস্তবেরই প্রতিচ্ছবিমূলক যে কর্মদর্শন, তাতে শ্রম এবং বুদ্ধি দুইকেই একসূত্রে গ্রথিত করে তোলা হয়েছে এবং সেই আধারে এক অখণ্ড দর্শনের ভিত্তিগাত্র গড়ে তোলা হয়েছে। গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মদর্শনের

মধ্যে আছে মনন ও প্রমেয়, স্থাণু ও গতিশীলতার, আধ্যাত্মিকতা ও অদ্বয়বাদের এক সুন্দর সমন্বয়। এই দর্শনে কর্মকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু তার ভাবের পৃষ্ঠভূমিকে বাদ দিয়ে নয়। অন্যদিকে ঈশ্বর-মুখীনতাকে এই কর্মযোগে একেবারে কেন্দ্রমধ্যে স্থাপন করা হলেও তাতেই এর বৈশিষ্ট্যকে নিঃশেষিত করে দেওয়া হয়নি। ব্যক্তিগত ঈশ্বরমুখীনতার পাশাপাশি গণভিত্তিক অর্থাৎ সামূহিক কর্মমুখীনতাকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এক কথায় ঊর্ধ্বগতি ও ব্যাপ্তি, অধ্যাত্ম চেতনা ও কর্মচেতনা এই পরিকল্পনায় এক অনবদ্য সমন্বিত রূপ লাভ করেছে।

এই জন্যেই গান্ধীজীর গঠনকর্মপদ্ধতির স্রোত ও অন্যান্য দর্শনের তুলনায় তার অগ্রসরত্ব। যুগের যাবী এই দর্শনে-ই সবচেয়ে সার্থকভাবে পরিপূরিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে। এটি একটি অখণ্ড দর্শন, সামগ্রিক দর্শন। অন্যান্য দর্শনের অপূর্ণতাকে বাদ দিয়ে তাদের গুণগুলিকে কেবলমাত্র নিয়ে এই দর্শনের প্রতিষ্ঠা। ফলে এর মধ্যে যে প্রগতিশীলতার সূচনা হয়েছে এমন আর কোন দর্শনের মধ্যেই হয় নি। পুরুষোত্তমানন্দজী যথার্থই বলেছেন,—"সমগ্র হইতে কোনও দার্শনিক মতবাদ বা চিন্তাপ্রণালী আজ পর্য্যন্ত সঙ্ঘ গঠনের যাত্রাপথে চলমান হয় নাই, মহাত্মাজীর কর্মপদ্ধতির মধ্যে এই অভিনব যাত্রাপথের সূচনা রহিয়াছে বলিয়া ইহা জগতে অদ্বিতীয়।" (মহাত্মাজীর গঠনকর্ম-পদ্ধতি, পৃষ্ঠা ১৪)

"...ঠাকুরের মুখ সরল সুন্দর দেহের ধ্যানই করিতে হয়, কেননা উহাদ্বারা পূর্বের আবেষ্টনজনিত অসুস্থতা দূর হয় কিম্বা পূর্বের আবেষ্টনের মধ্যে যে proportion-এর উপলব্ধি না হওয়ার জন্য অসুস্থতার উৎপত্তি হইয়াছিল, সুস্থতার ধ্যানে সুস্থতা-অসুস্থতার ওপারের সত্যিকার জীবনের খোঁজ মিলে। একান্ত সুস্থতাও নাই, একান্ত অসুস্থতাও নাই। আবেষ্টনের পরিবর্তনের সঙ্গে পূর্বেকার সুস্থতাও অসুস্থতায় পরিণত হয়। যাহাদের পূর্বে অসুস্থতা ছিল, তাহাদের তো পরবর্তী কালে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে বেশী। সেইজন্যই প্রতি অসুস্থতার সময়ে সুস্থতা-অসুস্থতার মধ্য দিয়া অনাদি অনন্ত চলিয়াছে যে জীবন-স্রোত, তাহাকেই ধরিবার চেষ্টা করিতে হয়। অসুস্থতার বিরোধী বলিয়া যে সুস্থতার ধ্যান করিতে হয় তাহা নয়, উহা ঋষিদের প্রণালী। অসুস্থকেও সুস্থতার ধ্যান করিতে হয় সুস্থতা-অসুস্থতা ব্যাপিয়া চলিয়াছে যে নিত্যই নব নব জীবন-ধারা তাহাকেই পাইবার জন্য। জীবন-ধারা সুস্থ অসুস্থ হইয়াই নিত্য নব নব। নিত্য সুস্থতাও static, উহাও চরম সত্য নয়। সুস্থতা-অসুস্থতা ব্যাপিয়া যে জীবন-ধারা তাহার সঙ্গে যুক্ততা হয় প্রেমে।..."

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাজইআটি, পো: অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

আমি বৈষ্ণব নহি কারণ তাহাতে তিলক কেটে ভেক নিতে হয়, আমি বৈষ্ণবের দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। দাড়ী আছে বটে কিন্তু কাজি মৌলভির নিকট কলমা পড়ে মুসলমান হই নাই, মুসলমান দলের মুসলমান কেবল মুখে বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। ব্যাপটাইজড না হইলে খৃষ্টান দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না, বাহ্যিক অপতপ পূজার্চনাও নাই, কুলগুরুর কাছে কাণে ফোঁকা মন্ত্রও লইতে চাহি না— ইহাতে সাধারণ হিন্দুরা আমাকে নাস্তিক বলিবেন। বাহ্যিক পূজা অর্চনা জপই আস্তিকের কার্য তাঁহারা বলেন। এখন কোন দলে ত আমাকে লইবে না, আমিও দল চাই না। দল গেড়ে ডোবাতেই, পচিল পঙ্ক পরিপূর্ণ পুতিগন্ধযুক্ত পচলেই হইয়া থাকে; স্বচ্ছ সরোবরে, প্রবাহিনী স্রোতস্বিনী নদীতে হয় না। তবে আমি কি? আমি সকল দলের ভিখারী। ভিখারীর জন্য সকল দ্বারই উন্মুক্ত। আমাকে প্রেম ভক্তি ভিক্ষা সকল দলের সাধুরাই দিয়া থাকেন। আমি সকল দলের ভিক্ষা পাই। সেইজন্য আমার সকল দল লয়ে এক অখণ্ড দল।'

—শ্রীনিত্যগোপাল

সূচীপত্র, মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭২, ১৮-৮-৭

আমাদের কথা

লাঞ্ছন সাহিত্যে নৈতিক পতাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ

শ্রীপ্রতিভা রায়

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

শ্রীরেণু মিত্র

প্রার্থনাকালীন ভাষণ (৬১)

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

স্থূল রাজা

একজন শিক্ষাবিদের অভিজ্ঞতা

দাক্ষিণ্য (কবিতা)

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার রায়

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (৫৩)

১৯৫৩

পৃথিবীটা যদ্দ বেশী সচল (কবিতা)

শ্রীকারতী

সিদ্ধান্ত দর্শন (পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীনিত্যগোপাল

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

গান্ধীজীর গঠন মূলক কর্মসূচীর

দার্শনিক ব্যবস্থা

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। মেরুহীন আত্মা যেমন অসম্ভব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—মানুষ কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

মন্ত্রতন্ত্র (অবধূত ভাষ্য)	
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	১।৩
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)	৮৲
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)	৬৲
ঈশোপনিষৎ	
কেনোপনিষৎ	
কঠোপনিষৎ	৩৲
প্রশ্নোপনিষৎ	
ঐতরেয়োপনিষৎ	
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	
শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ	
শ্রীনিত্যগোপাল জীবনে ও দর্শনে	
স্বরাজের পূর্বরূপ	
গীতাজয়ন্তী	
উদ্ধবসংবাদ (পুস্তিকা)	
মুণ্ডকোপনিষৎ	
মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে	
পুরুষোত্তম-স্মৃতিতীর্থে আলোচনা	৬৲
(গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)	

পাণ্ডুলিপি

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ

ছান্দোগ্য উপনিষৎ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি

শ্রীমতী প্রতিভা রায়ের

নারী-প্রগতির জন্মকথা

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ও শিল্প নিত্যগোপাল

ও শিল্পী সুধার কথা

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

১।	সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল	॥৶০
২।	রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে	২৲
৩।	শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন	৩৲
৪।	রবীন্দ্র-স্মরণ	৫৲
৫।	প্রাথমিক শিক্ষা	৪৲

নরনারায়ণ আশ্রম

ফোন নম্বর ৫৭-২৫৪০

গ্রাম : বাগুইআটি পো: অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

শ্রীনিত্যগোপাল

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৮৮৭, ১৩৭৩, সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র ১৯শ বর্ষ, ৪র্থ-৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা

আমি বৈষ্ণব নহি কারণ তাহাতে তিলক কেটে কেশ নিতে হয়, আমি বৈষ্ণবের দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। দাড়ী আছে বটে কিন্তু কাজি মৌলবির নিকট কলমা পরে মুসলমান হই নাই, মুসলমান দলের মুসলমান কেবল মুখে বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। ব্যাপটাইজড না হইলে খৃষ্টান দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না, বাহ্যিক জলতল পূজার্চনাও নাই, কুলগুরুর কাছে কাণে ফোঁকা মন্ত্রও লইতে চাহি না— ইহাতে সাধারণ হিন্দুরা আমাকে নাস্তিক বলিবেন। বাহ্যিক পূজা অর্চনা স্পষ্ট আস্তিকের কার্য তাঁহারা বলেন। এমন কোন দলে ত আমাকে লইবে না, আমিও দল চাই না। দল গেড়ে ডোবাতেই, পঙ্কিল পঙ্ক পরিপূর্ণ পূতিগন্ধযুক্ত পঙ্কলেই হইয়া থাকে; স্বচ্ছ সরোবরে, প্রবাহিনী স্রোতস্বিনী নদীতে হয় না। তবে আমি কি? আমি সকল দলের ভিখারী। ভিখারীর জন্য সকল ঘাটে উন্মুক্ত। আমাকে প্রেম ভক্তি ভিক্ষা সকল দলের সাধুরাই দিয়া থাকেন। আমি সকল দলের ভিক্ষা পাই। সেইজন্য আমার সকল দল লয়ে এক অখণ্ড দল।'

—শ্রীনিত্যগোপাল

উদ্বোধন

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৮৮৭ শকাব্দ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ ১৯শ বর্ষ, ৪র্থ-৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৬২)

নিত্যগোপাল, তোমার দেওয়া দর্শন এই সম্প্রতি আমি কার কাছে দিয়ে যাব? শ্রীরাধার মত বলি, মরিব মরিব সখি নিশ্চয়ই মরিব, কাকে হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব? পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া নিজেকে ব্রহ্ম সনাতন বলে ঘোষণা করা—এক নিত্যগোপাল ছাড়া আর কেউ বলেন নি ...নিত্যগোপাল, তুমি যদি আমাদের গোলাম রাখতে, তাহলে বুঝি বা তোমাকে মানতাম···কিন্তু তুমি আমাদের ভালবাসলে, কার কোথায় দুঃখ, কে কোথায় খেল না, কার কাপড় নেই—তুমি এই তো করেছ? মনের প্রেমাগ্নিকের জন্য বাড়া ভাত নিয়ে বসে থাক তুমি! একদিন কুমার [কুমার নাথ মৈত্র শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতজীর শিষ্য] লিখেছিল (যখন তাকে ১২৫৲ টাকা দিয়ে দিয়েছিলাম)—এতদিন শিষ্য গুরুর কেট জোগাত আজ গুরু শিষ্যের কেট জোগায়।···গুরু যখন কিছু প্রতিদান চান না, যখন বলেন যা পার না পার সব ভার রইল আমার উপর—তখনই তো তাঁকে সব দিতে হয়। প্রাণ দিতে হয় তাঁকে, প্রাণই তো তিনি চান।.. আমার কি আছে? আছে শুধু চোখের জল...বিশ্বে আমি কারো কাছ থেকে দূরে তো থাকি নি...সম্পদে হয়তো আমি কেউ নই...। আমার ভিখারী নিত্যগোপাল, অনাদরে এসেছিলে, অনাদরে চলে গেছ।...তোমাকে কার কাছে আমি রেখে যাব? কে তোমাকে নিয়ে থাকবে?...তাঁর শেষ বাণী মনে রেখো তোমরা—পরস্পর ভ্রাতৃভাবে থাকিবে...। তিনি বলছেন, আমার শিষ্যদের প্রতি আমার নিবেদন তারা পরস্পর ভ্রাতৃভাবে থাকবে।..... নিত্যগোপাল, চারদিকের শূন্যতা দেখে কখনও মনে হয় তোমার দর্শন কি ভুল? আমি কি মরীচিকার পিছনে ছুটেছি?···কিন্তু আমার তো এ ছাড়া আর কিছু নেই···আমার দেহে জয় নিত্যগোপাল, মনে জয় নিত্যগোপাল, বুদ্ধিতে জয় নিত্যগোপাল, অহংকারে জয় নিত্যগোপাল।...জগন্নাথ নিত্যগোপাল! ধরার ধূলি হোক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম-মানুষ।

৯।১১।৫৬ ঈ। নিত্যগোপাল-জীবনে শিবধারা ও বিষ্ণুধারা সমন্বিত হয়েছে। এ দেশে শৈব বৈষ্ণবে দীর্ঘকাল ঝগড়া। শ্রীনিত্যগোপাল-জীবনে শিব ও বিষ্ণু সমন্বিত হয়েছেন। শ্রীনিত্যগোপাল যে শিব তা তাঁর জন্মবৃত্তান্ত শুনলেও বুঝা যায়—দিদিমা আনন্দময়ী ও মাতা গৌরীর পুত্র-সাধনা···বীরেশ্বর-প্রসাদে নিত্যগোপালের জন্ম।··· শিব আশুতোষ, অল্পেই সন্তুষ্ট, নিত্যগোপালও আশুতোষ। এই যে আশুতোষত্ব, এ সম্ভব তখন যখন জীব তাঁরই অংশ। শিব যেখানে জীবকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল সেখানে জীবের তরফ থেকে একটু ইঙ্গিত—gesture—পেলেই তিনি কৃপা করে বসেন।···মাকে খুশী করা সব চেয়ে সোজা, সন্তান না থাকলে মায়ের মাতৃত্বই থাকে না—দুগ্ধ আছে বলেই ত্রস্তা, পুত্র আছে বলেই বাপ-মা···। জীব, আর শিব একত্র...জীব শিবেরই অংশ বলে, অপৃথক

বলেই তাঁর পক্ষে আশুতোষ হওয়া সম্ভব—পিতাই আশুতোষ, পুত্র নয়; শিবই আশুতোষ, জীব নয়।...রবীন্দ্রনাথের সেই লেখা—'মা, এসেছি।' সন্তান যদি বলে মা, আমি তোমার কাছে এসেছি—তাহলেই মা খুশী হয়ে যান। তাই মাকে—ভগবানকে—সন্তুষ্ট করতে কিছুই লাগে না।...মনে মনে আপন বলে ভাবি এটা ঔচিত্যের কথা—বাইরের ব্যবহারের মধ্যে আপন ভাবার পরিচয় দিতে হবে নিজের জীবনের কথাই বলি—কাউকে তো এ জীবনে পুরুষ বলে মনে করি নি—আমাকে খুশী করা কতই না সোজা! কিন্তু টাকা দিয়ে কাজ দিয়ে আমাকে খুশী করতে পারবে না—পারবে কেবল প্রাণের স্পর্শ দিয়ে খুশী করতে। একটু প্রাণের স্পর্শ দিয়ে আমাকে দিয়ে লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়ে নেওয়া যায়। অভিসন্ধি আমার নেই—আজ সারা দিন নারায়ণের (আশ্রমের পাশের জমিতে বসা রিফিউজীদের একজন) কথা মনে করছি—তাকে কত আপনই মনে করেছি, অথচ সে আজ কটু কথাও বলে।...কত মানুষ এসেছে, চলে গেছে...। শত অপরাধ শত বিরুদ্ধতা করেও ছ মাস ছ বছর পরেও কেউ একজন কাছে এসে দাঁড়ালেই তো আমি খুশী হয়ে যাই—কিন্তু কাছে এসেও কেউ দাঁড়ায় না।...রাজেন ঘুরে ঘুরে থাকতে চায়—কী যে আমার কষ্ট!...সে থাকবে না যাবে দেখি।...উদ্বাস্তীকে বলেছি তলাটিয়ারের মা হতে। জীবনে কোনদিন কারো আত্মসম্মান লঙ্ঘন করি নি, তাই প্রাণ ঢালা করতে পারি।...আশুতোষকে খুশী করতে পারলে না তোমরা—কী আর বলব?...নিত্যগোপাল ও শিব-চরিত্র বললাম—তারই একটু স্পর্শ ছিল বলে আমাকে সন্তুষ্ট করা এত সহজ ....আজ ঐ দুপুর বারোটার ছেলেরা কাঠ টেনেছে—যন্ত্রণায় আমি ছটফট করছিলাম...ঘুমাতে পারলাম না, গিয়ে কালীদের গায়ে একটু হাত বুলাই...। প্রাণ চাই আমি। অভিভাবক ছিল না যতদিন ততদিন যেমনি তেমনি চলেছ—কিন্তু এখানে বালিশের খোলে জামা করে রাখলে সে তো আমাদের কষ্ট...। নারায়ণের জন্য সারাদিন আজ মন কেমন করছে। যাই হোক, প্রাণ খুলে তোমরা চলো...আমার সাধ্যমত আমি সেবা করেছি, করব; কিন্তু তোমরা প্রাণ খুলে চলো। প্রাণ খুলে না চললে কিছুই করতে পারব না।...তোমরা খাটছ, খুব খাটছ, কেউ যদি যাও আমার কষ্ট হবে...। তোমরা সেবা করলে, আমি সেবা করতে পারলাম না।...আমার কাছে প্রাণ খুলে চলতে পারলে না সেই তো আমার কল্যাণ করতে না পারা...। ত্রুটি যদি থাকে সে তো আমারই ত্রুটি...। জীবের শাস্তি ভগবানকে পেতে হয়, প্রজার পাপে রাজার শাস্তি হয়...। ভাইয়ে ভাইয়ে সন্তানে সন্তানে বিরোধের মধ্য দিয়ে যে বিষ উঠছে তা পান করবে পিতা।...দুঃখের দায়িত্ব আমি নিয়েছি—আমার পুত্রকন্যাস্থানী বন্ধুবান্ধব শিষ্য প্রত্যেকের দুঃখের পাশে গিয়ে আমি দাঁড়িয়েছি...এত খানি হৃদয় নিয়ে কোন গুরু কোন শিষ্যকে দেখে নাই।...তোমরা কষ্ট করতে পার, আমি কি তোমাদের সে কষ্ট দিতে পারি? কিন্তু তোমাদের প্রাণখোলা হতে হবে। প্রাণ খোলা না থাকলে যে অপরাধ তুমি কর নি, সে অপরাধও তো আমি তোমার ঘাড়ে দিতে পারি?...যারা আমার সাথে মিলতে পারলে না তারা আমার সঙ্গে থাকবে কি করে কি জানি...।

৭,১১,৫৬।...গীতায় ভগবান বলেছেন নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম—ব্রহ্ম নির্দোষ, নিশ্চয়ই সম। সব মানুষই ব্রহ্মের এই দুটী বিশেষণে অভিহিত হতে চায়। যা কিছু বড় তাই নির্দোষ ও সম—পিতা নির্দোষ ও সম। প্রত্যেক মানুষ নির্দোষ হতে চায়—মানেই বড় হতে চায়—দোষ ধরা পড়লেই মুখ কালো হয়ে যায়। দোষ না থাকাই যখন বড়ত্বের লক্ষণ, তখন দোষ কইলেই রাগ হয়। নির্দোষ দুই রকম—যে কিছু করে না সে নির্দোষ—কাজকর্ম না করলে দোষ কিসে? বোঝার শত্রু নেই। কথা না বলার সার্থকতা আছে—সেটা ভাল। এখানে সবলেই কথা একটু বেশী বলে সেটা বন্ধ করা উচিৎ। আশ্রমের সম্বন্ধে সাধারণতঃ তেমন কিছু তোমাদের জানা হয় নি—আশ্রম নিয়ে আলোচনা করা তোমাদের এখনও সময় হয় নি...। কাজ না করে নির্দোষ হওয়া তো চলে না—তবে কি করে নির্দোষ হওয়া যায় সেইটে শেখ।...

আজকের কাজ এক রকম, কালকের কাজ আর এক রকম...নূতন করে প্রত্যেক দিনকে জানতে হয়।... আশুতোষ ..তাঁর কণ্ঠে বিষ—হৃদয়ে নেই—ভুল ধরে সেটা বুঝিয়ে দেওয়াই তাঁর কাজ—হৃদয়ে নেই।···শিব ভুল ধরেন, ভুলের জন্য শাস্তি দেন না যদি না সে ভুল আঁকড়ে থাকে। শুক কি তা যে জানে না, সে ভুল গোপরাধে কি বধে? Ram go যে লেখে সে Ram goes জানে না বলে লেখে...অজ্ঞানী ভুলকে সমর্থন করে হুড়াহুড়ি করে।.. বিশ্বে নিত্য নূতন ঘটনা, নিত্য নূতন পরিবেশ... ধরাবাঁধা কাজে ভুল কম। কিন্তু যারা বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের নিত্য নূতন ঘটনা···নিত্য গোপালের প্রসাদে সকল ক্ষেত্রে—বহু ক্ষেত্রে—বিচরণ করবার একটা ক্ষমতা পুরুষোত্তমানন্দ লাভ করেছে। ···যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেন সংস্থিতা···শিব খুঁজে বেড়ান না ত্রুটি কেননা তিনি মিলনের জন্য ব্যাকুল—খুঁৎ যারা ধরে, দোষই যারা দেখে তারা মিলন চায় না—এটা জীব-বৃত্তি...। নিখুঁত স্থানও তো মানুষের জীবনে থাকতে পারে—সেইটে খোঁজ করো।...থাকতে হবে নরনারায়ণ আশ্রমে—পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে খুঁৎ ধরে বেড়ালে তাতে কি কল্যাণ হবে?...যত এগোবে তত বেশী ভুল ধরা পড়বে...ভুলের সমর্থন করছ?···তোমাকে দোষ দিয়ে করছি কি? ভুল ধরে দিলে আনন্দিত হওয়া উচিৎ...এইবার পথের খবর পাওয়া গেল···। বিশ্বের লোক স্বামী—তুমি শুধু দোষা তুলসী...। সাধনার জগতে বিনয়ী হতে হয়, নম্র হতে হয়···ভুল ধরার জন্য নিজে চেষ্টা করো।...নারায়ণ আসে না—বার বার দেখে দেখছি আমার তরফ থেকে কিংবা আশ্রমের তরফ থেকে কোন অপরাধ হয়েছে কিনা...ভুল করে নিজের ভুলকে যুক্তিতর্ক দিয়ে সমর্থন—এ বড় সাংঘাতিক রোগ। কয় জনের সঙ্গে জীবনে মিলে মিশে চলতে পেরেছ?...দোষ শুনলেই আত্মস্থ হয়ে দেখবে কোথায় কি হল?·····অসুখ হল সে কি অন্যের দোষ তুমি অবস্থা বিবেচনা করে চললে না কেন?···এখানে থাকলে দেখবে কত লোক আসবে, কত অচেনা লোক আসবে।···সেই পরিবর্তিত আবেষ্টনে কি রকম করে চলতে হবে? কেউ যেন অপমানিত না হয়···নিত্য নূতন সমস্যা যখন তখন নিত্য নূতন জ্ঞান দরকার। কাল টাকা ছিল, আজ টাকা নাই—কি করতে হবে?...নির্দোষ হও—কিন্তু 'আমি' থাকতে হবে না—তোমার ক্ষুদ্র আমির হিসাবে চলতে চাইলে নির্দোষ হতে পারবে না।...আমি ও ব্যাপারে নেই—অমুকের সঙ্গে কথা কওয়া যায় না...তবে সমাধিস্থ হও—হলের মধ্যে থাকলে সব ব্যাপার চালাতেও হবে, মানুষের সঙ্গে কথাও কইতে হবে...। যারা আমাকে ভুলের মত কটু কথা বলেছে, কটু ব্যবহার করেছে, তাদের আজও আমি বুকের মধ্যে করে আছি। আমার কণ্ঠে বিষ—হৃদয়ে নেই—তোমাদের দোষ আমাকে ধরতেই হবে।...হৃদয় দেখ... এই যে শিবত্বের যোগ্যতা নিয়ে বা শিবত্বের এক কণা পেয়ে আমি দিনের পর দিন মানুষকে নূতন করে ব্যাখ্যা করছি—এর তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করো। আমার জীবন-কথা বলি—তা বুঝতে চেষ্টা করো। কোন্ পথে চলবে? ভেবে দেখো ···যীশু খৃষ্টের নিতাই মহাত্মা এদের সবাইকে সংসারী লোকেরা দোষী করে—লাঠি ঠেঙা রিভলভার ক্রশে হত্যা করে···কেননা সংসারী লোকের দৃষ্টির সঙ্গে এদের দৃষ্টি মেলে না। এরা মানুষের সঙ্গে মানুষের সামঞ্জস্য করতে চান—মানুষ তা চায় না তাই এদের দোষী করে।···

৮,১১,৭৬। ঐ পূর্বে যারা ভারতে সন্ন্যাসী হয়েছেন তাঁদের দেখলে চেনা যেত—সংসারের সমস্ত কার্যের সংস্রব ত্যাগ করে দূরে বাস করতেন, নরোত্তম করোয়া উঠিয়ে রাখতেন—সকল না করে পরী আউর দরবেশ।...তাদের রুক্ষতা ইত্যাদি দেখে তাদের চেনা সহজ।...বর্তমান যুগের সন্ন্যাসীরা বাইরে থেকে সংসারীদের মতই থাকে...।

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

॥ শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় ॥

মাতৃস্নেহ-ধন্য মানুষ নিজেকে বিজয়ী বীরের সমকক্ষ মনে করে। তার মনে জাগে এমন এক আত্মপ্রত্যয় যার বলে জীবনে সাফল্য অর্জন করা তার পক্ষে সহজ হয়ে উঠে। এই অনুভূতি জেগেছিল আধুনিক মনোবিজ্ঞানের জনক সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের মনে। জন্মাবধিই ফ্রয়েড পেয়েছিলেন অপার মাতৃস্নেহ। এমেলিয়া ফ্রয়েডের প্রথম সন্তান হচ্ছেন সিগমুণ্ড। এমেলিয়ার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে, তাঁর এই সন্তান জীবনে এক মহতী কীর্তি অর্জনের অধিকার নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে। জননী এমেলিয়া জীবনভোর এই ধারণা পোষণ করে এসেছেন। মাতা ও পুত্রের মধ্যে তাই গড়ে উঠেছিল এক অদ্ভুত গুণানুরাগ। পুত্রের ইচ্ছা ও আবার যত অসঙ্গতই হোক না কেন, অপূর্ণ থাকত না কখনো। ছেলেবেলা থেকেই সিগমুণ্ডের গভীর পাঠস্পৃহা। পাশের ঘরে ছোট বোন আনা পিয়ানো বাজায়। তাতে সিগমুণ্ডের পড়ায় বিঘ্ন ঘটে। সুতরাং পিয়ানো বাজান চলবে না। হলোও তাই। পিয়ানোটি অপসারিত হ'ল।

মায়ের অপরিমিত আদরে ও প্রশ্রয়ে সিগমুণ্ডের বাল্যজীবন ভালই কাটতে লাগল। সিগমুণ্ড কিন্তু সে প্রশ্রয়ে বিগড়ে যান নি, তার কারণ তাঁর সহজাত পাঠস্পৃহা ও বিদ্যানুরাগ। খেলাধূলার প্রতি সিগমুণ্ডের আকর্ষণ ছিল না বল্লেই চলে, বালসুলভ চাপল্য ছিল না তাঁর মধ্যে। বই পড়া আর পায়ে হেঁটে বেড়ান—এই ছিল বালকের স্বভাবসিদ্ধ ঝোঁক।

অস্ট্রিয়ার এক ছোট্ট শহর ফ্রাইবুর্গ। পিতা জেকব ফ্রয়েডের ছিল একটা ছোট তাঁতের কারখানা। ফ্রয়েডরা ইহুদী। ১৮৫৬ সনের ৬ই মার্চ সিগমুণ্ড জন্মগ্রহণ করেন। সংসারের অবস্থা অনতিস্বচ্ছল। এদিকে উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে অস্ট্রিয়ায় শিল্প-বিপ্লব সংঘটিত হয়। তার ফলে যন্ত্রচালিত জেকব মিলের কাপড়ের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় পরাজয় স্বীকার করে তাঁতের কারখানা তুলে দিলেন। ফ্রাইবুর্গ শহর ছেড়ে ফ্রয়েড পরিবার চলে এল রাজধানী ভিয়েনায়। জেকব কাপড়ের দোকান খুলে সেখানে ব্যবসা শুরু করলেন, আর সিগমুণ্ডকে পাঠান হল স্কুলে। এগুই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একাদিক্রমে আট বৎসর পড়াশুনা করল সিগমুণ্ড। লেখাপড়ায় ক্লাসের সেরা ছেলে সিগমুণ্ড—কি বছরই ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করত। স্কুলের পড়া সাঙ্গ করবার পূর্বেই সিগমুণ্ড সেক্সপীয়র, গোটে, কাণ্ট, হেগেল ও সোপেনহার প্রভৃতি সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের দিক্‌পালদের গ্রন্থাবলী পড়ে শেষ করেছে। মহাকবি গোটের অনুসরণে কাব্যরচনার ইচ্ছাও মনের কোণে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। কিন্তু বাস্তববুদ্ধিই শেষ পর্যন্ত জয়ী হ'ল। কাব্য ও কল্পনাবিলাস ছেড়ে অর্থকরী চিকিৎসা বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হ'ল সিগমুণ্ড। ১৮৭৩ সনে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হ'ল তরুণ সিগমুণ্ড।

অস্ট্রিয়া-জার্মেনীতে ইহুদী-বিদ্বেষ বরাবরই প্রবল। সেদিনের ইহুদী-বিদ্বেষ সিগমুণ্ডের স্কুল ও বিদ্যালয়ের দিনগুলিকেও অশান্তিকর করে তুলেছিল।

স্কুল কলেজের খৃষ্টান সহপাঠিরা ইহুদী বলে সিগমুণ্ড ফ্রয়েডকে হেয় জ্ঞান করত ও নানাভাবে উত্যক্ত করত। আর যে সব ইহুদী ছেলে নিজেদের হীনতা স্বীকার ক'রে নত-নম্র হয়ে থাকত তারা রেহাই পেত অত্যাচারের হাত থেকে। কিন্তু সিগমুণ্ড অন্য ধাতুতে গড়া—হীনতা স্বীকার করতে রাজী নয়—নিজের জাতি ও ধর্মের প্রতি অতি শ্রদ্ধাশীল। কাজেই তার ভাগ্যে জুটত নানা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। এর মধ্যে ইংলণ্ড ভ্রমণের এক সুযোগ এসে গেল। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনের

পুরস্কার স্বরূপ পিতা জেকব সিগমুণ্ডকে ইংলণ্ড ভ্রমণের খরচের টাকা দিলেন। ইংলণ্ডে কিছু দিন কাটিয়ে এল সিগমুণ্ড। ইংলণ্ডের মাটিতে পা দিয়ে সিগমুণ্ড বুঝতে পারল যে এখানে সে অন্য দশজনের মতই মুক্ত, স্বাধীন মানুষ। খৃষ্টান-ইহুদী বিবাদ-বিদ্বেষহীন ইংলণ্ডের মুক্ত সামাজিক পরিবেশ সিগমুণ্ডকে মুগ্ধ করেছিল। ইংলণ্ড থেকে শুধু সাম্য ও স্বাধীনতার আস্বাদই নয়, সঙ্গে নিয়ে এলেন একটা গভীর আত্মপ্রত্যয়। সিগমুণ্ড আবার ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে গিয়ে প্রথম দু'তিন বৎসর সিগমুণ্ড খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। প্রকৃতি বিজ্ঞানের কোন্ বিশেষ শাখায় তিনি কৃতিত্ব দেখাতে পারবেন—তার হদিস পাচ্ছিলেন না। এই সময় তাঁর সঙ্গে জীববিদ্যা ও শারীরবিদ্যার অধ্যাপক ব্রুকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়, এবং যথাকালে তাঁরই উপদেশ ও সাহায্যে সিগমুণ্ড বিজ্ঞানের এই বিশেষ দিকটি নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা সুরু করেন। তারপর দীর্ঘ আট বৎসর পর চিকিৎসা বিদ্যায় শেষ উপাধি লাভ করেন। চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করা কালে সিগমুণ্ড মানবদেহের স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও স্বভাব নিয়ে বিশেষভাবে অনুশীলন শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে স্নায়ুচিকিৎসাতেই সিগমুণ্ডের খ্যাতি ও পশার উভয়ই বৃদ্ধি পায়।

১৮৮৫-১৮৮৬ সনের মধ্যে প্যারীতে তদানীন্তন খ্যাতনামা স্নায়ুচিকিৎসক জ্যাঁ চারকটের নিকট স্নায়ুবিদ্যা বিষয়ে অধ্যয়নাদি করে স্বীয় কর্মস্থল ভিয়েনায় ফিরে আসেন। এ সময়ে তিনি পূর্ব বাগদত্তা মার্থা বার্নে নাম্নী তরুণীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

স্নায়বিক রোগের চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্র্যাক্টিস করতে গিয়ে সিগমুণ্ড ফ্রয়েডকে প্রথম প্রথম নানা বাধা ও বিরূপতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। স্নায়ুবিকারের চিকিৎসায় তিনি সংবেশন (hypnosis) পদ্ধতি অবলম্বন করতেন বলে ভিয়েনার চিকিৎসক মণ্ডলীর তরফ থেকে প্রবল প্রতিবাদ উঠল। এমন কি কয়েকটি স্থির চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ থেকে তাঁর নাম খারিজ করে দেওয়া হয়। কিন্তু দেশাদার চিকিৎসকগণের বিরূপতা সত্ত্বেও ডাক্তার হিসেবে সিগমুণ্ডের জনপ্রিয়তা ও পশার উত্তর বিপুলভাবে বাড়তে থাকে। নানা দেশ থেকে নানা প্রকারের স্নায়ুরোগীর (Neurotic) ভিড় লেগে থাকত তাঁর ভিস্পেন্সারিতে। স্নায়ুরোগীর চিকিৎসা সূত্রেই সিগমুণ্ড ফ্রয়েড হিষ্টিরিয়া বা মৃগী রোগের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, এবং প্রায় দশ বৎসর ব্যাপী গবেষণার ফল স্বরূপ "Studies in Hysteria" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৮৯৫ সনে। সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের এই বিখ্যাত গ্রন্থ চিকিৎসা-মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় অবদান। এই প্রথম মানুষ অচেতন (Unconscious) এবং অবচেতন (Sub conscious) মনের অস্তিত্বের কথা জানল। মানুষ জানল যে, স্নায়ুঘটিত রোগের মূল নিহিত থাকে মানুষের অবচেতন মনেই। এই অভিনব তত্ত্ব নিয়ে যে তর্ক বিতর্কের ঝড় উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি! সিগমুণ্ড কিন্তু অবিচল রইলেন তাঁর মতবাদে। তাঁর অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান আরও এগিয়ে চলল। মনের গঠন ও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ আরও বিপ্লবাত্মক। মানুষ স্বপ্ন দেখে। সেই স্বপ্নের উৎস অচেতন মনের গহনে; আর সেই উৎস থেকেই আদিম মানুষের আচার-আচরণের সৃষ্টি; সেই উৎসই প্রেরণা জোগায় সাহিত্য, শিল্প-কলা, হাস্যকৌতুক এমন কি মানুষের দৈনন্দিন ক্রিয়া কর্মেরও। ১৯০০ সনে ফ্রয়েডের জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ "Interpretation of Dreams" প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিয়েনার সীমিত প্রতিবাদ যেন সারা বিশ্বের সোচ্চার প্রতিবাদে পরিণত হল। কিন্তু অবিচলিত গবেষক পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর আরব্ধ কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হল তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ :—

(i) The Psychopathology of Every Day Life, (ii) Wit and its Relations to the Unconscious, (iii) Three Contributions to the Theory of Sexuality (iv) Totem and Tabu.

ফ্রয়েডের খ্যাতি যেমন বেড়ে চলল, তেমনি বইতে লাগল প্রতিবাদের প্রচণ্ড ঝড়। প্রত্যেকটি বই নিয়ে বাদ-বিতণ্ডার অবধি রইল না।

ক্রমে তর্ক-বিতর্ক চরমে উঠল। ফ্রয়েডের প্রধান প্রধান অনুবর্তীদের মধ্যেও মতভেদ দেখা দিল। দু'জন বিখ্যাত শিষ্য এ্যাডলার (Adler) এবং ইয়ুং (Jung) ফ্রয়েডের মতবাদ খণ্ডন ক'রে নিজেদের তত্ত্ব প্রচার করলেন। ইহুদী-বিদ্বেষের অগ্নিগিরির মাথায় যাঁর ছাত্রজীবন শুরু হয়েছিল, তাঁর সারাজীবনে যেরে অব্যাহত ছিল বাদ-বিতণ্ডার তুমুল ঝড়। নাৎসীরা জার্মানীর শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করেই ফ্রয়েডের তত্ত্বগুলিকে 'ইহুদী-যৌন-সাহিত্য' বলে ঘোষণা করল, এবং প্রকাশ্য স্থানে করল তাঁর বইয়ের বহ্নুৎসব। সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাও বিপন্ন হয়ে উঠেছে দেখে বন্ধুগণ তাঁকে বিয়েনা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে অনুরোধ জানাল। ফ্রয়েড তখন বিরাশি বছরের বৃদ্ধির এবং দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। কিন্তু রুগ্ন ও বৃদ্ধ সিগমুণ্ড বিয়েনা ছেড়ে যেতে রাজী নন।

এদিকে নাৎসী নির্যাতনের মাত্রা বেড়েই চলেছে। তাঁর যাবতীয় অর্থ, সম্পত্তি এবং পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হল। বন্ধু ও অনুবর্তীদের সনির্বন্ধ অনুরোধে ফ্রয়েড অগত্যা রাজী হলেন ইংলণ্ডে চলে যেতে। নাৎসীরা দেশ ত্যাগের অনুমতি পত্রের মূল্য ধার্য করে কুড়ি হাজার পাউণ্ড অর্থ দাবী করে বসল। গ্রীসদেশের রাজকুমারী এই অর্থ দান করে বৃদ্ধকে নাৎসী কবল থেকে মুক্ত করলেন। লণ্ডনে ১৯৩৯ সনের ২৩এ সেপ্টেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অন্যতম দিগমুণ্ড ফ্রয়েড।

ফ্রয়েডকে নিয়ে আজও অবধি মতভেদের শেষ নেই। বাস্তবানুগ সাহিত্যিকরা ত বটেই, এমন কি কালচার-বিলাসী সাধারণ মানুষও ফ্রয়েড এবং মনোবিশ্লেষণ বিষয়ক দু'চারটি চমকপ্রদ কথা বলে নিজেদের আধুনিকতার প্রমাণ দিতে পারলে ছাড়ে না। অনেকেই ফ্রয়েডের বই হয়ত পড়েনি, কিন্তু ফ্রয়েডের নামে দু'চারটা মুখ-রোচক বুলি আওড়াতে কম জানে না। এ-থেকেই বুঝা যায় মানুষের বর্তমান চিন্তাধারার উপর ফ্রয়েডের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব কতখানি।

ফ্রয়েডের আগে মানুষের মন ও আচার-আচরণ নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান বিশেষ কিছুই হয় নি। দর্শন শাস্ত্রেরই একটি অপেক্ষাকৃত গৌণ শাখামাত্র ছিল মনস্তত্ত্ব। কথিত মনস্তত্ত্ব নামধেয় বিষয়টি ছিল একান্তই শাস্ত্রীয়বৃত্ত-ঘেঁষা। ফ্রয়েডই সর্বপ্রথম মনস্তত্ত্বকে পরীক্ষা নিরীক্ষা-সিদ্ধ বিজ্ঞানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। নিগূঢ় রহস্যময় মানব মনের একটি মানচিত্রের কাঠামো রচনা করেছেন ফ্রয়েড। সচেতন মনের অন্তরালে সতত সক্রিয় অথচ নিঃসংশয়িত অবচেতন মনের অস্তিত্বটি প্রথম জানালেন ফ্রয়েড। শৈশব থেকে পূর্ণবয়ঃ প্রাপ্তি পর্যন্ত মানুষের ক্রম পরিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে তিনিই মানব মনের রহস্যের উপর আলোকপাত করেছেন ফ্রয়েড। মানুষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বগঠনের শিক্ষায় তাঁর এই গবেষণার মূল্য সমধিক। অদৃষ্ট ও অজ্ঞেয় মানব মনের গহনে প্রবেশ করে তার রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন ফ্রয়েড। এটা স্বাভাবিক যে, তাঁর এ হেন প্রচেষ্টা তীব্র সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াবে। মানুষের সামগ্রিক জীবন, চিন্তাধারা ও কর্মোদ্যম প্রভৃতি সব কিছুই যৌন-প্রবৃত্তিরই প্রতিফলন—এ হেন আশ্চর্য তত্ত্ব যে সবাই সহজে মেনে নেবে না—সে ত স্বাভাবিক। ফ্রয়েডের মতে মানুষের জীবনে যৌন প্রবৃত্তির প্রভাবই সব চাইতে বেশী প্রবল। যৌন প্রবৃত্তির অবদমনই (suppression) যত মানসিক ব্যাধি-বিকৃতি ও অসামাজিক আচরণের মূল। আবার যৌন-জীবনের সাব্‌লিমেশনই (sublimation) শিল্প কলা, কাব্য সাহিত্য ইত্যাদি সার্থক সৃষ্টির রূপান্তর। এই মূলান্তরবাদী তত্ত্ব নিয়ে যত বিতর্ক ও মতবিভেদের সৃষ্টিই হোক না কেন, এ-কথা সত্য যে, মানুষের স্বভাব ও আচরণের স্বরূপ নির্ণয় করতে সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের তত্ত্বগুলি অপরিহার্য।

রবীন্দ্রস্মরণে

।। শ্রীসুনীতি চক্রবর্তী ।।

আজ পঁচিশে বৈশাখ, আমাদের প্রিয় কবি এই দিনটীতে তাঁর প্রিয় ও সুন্দর মাটির জগতে এসেছিলেন। এই দিনটীতে আমরা কবিকে স্মরণ করি, জানাই অন্তরের শ্রদ্ধা। কিন্তু এই যে স্মরণ করা বা শ্রদ্ধা জানানো এ যেন মনে হয় আমাদের একটা নেশায় পরিণত হয়েছে কেননা বর্ত্তমান বাংলা তথা ভারতের দিকে তাকালে মনে হয় আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতাই শুধু আবৃত্তি করে চলেছি—দিয়েছি কবিতার কবিকেই বাদ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার মাধ্যমে কোন্ কথাকে ভাষা দিয়ে গেলেন সেকথা আমাদের আজ অবশ্যই বুঝতে হবে। নতুবা তাঁকে স্মরণ করা ভাবুকতা মাত্র হবে। রবীন্দ্রনাথকে জানতে হলে জানতে হবে আমাদের ভারতবর্ষকে। যুগ যুগ ধরে স্থিতিধর্ম্মী ভারতবর্ষ ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই দর্শনের ভিত্তিতে জীবন ও জগতের মাঝে একটা শক্ত ব্যবধান খাড়া করে মানুষের জীবনকে পঙ্গু, সংস্কার-সর্ব্বস্ব ও ছন্দবিহীন করে তুলেছিল—যার ফলে দেখতে পাই ধর্ম্মের নেশায় মানুষ মায়ের বুকের থেকে সন্তান ছিনিয়ে নাগরে ফেলে দিতে এতটুকু কম্পন হৃদয়ে উপলব্ধি করেনি, স্বর্গে পাঠাবার নেশায় অষ্টম বর্ষীয়া বালিকাকে ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ স্বামীর মৃত্যুতে সহমরণে যাত্রাপথে বালিকার করুণ অশ্রুজলে স্বর্গ প্রাপ্তির পথকে সিক্ত করতে দ্বিধা করে নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অমোঘ তুলিতে জগৎ ও জীবনের ব্যবধান তুলে দিয়ে অমৃত জীবনের বারতা মানুষের সামনে তুলে ধরলেন। মানুষ এই ধরার মাটিতেই অমৃতের সন্ধান পেয়ে ধন্য হল। রবীন্দ্রনাথ জগৎকে বাদ দিয়ে জগন্নাথকে দেখেন নি। ভারতবাসী আমরা এক সময়ে কেবল ভগবানকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। আগতিক রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ সব কিছুই মরীচিকা মাত্র ছিল। যার ফলে জীবন ধীরে ধীরে শুকিয়ে ক্লীবত্বে পরিণত হয়ে দীর্ঘকাল পর পরাধীনতা হয়ে দাসত্বের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হয়েছিল ভারতীয় সমাজ। আজ আবার কালের নিষ্ঠুর পীড়নে আর ভোগসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রাবনে ভারতবাসীর কাছে আগতিক বস্তু একান্ত সত্য এবং ব্রহ্মই মিথ্যায় পর্য্যবসিত হতে চলেছে—যার ফলে চারদিকে দেখতে পাচ্ছি বিলাসের মাত্রা অপরিসীম—আত্মসুখের লোভে জনগীহন বিকৃত। এর কোন অবস্থাই বাঁচার পথ নয়। ভগবানকে বাদ দিয়েও যেমন জগৎ অচল আবার জগৎ বাদ দিয়েও ভগবান অচল। তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনে, রবীন্দ্র-কাব্যে রবীন্দ্র-গানে আমরা দেখতে পাই তিনি জগৎকে ভালবেসেছিলেন, জগতের মানুষকে ভালবেসেছিলেন এবং ভালবেসেছিলেন মানুষের অন্তরের দেবতাকেও। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অগণিত রচনায় তেমনি করেই জগৎ ও জগন্নাথকে ভালবাসার ছন্দ আমাদিগকে শিখিয়ে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবন আলোচনা কালে আমাদের আগেই স্মরণ করতে হবে রবীন্দ্রনাথের জীবন যারা কোন্ ভিত্তিতে গড়ে উঠে ছিল। ধনীপুত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিশু বেলায় কথায় লিখেছেন ধন প্রাচুর্য্যের ভেতরে জন্ম গ্রহণ করেও যদি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পুত্রকে বিলাসিতার কোলে মানুষ করেননি। রবীন্দ্রনাথ একজায়গায় লিখছেন 'শীতের দিনে একটা সিল্কের উপর আরেকটা সিল্ক গায়ে দিতাম।' অতি সাধারণ পোষাক তিনি ছোটবেলায় তাঁর পিতার কাছ থেকে পেতেন। আজ আমরা রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করি কিন্তু গ্রহণ করিনা তাঁর জীবন ধারা। তাই দারিদ্রাক্লিষ্ট ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে দেখতে পাই প্রয়োজন মাত্রা ছাড়িয়ে হু হু করে বেড়ে চলেছে এবং না পেলেই মনুষ্যত্বকে হারিয়েও তা লাভের জন্য হীন প্রচেষ্টা। এক সময়ে ভারতবাসীর কাছে ছিল ছন্দহীন, মাত্রাহীন ত্যাগ—

আর আজকের দিনে আবার তেমনি যাত্রাহীন, ছন্দহীন, ভোগের লালসা—কোন পথেই জীবন সরবে না। রবীন্দ্রনাথে দেখতে পাই বারো বৎসর বয়সে উপনয়নের পর তিনি ভারতীয় দর্শন বেদান্ত উপনিষদ্ আয়ত্ত করেছিলেন অন্তর দিয়ে—এবং জীবনের কর্মধারা ও চিন্তাধারা এই ঔপনিষদিক প্রাণধারের সঙ্গে এক করে ফেলেছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে, রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে হলে ভারতীয় চিন্তাধারার মূর্ত প্রতীক রবীন্দ্রনাথের জীবনকে স্মরণ করতে হবে এবং সংকল্প নিতে হবে তাঁর চলার ছন্দে নিজেদের জীবন চালনার ছন্দ চালাতে। রবীন্দ্রকাব্যে নারী-জীবনের সমস্যার যে চিত্র দেখতে পাই তাতে দেখি কবি শলাতকা কাব্যে 'মুক্তি' কবিতায় লিখেছেন—একজন নারীর উক্তি —

'বাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে বাঁধা
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা—
আমার মনে দিন কেটেছে
আরও কাটত আরো বাঁচলে পরে'

আবার সেই নারী ই যখন তার নারীত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করল, তখন সে বলছে

"আমি নারী, আমি মহীয়সী
আমার সুরে সুর মিলেছে জ্যোৎস্না নীথর
নিদ্রাবিহীন শশী—
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যা তারা ওঠা
মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা।"

বাঁধা বাড়া স্বরকন্যা করেও যে নারী বিশ্ব ভুবনের সুরে সুর বাঁধতে পারে একথা আজকের নারীকে বুঝতেই হবে। এরই সঙ্গে নারীর উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তিকেও সংযত করতেই হবে। তবেই হবে নারীর মুক্তি সার্থক।

রবীন্দ্রনাথের জীবন বোধকে আমরা জীবনে গ্রহণ করে এই সংকল্প আজকের পুণ্য দিনে আমরা গ্রহণ করব। তাঁরই কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়ে সারা বিশ্বে আজ ধ্বনিত হোক

'যদি থাকে প্রাণ তবে তাই লহো সাথে,
তবে তাই করো দান।
বড় দুঃখ বড় ব্যথা সম্মুখেতে কষ্টের সংসার,
বড়ই দরিদ্র শূন্য বড় ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার।
আরো চাই প্রাণ চাই আলো চাই
চাই বল চাই স্বাস্থ্য চাই মুক্ত বায়ু
আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস বিস্তৃত বক্ষ পট।'

রবীন্দ্রনাথ অমর হোন। অমর হোক বিশ্ব-মানুষের।

'শ্রদ্ধা-ভক্তিতে দেহ-প্রাণ মন বুদ্ধি নমনধর্মশীল হয়, গুরুজনের চরণে লুটিয়া পড়ে। তাই ভাগবতে হাজার হাজার বার 'নমঃ' শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। নম্-ধাতু হইতে নমঃ শব্দ। 'হরিহরয়ে নমঃ'। এই নমস্কার যখন জীবনের সকল স্তরে নামিয়া আসে, তখনই সকল ভাগবতী—যোগ্যতা সেই জীবনে প্রকাশ পায়।'

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

আমাদের কয়েকটি সমস্যা

॥ শ্রীআভা শেঠ ॥

[ভারতবর্ষ হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া জ্ঞানের ক্ষেত্রে খুব ব্যাপক চিন্তাধারার কথা শুনাইয়াছে। সব কিছুকে ব্রহ্ম অর্থাৎ খুব সহজ অর্থে বড় বলিয়া ভাবিবার কথা সে বলিয়াছে অনেক, শুচিতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও তাহার সাধনার জীবনে বড় কথা। কিন্তু ট্রাজেডী ইহাই ঘটিয়াছে যে সকল ভাল ভাল কথা ভারতবাসীর বাস্তব জীবনে একেবারেই রূপলাভ করে নাই—যেজন্য মানুষকে আমরা অন্ত্যজ অস্পৃশ্য করিয়া রাখিতে পারিয়াছি, যেজন্য জাতীয় জীবন বলিয়া আমাদের কোন বোধ নাই, যেজন্য ব্যক্তিগত-ভাবে শুচিতার কথা জানা সত্ত্বেও আজ বিংশ শতাব্দীর অর্ধেক পার করিয়াও আমাদের সর্বসাধারণের ব্যবহৃত স্থানগুলি নরকসদৃশ। শ্রীযুক্তা আভা শেঠের বিদেশের পত্রগুলিতে এই ব্যথাটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এগুলি অত্যন্ত সাধারণ কথা মনে হইতে পারে—কিন্তু এগুলি জাতির জীবনের ভিত্তি। জাতিকে এই দৃষ্টি সঞ্চিৎ দান করিতে সাহায্য করিবে বিশ্বাস করি।—সম্পাদিকা, উজ্জয়ন্তভারত]

এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশানালে বম্বে, কাইরো, ফ্রাঙ্কফার্ট ও প্যারিস হয়ে লণ্ডন পর্যন্ত আসি। প্লেনে এলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্নতা একটুও বুঝতে পারা যায় না। কোনও শহরেই কাস্টমের দরজা অতিক্রম করে শহরে ঢুকিনি বলে transit passenger-দের জন্য রাখা ঘর ও দোকান ঘরেই আমাদের সময়টা ব্যয় হয়েছিল। কায়রোতে ইজিপ্সিয়ানদের সঙ্গে আলাপ করবার আমার কৌতূহল ছিল কিন্তু কথা বলতে পারলাম মাত্র স্ত্রীলোকদের বিশ্রামঘরের মেয়েটির সঙ্গে। মেয়েটি ফর্সা পানা, ফ্রক পরা ও কতকটা আদব কায়দা দুরস্ত; কথা বললাম ইংরাজিতে ও উর্দুতে। রাত্রি ৩টার সময় মহিলাদের ঘরের দায়িত্বে ছিল সে অর্থাৎ তত্রস্থ (ইউরোপীয় পদ্ধতির) মেথরের কাজ। ভারতের মেথরের পদ কেহো না। কিন্তু, ইউরোপীয় মেথরেরা নিরক্ষর বা সমাজ পংক্তির বাইরে নয়; সমাজের অন্যান্য লোকদের মত প্রয়োজন ও আরামের অধিকার তাদের আছে। দেখে খুশী হলাম যে কায়রোতে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে মেথরের কাজ সম্পন্ন করা হয়, ভারতীয় পদ্ধতিতে নয়।

লণ্ডনের সঙ্গে জড়িত ছিল আমার আড়াই বৎসরের পরিশ্রম ও সুখ দুঃখের জীবন; লণ্ডনে পদার্পণে সে স্মৃতি জেগে এলো ধীরে ধীরে। লণ্ডনের আচ্ছন্ন আবহাওয়া আমার ভাল লাগে না, তবুও মনে হয় লণ্ডন আমার অন্তরাত্মার স্থান পেয়েছে। কেবল আমার কথা নয়, বিদেশীরা লণ্ডনে যত সহজে আসতে, থাকতে ও কাজ করতে পারে অন্য কোনও দেশে তত সহজে পারে না। এখানে কেউ তোমার সঙ্গে কাজের কথা ছাড়া কথা কইবে না, আবার এখানে কেউ তোমাকে তোমার নিজের পথে নিজের মতে নিজের ধরণে চলতে বাধাও দেবে না। শহরটা এত বড় যে কেউ যদি দশ বৎসর এখানে বাস করেও শহরের সব রাস্তা ঘাট না চেনে তবে তাতে একটুও আশ্চর্য্য হবার নেই। সমস্ত অষ্ট্রেলিয়াতে যত লোক আছে প্রায় তত লোক নাকি লণ্ডন শহরে আছে; তবুও জনতার চাপ শহরের অনেক স্থানে একেবারেই নেই।

আরও দেখ, সমস্ত লণ্ডন শহরে শত শত পাব্লিক স্নান পায়খানায় কোথাও কোনদিন একবিন্দু নোংরা গন্ধ আমি আড়াই বৎসরে পাই নি। এরকম অবস্থা ভারতে সৃষ্টি করা ভারতীয়েরা সম্ভব বলে মনে করে না। ভারতের sanitation-এর অভাবের জন্য ভারতীয়েরা ইংলণ্ড ইউরোপে "dirty" বলে অভিহিত হয়েছে এবং ভারতীয় ছাত্রদের আমেরিকাতে ঢুকবার আগে বম্বেতে sanitation সম্বন্ধে এক সপ্তাহ শিক্ষা নিতে হয়েছে। ভাবতে

পারে যে কেন 'পবিত্র' হিন্দুরা বা 'পাক' মুসলমানেরা বিদেশের কাছে 'নোংরা' বলে আখ্যা পায়?

'পবিত্র' হিন্দুরা নিজেদের শরীর কাল করে পরিষ্কার করে বা নিজের ঠাকুরঘর, রান্নাঘর বা বসবার ঘর পরিষ্কার করে রাখে তা ঠিক। কিন্তু নিজের শরীরের ময়লা বা নিজের বাড়ীর ময়লা অন্য কারও পথে এসে অন্য কারও অসুবিধা সৃষ্টি করছে কিনা সেদিকে নজর রাখতে শেখে না। আমাদের দেশে একজন তার private কাজটি যেমন ইচ্ছা সেরে বেরিয়ে আসে—একবার তাকিয়ে ভাবে না পরের মুহূর্তে যে ব্যক্তিটি ও ঘরে ঢুকবে তার কোনও বিরক্তি বোধ হবে কি না; এও মনে রাখে না যে তাকেই আবারও আসতে হবে ওখানের কাজে। আমাদের এই civic sense-এর অভাব বা পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে দূরদৃষ্টির অভাব যে কবে দূর হবে আজ তা বলা যায় না। Sanitation-এর অভাব যে কেবল গরীব ও অশিক্ষিতের মধ্যে রয়েছে তাই নয়, উচ্চশিক্ষিত উচ্চপদস্থ বা ধনী ব্যক্তিরাও সে অভাবের প্রমাণ দিচ্ছেন তা বেশ অনুভব করা যায় আমাদের দেশের সরকারী অট্টালিকা বা পাব্লিক স্থানগুলির নোংরা গন্ধ হতে। এটা লজ্জার বিষয় যে আমরা ঘরে বাইরে, স্কুলে অফিসে, সিনেমা থিয়েটারে, রাস্তায় পার্কে এত নোংরা গন্ধ এতদিন ধরে বরদাস্ত করে আসছি।

লণ্ডনে কয়েকদিন থেকে আমেরিকার দিকে রওনা হই প্লেনে—আমেরিকান প্লেনে। প্যান আমেরিকান প্লেনে কাঁপুনী অনুভূত হয় কিন্তু এয়ার ইণ্ডিয়ার গতি এত smooth (মোলায়েম) যে মনে হয় না যে প্লেন চলছে।

কলকাতা ছেড়েছিলাম রাত্রি ২টাতে; আমরা ভূমণ্ডলের পশ্চিমে ছুটেছিলাম বলে রাত্রিটা এক ঘণ্টা বেড়ে গিয়েছিল। লণ্ডন ত্যাগ করি ভূপুর ১টা ৪৫ মিনিটে। সূর্যেরই সাথে ছুটছিলাম বলে দিনটা ৩ ঘণ্টা বড় হয়ে গেল। আমেরিকার রাজধানী ও United Nations এর তীর্থভূমি ওয়াশিংটনে পৌঁছালাম ওখানকার গোধূলিতে। আমেরিকার সহিত প্রথম সাক্ষাতের (৩৩ খৃষ্টাব্দ) পরই আমরা উড়ে আসি নিউ-অরলিন্‌স এ; বুঝলাম আমেরিকাকে জানতে হবে ধীরে ধীরে। ২৯।৪।৬৩

লুসিয়ানা উত্তর আমেরিকার দক্ষিণে এক স্টেট, শ্রেষ্ঠ সহর নিউ অরলিন্‌স্। এখান হতে জনভার ভার কিছু লাঘব করবার জন্য এই স্টেটের (রাজ্যের) রাজধানী এখান হতে ৮০ মাইল দূরে বাটনরুজে ১৯৩২ সনে স্থানান্তরিত হয়েছে। এরা প্লান করে কাজ করে। অনুমান করতে পার বঙ্গদেশের রাজধানী কলকাতা হতে ৮০ মাইল দূরে স্থানান্তরিত করতে চেষ্টা করলে আমাদের দেশে কতটা বিরুদ্ধতা ও ধর্মঘট সুরু হবে? দুঃখ লাগে আজ ভাবতে যে কয়েক বৎসর আগে যখন দিল্লী সরকার বাংলার উদ্বাস্তুকে আন্দামানে বসবাস করতে উপদেশ করেছিল তখন সম্ভবত বামপন্থীদের প্ররোচনায় তারা শিয়ালদহ ষ্টেশনে বসবাস করাই শ্রেয় মনে করল, তবুও নড়ল না। বামপন্থীরা যদি বরং তাদের প্লান করে আন্দামানে পরিশ্রম করে অগ্রসর হতে সহায়তা করত, তবে হয়ত এই সুন্দর দ্বীপটি একটি দ্বিতীয় বঙ্গদেশে পরিণত হয়ে বাঙ্গালী সমাজের প্রকৃত উপকার সাধন করত। ভেবে দেখো ইংলণ্ড ইয়োরোপে যথেষ্ট স্থান না হওয়াতে ওখানকার লোকেরা অষ্ট্রেলিয়া হতে দক্ষিণ আমেরিকা পর্য্যন্ত ছড়িয়ে গিয়ে নিজেদের ও অপরের সমস্ত প্রয়োজন সহজে ও সানন্দে মিটিয়ে নেয়।

এশিয়া ও আফ্রিকার দুঃখের প্রধান কারণ তাদের দ্বিভিলীলতা, আলস্য ও সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তার নূতন সমাধান বার করবার চেষ্টার অভাব। বুদ্ধি যে তাদের শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে কম তা তো আমাদের মনে হয় না। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন হয়েও অভিনিবেশ ও অধ্যবসায়ের জোরে কিছু না কিছু শ্বেতাঙ্গরা অহরহ করে ফেলছে।

যুক্তরাষ্ট্রে (United States) এ লুসিয়ানা স্টেট নাকি সবচেয়ে কম অগ্রসর হয়েছে। তবুও এখানে সর্ব বিষয়ে এমন কি লণ্ডন হতেও বেশী মেসিন ব্যবহার করা হয়। যেমন লণ্ডনে বাসে conductor থাকে এবং automatic ব্যবস্থা থাকে না; এখানে এক ড্রাইভারই সব manage করে। লণ্ডনে মাছ মাংস, ফলপত্রী, আমা

কাপড় অন্যান্য বিবিধ পত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ছোট ছোট দোকান অনেক আছে। এখানে সব কিছুই একই বৃহৎ দোকানে পাওয়া যায়। সব দোকানের দরজা জানালা বন্ধ, দরজাতে পা দিতেই খুলে যায়, সোয়া আড়াই পাউণ্ডের দাম কত হল একটি স্ত্রীলোক মেসিন টিপে বলে দেয়। ইংলণ্ড ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ আকারে আমেরিকার থেকে অনেক ছোট তবুও ফল সব্জী পাওয়া যায়। এ দেশে চাষীদের অর্থ দিয়ে সরকার উৎপাদন করা বন্ধ রাখে তবুও মটরশুটি ও ভুট্টা frozen ছাড়া পাওয়া যায় না। নিউ অরলিন্‌সে সূর্য্য কিরণ প্রখর, বাইরের হাওয়া খুব আরামপ্রদ, তবুও স্কুল কলেজে দরজা জানালা সব বন্ধ করে নীল লাইটে ঘর আলোকিত করে, একটু ঠাণ্ডা হলে electric heater আর নয়তো air condition চালাবে।

শুনে মজা পাবে এখানে আপেলের টমেটোর দাম দুই টাকা এবং এক শুকন ডিমের দামও তাই। এখানে দুধ কাঁচের বোতলে বিক্রি হয় না, কাগজ দিয়ে বোতল বা বাক্সের মত তৈরী করা হয়, এখানে সম্ভবৎ কাগজের গ্লাসে খায়, ডিনার বা লাঞ্চও অনেক সময়ে কাগজের থালায় খায়। এখানে মেয়েদের চুল কাঁটা বা ড্রেস করার জন্য অনেক দোকানে অনেক সাজ সরঞ্জাম ও প্রণালী আছে, কিন্তু পুরুষদের চুল কাঁটার কোনও পরিপাটি নেই। তারা একবার চুল কাঁটতে বেশ টাকা খরচ করবে না বলে স্ত্রীরা স্বামীদের চুল খুব ছোট করে কেটে দেয়।

জানই তো যে এখানে কি চাকর কেউ রাখে না; শনি রবিবার স্বামী স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা স্নানের টব, পায়খানার পট, ঘর দুয়ার, জামা কাপড় সব সাফ করে, বাগানে ঘাস কাটা, জল দেওয়া, ঘরের চাল পরিষ্কার করা ও রং করা সব শেষ করে। আমাদের দেশে যারা খাটে—অর্থাৎ দরিদ্রেরা—তারা খেটে মরে; আবার একটু ভাল আয় থাকলে পুরুষ ও মেয়েরা এতটুকু হাত পা চালায় না বলে নিজেদের দেহকে কদাকার ও ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলে। আমাদের দেশে একটু বয়স হলেই পুরুষ হাতে কাজ করে নিজেকে নীচু করে না, অথচ তার বিশুদ্ধ বয়সের অন্য পুরুষ বা নারীকে 'তুই' 'তুমি' বলে অপমান করে খাটাচ্ছে অহরহ। অপরকে অপমান করে আমরা নিজেকে যে নীচু করি তা বুঝি না!

আমাদের দেশে তোমার মত ফীগকায় অনেকে আছেন। ইউরোপে ও আমেরিকায় ওরকম একজনও দেখিনি। আমাদের দেশে আবার ২০।২৫ বয়সেই অনেক ছেলেমেয়ে খুবই বৃহদাকার হয়ে পড়ে যে রকম শ্বেতাঙ্গদের ২০।২৫ এ যেন ৪০।৪৫ বৎসর বয়সের বয়সেও হতে দেখা যায় না। সকলেই এখানে প্রচুর খেতে পায়, তবুও খাওয়াতে যথেষ্ট সংযম ও জ্ঞান মেনে চলে। আমাদের দেশে যারা পায় না তারা তো খায় না কিন্তু যারা পায় তারা খেতে একটুও ছাড়ে না।

এখানে আমাকে প্রতি মাসে ৬০০৲ টাকা আয়কর দিতে হয়েছে। আয়কর ঠিক সময়ে মিটিয়ে না দিলে গণ্যমান্য ব্যক্তিকেও জেলে পুরে দেয় শুনেছিলাম পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে যেন কত বৎসরে কত লক্ষ টাকা আয়কর আদায় করা হয় নি! এমন কি অনেক শিক্ষক আছেন যারা প্রতি মাসে ১০০০৲ বেতন পেয়ে মাত্র ১০০৲ টাকা কর দিয়েছেন! অন্য লোকদের থেকে শিক্ষকদের মধ্যে নাকি প্রবঞ্চনা করবার প্রবৃত্তি কম। তা হলে বুঝতে পারছ সমস্ত দেশে প্রবঞ্চনা করার কতখানি চেষ্টা রয়েছে।

এদেশে মেয়েরাও বাল্যকাল হতে ভাল করে লেখাপড়া ও দায়িত্ব নেওয়া শেখে, বাইরে চাকরী এরা অনেকেই করে, দুঃখের অবস্থাতে মুসড়ে না গিয়ে কোনও পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করে। কিন্তু তবু এ মেয়েদের performance-এ আমি তেমন খুশী হই না। কারণ এত সুবিধা পেয়েও কোন দিকে উচ্চতম ধাপে উঠতে তাদেরকে দেখি না সাধারণতঃ। এরা সাধারণতঃ চাকরী করে হোটেলে, রেস্তোরাঁয়, দোকানের বিক্রেতা ও আপিসের সেক্রেটারি টাইপিষ্ট হিসাবে। মনে পড়ে বার্টাণ্ড রাসেলের উক্তি: "Women protested that they did not like to be dictated, as a result

we have so many women-stenographers only to be dictated"। এ মেয়েরা কেবল এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হবার পারদর্শিতা অর্জন করে—তা হল পুরুষের মন জোগানর চেষ্টাতে। সর্বদেশে সর্ব কালে স্ত্রীলোক পুরুষের ও পুরুষ স্ত্রীলোকের মন জোগাবার চেষ্টা করেছে তা স্বরণ রেখেও বলি যে এ বিষয়ে এদের মনোযোগ ও চেষ্টা দেখে আমার মনে হয় যে এটা পৃথিবীকে ততটা আনন্দ দেয় না যতটা আনন্দ দেয় বলে এরা মনে করে।

৭. ৬. ৬৫

আমার তো মনে হয় যে আমাদের দেশের অগ্রসর হতে না পারার একটা কারণ হল এই যে আমাদের বুদ্ধি প্রধানতঃ নিজস্ব ও আশু (immediate) স্বার্থলাভে সচেষ্ট থাকে। নিজের, পরিবারের ও দেশের স্থায়ী ও সুদূরবর্তী স্বার্থ রক্ষা করার মত দূরদৃষ্টি আমাদের জনসাধারণের তো দূরের কথা যারা একটু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁদেরও নেই। হয়তো বিশিষ্টদের মধ্যে সে গুণ আরও কম দেখা যায় এই কারণে যে একটু ভাল পদে অধিষ্ঠিত হতে পারলে স্বার্থসিদ্ধি করবার সুবিধা হাতে আসে বলে স্বার্থসিদ্ধিতে তাঁরা আরও বেশি মনোযোগ দেন।

দেখা যায় যে আমাদের দেশে একজন সফলকাম ব্যক্তি নিজের শক্তি ও চেষ্টার সফলতা, অর্থ ও খ্যাতি অর্জন করে যে সম্মান পরিবারকে দিয়ে যান, তাঁর পুত্র-কন্যা সে খ্যাতির জোড়ে ততটা অগ্রসর হয়ে যায়। আর তাঁর পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রীরা কেবল অতীত সম্মানকেই ভাঙিয়ে চলতে চেষ্টা করে, নিজেদের চেষ্টায় গর্ব করবার মত কিছুই অর্জন করে না। তৃতীয় বা চতুর্থ পুরুষের মধ্যে appreciate করবার মত কিছু থাকে না। এদেশে সে রকম হয় না। পিতামাতার সফলতা ও খ্যাতির গর্ব করে পুত্র-কন্যার মন ভরে না। তাদের নিজেদের কৃতকার্যতাই তাদের নিজেদের আনন্দ শান্তি।

আমাদের দেশের অনেকে নিজে দুঃখ ও সংকটের মধ্য দিয়ে এসেছেন বলে স্নেহের পাত্রদের আরাম দিতে উৎসুক হন। কিন্তু এ তো ঠিক কথা যে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই শৈশব বাল্যকাল ও যৌবনে নানারকম শিক্ষা-দীক্ষা, অভিজ্ঞতা অনুভূতি, প্রচেষ্টা ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে আসতেই হবে; নয়তো তার নিজের তো কিছু অর্জন করা হয় না।

এখানে দুটো উদাহরণ দিই—দেড় দুই আড়াই বৎসরের শিশু রাস্তায় বা খোলা স্থানে একা একা ঘুরে বেড়ায় যেন পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক তারা নিজেরাই পাতিয়ে নিচ্ছে বা পাতাতে শিখছে। এখানে পশ্চাদবর্তন একটা বিরাট স্বাভাবিক লেন্স, যার অপর পারের কিছু দেখা যায় না। একদিন দেখি একটি দেড় দুই বৎসরের শিশু সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে আবার একটু উঠে আসছে—জল তার থেকে ১০।১২ সিঁড়ি নীচে—আর তার পিতামাতা তার চেয়ে ৪।৫ সিঁড়ি উপরে বসে গল্প করছেন। তাঁরা শিশুটিকে একটু বাধা তো দিলেনই না, তাঁদের মধ্যে কোনও নিশ্চিন্ততার অভাবও দেখলাম না। আমাদের দেশে কোনও শিশুকে পিতামাতা ওরকম নিশ্চিন্ত হয়ে অতটুকু শিশুকে নিজের ইচ্ছায় নিজের পথে চলে সাবধানতা নিজে অর্জন করতে শিখতে অবকাশ দিতে পারবে বলে তো আমার মনে হয় না।

দ্বিতীয় উদাহরণ—এখানে শ্বেতাঙ্গ বা কৃষ্ণাঙ্গ প্রায় সকল ছেলেরাই ১৭।১৮।১৯ বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবার সময় থেকেই চাকরী করে নিজের অনেকটা খরচ চালায়। মনে করো না যে দরিদ্র পিতামাতার সন্তানেরা এরকম চাকরী করে। আমি একটি শ্বেতাঙ্গ পরিবার জানি যেখানে পিতা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ভালপদে অধিষ্ঠিত—বাড়ী, গাড়ী, রেফ্রিজেরেটর, টেলিভিসন, কাপড় ধোবার ও শুকোবার মেসিন, বাসন ধোবার মেসিন প্রভৃতি সমস্ত রকম আসবাব রয়েছে; সেখানে বাড়ীর প্রথম পুত্র স্কুলের পরীক্ষা পাশ করে ১৮ বৎসর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে সুরু করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের খরচ চালাবার জন্য চাকরী করবে এরকম তার মা আমাকে বলেন।

আমাদের দেশে স্নেহের পাত্রদের আমরা দায়িত্ব নেওয়া হতো বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করি; অতএব বয়স বেড়ে গেলেও তারা খোকা-খুকুই থেকে যায়।

লুসিয়ানা স্টেটের রাজধানী বটনরুজের উপকূলে মাসখানেকের জন্য এক নিগ্রো মহল্লায় আমাদের থাকতে হচ্ছে। নিগ্রোদের এদেশের হরিজন বলতে পার, কিন্তু আমাদের হরিজনদের দারিদ্র্যের তুলনায় এরা অনেক আরামে আছে। খাওয়াপরা, চৌকিবিছানা, বা কিছু টেবিল চেয়ারের অভাব বা পুত্রকন্যাকে স্কুলে পাঠাবার অসামর্থ্য আমি এখানকার নিগ্রোদের মধ্যে এখনও দেখিনি। আমার জানা সকল নিগ্রোর আর্থিক অবস্থাই আমাদের মধ্যবিত্ত লোকের তুলনায় ভাল। বর্তমান নিগ্রো পাড়ায় প্রত্যেকের বাড়ীতে গাড়ী দেখেছি। বলা চলতে পারে যে এখানে বয়স্ক পুরুষ নারী সকলেই কিছু রোজগার করে এবং ঝি চাকর-ধোপা-নেথরের কাজ নিজেরা করে, অতএব সহজে কাজ সমাপ্ত করবার মেসিন ও আসবাবের জন্য পয়সা খরচ করতে হয় এবং তাতে নিজেদের asset বাড়ে। প্রেসিডেন্ট জনসন প্রেসিডেন্ট হয়ে যখন দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করলেন তখন এখানকার কাগজ হতে এখানকার দারিদ্র্যের কিছু নমুনা পেলাম। কাগজ লিখছে : তিন নিগ্রো বোনকে ৩ ফিট চওড়া চৌকিতে শুতে হয় এবং দুই ভাইকে আর এক single চৌকিতে শুতে হয় এত দরিদ্র তারা !!!

কেন্দ্রিয় রাজ্য সরকার নিগ্রোদের জন্য অনেক টাকা খরচ করছে। এরা যা পাচ্ছে না তা হল সম্মান, সমান স্তরের মানুষ হিসাবে মর্যাদা। কেন্দ্রীয় সরকার নিগ্রোদের মর্যাদা দিতে চায়; কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রাজ্য সরকারগুলি তাদের ভোট দেবার অধিকারও দেয় না।

যারা আমেরিকার নিগ্রোদের উদাহরণ দেখিয়ে আমাদের হরিজন ও নিম্নশ্রেণীদের প্রতি অমর্যাদাকে বাস করে, আমি সে দলের নই। প্রথমতঃ একটি শ্বেতাঙ্গের পক্ষে একটি নিগ্রোকে আপন ভাবা যত কঠিন, আমাদের গ্রামের অল্প শিক্ষিত ও সংস্কারাচ্ছন্ন উচ্চবর্ণের পক্ষে ঐ গ্রামের ধোপা, নাপিত মুচি প্রভৃতিকে আপন বোধ করা মোটেই তত কঠিন হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ—নিগ্রোরা অল্প বৃহৎ মহাদেশ আফ্রিকা হতে এসেছে। ইয়োরোপ হতে ইংলণ্ড, আয়র্লাণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানী, গ্রীস, সুইডেন, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম সমস্ত দেশের লোক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এসে একেবারে এক হয়ে মিশে গেছে. কিন্তু আফ্রিকা ও ইয়োরোপ এই মহাদেশ আমেরিকাতে এক হতে পারে নি এখনও—এটা সত্য। আর আমাদের একই ভারতবর্ষ, একই হিন্দু সমাজ বিভক্ত হয়ে দুই হয়ে আছে !

'মানুষের জন্য ধর্ম এবং ধর্মের জন্য মানুষ—দুই-ই সত্য হইতে পারিত যদি ধর্ম বলিতে বিশেষ কোন ধর্ম না বুঝাইয়া সর্বধর্মসমন্বয়ই বুঝাইত। সর্বধর্মসমন্বয়ই মানুষের স্বধর্ম। প্রতি মানুষ এই হিসাবে স্বধর্মী, সর্বধর্মী। .....ইহাও সত্য যে প্রত্যেকটি ধর্মই স্বয়ংপূর্ণ, উহা ঐ সম্প্রদায়ের সকল স্তরেরই আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও তুল্যভাবেই সত্য যে, কোনও বিশেষ দেশ-কাল-পাত্র বা বিশেষ দৃষ্টিকোণের মধ্যে সমগ্র মানবসমাজকে, এমন কি কোনও বিশ্বরূপ ব্যষ্টি মানুষকেও আটকাইয়া রাখা যাইবে না। সব বিশেষত্বকে ছাপাইয়া অখণ্ড বিশ্বরূপ ব্যষ্টি মানব ও মানবসমাজ আগাইয়াই চলিয়াছে, চলিবেও।'

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-কৃত মহাত্মাজীর গঠনকর্ম পদ্ধতি

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় জন্যই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দ্দেশিত "সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

ত্রয়োদশ সিদ্ধান্ত

কর্ম্মকাণ্ডানুসারে দেহপাতের পরও আত্মাকে নানা-প্রকার কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। অপরোক্ষানুভূতির অষ্টত্রিংশ শ্লোকে অথবা তৎপরবর্ত্তী কোন শ্লোকে শঙ্করাচার্য্য ঐ মতের প্রতিবাদ করেন নাই বলিয়া তাঁহারও ঐ মত স্বীকার করা হইয়াছে। ঐ অষ্টত্রিংশ শ্লোকে তাঁহার কেবল ঐ মত প্রকাশ করায়, তিনিও ঐ মতের পক্ষ, ইহাই অবধারণ করা যাইতে পারে। ঐ বিষয়ে শঙ্করাচার্য্যের মূল শ্লোক এই প্রকার,

"প্রোক্তোঽপি কর্ম্মকাণ্ডেন হ্যাত্মা দেহাদিলক্ষণঃ।
নিত্যশ্চ তৎ ফলং ভুঙ্‌ক্তে দেহপাতাদনন্তরম্।"

দেহপাতের পর আত্মা কর্ম্মফল ভোগ করেন স্বীকার করিলে আত্মাকে নির্ব্বিকার, নির্ম্মল, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় প্রভৃতিও বলা যায় না। তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্যের মতেই আত্মা সবিকার, অঞ্জনবিশিষ্ট, সগুণ, সক্রিয়ই ও প্রতিপন্ন হইতেছেন।

চতুর্দ্দশ সিদ্ধান্ত

অপরোক্ষানুভূতির চত্বারিংশ শ্লোকানুসারে আত্মা-পুরুষই ঈশ্বর। নানা শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বর সগুণ-সক্রিয়। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ঈশ্বর সগুণ-সক্রিয় বলিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে তাঁহার উক্তি—

'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।'

ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যবান। ঐশ্বর্য্যবান যিনি, তিনি নিশ্চয়ই সগুণ-সক্রিয়।

পঞ্চদশ সিদ্ধান্ত

আত্মার রূপ নাই বলিতে পার না। স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যই

অপরোক্ষানুভূতির চত্বারিংশ শ্লোকে আত্মার বহু রূপ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

'এবং দেহত্রয়াদস্ত আত্মাপুরুষ ঈশ্বরঃ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বরূপশ্চ সর্ব্বাতীতোঽহমব্যয়ঃ।'

আত্মা নিরাকার বলিলেও আত্মা রূপবান ও আত্মা সাকার স্বীকার করা হয়। কারণ নিরাকার অর্থে যিনি আকার নন্ ইহা বলিলেও বলা যায়। নিরাকার অর্থে যিনি আকার নন করিলে নিরাকার অর্থে যিনি সাকার ইহাও বলা যাইতে পারে। নিরাকার অর্থে যাহার আকার নাই বলা অতি অসঙ্গত। কারণ যিনি আপনাকে নিরাকার আত্মা বলেন তাঁহারও আকার আছে। তবে তিনি নিরাকার আত্মা অর্থে আকারবিহীন আত্মা বলেন কি প্রকারে? তাঁহার নিরাকার অর্থে আকার নন ইহাই বলা সঙ্গত। পরমহংস শঙ্করাচার্য্য আত্মা সর্ব্ব-রূপ বলিয়াছেন বলিয়াই আত্মার বহুরূপ এবং বহু প্রকার আকার আছে স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার ঐ কথার সঙ্গে পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক সাকারবাদের বিরোধ নাই।

ষোড়শ সিদ্ধান্ত

সর্ব্বাত্মা বলিলে সবলই আত্মা বলিতে পারা যায়। অথবা সর্বাত্মা বলিলে সর্ব্বই যাহার আত্মা ইহাও বলা যাইতে পারে। যেমন সর্ব্বরূপ বলিলে সর্ব্বই যাঁহার রূপ ইহাও বলা যাইতে পারে। যদি সর্ব্বাত্মা অর্থে যিনি সকলের আত্মা প্রতিপন্ন কর তাহা হইলে সর্ব্ব-রূপ অর্থেই বা যিনি সকলের রূপ প্রতিপন্ন করিবে না কেন? যিনি সকলের রূপ বলিলে সেই 'যিনি' শব্দ গুণ-জড়বাচক প্রতিপন্ন করা হয়। যথা—

'এবং দেহত্রয়াদস্ত আত্মাপুরুষ ঈশ্বরঃ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বরূপশ্চ সর্ব্বাতীতোঽহমব্যয়ঃ।'

উক্ত শ্লোকে পরমহংস শঙ্করাচার্য্য আত্মাকেই 'সর্ব্বাত্মা সর্ব্বরূপশ্চ' বলিয়াছেন। যে আত্মা সর্ব্বরূপ, তিনি আকার ননই বা কি প্রকারে বলা যায়, কারণ রূপই ত আকার। যে আত্মা সর্ব্ব রূপ, তিনি নিশ্চয়ই সর্ব্বাকার। তবে আত্মাকে বৈদান্তিক মতে 'সৎ' বলা হইয়াছে বলিয়া পরম-হংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের ত্রিংশ শ্লোকে 'সদাকারং' বলিয়াছেন। শঙ্করা-চার্য্য তাঁহার ব্রহ্মনামাবলীমালার একোনবিংশ শ্লোকে 'ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বমিতি' বলায় আত্মাই সর্ব্ব রূপ ইহাও তাঁহার স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ জগৎ অরূপ নহে। শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্মই সর্ব্ব জগৎ বলিয়া ব্রহ্মই সর্ব্ব রূপ। বেদান্ত নানা বৈদান্তিক গ্রন্থে ও নানা উপনিষদে ব্রহ্মই আত্মা। ঐ সকলে ব্রহ্ম এবং আত্মার অভেদত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সপ্তদশ সিদ্ধান্ত

অপরোক্ষানুভূতির ত্রিচত্বারিংশ শ্লোকানুসারে অবগত হওয়া যায় চৈতন্য বা আত্মা অজীব। সে মতে ভ্রমবশত যেমন রজ্জুকে সর্প-বোধ হয়, তদ্রূপ ভ্রমবশতই চৈতন্য বা আত্মাকেও জীব বোধ হয়। সে মতে রজ্জুতে সর্প জ্ঞান যেমন মিথ্যা, তদ্রূপ চৈতন্য বা আত্মাতে জীবত্ব-জ্ঞানও মিথ্যা। ঐ অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের একোন-পঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে সমস্তই ব্রহ্ম অবগত হওয়া যায়। সেই শ্লোক এই প্রকার—

'ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব তৎসত্যমিত্যধারয়েৎ।'

উক্ত শ্লোকানুসারে সমস্তই ব্রহ্ম অবধারিত হইয়াছে। সেইজন্য জীবও সেই সমস্তরই অন্তর্গত। সুতরাং জীবও যে ব্রহ্ম সে বিষয়ে সংশয় কি আছে? ঐ অপরোক্ষানু-ভূতিরই দ্বিপঞ্চাশৎ শ্লোকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে সম্পূর্ণ অভেদ তাহা স্পষ্টই প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই শ্লোক এই প্রকার—

'ঘটমধ্যস্থিতং কৃত্বা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
যতিষ্টতি স মূঢ়াত্মা ভবং তত্ত্বাভিভাষিতম্॥'

শঙ্করাচার্য্যের আত্ম-পূজাতেও সদা-শিবাত্মা ও জীবে যে কোন প্রভেদ নাই, তাহাও বোঝা যায়। শঙ্করাচার্য্যের আত্ম-পূজার অষ্টম শ্লোকে আছে—'দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তো জীবো দেব সদাশিবঃ। ক্রমশঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৩—

(৩৪)

ঠাকুর, সারা জীবনের সঙ্গী আমার, আমার এ পাশে ও পাশে সামনে পিছনে তুমি ছাড়া আমার এমন কেহ নাই যে আমাকে স্নেহে আদরে আবরণ করিয়া রাখে। আমি যেন আর পথ চলতে পারিতেছি না। তোমার দর্শন লইয়া পথ কাটিয়া চলিতে আবেষ্টনগত যে আনুকূল্যটুকু দরকার, তাহা তো আমার নাই। অথচ চলিতে হইবে তোমাকে ছাড়িয়া আমি কি করিব? আমার আর করিবারই বা কি আছে? অথচ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কি যন্ত্রণা আমি ভোগ করিতেছি!...২টার কিছু পূর্বে মনু আসে। কিছু মুসাব্বি নিয়া আসে। যাইবার সময় রেণুর কাছে রোগীদের জন্য ১৫৲ টাকা, তাহার মায়ের দুধ খাওয়ার জন্য ১০৲ টাকা দিয়া যায়। আমি ইহাদের মধ্যে আজ আর নাই। বেশ করেছ কালী। ইহাদের সঙ্গে একদিন পরমার্থ সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিয়া সকল দেহ-মন-প্রাণ দিয়া মুক্ত হইতে চাহিয়াছিলাম। ইহারা তাহা চাহে নাই। আজ ইহাদের সঙ্গে ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই নাই। ইহাদের সঙ্গে ভক্তের পরিচয়। তাই আজিও 'পিতা' হিসাবে কর্তব্য পালন করিতেছি। সব প্রাণ কেমন করিয়া দিব? যাত্রা তো লঙ্ঘন করা চলে না। তাহা যে জীবনের পক্ষে মৃত্যু। 'রেমে তত্র আত্মরতঃ আত্মারামোঽপ্যথণ্ডিতঃ'। আমার ঠাকুর ও ঠাকুরের কাজ নিয়া ইহাদের সঙ্গে কত পৃথক হইয়া পড়িয়াছি। অথচ ইহাদের মধ্যেই আছি। আমাকে অস্বীকার তো করিতে পারিতেছে না। ঠাকুর আমার সহায়।...

২৭শে আগষ্ট

ঠাকুর, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে এই রক্তাপ্লুতির মধ্যে, হানাহানির মধ্যে সখা আমার,—আমার রথ-রজ্জু তুমি ধারণ করিয়াছ। তাই এই অচল রথ আজিও ঠিক পথে চলিয়াছে। সারথি আমার, আমার মন-প্রগ্রহ আজ তোমার হাতে। আমার সংকল্প বিকল্প সব মুছিয়া যাউক। তোমার বিশ্ব-রচনার কল্পনায় আমি গর্ভধারণ করিব, তোমার ছাঁচে গড়িয়া তুলিব, তোমার ছাঁচে-গড়া বিশ্ব তোমাকে উপহার প্রদান করিব—ইহাই আমার জীবন-সাধনা। আমার সিদ্ধি তুমি, তোমার জয় হউক। আজ সকালে আমার পরিবার ও ইহাদের সঙ্গে সম্পর্কের আলোচনা হয়। স্ত্রী পুত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক আজ 'যো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে'—এর মত। যোগমায়ার প্রভাব না হইলে সংসারে কোনও পুত্র তাহার পিতার সম্বন্ধে—সে যদি নিতান্ত দুর্বৃত্তও হয়—এমন করিয়া উদাসীন হইতে পারে? আমি আজ পুত্রগণের উপ-পিতা। এইরূপ সম্পর্ক না হইলে কি প্রতিভা-রেণু প্রভৃতি ইহাদের মধ্যে এমন করিয়া সহজ ভাবে চলাফেরা করিতে পারিত? সবই আমার জীবনে অভিনব; সব অসম্ভব আমার জীবনে আজ সম্ভব হইয়াছে।...সত্যেন শাস্ত্রী আসে। সে ২৯৷৷০ টাকা চায়—তাহার পুত্রদের বাকি-পড়া মাহিনার অর্দ্ধেক ঐ টাকা দিলেই নাম কাটা যায় না। আমি প্রথমে ১০ টাকা পরে আরও ৫৲ টাকা চাওয়ায় দিয়া দেই। সে বলিল, আমার না-আসার জন্য অপরাধ লইবেন না। কাহাকেও আমি অপরাধী করিয়া ত্যাগ করি নাই। ঠাকুরের সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। কে তাঁহার কি করিল বা না করিল, ইহা আমি দেখি না। আমি

কি করিতে পারিলাম সেই দিকেই আমার দৃষ্টি। আমি divided respousibility বুঝি না। আমি যাহা পারিব, তাহা করিব।—দুলালী জিজ্ঞাসা করে আমাকে, দাদু, তোমার চেহারা নিত্যগোপালের মত কেন? আমি বলি, 'যথৈবেষ বৃণুতে—তস্যৈষ এষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্'। নিত্যগোপাল দয়া করিয়া তাঁহার তনু আমাকে দিয়াছেন, তাঁহাকে তো তোমরা আর দেখিবে না, আমাকে দেখিয়াই তোমরা তাঁহাকে দেখিবে, ইত্যাদি।

২৮শে আগষ্ট

ঠাকুর, তুমি আসিয়াছিলে প্রাকৃত সকল সম্বন্ধের ব্রহ্ম-মূল্য প্রদান করিবার জন্য, ব্রহ্ম-নর ব্রহ্ম-নারী, ব্রহ্ম-পতি ব্রহ্ম-পত্নী, ব্রহ্ম-পিতা ব্রহ্ম-মাতা, ব্রহ্ম-পুত্র গড়িয়া তুলিতে—ইহাই তো আমাকে প্রাণে প্রাণে বুঝাইয়াছিলে। আমিও চাহিয়াছিলাম তোমার এই আগমনকে সার্থক করিয়া তুলিতে। কিন্তু আমি যে বড় নিঃস্ব। পারিলাম না তো। তাড়াতাড়ি করিয়াছি, টানাটানিও করিতেছি, কেহ আসিল না। আমাকে সকলেই এড়াইয়া চলিতে চায়। আমাকে কেহ সহজ স্বীকৃতি দেয় নাই—বরং করে নাই। তাই আজ তোমার জীবনে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল। আমার 'আমি'-র বাহিরে যে 'আমি'-র পরিপূর্ণ সার্থকতার জন্য আর একটি পরম 'আমি' কাজ করিতেছে, তাহা যতদিন প্রকাশিত হয় নাই, ততদিন মানুষ মুক্তির সাধনা করিত। কিন্তু ভাগবত ধর্ম প্রকাশ করিয়াছে যে আমার জীবনের সর্ববিধ সমস্যার সমাধানের জন্য আমার অজ্ঞাতসারে একটী মহাশক্তি কাজ করিতেছে। এই শক্তির সঙ্গে যুক্ত হইলে সকল সমস্যার সমাধান সহজ হয়। ইহার সঙ্গে সর্বাগ্রে যুক্ত হওয়াই বর্তমান যুগের সাধনা। বর্তমান যুগ-সাধনা এই পরম আমি হইতে যাত্রা করা। আমি আমার জীবনে স্ত্রী পুত্র কন্যা কিম্বা ইহাদের সঙ্গে ব্যবহারে এই ছন্দেরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি। এই সব আলোচনা সত্যব্রতের সঙ্গে হয়। শ্রীশ দাস আসেন, তাহার সঙ্গে মহেন্দ্রের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে যাই। কীর্তন হয়। সিদ্ধু সরে একটী পানতোয়া লইয়া ফিরি। বীরেন আসে।.....

২৯শে আগষ্ট

রসমুধানিধি শ্রীরাধা আমার, তুমি নিত্যগোপালরূপে আমার জীবনের কাছে ধরা দিয়াছ। তুমি বিশ্বের যাবতীয় ব্যাপারের পরম অর্থ। আমি তোমাকে দিয়াই অর্থবান, সত্য আমি। তোমার সঙ্গে যুক্ত না হইলে আমি নিরর্থক। তোমার আশ্রয় পাইয়াই তো আমার জীবনের 'অর্থ' আমি বুঝিয়াছি। কে আমি, কি আমার কর্ম—ইহা আমি উপলব্ধি করিয়াছি তোমার স্পর্শের ফলেই। তুমি অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত আনন্দ; তাই অনন্ত অস্তিত্ব। তোমার অস্তিত্বেই আমার অস্তিত্ব। তুমি আমি এক। শব্দ ও অর্থ যেমন এক, আমি তুমি তেমনি এক। বীরেন আসে ৯টায়। সুবোধের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই অবস্থায় ভাত খাইতে বলিল। Relapse করিলে ইহার মধ্যে করিত—ইহা সুবোধের বক্তব্য। রেণু সুবোধের ওখানে গিয়া এই সিদ্ধান্ত জানিয়া আসে।...গীতা পাঠ হয়। সন্ধ্যার পর চিদানন্দ ও তাহিরী বন্ধী আসে। শতবার্ষিকীর কি করা যাইবে তাহার আলোচনা করা হয়। অর্থ সংগ্রহের জন্য রসিদ বই ছাপানো হইবে। মঠ হইতে অন্ততঃ ২ হাজার টাকা প্রথমে মঞ্জুর করা ট্রাস্টীদের উচিত। রাত্রিতে রেণুকে দিয়া ঠাকুরের জীবন চরিত লেখাইবার কথা মনে হয়। চিদানন্দ আফিস নিয়া বসিবে।...রেণু বলিল, প্রতি সপ্তাহে সভা হওয়া প্রয়োজন।...

৩০শে আগষ্ট

জন্মাষ্টমী

শ্রীকৃষ্ণ আমার, তুমিই লোকে বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রথিত। তোমার আকর্ষণে ব্রজে গোপীগণ 'প্রোজ্ঝিতলোক-বেদ-ধ'। তাহাদের লৌকিক আচার, বৈদিক আচার ও স্ব আচার সব পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিশ্বের সর্ববিধ আকর্ষণের পরম অর্থ তুমি। তুমিই মূর্তিমান আকর্ষণ। তাই তুমি কৃষ্ণ। সর্ব আকর্ষণের দেবতা তুমি, সার্থকতা তুমি। তুমি আবির্ভূত না হইলে ব্যাধ বিলিত না কেন নারীর আকর্ষণে নর উন্মাদ, নরের

আকর্ষণে নারী পাগল, কেন জড়তপার আকর্ষণে অপর জড়তপা এত অস্থির, কেন চিৎ জড়কে আকর্ষণ করে, জড়ই বা কেন চিৎকে আকর্ষণ করে। তুমি বিশ্বের সর্ব-ক্ষেত্রে বাস্তব অদ্বৈত জ্ঞান স্থাপন করিবার জন্য আসিয়াছ। সকল ভেদ তোমাতে বিলুপ্ত। তুমিই 'ক্রিয়েক্টু'। শ্রীনিত্যগোপাল রূপে তোমার দর্শন তুমি বর্তমান যুগে দিয়া গিয়াছ। আমার সবটুকু দিয়া তোমাকে বরণ করিতেছি। আমাকে তোমার সেবার উপযোগী তনু ও অবস্থা দান কর। তোমার জয় হউক। রেণু সকালে বাজার হইতে ফুলের মালা ২টী ও ফুলপাতা নিয়া আসে। একটী মালা ঠাকুরের উপরের প্রতিকৃতিতে পরাইয়া দেওয়া হয়, একটী এখানের। ঠাকুরকে লুচি হালুয়া তরকারী ভোগ দেওয়া হয়। দুপুরে ইলিশ মাছ ও চিংড়িমাছ দিয়া চালকুমড়ার তরকারী ভোগ দেওয়া হয়। সোণা আমার গলায় ঠাকুরের প্রসাদী মালা পরাইয়া দেয়। বীরেন আসে। তাহাকে প্রসাদ দেওয়া হয়।...বৈকালে জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে আনন্দ বাজারের প্রবন্ধ, ঐ পত্রিকায় বিপিন পালের প্রবন্ধ ও এবারকার রেণুর প্রবন্ধ পড়া হয়।...

৩১ শে আগস্ট

ঠাকুর, সখা আমার, তুমি আমি সম-প্রাণ। আমার জীবনের সকল সুখদুঃখের যে তুমি সম অংশীদার—ইহা আমাকে প্রত্যেকটি ঘটনায় উপলব্ধি করিতে দেও। তুমি আমি বুকে বুক মিলাইয়া চলিব—তবে না আমি সার্থক হইব? তুমি কায়া, আমি ছায়া। তোমার প্রতিটী ব্যবহার আমি জীবনে বহন করিয়া চলিব। এই বিশ্ব সংগঠনের মূলে রহিয়াছে তোমার আমার একাত্মতা। স্বামী-স্ত্রী একাত্ম হইলেই না সন্তান সৃষ্টি? আমাকে এক করিয়া লও। তুমি-আমি অপৃথক ইহা আমি ভাবিতে পুলকিত হই। তুমি আমার জীবনের গতিপথে প্রতি পদক্ষেপে অনুস্যূত রহিয়াছ।...আশ্বিনের শতবার্ষিকী লিখিবার জন্য কিছু কিছু পড়ি।

১লা সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, বিশ্ব সংগঠনের নূতন মন্ত্র লইয়া তুমি এলে—নিত্যানিত্য সমন্বয়ের মন্ত্র, জড়-অজড় সমন্বয়ের মন্ত্র, চৈতন্য অচৈতন্য সমন্বয়ের মন্ত্র। তুমি মন্ত্রদাতা গুরু। কিন্তু তুমি যে আজ বড় একা। এই বিরাট একাকিত্বের মাঝে আমি তোমার সঙ্গে যাইব, তোমার সেবা করিব আমার সকল স্নেহমনপ্রাণ লইয়া। তুমি আর আমি, আমি আর তুমি—এই বিরাট বিশ্বের বুকে তোমার অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া, প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া, মনে মন মিলাইয়া চলিব। তোমার এই গুরুতম ভার যতখানি পারি আমি মাথা পাতিয়া বহন করিব। আমায় সেই অধিকার দেও, সেই সৌভাগ্য দেও।...কাজেই মনে হইল সত্যব্রতের জাপ আবার বাড়িবে। রেণু বীরেনের ওখানে যায়...৪টি ছাগ কিনিয়া আনে।...কাহারও উপর কোনও অভিযোগ না করিয়া নিজের ক্ষেত্রে নিজে স্থিত থাকিয়া স্বকর্ম নিয়া আগাইয়া গেলেই মানুষ সার্থক হয়। যাহা পাইয়াছি, তাহাই সত্য; যাহা পাই নাই তাহার জন্যে চীৎকার করিলে কি হইবে? সম্পর্ক আরও মলিন হইবে, পথ জটিল হইবে। নিজের পথে চলিব, আক্রমণের বদলে প্রতি-আক্রমণ না করিয়া আগাইয়া গিয়া আক্রমণকারীকে পরিত্রাণ করাই আমার জীবনের ব্রত।...রেণু ২টার পূর্বে বাহির হয়...।

২রা সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তুমি বিদ্যাপতি, অবিদ্যাপতি দুই-ই। অবিদ্যা-ক্ষেত্রকে বিদ্যা ক্ষেত্রে, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিবার (create) বীর্য লইয়া, দর্শন লইয়া তুমি আসিয়াছিলে।... আচার্য শঙ্কর বলিলেন, ব্রহ্ম নিঃশক্তি; ইহার পর বৈষ্ণবাচার্যগণ করিলেন ব্রহ্মের সঙ্গে বিদ্যামায়ার সমন্বয়। সকলেই অবিদ্যার হাত হইতে মুক্তি চাহিয়াছেন। তুমি আসিলে ব্রহ্মের সঙ্গে অবিদ্যা-মায়ার সমন্বয় বিধান করিতে, creative ধর্ম প্রচার করিতে। আচার্য শঙ্কর বা বৈষ্ণবাচার্যগণ অবিদ্যাকে অস্বীকার করিয়া ত্যাগী হইয়াছিলেন। তুমি অবিদ্যাকে স্বীকৃতি দিয়া গৌরব দিয়া অবিদ্যা-প্রকৃতিকে গড়িতে গড়িতে ত্যাগের কৌশল শিখাইয়া গেলে। কত বড় ত্যাগী হইলে তবে ভোগ করিতে করিতে ত্যাগ করা সম্ভব। ছাড়িয়া ত্যাগ আর রাখিয়া ত্যাগ—ইহার মধ্যে বিরাট পার্থক্য। তুমি 'রাখিয়া' ত্যাগী। তোমার ত্যাগই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা। ইহার মধ্যে আছে গৌরব,

বীর্য।...রেণু ১২টার পর কলিকাতা যায়...ফেরে ৬টায়।... রেণু বলে, প্রতিজ্ঞাও বলে, আমি উদাসীন হইয়াছি, সরিয়া গিয়াছি। এখন সম্পর্ক এড়াইতে চাই—একথা সত্য। ইহারা ইচ্ছা করিলে আবার আমাকে সুস্থ করিতে পারে—ইহাদের হাতেই তো সব ছাড়িয়া দিয়াছি—আমার খাওয়া পরা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য।

৩রা সেপ্টেম্বর

মাধারাণী আমার, বিশ্বের সকল সৃজনী শক্তির মহাকাশ তুমি, তাই তুমি পরাশক্তি। পুরুষোত্তম-বিশ্ব রচনার বীজ তুমি গর্ভে ধারণ করিয়াছ, পুরুষোত্তম-বিশ্বের জননী তুমি। এখানে সৃষ্টির পর রূপ, পুরুষোত্তম রূপ উদ্ভাসিত। তুমি নিত্যগোপাল রূপে আসিয়া আমার জীবনের মাঝে ধরা দিয়াছ। আমি তোমার এই সৃষ্টি কার্যে তোমার সঙ্গিনী হইব। সৃষ্টি চলিবে psychological line of development ধরিয়া। সংসার গড়িয়া তুলিবার জন্যই এই সংসারের মধ্যে রহিয়াছি। কিন্তু গড়িতে পারিলাম কৈ? আঘাতের পর আঘাত আসিয়া আমার সকল শক্তি বুঝি বা শুষিয়া লইয়াছে। আমাকে শক্তি দেও, মন দেও, জন দেও, হৃদয়ে বল দেও। তোমার অবতরণ-প্রয়োজন আমি মাথায় বহিয়া চলিব। তোমার জয় হউক। ...রেণু বীরেনের ওখানে যায়।...রেণু ১১টার পর বাহির হয়। ৪টায় একবার ফেরে। ৪॥টায় কমলালয়ে যায় গোপা সহ। ফেরে ৭॥টার পর।...সন্ধ্যার পর তারিণী নন্দী মহাশয় ও চিদানন্দ আসে। অনরঞ্জনবাবুর দুইটি প্রবন্ধ দিয়া যায় পড়িবার জন্য। ইহাদের বিশ্বাস অন্য অযোগ্য সম্পাদক হওয়ায় জন্য অনরঞ্জনবাবুরাই অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। সামঞ্জস্য করিয়া না চলিলে সংসারে কিছুই চলে না। অনরঞ্জনবাবুকে বাদ দেওয়া চলে না। প্রতিশ্রুতির নামের তালিকা দেখিয়া তাহাদের গুরুমহারাজদের কাছে গিয়া আলাপ আলোচনা করিয়া আনিতে হইবে। ঐটি না হইলে অর্থসংগ্রহ করা হইবে কি করিয়া?...মহানির্বাণ মঠের একটী নিজস্ব ক্ষেত্র এতদিনে প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল। অথচ ইহাদের এরূপ কোন ক্ষেত্রই নাই।...

৫ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, যে প্রয়োজনে তুমি এই ধরার ধূলিতে পা দিয়াছিলে, সেই প্রয়োজনকেই আমার প্রয়োজন মনে করিয়া জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের প্রতি স্পন্দনটীকে কাজে লাগাইব। আমার বাঁচিবার অন্য কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। আমি অপ্রয়োজন। তুমি আসিয়াছিলে। আমার হৃদয়ে নিজে তোমার মেহমূর্তি শ্রীচরণ স্থাপন করিয়াছ। আমি ধন্য, আমি কৃতার্থ। তোমার সেই পাদপদ্ম আমি হৃদয়ে বহন করিয়া চলিব। আমার তুমিই সব—পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু স্বামী, 'সর্বাণি সর্বম্'। সকালে সত্যেন পাত্রী আসে। 'নিত্যগোপাল সত্যবাহিকা' লিখি, এখনও শেষ হয় নাই। ৪-২৫ এ মঠে রওনা হই। ...গিয়াই সভা আরম্ভ করা হয়....কেবল নিরাশার কথাই চতুর্দিকে। সাহস করিয়া নামিলেই পথ হয়।...

৬ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, সেই কবে তোমার নাম লইয়া তোমাকে বুকে করিয়া তোমারই বিশ্বে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলাম তোমার বিশ্বকে তোমারই ছাঁচে গড়িয়া তুলিয়া তোমাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্যে। আজিও আমি তোমার বিশ্ব-পথ বহিয়া চলিয়াছি, চলিব। হৃদয়ে বল দেও। সকলেই তো ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কাহারও সাধনে কিছু নাই। সকলের জন্য দুয়ার বন্ধ। আমার তো পথ আছে। আমি চলিব, শত আঘাত অনাদরের মাঝেও চলিব। তোমার জগৎকে তোমারই মত সত্য মনে করিয়া সম্মান দিতে চাহিয়াছি। সুধা একদিন হৃদয় নিয়া আসিয়াছিল। আমিও বুকে তুলিয়া লইয়াছিলাম। আমি সেই সম্পর্কের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছি। অবিশ্বাস আমি করি নাই। অবিশ্বাস করিয়া তাহার নিকট হইতে আমার লেখা চিঠিগুলি ফিরাইয়া আনি নাই। তোমাকে বিশ্বাস করিব, তোমার বিশ্বকে বিশ্বাস করিব। তুমি কি ইহাদিগকে (সত্য-ব্রতদের) ফিরাইয়া দিতে পার না? আমার কি তাহাতে আমার সঙ্গে যুক্ত করিতে পার না? অনেক কিছু লাঞ্ছনা তো পাইল, আজও কি বুদ্ধির উদয় হইবে না? বীরেন আসে ৮টার পর।... -র মাথার উদ্বেগ হয়...। ইহা আমাকে আমার ৪॥টার পর। রাত্রি ১১টাতেই জানানো উচিত

ছিল। কিন্তু সময় থাকিতে কেহ তো তাহা করিতে জানে না। আমি সুস্থ থাকিলে তোর ৫টার মধ্যে ডাক্তারের কাছে গিয়া খবর আনিতাম। রেণুকে ৫-৩০-এ পাঠাইয়া দেই। বিকাল ৪॥টায় পাঠ হয়—আশ্চর্যবৎ পঙ্‌ক্তি ইত্যাদি শ্লোক।...

৬ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, আর যে পারিতেছি না। রূপে গুণে জ্ঞানে প্রেমে তুমি ছিলে অতুলনীয়। তবুও তো তোমাকে কেহ নিল না। এমন রূপবান গুণবান বয় কাহারো মনে ধরিল না! কি দুর্ভাগ্য! আমি তোমাকে নিয়া দ্বারে দ্বারে ঠেকিয়াছি। তোমার যাহারা সম্প্রদায় রক্ষক, তাহারা অবসন্ন, শ্রান্ত, ক্লান্ত। কোন উৎসাহ তাহাদের নাই। অনেকেরই টাকা আছে। কিন্তু তাহা তো তোমার সেবার জন্য নয়। যে যার লইয়া ব্যস্ত। তোমার পত্রবাহিকীর জন্য কাহারও তো মাথা ব্যথা নাই। এদিকে -কে লইয়া আসিয়াছি। আজ সে ধনহীন, জনহীন। কেহ তো আসে না। কেন এরূপ হইল? একথা তো তাহার সঙ্গে আলোচনা করাও সম্ভব নয়। রেণুর উপর চাপ পড়িতেছে। তাহাতেও তো আমার সঙ্কোচ। উদ্বোধনের চলিবে কি করিয়া? সকলেই অসুস্থ, খাওয়ার খরচও তো কমানো যায় না। কোনও দিক দিয়া বাহির হইবার যেন পথ নাই। 'জয় কি, টেনে তুলব'-বাণীই আজ আমার সম্বল।...সন্তোন শাস্ত্রীকে লইয়া সেখানে (মহানির্বাণ মঠে) এখনই সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।... রেণু ২বার কলিকাতা যায়।...টাকা কড়ি সব নিঃশেষ হইয়া গেল।...

৭ই সেপ্টেম্বর

মাধাময়ী আমার, পদ্মাপদ্মবনী আমার, তুমিই আমার স্বরূপ, তোমার পদ্ম প্রকৃতির মধ্যে আমার অপদ্ম প্রকৃতি পূর্ববোক্তমন্ত্রপে গড়িয়া উঠুক, যাহাতে আমার দেহমনপ্রাণ সেবায় লাগিয়া ধন্য হইতে পারে। তোমার সত্তাই আমার সত্তা। তোমার মাঝেই আমি সত্যি করে আছি। তোমার রূপই আমার সত্যরূপ, তোমার নামই আমার সত্য নাম। আমি তুমি বনিয়া যাইতে না পারিলে আমার জ্বালা যে মিটিতেছে না। আমার আমিকে তোমার আমিতে গড়িয়া নেও। আমি তোমার আমি হইব। তুমি আমি এমন ভাবে এক হইব যে দুইয়ের পৃথক সত্তা, পৃথক চৈতন্য পৃথক আনন্দ মুছিয়া যাইবে। আমরা একসত্তা, একচৈতন্য ও একানন্দ হইব।...রেণু ১০টায় যাইয়া কলিকাতায় যায়। অনেক জায়গায় যায়—১০।১২ জায়গায়। ফেরে প্রায় ৩টায়।...সন্ধ্যার পর চৈতন্য আসে—আমার মতবাদসহ কার্যবিবরণী নিয়া যায়। কে তার কাজ করে?...এই উৎসাহে কাজ হয় না। আমি ইহাদের নিয়া কেমনে কাজ করিব?...জয়া আসে বৈকালে।...রেণু আর এক কাইল অরিওমাইসিন ৮৷০ টাকা দামে কিনিয়া আনে।...

৮ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, প্রাণসাধনা ঊর্ধ্বমূল তোমাকে আশ্রয় করিয়াই প্রবাহিত হইয়াছে। আমি প্রাণ-সাধনার ভিতর দিয়া বিশ্বময় তোমার আসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পাগল। কিন্তু চতুর্দিকে আমি যেন পাষাণ-প্রাচীর দিয়া ঘেরা। যাহা কিছু অর্থ সঞ্চিত ছিল, সবই তো এখানের সেবায় খরচ হইয়া গিয়াছে। থাকিলে তোমার পত্রবাহিকীতে ব্যয় করিতে পারিতাম। আজ আমি রিক্ত। কোথাও যে বক্তৃতা দিতে যাইব, তাহার পয়সাও নাই। মঠে চাহিয়া লাভ নাই। কে-ই বা দিবে? কাহার কাছেই বা চাহিব? যাহা হয় তুমি করিও। আমি তুমি এক ইহা ভাবিয়াই আমার সুখ। তোমার আমার দেওয়া নিঃশেষ হউক।...তারিণীবাবু ২৫জন গ্রাহক করিয়া দিবার কথা বলেন। তিনি নিজে গ্রাহক হইবেন। তাহাকে বলি, 'আপনাকে গ্রাহক হইবার জন্য বলিয়াছি, আপনি হন নাই। অথচ আমি ঠাকুরের সেবাই করিয়া আসিয়াছি। আজিও আপনাদের সেবক।' আমি ট্রাস্টী হইতে চাই নাই। চাহিয়াছিলাম শুধু সেবা। Sree Krishna was never a king. প্রণিপাতের আমি ভালবাসি। 'ভ্রাতুষ্পুত্রেণ পুত্রতা।'

৯ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, এই মায়ার ক্ষেত্রে কি এতটুকুও যোগমায়ার ক্ষেত্র রচনা করিয়া আমাকে দিতে পারিবে না যেখানে

দাঁড়াইয়া এই মায়ার ক্ষেত্রকে গড়িয়া তুলিতে পারিতাম। কয়েকটি মানুষের মধ্যে যোগমায়ার সম্বন্ধই তো স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলাম—স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে, প্রতিভা বেণু প্রভৃতিদের সঙ্গে। কতদূর পারিয়াছি আমি না। তুমি মুক্ত জীবন-প্রবাহ উন্মাদিনী রাধারাণীর উন্মাদ দর্শন দিবার জন্য আসিয়াছ। সর্বদর্শন সময়েই উন্মাদের দর্শন। কোনও একটিকে আঁকড়াইয়া থাকিবার দর্শন তো ইহা নয়। ইহাই উন্মাদের অবস্থা। তুমি বিরাট, তোমার জগৎ, তোমার দর্শনও বিরাট। রূপ-রসের উন্মাদ আকর্ষণে জীব-জগৎ ছুটিয়াছে। এই ছোটার চরম পরিণতি তোমার উন্মাদ দর্শনের মধ্যে, যেখানে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির মহা মিলন সংঘটিত হইবে। তোমার সত্যব্রতের তাপ.....আমি তো প্রার্থনা করিতেছি, খোঁজখবর লইতেছি ও ডাক্তারকে জানাইতেছি। ওষুধের dose বাড়ানো ডাক্তারের বিবেচনা। ৫০ marg-এ যখন উপসর্গ বাড়িয়াছে, তখন বেশী দিলে বিপদ হইবে ডাক্তার মনে করে। ডাক্তারকে জানাইব। ইহা লইয়া সত্যব্রত, বড় বৌ ও সত্যব্রতের মায়ের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে। অথচ ইহার মধ্যে আমি নাই। আলোচনার সিদ্ধান্তই শুধু বড় বৌ জানাইয়া দিয়া যায়। আমি আলোচনার মধ্যে নাই। খুব বেদনা পাইয়াছি। সারা জীবনই তো এই ভাবে বেদনা দিয়াছে। নূতন করিয়া আবার তাহা উপলব্ধি করিলাম। বৈকালে সত্যেন শাস্ত্রী আসে, তাহাকে হাত দেখাই। সে বলে তুমি ও গৃহযোগ আছে। বেশ বৎসর পর পূর্বের চেয়ে অধিকতর প্রতিষ্ঠা আসিবে। সন্ধ্যায় চিদানন্দ আসে, অর্থ সংগ্রহের রসিদ বহির প্রুফ দেখাইয়া লইয়া যায়। বেণু সকালে খাইয়া বাহির হয়—কোথায় উল্টাডাঙা কোথায় চরকডাঙা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

১০ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তোমার কর্ম তোমার থাকুক, তোমার বিশ্ব তোমার থাকুক, আমি ছুটি চাই। আমি যে আর পারি না। তুমি আমার সকল লাঞ্ছনা, সকল উপেক্ষা, সকল অনাদর তোমার স্নেহপরশ দিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছ। আমি চাহিয়াছিলাম প্রতিটি মানুষকে প্রথমে 'পাইয়া', তাহার সঙ্গে প্রথমে একান্ত হইয়া তাহার সেবা করিতে। কিন্তু যখন আমি দেখি সে আমায় বাহিরে দাঁড়াইয়া নিজের সুখদুঃখের সমাধান করিতে চায়, আমি অথই জলে পড়ি। সকলকেই প্রথমে বুকে টানিয়া লইয়াছি। তাহারা আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। বড় কষ্ট আমার! স্ত্রীপুত্রকন্যাকে কোনও দিন পৃথক বুদ্ধি নিয়া দেখি নাই। তাহারা কি অপৃথক হইল? আজ তাহারা তাহারা, আমি আমি। অথচ এখনও তাহাদের দায়িত্ব আমাকে বহিতে হইতেছে। কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা আমার নাই।...জগাই মেধে উমা আসে।...

১১ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, বিশ্বের সৌর আমার, তুমি বিশ্বকে প্রেমে ভরিয়া দিবার জন্য ধূলায় গড়াগড়ি দিলে। আমি তোমার বিশ্বের ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া চলিব, বিশ্ব-গতিতে গতি মিলাইয়া ছুটিব, বিশ্ব-আমির মাঝে আমার আমি গলাইয়া চলিব। ওগো বিশ্ব, তুমি আমার, আমি তোমার। ঠাকুর, আমার সংসারধারা কি সার্থক হইবে না? বাস্তবিকই কি আমাকে সন্ন্যাসী সাজাইলে? সংসার-ধারা ও সন্ন্যাস ধারার সমন্বয় চাহিয়াছিলাম দার্শনিকতার বাস্তবের ক্ষেত্রে। তুমি বলিয়াছিলে সত্যব্রতের জন্মপ্রসঙ্গে, 'শরৎবাবুর একটি সুপুত্র হইয়াছে'। পুত্র ও পুত্র একই ধার দিয়া বাহির হয়, সুপুত্র হইলেই পুত্র, নহিলে শুধুই পুত্র।...তোমার সেবার জন্য তাহাকে তো পাইলাম না। পাইবার জন্য অনেকদূর গিয়াছি। তোমার যাহা ইচ্ছা করিও। তোমার মুখের অন্নদ্বারা অন্নপ্রাশনও করাইয়াছিলাম।...সত্যেন কেবল অভিযোগ করে। আমি 'অন্যোঽসৌ অলক্ষিত-উত্তম' হওয়ার কথা বলি।...

১২ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তুমি যে পথ বহিয়া চলিয়া গিয়াছ, তোমার সেই চলা-পথে থাকিয়া তোমাকে বুকে লইয়া তোমার ব্যাকুল চরণ মাথায় রাখিয়া চলিয়াছি। দুনিয়ার মানুষ হইতে বুদ্ধিতে আমি কত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি? সকলেই আমার, অথচ আমি কাহারও একান্ত নই। যতদূর পারি আমি মানুষকে স্বীকার করিব, মর্যাদা দিব।

কিন্তু কাহারও সঙ্গে একান্তভাবে জড়াইয়া পড়িব না। আমার পথ তাই compromise-এর পথ। কাহাকেও আমি পরিত্যাগ করি নাই। মানুষই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি নিজের কাছে নিজে মুক্ত আছি। কাহাকেও আমি আঘাত করি নাই। আমি ছিলাম অপ্রতিকার ও অপত্র। অথচ তোমার আশীর্বাদে আজিও মাথা উঁচু করিয়া চলিতে পারিতেছি। তোমার জয় হউক।...কমলা আসে ৮টার পূর্বে। শিশিরের বাবের মৃত্যুদিন। অনেক তরকারী পাঠাইয়া দেয়।...বড় বৌ ২দিন হইল সন্ধ্যার পূর্বে বেহালা যাইবার সময় আর দেখা করিয়া যায় না। খুব বিরক্ত হইয়াছে। আমি নিরীহ, অপ্রতিকার ও অপত্র বলিয়াই মানুষ আমার উপর জুলুম করে। তুকারাম তাহার ঘায়ের ভাব নেয় নাই। আমি নিজে গিয়া নিয়া আসিয়াছি। এতদিন গিয়াছে, আমি কি করিতে পারি? তাক্তারের উপর রাগ করিয়াই বা কি হইবে?...আমি সত্যব্রতকে বলিয়াছি—ঠাকুরের কাছ হইতে চাহিয়াছিলাম তোমাকে, আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে চাহিয়াছিলাম। সংসার-ধারাকেও বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিলাম। ঠাকুর আমাকে সন্ন্যাসীই করিলেন। সুখে থাকিও।

১০ই সেপ্টেম্বর

রাধারাণী, পরাণপুতলী আমার, তুমিই আমার হৃদয় সম্পুটমণি। তোমাকে জীবনের মণি-কোঠায় পুরিয়া রাখিয়াছি, কেউ জানিবে না, কেউ শুনিবে না। 'হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্'। তোমার পরশে অন্ন পূর্ণ হয়, সব ছোট ব্রহ্ম হয়, সব অন্ত অনন্ত হয়। তুমি জীবনে ঘর বাহির এক করিয়াছ। আত্মরতিকে সর্বরতির স্তরে জমাইয়া তুলিবার জন্যই তুমি আতি ক্ষুদ্র শীলছাড়া। সর্বের ক্ষেত্র যখন আত্মরতির স্পর্শ হারায়, তখনই সেখানে আতি-কৌলীন্য, কুল-কৌলীন্য, শীল-কৌলীন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আত্মরতি সর্বরতির সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাহা হয় ব্রহ্মধাম। তুমিই ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। জয় রাধে।...আজ সত্যব্রত ভাত খাইয়াছে, পরমমণিও খাইয়াছে। কোনও উদ্বেগ হয় নাই। রেণু ১০টার পর বাহির হইয়া ফেরে ৫॥টায়। দাঁতের ডাক্তার জীবনবাবুর স্থানে ঠিক করিয়া আসিয়াছে কাল ৪টার সময় আমি সেখানে যাইব দাঁত ফেলিবার জন্য। দাঁত ২টী এমন হচ্চালো হইয়াছে যে উহাতে খোঁচা লাগে। ফেলিয়া দেওয়াই উচিত। ১৪ই সেপ্টেম্বর

জীবন-তৃষা আত্মনিবেদনের ঘন-বিগ্রহ তুমি রাধারাণী। আমার জীবনের আঙিনায় তুমি আসিয়া দাঁড়াইলে ভিখারিণী বেশে রাজরাজেশ্বরী হইয়াও। আমি তোমার জীবনে জীবন মিলাইয়া বিশ্বের কাছে বিশ্বেশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন করিব—যে আত্মনিবেদনের মধ্যে আত্মজ্ঞান ও আত্মানন্দ পরিপূর্ণ সমাট রাজিয়া আছে। তুমি আমার জীবনে এক বিশ্বময়ী রূপ। তুমি নিত্যগোপাল বেশে আমার জীবনে ধরা দিয়াছ। আমার নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত তোমার শ্রীচরণতলে বিকানো। আমার জীবনে তোমার জয় হউক। সত্যব্রত ভাল আছে। সেবানন্দ মঠ হইতে ফুল দিয়া যায়। রেণু ১০টায় বাহির হইয়া ৩॥টায় ফেরে। তখনই আমি ও রেণু জীবন মজুমদারের বাড়ী যাই। জীবনবাবু সবশে ২টী দাঁত... তুলিয়া ফেলেন। যাইবার সময় ট্রাম ও রিকসায় যাই। আসার সময় ট্যাক্সীতে আসি ...আসিয়া দেখি সত্যেন ও শিশির উপস্থিত।...ট্যাক্সীতে আসিতে আসিতে মনে হইতেছিল—দাঁত তো আমার দেহের অংশ দেহ, আমি। অথচ আজ সে 'পর' হইয়া গিয়াছে, ফেলিয়া দিতে হইল। দেহের সঙ্গে দাঁত যুক্ততা হারাইলেই সে 'পর' হয়। সে তো চিরকালই 'পর' হয় না। এইভাবে সংসারের স্ত্রীপুত্রও সব সময়ই 'মিথ্যা' নয়। আমার অগ্রগামী জীবনের সঙ্গে একাত্মতা না থাকিলেই তাহারা 'পর' হয়। একাত্ম রাখিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছি, পারি নাই। আজ 'পর' হইয়া গিয়াছে। ইহাদের কোনও দায়িত্ব বুঝি আজ আর নাই। বেশ করিয়াছ কালী।...একটী অর্থনৈতিক গ্রন্থের রসিদ বই দিয়া যায়। শিশিরের কাছ হইতে ১৲ টাকা সত্য-বার্ষিকীর জন্য আদায় করা হয়। ১৫ই সেপ্টেম্বর

শ্রীশ্রীরাধাইমী

বৃষভানুপুরে কালী কাত্যায়নী আজ কৃত্তিকা-বৃষভানুর কোল আলো করিয়া জনম নিলেন। কালীও বিপ্লবী, রাধাও বিপ্লবী। কালীর মানবীয় রূপই শ্রীরাধা। দিব্য-জ্ঞানানন্দময়ী। কি অপূর্ব রূপেই না আমার জীবনে তুমি এলে। তোমার ব্যাকুল চরণ পুরুষোত্তমের ধ্যানের ধন—'অবগয়নখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহী যে পাদপল্লব-মুদারম্'। তোমার পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন। সকল প্র-বৃত্তির বুকে তুমিই নিবৃত্তিকে জমাইয়া তুলিলে। মিথ্যা সংসারকে, অস্বীকৃত সংসারকে কে এমন করিয়া সত্যরূপে গড়িয়া তুলিতে পারে? তুমি তাই পরা প্রকৃতি। তোমার চরণস্পর্শেই ধরার ধূলি ব্রজ রেণু। ব্রজ রেণু গায়ে মাখিয়া আমি নূতন বিশ্ব গড়িয়া তুলিব।...রেণু ১১টার পর বাহির হইয়া যায়, কর চৌধুরীর সঙ্গে নূতন নূতন জায়গায় যায়। আশ্বাসও পায়। ফেরে ৬টার পর। সত্যেন শাস্ত্রী বৈকালে আসে, ১৫৲টাকা হাওলাত দেওয়া হয়। ওরা দিবে। মুক্ত হইতে পারিলে প্রাণপণ আমাদের কর্মে—পুস্তক বিক্রয় গ্রাহক সংগ্রহ করিলে অনায়াসে তাহার পরিবারের ভার নেওয়া যায়। কিন্তু কে আছে? আজ সত্যব্রত বিব্রত, সত্যেন শাস্ত্রী বিব্রত, কাহারও সামনে পথ নাই। রুদ্ধ দুয়ার। সামনে আমার বিরাট কর্মক্ষেত্র আজও প্রসারিত ছিল। এই বিরাটকে তো কেহ নিল না।...সন্ধ্যার পর বিভা সরকার আসে।...

১৬ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তোমার নূতন সৃষ্টির বীর্য ধারণ করিব, তোমার আধান করা বীজ গর্ভে ধারণ করিব, নূতন বিশ্ব সৃষ্টি করিব—ইহাই ছিল জীবনের সৌভাগ্য। 'মম যোনিঃ মহৎ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।' চতুর্দিকে যেভাবে বিশ্ব ভাঙিয়া পড়িতেছে, ইহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। তুমি যে নূতন বিশ্বের মূল স্রষ্টা, ইহা আমি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছি। তোমার আমার দিব্য মৈথুনের ভিতর দিয়া আমার গর্ভে তোমার বীর্য আধান হউক। আমি পরা প্রকৃতি হইব, মহৎ ব্রহ্ম হইব। আমাকে যেমন সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী কর। আমি যে তোমার প্রকৃতি, তাহা তুমি স্বীকার করিয়া গিয়াছ। আজ আমাকে বঞ্চিত করিও না। তোমার বীর্য ধারণ করিবার যোগ্যতা আমাকে দেও। সেবানন্দ মঠ হইতে ফুল দিয়া যায়। রেণু ৯টার পর কর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বাহির হইয়া যায়। তাহার সঙ্গে ৪টি advertising agency-র সঙ্গে দেখা করে। ২টায় ফেরে।...মঠে কি হইতেছে জানিবার জন্য আমি ও রেণু ৪টার পর রওয়ানা হই। সদানন্দ রোডের মোড়ে চৈতন্যের সঙ্গে দেখা। ফিরিয়া আসি। শুনিলাম—বলহাটীর টেলিগ্রাম পাইয়া তারিণীবাবু, চিদানন্দ চলিয়া গিয়াছে...। এ দিকের সব অগুছাল রাখিয়া যে যাহার মত চলিয়া যাইতে পারিল, আমি ঠিক ইহা বুঝি না। কাজের কি এতটুকুও মূল্য নাই? কাজ পড়িয়া রহিল, কোনও বন্দোবস্ত করিয়া গেল না। কাজ নিয়া ছেলেখেলা আমি কোনও দিন করি নাই। তাই আমার 'কাজ' আছে, আর কাহারও কাজ নাই। ব্রত হিসাবে কাজ তো কেহ করে না।...

১৭ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তোমার জন্য কেহ বসিয়া নাই, যে যাহার বাঁধা নিয়া বিব্রত। তোমার কাজ করিবার কে আছে বল? তোমার দর্শন পড়িয়া রহিল; তুমিই রাখিয়া গিয়াছিলে। তুমি চলিয়া গিয়াছ। উহার ভার কে বইবে? তোমার অন্ত্যেষ্টিসবের জন্য কাহার মাথাব্যথা আছে? কেউ তো খোঁজও নেয় না। আমি বুক ভরা বেদনা লইয়া ছটফট করিতেছি। অথচ আমি নিঃসম্বল—অর্থহীন, জনহীন। আমি জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরিলাম। তোমার কাজ আজিও আরম্ভ হইল না, আরম্ভ হইবার উপক্রম হইতেছিল মাত্র। ইহার মধ্যে যে যাহার মত কোনও পরামর্শ না করিয়া চলিয়া গেল। কেমন করিয়া কাজ হইবে? রেণুর মাথার বাঁয়ে neuralgic pain হইয়া বেশ কষ্ট পাইতেছে।

ক্রমশঃ

পরলোকে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ কুশারী

॥ শ্রীনীরোদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ॥

ঢাকা জেলা কংগ্রেসের নেতা, পূর্ববঙ্গের সুপরিচিত জননায়ক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ কুশারী মহাশয় গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তাঁর হুগলী জেলাস্থিত কোন্নগর নবগ্রামের বাড়ীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ১৮৯৪ খৃঃ তাঁর জন্ম হয় ঢাকা-র (বিক্রমপুর) বাহেরক গ্রামে। তাঁর পিতা ৺শ্যামাচরণ কুশারী ছিলেন ময়মনসিংহ—টাঙ্গাইল স্কুলের হেডপণ্ডিত। সিটি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ৺রজনীকান্ত গুহ তাঁর অন্যতম ছাত্র। অল্পবয়সে জিতেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ হয়। বরিশাল বি. এম. কলেজের ছাত্রাবস্থায় তিনি মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের স্নেহলাভ করেন। অতঃপর দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সুবক্তা এবং সুগায়ক হিসাবে তিনি ছিলেন বিখ্যাত। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল নিবিড়। গান্ধীজীর আদর্শে ১৯২১ সালে তিনি বাহেরক গ্রামে "সত্যাশ্রম" স্থাপন করেন। মহাত্মাজী বাহেরক সত্যাশ্রম পরিদর্শন করে বিশেষ পরিতুষ্ট হন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়েরও সত্যাশ্রমের প্রতি বিশেষ স্নেহদৃষ্টি ছিল। সেই সূত্রে সত্যাশ্রমের কাজে তিনি আচার্য্যদেবের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। দেশ বিভাগের পরে তিনি পশ্চিম বঙ্গে আসেন ১৯৪৭ সালে, কলকাতায় এসে তিনি নলিনীরঞ্জন সরকারের আগ্রহে "দৈনিক স্বরাজ" পত্রিকার (অধুনা লুপ্ত) সম্পাদক নিযুক্ত হ'ন। মতভেদ হেতু কর্মত্যাগ করার পরে ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গাপুরা রিফিউজী ক্যাম্পের কম্যাণ্ড্যাণ্ট রূপে ৫২,০০০ উদ্বাস্তুর ভার গ্রহণ করেন। বর্ধমান ট্রেনিং সেণ্টারের তিনি প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক (লীডার) ছিলেন। মতভেদ-হেতু ১৯৫৪-র ৩১শে জানুয়ারী সরকারী চাকুরী ত্যাগ করেন। অতঃপর নবগ্রামে (হুগলী) আসেন ১৯৫৪-র জুলাই মাসে। নবগ্রাম বালিকা বিদ্যালয় এবং নবগ্রাম বিদ্যাপীঠে তিনি কিছুকাল শিক্ষকতা করেছেন। তিনি কয়েক বছর নবগ্রাম কো-অপারেটিভ্ কলোনীর চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গান্ধীশ্রমিক নিধি-র (বাংলা) তত্ত্বপ্রচারক রূপে তিনি তাঁর কর্মজীবন শেষ করেন। তিনি গত কয়েক বছর যাবৎ দুরারোগ্য পারকিন্‌সনিজম রোগে ভুগছিলেন। ১৯৫৫ সালে ডঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁকে উড়িষ্যার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজে পরামর্শ দানের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর চিন্তা ও পরামর্শ উড়িষ্যার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজকে সুসংহত ও ত্বরান্বিত করেছে। জননেতা সতীন সেনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল এবং উভয়ে একসঙ্গে সেবাগ্রামে ও শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত "ওয়ার্ল্ড্ প্যাসিফিষ্ট কনফারেন্সে" প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

সাহিত্য সেবক হিসাবেও তাঁর পরিচয় উল্লেখযোগ্য। "দেশ" পত্রিকায় তাঁর বিভিন্ন রচনা প্রকাশিত হয়েছে। "স্বদেশ ও শিল্প", "নবগ্রাম", "জনমত" (ঢাকা) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার তিনি ছিলেন সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি। তাঁর অনেক রচনা "উজ্জল ভারত" পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছে। স্বদেশী যুগে তিনি চরকা, জাতীয় পতাকা, পল্লীসংগঠন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া তাঁর রচিত পুস্তক "গান্ধীজী স্মরণে" গান্ধী-চিন্তাধারার ব্যাখ্যা হিসাবে সুধীজনের কাছে সমাদৃত। এই বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তাঁর "পথের সন্ধানে" বইটিতে তিনি বরিশালের ছাত্র-জীবনের এক সর্বাঙ্গসুন্দর স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বইয়ের মুখবন্ধ লিখেছেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্বর্গতঃ ডঃ বীরেশচন্দ্র গুহ।

ত্যাগী নিষ্ঠাবান ব্রতী দেশ-সেবকরূপে স্বর্গতঃ জিতেন্দ্র নাথ কুশারী মহাশয়ের নাম সমগ্র বঙ্গদেশে বিখ্যাত। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও কন্যা রেখে গেছেন।

গম্ভীর-বেদী হস্তী

(পূর্ব্ববঙ্গ হিন্দু-সমাজ-চিত্র)

।। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ, জ্যোতিঃ সিদ্ধান্ত ।

[লেখকের 'অজানার কথা' নামীয় কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত বইটী হইতে 'গম্ভীর-বেদী হস্তীর' প্রবন্ধটি এইখানে পুনর্মুদ্রিত করিলাম। ইহাতে পণ্ডিতমহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অনেকের জানাই নাই, অনেকে পরিবর্ত্তিত আবেষ্টনে সব কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ বর্ত্তমানে যাহাদের বিশপঁচিশ বৎসর বয়স তাঁহারা এসব কিছুই জানেন না। লেখকের চিন্তাধারায় তুষ্ট হইয়া শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ লিখিয়াছিলেন, 'পণ্ডিতমহাশয়ের প্রবন্ধ খুবই উপাদেয়। তিনি চিন্তায় ও কর্ম্মে বিপ্লবী'। এই বিপ্লবী চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। বর্ত্তমান প্রবন্ধটিতে হিন্দুসমাজের দুর্গতির বাস্তব চিত্র রহিয়াছে, কেন এরূপ হইল তাহারও কিছু আলোচনা আছে—এজন্য প্রকাশ করিলাম।—সম্পাদিকা, উদ্ভব-ভারত]

কোনও হিন্দু সমাজ-সংস্কার সভায় আলোচনা। একজন সভ্য উঠিয়া আন্দামান দ্বীপ হইতে প্রেরিত একখানা সুদীর্ঘ পত্র পাঠ করিলেন। কোনও বাস্তুত্যাগী হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আন্দামানে যাইয়া সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছিলেন। তিনি ঐ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, পত্রলেখক অতি বৃদ্ধ। তিনি তিনটি প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রশ্নগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবহুল প্রথম প্রশ্নে তিনি জানিতে চাহেন যে হিন্দুর ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানগুলির গুরুত্ব দৃষ্ট হয় না কেন? এই প্রশ্নের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে পূর্ব্ববঙ্গের যে গ্রাম হইতে তিনি বাস্তুত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন সেই গ্রামে বহু ধনাঢ্য, বহু মধ্যবিত্ত এবং বহু সাধারণ অবস্থার হিন্দু বাস করিত। গ্রামের হিন্দুরা খুব আড়ম্বর সহ দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, রাস, সরস্বতীপূজা, দোল, রথযাত্রা প্রভৃতি দেব পূজার অনুষ্ঠান করিত। প্রতিমাসে না হইলেও প্রত্যেক বৎসরেই ৪.৫ বার অষ্ট প্রহর, চব্বিশ প্রহর ও ছাপ্পান্ন প্রহর নাম যজ্ঞ হইত, এইসব নাম-যজ্ঞ উপলক্ষে যে মহোৎসব বা বিরাট ভোজের আয়োজন হইত তাহাতে বহু সহস্র লোক প্রসাদ প্রাপ্ত হইত। কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও চোর দস্যু খুনীদিগকে নির্ব্বাসনদণ্ডে যে স্থানে প্রেরণ করা হইত, সেই আন্দামান দ্বীপে এখন তাহারা বাস করিতেছেন। তাহাদের এত ধর্ম্মানুষ্ঠানের কি এই পরিণাম? হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম কি সবই নিষ্ফল?

বৃদ্ধের দ্বিতীয় প্রশ্নটি এই—তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের প্রথম অবস্থায় দেখিয়াছেন তাঁহার গ্রামে অন্যান্য অঞ্চলে হিন্দুর সংখ্যা বেশী ছিল কিন্তু তাঁহার শেষ জীবনে বার্দ্ধক্যে দেখিয়াছেন হিন্দুর সংখ্যা দ্রুত গতিতে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। অথচ সেই অঞ্চলের অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু কোনও হিন্দুকে বলপূর্ব্বক অন্য ধর্ম্মে নেওয়া হয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল না। কারণ সমস্ত ক্ষমতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল হিন্দু।

হিন্দু জমিদার তালুকদারগণের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে সকলে ভয়ে কম্পমান থাকিত। থানার দারোগা, জিলার অধিকাংশ রাজকর্ম্মচারী, উকিল, মোক্তার, মহাজন প্রভৃতি প্রায় সকলেই হিন্দু। এই অবস্থায় ইংরেজ রাজত্বে বলপূর্ব্বক হিন্দুকে ধর্ম্মান্তরিত করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং প্রশ্ন এই হিন্দুর এত ক্ষমতা ও প্রতাপের সময়ে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইল কেন? এই প্রশ্নের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া পত্রে লিখিত হইয়াছে যে হিন্দুর সংখ্যাহ্রাসের ফলেই পরবর্ত্তী সময়ে তাদের বহু দুঃখ, দুর্দ্দশা লাঞ্ছনা এবং চরম দুর্ভোগের উৎপত্তি হইয়াছে। পত্র লেখকের

আন্দামান বাসস্থান নির্ব্বাচনের মূলেও সেই সংখ্যা হ্রাসের ব্যাপারই সক্রিয় রহিয়াছে।

মূলের তৃতীয় প্রশ্ন এই—হিন্দুর উৎকৃষ্ট ধর্মগ্রন্থগুলির সার্থকতা কি? পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসিত বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, চণ্ডী, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থগুলি কার্য্যতঃ আলমারীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। কদাচিৎ গ্রন্থ প্রকাশে বা সভায় বক্তৃতায় ব্যবহৃত হইতেছে। হিন্দুর ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য, প্রতাপ, প্রতিষ্ঠা, জ্ঞান, বিদ্যা, নেতৃত্ব প্রভৃতি সংরক্ষণে পূর্ব্বোক্ত ধর্মগ্রন্থগুলির কোনও অবদান দৃষ্ট হয় না কেন?

আন্দামানের পত্র পাঠের পর সভাপতির অনুরোধে একজন প্রবীণ পরিব্রাজক দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান-প্রসঙ্গে বলিলেন:—আন্দামানের পত্রে যে প্রশ্নগুলির অবতারণা করা হইয়াছে সেই সমস্ত প্রশ্ন কেবল পত্রলেখকের একার প্রশ্ন নহে, ইহা বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গের প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। এই প্রশ্নগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। যাহা হউক তিনটি প্রশ্নের একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে হিন্দু-সমাজের সর্ব্বনাশা কুব্যবস্থাগুলিই পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নত্রয়ের উত্তরের মূলে বিদ্যমান রহিয়াছে। এবং পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু তার পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে হিন্দু ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সমাজ গঠনে প্রধানতঃ সেই সেই ধর্ম্মের ধর্মগ্রন্থগুলির অবদান রহিয়াছে। কিন্তু হিন্দু-সমাজ-গঠন তার প্রধান ব্যতিক্রম। বর্ত্তমানে গীতা গ্রন্থের প্রচার সর্ব্বাধিক। সমস্ত হিন্দুই গীতা গ্রন্থকে শিরোধার্য্য করে। হিন্দু সমাজে ছত্রিশ জাতি বা ততোধিক জাতি বিদ্যমান। গীতায় মাত্র চারি বর্ণের কথা আছে, এবং সেই চারিবর্ণও জন্মগত নহে, গুণ ও কর্ম্মগত। সুতরাং সর্ব্বজনমান্য গীতার সঙ্গে হিন্দু সমাজ গঠনের কোনও সম্পর্ক নাই। গীতায় ভগবান্ ঘোষণা করিয়াছেন যে প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বর বাস করেন। এইজন্য বৈষ্ণব শাস্ত্রের উপদেশ এই যে "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান"। গীতায় পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল কথা সর্ব্বত্র সমদর্শন। এই সমদৃষ্টি ভুলে খাদুক হিন্দু সমাজে মানুষে মানুষে ঘোরতর বৈষম্য করা হইয়াছে। পরস্পরের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নিম্নবর্ণের উপর ঘোরতর নির্য্যাতনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমাজের প্রতি স্তরে ভেদ বুদ্ধি ও অনৈক্যের প্রাচীর গঠন করা হইয়াছে। গীতাকে অগ্রাহ্য করিয়া অস্পৃশ্যতা মহাপাপের বিধান করা হইয়াছে। হিন্দু সমাজকে একটি বিশাল গজরাজের সহিত তুলনা করিয়া বলা যায় যে পূর্ব্বোক্ত পাপের ফলে এই বিশাল গজরাজের স্বগ্‌ভের অর্থাৎ চর্ম্ম ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

হিন্দু ধর্ম্মের মূলে বিদ্যমান বেদ। কিন্তু বঙ্গদেশে বেদের পঠন পাঠন যৎসামান্য মাত্র। অথবা বঙ্গদেশে বেদের পঠন পাঠন নাম মাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেদের সংস্কৃত ভাষা পৃথক্। তার ব্যাকরণও পৃথক্। তার উচ্চারণ অতীব দুরূহ। পূর্ব্ববঙ্গে বেদজ্ঞ পণ্ডিত অতীব বিরল। সুতরাং প্রায় সমস্ত হিন্দুরই বেদ সম্বন্ধে হিমালয় প্রমাণ অজ্ঞতা বিদ্যমান। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নাই, যে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক সেই ধর্ম্মের মূলগ্রন্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; গীতাগ্রন্থে বেদের শিক্ষার সারভাগ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সেই সারগর্ভ উপদেশের একটি প্রধান কথা এই যে মানুষের মৃত্যু একটি গুরুতর বিষয় নহে। জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণের ন্যায় দেহান্তর একটি সাধারণ ঘটনা মাত্র। গীতার এই মহতী শিক্ষা হিন্দু সমাজের লোকেরা অগ্রাহ্য করিয়াছে। কারণ হিন্দুই মৃত্যুভয়ে ভীত ভীরু বেশী। হিন্দুর বহু লাঞ্ছনা এবং দুর্গতির মূলে রহিয়াছে তার এই গীতা-বিরোধী ভীরুতা। সুতরাং হিন্দুর সমাজ জীবনে গীতার শিক্ষা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। সেইরূপ চণ্ডীর শিক্ষাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।

গীতার পরে চণ্ডীর প্রচারও সর্ব্বাধিক। চণ্ডীর উদাত্ত ঘোষণা এই যে "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলাজগৎসু" অর্থাৎ নারী মাত্রই সেই মহামায়া ভগবতীর অংশ স্বরূপ। । সুতরাং নারী জাতির মর্য্যাদা ও সম্মান বেশী দিতে হইবে। কিন্তু হিন্দুর সমাজ জীবনে ইহার বিপরীত আচরণ দৃষ্ট হয়।

হিন্দুর ভীরুতা এবং অক্ষমতার জন্য যে নারী লাঞ্ছিতা হইয়াছে সেই নারীকে বর্জ্জন করিয়া, তাহাকে নিরুপায় করিয়া বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করিয়া চণ্ডীর অসম্মান করা হইয়াছে। শাস্ত্রে বিধবা বিবাহের বিধান থাকিলেও সমাজ-জীবনে তাহা রহিত করিয়া লক্ষ লক্ষ বিধবাকে পশু করিয়া রাখা হইয়াছে। অক্ষম অনিচ্ছুক নিরুপায় লক্ষ লক্ষ বিধবা কঠোর জীবন যাপনে বাধ্য হইয়াছে। একটি মাত্র তথাকথিত কুলীনের কয়েক শত পত্নী গ্রহণের ব্যবস্থা দ্বারা, রক্ষিতা রাখার মাধ্যমে বেশ্যাপাড়া, দাসীপাড়া বৈষ্ণবী পাড়া এবং অন্যত্র ব্যাপক ভাবে শত সহস্র লক্ষ কোটি ভ্রূণ হত্যার অঘন্য পাপের প্রশ্রয়দানে কেবল যে চণ্ডীর মহতী শিক্ষাকে ব্যর্থ করা হইয়াছে তাহা নহে পরন্তু পূর্ব্ব বঙ্গের নারী জাতির দীর্ঘশ্বাসজনিত অভিশাপে হিন্দুর জীবন জর্জ্জরিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ব্যাপারই পূর্ববঙ্গের হিন্দুর পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত হিমালয় প্রমাণ মহাপাপ। আত্মামানের পত্রলেখক এবং পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য হিন্দু আজ পূর্ব্বপুরুষের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে হিন্দু সমাজ জীবনে অস্পৃশ্যতা পাপ, নিম্ন বর্ণের নির্য্যাতন, বেদবৃদ্ধি, অনৈক্য, ঘৃণা, হিংসাবিদ্বেষ প্রভৃতি দ্বারা হিন্দু সমাজরূপী বিশাল গজরাজের স্বগ্ ভেদ অর্থাৎ চর্ম্ম ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। পূর্বে বর্ণিত নারীজাতির লাঞ্ছনা দ্বারা হিন্দু সমাজরূপ বিশাল গজরাজের অনেক শোণিতস্রাব অর্থাৎ রক্তক্ষরণ হইয়াছে এবং ঐ গজরাজের মাংস ক্রথন অর্থাৎ মাংস খণ্ড বিখণ্ড করণ ঘটিতেছে প্রধানতঃ হিমালয় প্রমাণ তত্তামি দ্বারা এবং গীতার দৈবী সম্পদ অর্থাৎ মানব ধর্ম্ম বর্জ্জন দ্বারা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এত স্বগ্ভেদ, এত শোণিতস্রাব এবং এত মাংস ক্রথন হইলেও বিশাল গজরাজের [হিন্দু সমাজের] কোনও চেতনা নাই। যতই ক্ষতি হউক না কেন হিন্দু সমাজ এই সমস্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার।

শাস্ত্রে এই প্রকার হস্তীর বিশেষ উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে। সেই উপাধির নাম গম্ভীর বেদী হস্তী। শাস্ত্রে ইহার লক্ষণ এই "স্বগ্ভেদাচ্ছোণিতস্রাবান্ মাংসস্য ক্রথনাদপি। আত্মানং যো ন জানাতি তত্ত গম্ভীর বেদিতা॥" অর্থাৎ অঙ্কুশের আঘাতে স্বগ্ভেদ হইলেও, রক্তক্ষরণ হইলেও এবং মাংস ক্রথন হইলেও যে হস্তীর চেতনা থাকেনা পরন্তু নিমীলিত-নেত্রে নিদ্রাসুখ ভোগ করে সেই প্রকার হস্তীকে গম্ভীর বেদী হস্তী কহে। হিন্দুসমাজের সহিত পূর্ব্বোক্ত গম্ভীর বেদী হস্তীর সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

পূর্ববঙ্গের হিন্দুর দুঃখ দুর্দ্দশা ও লাঞ্ছনার বর্ণনা করিয়া যে সিনেমা নাটক লিখিত হইয়াছে সেই বই এর নাম দেওয়া হইয়াছে নতুন ইহুদী। ইহুদী জাতির ও সর্ব্ব বিশ্বে জাতীয় বাস ভূমি নাই। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরও সেই অবস্থা। ইহুদী জাতি যেমন অবাঞ্ছিত জাতিরূপে সর্ব্বত্র অনাদৃত পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুর অবস্থাও প্রায় সেইরূপ। অমর লেখক সেকস্পিয়র ইহুদীকে অমর করিয়াছেন "মার্চ্চেন্ট্স্ অব্ ভেনিস্ গ্রন্থে"। টাকা ধার দিয়া বিপন্নের বুকের মাংস গ্রহণে লোলুপ হিন্দু-ইহুদী পূর্ব্ববঙ্গের বহু জিলায় ব্যাপক ভাবে তার পাপের ব্যবসায়ের বিস্তার করিয়াছিল। পূর্ব্ব-বঙ্গের বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থ জমিদার তালুকদার এই জঘন্য পাপের ব্যবসায়ে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায় করিয়া শত সহস্র অতিবিপন্ন দরিদ্র গৃহস্থকে ধ্বংস করিয়াছে। এই সুদের ব্যবসায়ে যেমন ইহুদীর সহিত পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুর সাদৃশ্য বিদ্যমান তেমন মদের ব্যবসায় এবং মদ্যপানের ব্যাপারেও ইহুদীর সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহাও অধিকাংশে পূর্ব্বপুরুষের পাপ। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম অবস্থায় হিন্দু সমাজে মদ্যপানের জঘন্য ব্যাপার অতি ব্যাপক ছিল। বিবাহ প্রভৃতি শুভ-কার্য্যে এবং পূজা পার্ব্বণে ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানে অত্যধিক মদ্যপান এবং পতিতা নারীর বাইথেম্‌টা নৃত্যগীত সমাজে ব্যাপক ভাবে প্রচলন ছিল। বরযাত্রীরা প্রকাশ্যভাবে মদ্যপান এবং মদের বোতল বগলে করিয়া নির্লজ্জ ভাবে নৃত্য করিত। ইহাই অধিকাংশ পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি কাহিনী।

পূর্ববঙ্গের হিন্দুর পূর্ব্ব পুরুষগণের ধারণা ছিল তাহাদের বুদ্ধিমত্তা, সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব এবং ধার্ম্মিকতার তুলনা নাই। এই মিথ্যা গর্ব্বে এবং অভিমানে ভবিষ্যদ্ বিপদ্ সম্বন্ধে

উদাসীন থাকায় তাহাদের বংশধরগণ বর্ত্তমানে মহাদুর্গতি ভোগ করিতেছে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ পূর্ব্ব বঙ্গের জমিদার ও ধনাঢ্য মহাজনদিগকে নূতন নূতন কাপড়ের কল, অন্যান্য মিল এবং বিভিন্ন শিল্প বাণিজ্যে অর্থ নিয়োগ করিতে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ বিপদের বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। যদি পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের বৃথা গর্ব্ব, মিথ্যা অভিমান এবং হুকের ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া সেই পরামর্শ গ্রহণ করিতেন তবে তাহাদের বংশধরগণ তাহাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং স্বদেশবাসী বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ বিপন্ন হইত না। বরং বিরলা ব্রাদার্স্ প্রভৃতি বাণিজ্য সম্রাটগণের ন্যায় শিল্প বাণিজ্য এবং অন্যান্য স্বাধীন ব্যবসায় ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিতে পারিতেন এবং বহু লোককে আশ্রয় দান করিতে সমর্থ হইতেন।

তাঁহাদের দূরদর্শিতার অভাব, ভোগ বিলাসে জীবন যাপন এবং আড়ম্বরপূর্ণ ধর্ম্মীয় ক্রিয়া কর্ম্ম সম্পাদন প্রভৃতি তাবক ও মোসাহেবগণের পক্ষে খাঁটি মধ্যাহ্ন স্বরূপ ছিল। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁহারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ এমন ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতেন যাহা পরবর্ত্তী যুগে সামাজিক আত্মহত্যা এবং স্বকীয় চরণে কুঠারাঘাতরূপে গণ্য হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাত্র একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। ময়মনসিংহ জিলার গৌরীপুরের কর্ত্তার বার্ষিক আয় বোধ হয় তখন ৮।১০ লক্ষ টাকা ছিল। তিনি বহুগুণ-বিমণ্ডিত ধনাঢ্যতম পুরুষ ছিলেন। সঙ্গীতের চর্চ্চা করিয়া একদিকে ললিত কলার বিস্তারে যেমন খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, অন্যদিকে স্বদেশ হিতৈষণায় বহুদান ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া জনকল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন এবং বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ময়মনসিংহের মহারাজারও তখন বার্ষিক আয় ৮।১০ লক্ষ টাকা ছিল এবং তিনিও বহু টাকা দেশ-হিতকর কার্য্যে, শিল্প বাণিজ্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন। উভয়েই ভোগ বিলাসহীন উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে এক বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য ছিল। গৌরীপুরের কর্ত্তা ছিলেন সনাতনী, কঠোর আচার-বিচার-নিষ্ঠ, রক্ষণশীল এবং ব্রাহ্মণ সভায় সভাপতি-রূপে সমুদ্রযাত্রা ও বিলাত যাত্রার তীব্র বিরোধী। পক্ষান্তরে মহারাজা ছিলেন হিন্দু সমাজ সংস্কারক হিন্দু মহাসভায় সভাপতিরূপে সমুদ্রযাত্রা ও বিলাতযাত্রার পক্ষপাতী এবং নিজে বিলাত ফেরৎ। বিলাত যাত্রার পক্ষে ও বিপক্ষে সেই সময়ে তীব্র আন্দোলন চলিতেছিল। বহুলোক সমাজে সমাজচ্যুত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। মহারাজও সেই লাঞ্ছনা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিলেন না। গৌরীপুরের কর্ত্তার উদ্যোগে ময়মনসিংহ টাউনে দুর্গা-বাড়ীতে ব্রাহ্মণ সভার অধিবেশন আহূত হইল। সভাপতি পদে বৃত হইলেন স্বয়ং মহারাজা। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইলেন খুদং-এ মহারাজা। বহু জমিদার ও বহুশত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সভায় যোগদান করিলেন। এই বিরাট সভায় হিন্দু সমাজের পক্ষে এক সর্ব্বনাশা প্রস্তাব গৃহীত হইল। সেই প্রস্তাবের সারমর্ম্ম এই যে "প্রায়শ্চিত্ত করিলেও বিলাত ফেরৎ সমাজে অচল থাকিবে"। এই প্রকার অযৌক্তিক প্রস্তাব কোনও বিদগ্ধ সমাজে গৃহীত হইতে পারে তাহা বর্ত্তমানে কেহ ধারণা করিতে পারিবে না। এই প্রকারের অদ্ভুত মনোবৃত্তি এবং বিপন্ন নিজ বর্গের উপর নির্য্যাতন লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য ভাষায় গাহিয়াছেন :

"বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে ব'সে
ত্যাগ করে খেতে হবে অন্নপান।"

* * * * *

অপমানে হ'তে হবে তাদের সবার সমান।"

বলাবাহুল্য বিশ্বকবির আর্ষ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছে। কিন্তু গতীয় বেদী হস্তীর ইহাতেও চেতনা হয় নাই। মহারাজা এই অযৌক্তিক প্রস্তাব অমান্য করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। এই অমান্য করার পদ্ধতিতে অভিনব কর্ম্মপন্থা গৃহীত হইল। প্রতি বৎসর শত সহস্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে শারদীয় পূজার পূর্ব্বে তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বহু সহস্র টাকা বার্ষিক বিধায় দক্ষিণারূপে মহারাজার

তহবিল হইতে প্রদত্ত হইত। পূর্ব্বে বিনা সর্ত্তেই উক্ত টাকা প্রদত্ত হইত, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবের পর মহারাজা নিয়ম করিলেন যে অতঃপর নিম্নলিখিত সর্ত্তে ঘোষণায় স্বাক্ষর না করিলে কেহ পূর্ব্বোক্ত বার্ষিক দক্ষিণার টাকা পাইবেনা। সেই ঘোষণার সর্ত্ত এই :—"বিলাত প্রত্যাগত অথচ কৃত প্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তির সহিত ভোজনাদি ব্যাপারে আপত্তি নাই"। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল প্রায় সকলেই উক্ত ঘোষণায় সর্ত্তে স্বাক্ষর দিয়া টাকা গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্যাপারে অপর একটি কৌতুক নাট্যের অভিনয় হইল—পূর্ব্বোক্তভাবে স্বাক্ষরদানকারীগণের মধ্যে অনেকে বিপরীত ঘোষণা করিয়া অপর পক্ষ হইতেও টাকা গ্রহণ করিলেন। বলাবাহুল্য দারিদ্র্যই ইহার মূল কারণ। ধনাঢ্যগণ উহাদের দারিদ্র্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়াছিলেন। কেবল যে মহারাজা ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন তাহা নহে, হিন্দু জনসাধারণও উহা অমান্য করিয়া চলিল। কালক্রমে উহা বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। দেশের যাহারা শিরোমণি, জ্ঞানী, গুণী তাঁহারা কিরূপে অকিঞ্চিৎকর, অযৌক্তিক, অবাস্তব, সমাজধ্বংসকারী কার্য্য-কলাপে নিজেদের শক্তি ও অর্থের অপব্যয় করিতেন তাহা চিন্তা করিলে মন অবসন্ন হয়। এই সামাজিক অত্যাচারের সংখ্যা নির্ণয় দুঃসাধ্য ব্যাপার। কথাশিল্পী সমাট্ শরৎচন্দ্রের লেখনীতে বহু মর্ম্মান্তিক সামাজিক নির্য্যাতনের কাহিনী লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত হইয়াছে। এস্থলে অপর একটি হৃদয়বিদারক সামাজিক অত্যাচারের সত্য ঘটনা বর্ণিত হইতেছে। কোনও গ্রামের কোনও ধনপতির গৃহে আড়ম্বরপূর্ণ উৎসবে সহস্র সহস্র লোকের নিমন্ত্রণ সভায় রন্ধনশালা হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন একটি সতীসাধ্বী ধর্ম্মশীলা প্রৌঢ়া মহিলা। সেইদিন সেই উৎসবের ভোজসভায় হঠাৎ আবিষ্কৃত হইল সেই মহিলার অমার্জ্জনীয় অপরাধ। তাঁর শ্বশুর বাড়ীর বৃদ্ধ পূজনীয় কর্ত্তারা নাকি সেই মহিলার বিবাহের পরে পাকস্পর্শরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন নাই। সেই পূজনীয় কর্ত্তাদের পাপে পূর্ব্বোক্ত উৎসবের ভোজ-সভায় সহস্র সহস্র লোকের সমক্ষে বিতাড়িত হইয়া সেই নারী লাঞ্ছিতা এবং অপমানিতা হইলেন। নানাভাবে লাঞ্ছিতা, অপমানিতা এবং সামাজিক অত্যাচারের দুর্নীতির গভীর পঙ্কে নিক্ষিপ্তা শতসহস্র নারীর দীর্ঘশ্বাস ও অভিশাপে পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত হিন্দু দগ্ধ ও ভস্মে পরিণত হইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? এখন চিন্তা করুন হিন্দুর গৌরবের বেদ-বেদান্ত উপনিষদ্ গীতার উপদেশ কিভাবে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুসমাজে প্রতিপালিত হইতেছে !!

'মানুষের জন্য ধর্ম এবং ধর্মের জন্য মানুষ—দুই-ই সত্য হইতে পারিত যদি ধর্ম বলিতে বিশেষ কোন ধর্ম না বুঝাইয়া সর্বধর্মসমন্বয়ই বুঝাইত। সর্বধর্মসমন্বয়ই মানুষের স্বধর্ম। প্রতি মানুষ এই হিসাবে স্বধর্মী, সর্বধর্মী। .....ইহাও সত্য যে প্রত্যেকটি ধর্মই স্বয়ংপূর্ণ, উহা ঐ সম্প্রদায়ের সকল স্তরেরই আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও তুল্যভাবেই সত্য যে, কোনও বিশেষ দেশ-কাল-পাত্র বা বিশেষ দৃষ্টিকোণের মধ্যে সমগ্র মানবসমাজকে, এমন কি কোনও বিশ্বরূপ ব্যষ্টি মানুষকেও আটকাইয়া রাখা যাইবে না। সব বিশেষত্বকে ছাপাইয়া অখণ্ড বিশ্বরূপ ব্যষ্টি মানব ও মানবসমাজ আগাইয়াই চলিয়াছে, চলিবেও।'

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-কৃত মহাত্মাজীর গঠনকর্ম পদ্ধতি

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

॥ শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

প্রজাসৃষ্টি কামনায় স্বরীমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট সেই, যিনি 'এই' পুরুষে, যিনি 'ঐ' আদিত্য মণ্ডলে—তিনি উভয় স্থলেই এক। যিনি কেহ এবম্প্রকার ব্রহ্মকে জানেন, তিনি অন্নময়কে উপসংক্রমণ করেন, অর্থাৎ সমীপস্থ হইয়া সংক্রমণের ভিতর দিয়া আত্মসাৎ করেন, প্রাণময়কে আত্মসাৎ করেন, মনোময়কে আত্মসাৎ করেন, বিজ্ঞানময়কে আত্মসাৎ করেন, আনন্দময়কে আত্মসাৎ করেন, পুরুষোত্তমানন্দ শরীর প্রাপ্ত হন্। এই বিষয়ে শ্লোক রহিয়াছে।

নবম অনুবাক

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন। ইতি।

যতঃ [যে ব্রহ্ম হইতে] বাচঃ [বাক্যসমূহ ; কি ব্রহ্মাদি বিষয়ক নাম কি ব্রহ্মবিষয়ক নাম সবই ;] নিবর্ত্তন্তে [নিবৃত্ত হয়, সমগ্র নামরূপ লীলার সীমারেখা আঁকিয়া দিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসে] অপ্রাপ্য [সীমায় কোনও ওর না পাইয়া] মনসা সহ [মনের যতখানি গভীর ও বিস্তীর্ণ ব্যাপক শক্তি আছে সব সঙ্গে লইয়াও] আনন্দং ব্রহ্মণঃ [ব্রহ্মানন্দকে] বিদ্বান্ [যিনি জানিয়া] ন বিভেতি [ভীত হন্ না] কুতশ্চন [কোনও কিছু হইতে] ইতি

যাহা হইতে মনসহ বাক্যসমূহ কূল না পাইয়া ফিরিয়া আসে এমন ব্রহ্ম-আনন্দ যিনি জানেন, তিনি কোনও কিছু হইতে ভয় পান না।

এতম্ হ বাব ন তপতি। কিমহং সাধু নাকরবম্। কিমহং পাপমকরবমিতি। স য এবং বিদ্বানেতে আত্মানং স্পৃণুতে। উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মানং স্পৃণুতে। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ ॥৯॥৯

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ।

তম্ হ বাব [কেবল সেই ব্রহ্মানন্দাস্বাদনকারী পুরুষকে] ন তপতি [তাপ দেয় না] কিম্ [কি এবং কেন] অহং [আমি] সাধু [সৎকর্ম] ন অকরবম্ [করি নাই] কিম্ [কি এবং কেন] অহম্ [আমি] পাপম্ [অসৎ কর্ম] অকরবম্ [করিয়াছি] ইতি [এই রূপ অনুতাপ] (৬ষ্ঠ অনুবাকে পুরুষোত্তমের যে সৎ অসৎ বিধা লীলাবিকল্প রূপ প্রকাশ করিয়াছেন, এইখানে তাহারই মীমাংসা দিতেছেন। সৎ যাহার সর্ব্বশেষ বিকাশ,—সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে। ১৭।২৬ ; যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে, কর্ম্মচৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ১৭।২৭—সৎকর্ম এবং অসৎ, যাহার সর্ব্বশেষ বিকাশ অসৎকর্ম পাপকর্ম, সবই পুরুষোত্তম-জীবনে পুরুষোত্তমার্থেই প্রকাশ করে। সাধুকর্ম অসাধুকর্ম্মের সঙ্গেও আনন্দময়ের স্তরে পুরুষোত্তমের সম-সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় সবই পুরুষোত্তম-জীবনে পরিসমাপ্ত হয়। সাধু অসাধুসম্বন্ধে 'কি' এবং 'কেন'র মীমাংসা রসানন্দময় পুরুষোত্তম ; সব কর্ম্মই তখন লীলারস সাগরের এক একটী হিল্লোল) [সঃ যঃ [সেই যিনি] এবং বিদ্বান্ [পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে পুরুষোত্তমার্পিত সাধু কর্ম্মের সহিত 'কাব' বস্তুর সাক্ষাৎ যোগ, অসাধু কর্ম্মের সহিত রসবস্তুর সাক্ষাৎ যোগসম্বন্ধে বিদ্বান] এতে [এই সাধুকর্ম ও পাপকর্ম] আত্মানং [আপনাকে, ব্রহ্মানন্দকে] স্পৃণুতে [প্রীত করেন, ঘেনাইয়া তোলেন, উদ্বেলিত করেন ; সাধুকর্ম পুষ্ট করে

জীবনের নিস্তরঙ্গ অবস্থাকে, অসাধুকর্ম উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত করে ঐ রস-সাগরকে] উভে হি এতে [সাধু অসাধু এই উভয় কর্মাত্মক] আত্মানম্ [আত্মাকে] এবঃ এব [ইনিই] য স্পৃণুতে [সর্বাত্মস্বরূপ আনন্দরসে ফুটাইয়া তোলেন] যঃ [যিনি] এবং বিদ্বান্ [এইরূপ জানেন] ইতি উপনিষৎ [গুহ্যতম ব্রহ্মবিদ্যা ; কমলা-কান্তেরি মনে আশাপূর্ণ এতদিনে। সুখ দুঃখ সমান হল, আনন্দ সাগর উথলে ॥

'আমি কোন্ সৎকর্ম কেন করি নাই, কোন্ অসৎ কর্ম কেন করিয়াছিলাম'—এইরূপ চিন্তা ইহাকে তাপ দেয় না। যিনি এইরূপ জানেন, এই সাধু অসাধু কর্ম আত্মাকে উত্তেলিত করে ; কারণ যিনি এইরূপ জানবান্, তিনি সাধু-পাপকর্মাত্মক আত্মাকে সর্বাত্মস্বরূপ আনন্দরসে ফুটাইয়া তোলেন।

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি ॥

তৃতীয় ভৃগুবল্ল্যধ্যায়

প্রথম অনুবাক

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ—অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—অ১

[অতঃপর ব্রহ্মজ্ঞানী সংসারী পিতা বরুণ পুত্র ভৃগুকে ব্রহ্মবিদ্যার সাধন তপস্যা এবং অন্নাদি সব বস্তুকে ব্রহ্ম ভাবে ভাবিত দেখিয়া জীবনে সম্যকরূপে আত্মসাৎ করিবার কৌশল শিখাইতেছেন] পিতা পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন—ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়] ভৃগুঃ বৈ [ভৃগুনামে প্রসিদ্ধ] বারুণিঃ [বরুণ পুত্র] বরুণং পিতরম্ [পিতা বরুণের] উপসসার [সমীপে উপস্থিত হইলেন] অধীহি [অধ্যাপয়—অধ্যাপন করুন] ভগব [হে ভগবন্] ব্রহ্ম [ব্রহ্ম] ইতি [এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] তস্মৈ [পুত্রের প্রতি] এতৎ [এই কথা] প্রোবাচ [বলিলেন] অন্নং [অন্নময় শরীর] প্রাণং [প্রাণ] চক্ষুঃ [নয়ন] শ্রোত্রম্ [কর্ণ] মন [অন্তঃকরণ] বাচম্ [বাগিন্দ্রিয়] ইতি [এই সকল] (ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার বলিলেন) তং [সেই ভৃগুকে] উবাচ হ [আরও বলিলেন] যতঃ বৈ [যাহা হইতেই] ইমানি [এই সমস্ত] ভূতানি [ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত সর্বভূত] জায়ন্তে [জন্মে] যেন [যাহার দ্বারা] জাতানি [জাত হইয়া] জীবন্তি [বাঁচিয়া থাকে, বাড়ে] যৎ [যাহাকে] প্রয়ন্তি [গমন করে] অভিসংবিশন্তি [প্রবেশ করে, তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়] তৎ [তাহাকেই] বিজিজ্ঞাসস্ব [বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর] তৎ [তিনি] ব্রহ্ম [ব্রহ্মনাম বাচ্য] ইতি। সঃ [তিনি, ভৃগু] তপঃ অতপ্যত [তপস্যায় রত হইলেন] মনসশ্চেন্দ্রিয়াণা-মৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ। তস্মাৎ সর্বধর্মেভ্যঃ স শ্রেষ্ঠ পদ উচ্যতে॥ হংসীর বুকের 'তাপ' পাইয়া যেমন ডিম নিজের মধ্য হইতে নিজেই ফুটিয়া বাহির হয়, ঠিক তেমনি গুরুদেবাত্মা শিষ্যও গুরু-দেবতার কৃপাঘন 'তাপে' নিজের অন্তর্নিহিত পুরুষোত্তম সত্যচৈতন্যানন্দ লইয়া ফুটিয়া উঠিতে থাকেন। ভৃগুও গুহাপ্রদেশে নিদ্রিত পুরুষোত্তম আর গুরু-দেবতার তাপে জাগিয়া উঠিতেছেন। শ্রুতি তাহারই বর্ণনা অপূর্ব ঘনালঙ্কারে বর্ণনা করিতেছেন। গুরু-দেবতার বুকের তাপই শিষ্যের জীবনে তপস্যা।] সঃ তপঃ তপ্ত্বা [তপস্যা করিয়া]

বরুণ পুত্র ভৃগু পিতা বরুণের নিকট উপনীত হইলেন, বলিলেন, হে ভগবন্, ব্রহ্ম অধ্যাপন করুন। তাহাকে এই কথা বলিলেন—শরীর, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও বাক্ (ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার)। আরও বলিলেন—যাহা হইতে এই ভূতসমূহ জন্মে, জন্মিয়া যাহাদ্বারা জীবিত থাকে, বর্দ্ধিত

হয় এবং যাহাতে সব প্রাপ্ত হয়, তাদাত্ম্যভাবে প্রাপ্ত হয়, তাহাকে জানিতে ইচ্ছুক হও। তিনিই ব্রহ্ম। তৃতীয় তপস্যানিরত হইলেন এবং তপস্যা করিয়া।

অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—॥ ৩২

অন্নম্ [স্থূলদেহের হেতুভূত বিরাটনামক ভূতপঞ্চক] ব্রহ্ম ইতি [ব্রহ্ম বলিয়া] ব্যজানাৎ [জানিলেন; আপনা আপনি ভিমের ফুটিয়া যাওয়ার মত প্রতি স্তর স্বয়ং পূর্ণ, তাহাই এই ময়সমূহের ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্ন বিস্তীর্ণ, অন্ন গভীর, অন্ন নিজের মধ্যেই নিজে পূর্ণ। অন্ন ব্রহ্মের প্রতীক নয়। অন্ন ও ব্রহ্মের তাদাত্ম্যই গ্রহণ করিতে হইবে, দেহ দেহীর ভেদ পুরুষোত্তমে নাই। অন্ন দেহ, ব্রহ্ম দেহী। অন্ন ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্যই শ্রুতি প্রতিপাদিত সত্য। হি [যেহেতু] অন্নাৎ এব খলু [অন্ন হইতেই] ইমানি ভূতানি [এই ভূতপঞ্চক] জাতানি অন্নেন [অন্ন-দ্বারাই] জীবন্তি; অন্নম্ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি ইতি। তৎ [অন্ন ব্রহ্মকে] বিজ্ঞায় [বিশেষরূপে বিবিধভাবে জানিয়া। অন্নের ব্রহ্মরূপ জানিয়াও তৃতীয় সাধ মিটে নাই, অন্নই তাহাকে প্রাণাদি তত্ত্বের প্রেরণা জাগাইয়া দিয়াছে। অন্নের বুকের মধ্যে যে কত কি রহস্য লুকাইয়া রহিয়াছে—তাহা টের পাইলেন। অন্ন-প্রাণ-মনোময়াদি কোশ-সমূহ তো অন্যোন্যসক্ত এবং অনবিপ্রযুক্ত। অন্নকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে আঁকড়াইয়া ধরিলে অন্নের সঙ্গে সঙ্গে সবই সাধকের সামনে নিজ নিজ রহস্য উদ্ঘাটন করিবে। সমস্ত কোষই অন্নের বিবিধ রূপ, অন্ন অন্নাদ এক রস] পুনঃ এব [পুনরায়] বরুণং পিতরং [পিতা বরুণের] উপসসার [সমীপে উপনীত হইলেন] অধীহি ভগবো ব্রহ্ম ইতি। তং হ উবাচ [তাহাকে বলিলেন] তপসা [তপস্যা দ্বারা; পিতা-গুরু পুত্র-শিষ্যকে আত্ম শক্তির উদ্বোধন দ্বারাই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার পথ খুলিয়া দিতেছেন; গুরু দেন প্রেরণা, পথ চলিবার শক্তি, শিষ্যকে সেই প্রেরণা বুকে লইয়া চলিতে হইবে নিজের শক্তিবিকাশ সহকারে সমস্ত অন্তঃকরণ বৃত্তিকে প্রেরণাময় করিয়া ধ্যান বৃত্তিতে পরিণত করিয়া। গুরুশিষ্য একাত্মা হইলেই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা সম্ভব। আত্মৈব আত্মনঃ বন্ধুঃ—আত্মা অর্থ জিজ্ঞাসু ও গুরু দুই-ই। একাকী গুরু বা একাকী শিষ্য কিছুই পারেনা। শিষ্য যদি গুরু-প্রেরণাকে আত্মশক্তির মাঝে বীর্যরূপে ধারণ না করে প্রেরণা ব্যর্থ; পক্ষান্তরে প্রেরণাহীন পথ চলাও শ্রমই শুধু।] ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসস্ব [ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর] তপঃ ব্রহ্ম ইতি [তপস্যাই ব্রহ্ম] স তপঃ অতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—

অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন, কারণ অন্ন হইতেই ভূতসমূহ জন্মে, অন্নদ্বারাই জীবিত থাকে, অন্নেই গমন করে, বিলীন হয়। ইহা জানিয়া পুনরায় পিতা বরুণের নিকট উপনীত হইলেন, বলিলেন 'হে ভগবন্, ব্রহ্ম অবগত করুন'। তাহাকে বরুণ বলিলেন—তপস্যার দ্বারাই ব্রহ্মকে বিশেষ ভাবে বিবিধরূপে জানিতে ইচ্ছা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম। তৃতীয় তপস্যায় রত হইলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—। ৩২

প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা—৪ ৩৩

ইতি ভৃগুবল্ল্যাম্ তৃতীয়োঽনুবাকঃ।

প্রাণঃ [প্রাণ, বিরাটের কারণ ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ] ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ [ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন, সমস্ত ক্রিয়াকে বিস্তারে এবং গভীরতায় বিষয়কর্মে পরিণত করিলেন] প্রাণাৎ হি এব খলু [কেননা প্রাণ হইতেই নিশ্চিতভাবে] (অবশিষ্ট অংশ পূর্বের ন্যায়)

প্রাণই ব্রহ্ম ইহা জানিলেন। কারণ প্রাণ হইতেই নিশ্চিতভাবে এই ভূতসমূহ জাত হয়। প্রাণের দ্বারাই

জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয়, প্রাণেই গমন করে ও লীন হয়। ইহা জানিয়া তিনি পুনরায় পিতার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—হে ভগবন্, ব্রহ্ম অধিগত করান। তাহাকে বলিলেন—তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষ ভাবে জানিতে ইচ্ছা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম। ভৃগু তপঃ অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—

মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনসো হ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা।—৩।৪

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং চতুর্থোঽনুবাকঃ।

মনঃ [মন, সঙ্কল্পশক্তিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ] ব্রহ্ম [ব্রহ্ম]—অবশিষ্ট অংশ পূর্ব্বের ন্যায়।

মন ব্রহ্ম ইহা জানিলেন। কারণ মন হইতেই এই ভূতবর্গ জাত হয়। জাত হইয়া মনের দ্বারা বৃদ্ধিপায়, অন্তকালে মনের অভিমুখে গমন করে ও বিলীন হয়। ইহা জানিয়া ভৃগু পুনরায় পিতা বরুণের নিকট উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্, ব্রহ্ম অধিগত করান। বরুণ তাহাকে বলিলেন—তপস্যা সহকারে ব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম। তিনি তপঃ অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—

বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা।—৩।৫

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং পঞ্চমোঽনুবাকঃ।

বিজ্ঞানম্ [বিজ্ঞানই ; (science and art) ; বিশেষ যা কিছু গতিশীল ও চঞ্চল, সেই সব সম্বন্ধে বিবিধ ও বিপরীত জ্ঞান, কলাবিজ্ঞান—যে বিজ্ঞান প্রাকৃত শক্তির (Natural forces) প্রতি স্পন্দনের মুক্ত ক্রীড়ন আস্বাদন করে, তাহাই যথার্থ কলা বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞান তাহারও মূল্য দান করে যাহা বাহিরের দিকে রূপবান্ হইয়া ফুটিয়া উঠে (outwardly embodied)] ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ [ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছেন]। বিশ্বের সব প্রাণনই যে মুক্তক্রীড়ন, কেবল যান্ত্রিক ব্যাপার (mechanical) নহে, এই বিশ্ব-প্রকৃতি যে মুক্তিরই আস্বাদন ক্ষেত্র ইহাই বিজ্ঞানময় কোশের নিজস্ব দান। এই কলা বিজ্ঞান বুকে করিয়াই সর্ব্বভূত জনম পাইয়াছে। এই কলার সাহায্যেই সর্ব্বভূত বাড়িয়া চলিয়াছে এবং এই ছন্দ বজায় রাখিয়াই ইহার মধ্যে আত্মগোপন করিতেছে :

বিজ্ঞানই ব্রহ্ম, ইহা জানিলেন। কারণ বিজ্ঞান হইতে এই ভূতবর্গ জাত হইয়াছে। জাত হইয়া ইহা যাহাই বাড়িয়া চলিয়াছে, বিজ্ঞানেরই দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং লীন হইতেছে। ইহা জানিয়া পুনরায় পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া, বলিলেন, হে ভগবন্ ব্রহ্ম অধিগত করান। তাহাকে বরুণ বলিলেন—তপস্যা সহায়ে ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম, তিনি তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা। পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা ॥ ৩।৬

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং ষষ্ঠোঽনুবাকঃ।

ক্রমশঃ

সাময়িকী

প্রতিবাদ—শ্রীমন্মহাপ্রভু কি বস্তু?—

১৩৪২ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে একচল্লিশ বৎসর আগে 'উজ্জ্বল-ভারত' ও 'নরনারায়ণ আশ্রম'-প্রতিষ্ঠাতা, বর্তমান কালে বেদান্ত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও এগারখানা প্রধান উপনিষদের অনুবাদ-ভাষ্য রচয়িতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ যা লিখেছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু কি বস্তু তার উত্তরে তাই-ই এখানে উদ্ধৃত করে উত্তর দিচ্ছি—

"শ্রীশ্রীদোলপূর্ণিমা বাঙ্গলার জন্মগীতি গাইবার তিথি। বৃন্দাবনের পোষ-ঘন তরল আবির-রাগরঞ্জিত দোললীলা-আবর্তের মাঝে রসিক ভাবুক বাঙ্গালী সত্তা বাংলা নিজেকে পেয়েছে, বিশ্বকে চিনেছে ও তাদের মিলন-সৌধা সকল দেহপ্রাণে অনুভব করেছে; সে আজ তাই জগতের মৈত্র, হরি-দেবতা, অন্নদা। 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি'—এই উপনিষদ্ মন্ত্রকে কার্যকরী মূর্তিতে ফুটিয়ে তুলে যে বাঙ্গলা ঘরের সন্ধ্যা আরতিতে, বাইরের রাজপথের খোলকরতাল সহ উদ্দণ্ড নাম কীর্তনে, মুমূর্ষুর শিয়রে মহাযাত্রার প্রাক্কালে 'হরেরাম হরেরাম' ধ্বনিতে ও শ্মশান যাত্রায় 'হরিবোল' 'হরিবোলের' রবের উচ্চ-কীর্তনে ধনী নির্ধন, কুলীন অকুলীন, পণ্ডিতমূর্খ, চণ্ডালব্রাহ্মণ সম্মিলিত মহা মহোৎসব আজও আস্বাদন করছেন; 'রসো বৈ সঃ'-মন্ত্রের উজ্জ্বল কার্যকরী আস্বাদন যে বাঙ্গলার তরলতা, দর্শনসাহিত্য, কাব্য অলঙ্কার ইতিহাস তার বুকের ভিতর অনুভব করছে, সে বাঙ্গলাকে যে বিশ্বের বুকে বিশ্বরাজ মূর্তিতে দাঁড়াতে হবে তাতে আর বিচিত্রতা কি?.....রাগ সাধনায় যে উজ্জ্বল পথ বাঙ্গলা দেশের 'স্বর্ণরেণু' বুকে হাসিখেলা, নাচগান, কেঁদে গড়াগড়ি দেওয়ার ভিতর দিয়ে অঙ্কিত হয়ে আছে, উজ্জ্বল রসসাধনায় যে মূর্তিমতী-নয়ন ধারা মহামানবের অন্তরাত্মাকে বিধিমার্গের শুষ্কনো বেদবৃত্তিসহল কামমার্গ হতে উদ্ধার করে অনুরাগের শীতল ছায়ায় কণ্টকিত করছে, যে উজ্জ্বল সাধনা দুনিয়ার সকল ছোট, সকল বেঁচে, সকল উপেক্ষিতকে ব্রহ্ম-কোল দিয়ে বিশ্ব-মেলায় তাদের স্ব স্ব স্থানে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা হবার লালসা জাগিয়ে তুলেছে, যে রসরাজমূর্তি অন্তরের ঐক্য, অন্তরের সন্ন্যাস-গৈরিকে অন্তরেই আবৃত রেখে বাইরে মহা ভাবোজ্জ্বল নৃত্যগীতকলা চাতুর্যময়ী প্রকৃতির ভাববিলাসকে অনন্ত ধারায় প্রকট করছেন, তিনিই গৌর্মাসীর হৃদয়-নিংড়ান ধন, বিশ্বের 'পুণমির চাঁদ' সকল দোলনের কৌস্তুভ মণি বাঙ্গলার সহজ মানুষ শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীগৌর-স্পর্শে বাংলা আজ 'সোনার বাংলা'। গৌর আসবার পূর্বে বাঙ্গলার গরব করবার মত কিছু ছিল কি? সে যে ছিল 'পতিত'। পতিত বাঙ্গলাকে 'পাবন' মূর্তিতে কে জগতের সামনে উঁচু করে তুললে? সে যে আমার গৌর গো, সে যে আমার গৌর; এমন গৌর কার আছে বলতে পার কি? কার পাদস্পর্শে বাঙ্গলার মলিনতা উজ্জ্বলতায় ফুটে উঠল, জান কি? যার প্রসাদে বাঙ্গলা আজ বিশিষ্ট কিছু, তাঁর খোঁজ না করলে যে বাংলাকে আত্মঘাতী হতে হবে। বাঙ্গলার সকল ঋদ্ধি, সকল সিদ্ধি, সকল মুক্তি শ্রীগৌর। বাঙ্গলার দর্শনসাহিত্য ধর্ম কর্ম, কাব্য অলঙ্কার, মীমাংসা ন্যায়, গানবাদ্য, নাটক অভিনয়, পদাবলী, খোল করতাল, নয়নের বারি ও হৃদয়ের কমনীয়তা এক কথায় বাঙ্গালীর 'বাঙ্গালী হওয়া'টাই শ্রীগৌরাঙ্গের দান। বাঙ্গলার ধরাও শ্রীগৌরাঙ্গ। বাঙ্গলা শ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীগৌরাঙ্গদেবই বাঙ্গলা। নৃসিংহ-ধারা, রাম-ধারা, কৃষ্ণ-ধারা ভারতের সকল নগর-প্রান্তর প্রেম প্লাবনে ভাসিয়ে বাঙ্গলায় গৌরধারা মূর্তিতে ঘনীভূত। সোনার গৌরস্পর্শে বাঙ্গলার আজ সব

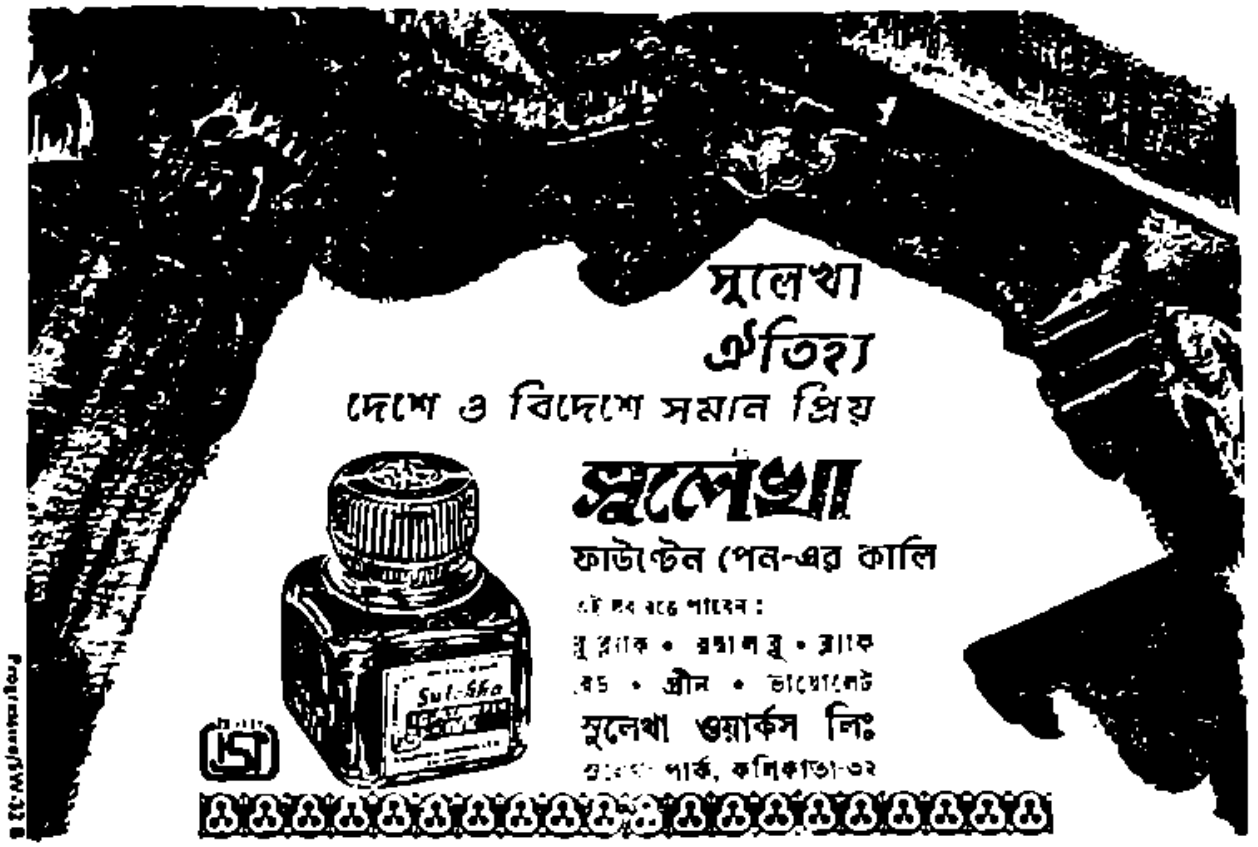

Phone : 23-9990
23-2428

With best Compliments

S. K. KAHANSONS & CO.

29, Waterloo Street,
Calcutta-1

Ask for :

Lime, Lime Stones, Coal, Fire bricks
&
Other Materials

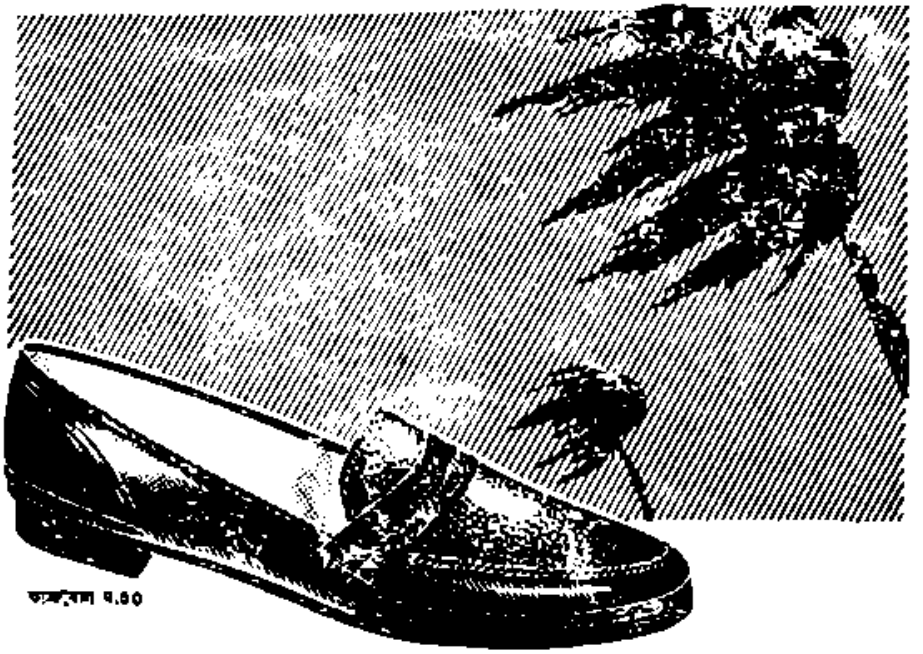

বরষার পথে ভরসা

বৃষ্টি ধোয়া পথে সমস্যা শুকনো পায়ে চলা। এই সমস্যার সমাধান বাটার ওয়াটারপ্রুফ জুতো।
এই ধরনের জুতোর প্রয়োজন উপযুক্ত ডিজাইন, যাতায় জুতোরা তা পাবেন। আরামের জন্য
জালি কাপড়ের লাইনিং। সেল অন্য হিল-এ এমন নকশার কোথাও
যা পায়ের সঙ্গে মানাবে না। তাছাড়া, ফ্যাশনের ছন্দ...জলে ভিজুক, কাদা লাগুক,
এবারে বৃষ্টিই হোক সুখের দিনের ঘরোয়া আলোচনা, বিষয়বস্তু।

Bata

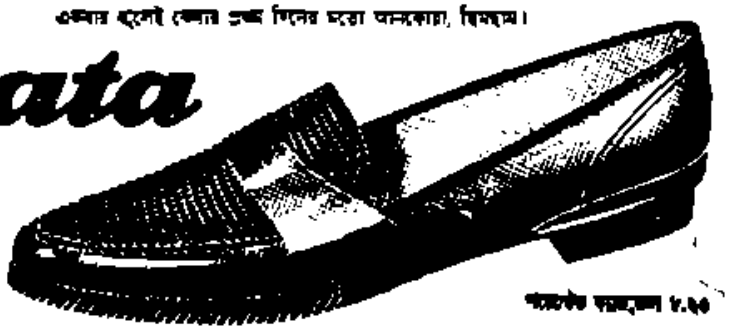

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০
কর্মবাণী	১·২৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
Soul of India Speaks	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	২·২৫

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার বিদুষী	১·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
জীবন গড়া	৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি টি

সাহিত্যের গল্প	
বিদ্যাসাগর	

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান **ব্যবহারিক শব্দকোষ** ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী :: ১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা-১২

॥ গান্ধী স্মারক নিধির বই ॥
বাহির হইল

সর্বোদয়ের পথ

বর্তমান ভারতের নানাবিধ সমস্যার উপরে বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতৃবর্গের প্রদত্ত ভাষণের সংকলন। সর্বোদয় আদর্শের স্বরূপ আলোচনার মধ্যে নিপুণ-ভাবে ব্যাখ্যাত। মূল্য—৩·০০

*

মহাত্মা গান্ধী বিরচিত

মোহনমালা

সারা বৎসরের জন্য গান্ধীবচনের জপমালা

মূল্য—৩·৫০

*

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রণীত

মহাত্মাজীর গঠনকর্ম-পদ্ধতি

গান্ধীজীর ১৮ দফা রচনাত্মক কার্যসূচীর দার্শনিক বিশ্লেষণ। মূল্য : ৩·০০

*

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

মহাত্মা গান্ধী

লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতিমণ্ডিত জীবনী

মূল্য—৬·৫০ (কাপড়ে বাঁধাই) ৫·৫০

*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

গান্ধীজীর অর্থ নৈতিক দর্শন

মূল্য—৫·৫০

অন্যান্য বইয়ের তালিকার জন্য লিখুন

প্রকাশন বিভাগ,
গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)
১২ডি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

গ্রন্থ সমালোচনা

অজানার কথা

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত কাব্যতীর্থ প্রণীত

মূল্য একটাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—হাওড়া কদমতলা

গভর্নমেণ্ট ব্লক বি, রুম নং ১৪ এবং

সংস্কৃত বুক ডিপো—বিধান সরণী, কলিকাতা।

বহু মনীষী কর্তৃক প্রশংসিত এই 'অজানার কথা'য় গীতা চণ্ডী সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব মৌলিক গবেষণা ছাড়া পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান হওয়ার মূল কারণ বিবৃত হইয়াছে। এত ক্ষুদ্র পুস্তকায় এত গভীর জ্ঞানের কথা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। ইহাতে গতানুগতিক চর্বিত চর্বণ নাই। গ্রন্থকারের কোন কোন লেখা উজ্জলভাষতে মুদ্রিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে পুতনা লেখাটী এই পুস্তকে কৃপা-বহুস্যনামে লিখিত হইয়াছে, উজ্জলভারতে সেই সময় স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ উহার প্রশংসা করিয়াছেন।

'অজানার কথা'য় বহু জানার কথা আছে।

সূচীপত্র, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৭২, ১৮৮৭

১। প্রার্থনাকালীন ভাষণ (৬২) ৩৩
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত
সিগমুণ্ড ফ্রয়েড ৩৬
শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়
৩। রবীন্দ্র স্মরণে ৩৯
শ্রীসুনীতি চক্রবর্তী
৪। আমাদের কয়েকটি সমস্যা ৪১
শ্রীআত্মা শেঠ
৫। সিদ্ধান্ত দর্শন (পূর্বানুবৃত্তি) ৪৬
শ্রীনিত্যগোপাল
৮। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (৫৪) ৪৮
১৯৫৩
পরলোকে জিতেন্দ্রনাথ কুশারী ৫৬
শ্রীনীরোদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
৮। গভীর-বেদী ঋষী ৫৭
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ
৯। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ (পূর্বানুবৃত্তি) ৬২
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত
১০। সাময়িকী : প্রতিবাদ ৬৬

দোনা।...শ্রীগৌর সব সম্প্রদায়ের, কারও একচেটে সম্পত্তি নন। গৃহে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, অর্থনীতিতে, ধর্মনীতিতে চলছে যে শোষণের তাণ্ডব লীলা, শ্রীগৌরাঙ্গ সেখানে মূর্তিমান যম।...মহাপ্রভুই আমার রাষ্ট্রগুরু, ধর্ম-গুরু, সমাজ-গুরু।...বাঙ্গলার যুক্তিশাস্ত্র ও বাঙ্গলার ইতিহাস যুগল হয়ে শ্রীগৌরকে প্রতিপন্ন করছে; বাঙ্গলার মাপকাঠি তাই শ্রীগৌর।...'সর্বধর্মময় প্রভু স্থাপে সর্বধর্ম'—শ্রীচৈতন্যভাগবত। পরিবার-ধর্ম, সমাজ-ধর্ম, জাতীয় ধর্মকে সার্বভৌমক্ষেত্রে মধুর রসাল করে সর্ব সাধারণের আস্বাদন-যোগ্য সাধন পন্থা বের করছেন এই বাঙ্গলার ঘরের ঠাকুর।...”—

এই হলেন অতি সংক্ষেপে শ্রীমন্মহাপ্রভু। অধুনা শ্রীমন্মহাপ্রভু তথাকথিত আধুনিক পণ্ডিতদের কাছে যেভাবে প্রতিপন্ন হয়েছেন, তারই একটি বেদনাদায়ক অবস্থা আজ চলছে। ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেনের 'ইতিহাসে শ্রীচৈতন্য' গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে রূপে চিত্রিত হয়েছেন তাতে বেদনাতুর হয়ে বন্ধুবর শ্রীকৃষ্ণদাস সাহা যা লিখে পাঠিয়েছিলেন, এখানে তা উদ্ধৃত করলাম। বাঙ্গলা তার 'গৌরে'র অসম্মানে শুধু বাক্য দিয়ে নয়, জীবন দিয়ে গর্জন করে উঠুক—এই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীকৃষ্ণদাস লিখছেন—

'ঐতিহাসিক-সুলভ বৈশিষ্ট্যসমূহ জলাঞ্জলি দিয়ে ইতিহাসের নামে যে অপকর্ম করেছেন সংস্কৃত কলেজের অমূল্যচন্দ্র সেন তার নিন্দা করবার ভাষা আমাদের নেই। 'ইতিহাসে শ্রীচৈতন্য' নামক কুখ্যাত পুস্তকে মানবত্রাতা শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ ও তাদের পার্ষদদের সম্পর্কে তিনি যে সকল উক্তি করছেন, তাতে মানবসমাজের কাছে ঘৃণাই তাঁর প্রাপ্য হওয়া উচিত। মানবতার অপমানে কেঁদে ফেলতেন যিনি, প্রেমধর্ম প্রচার করে অহিংসু হিন্দু সমাজকে যিনি দিলেন নতুন প্রাণ, যাকে কেন্দ্র করে দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি রাজনীতিতে সূচনা হল নব-যুগের, অধম পতিতকে হৃদয়ের মাঝে আঁকড়ে ধরেছেন যিনি, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রে কলঙ্কলেপন করার প্রয়াসী হন যারা তাঁরা শুধু বাঙ্গালীর শত্রু নন, সমগ্র মানবসমাজের শত্রুও তাঁরা। তাঁদের এই অপকর্ম শুধু কু-উদ্দেশ্য প্রণোদিতই নয়, হীন চক্রান্তের বেড়াজালে কলঙ্কিত। আনন্দের কথা, এই হীন-উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে দেশবাসী। আর এই প্রতিবাদের নেতৃত্ব নিয়েছেন অধ্যক্ষ শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, শ্রী অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, শ্রীরমাপ্রসাদ মুখার্জী, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী, শ্রীঅশোককুমার সরকার প্রমুখ সুধীমণ্ডলী।

বিলম্বে হলেও সরকার পুস্তকখানাকে বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষণা করেছেন। সে জন্যে সরকারের উদ্দেশ্যে আমরা অভিনন্দন জানাই। বাজেয়াপ্তের সমর্থনে যে মন্তব্য করা হয়েছে সরকারী গেজেটে তাকে কিন্তু আমরা সমর্থন করতে পারি না। সেখানে বলা হয়েছে—ভারতের বৈষ্ণবদের ধর্ম-বিশ্বাসকে ইচ্ছাপূর্বক আঘাত দেওয়া হয়েছে এ পুস্তকে। মানবতার অথচ পূজারী শ্রীগৌরাঙ্গ শুধু ভারতের বৈষ্ণবদের হৃদয়ের দেবতা নন, ফলে তাঁর চরিত্রে কলঙ্কলেপনের প্রতিবাদে শুধু বৈষ্ণব-সমাজই ক্ষোভ প্রকাশ করেনি, অন্যান্য সুধীজনও এগিয়ে এসেছেন এ প্রতিবাদে। তাই দেখি, আশুতোষ কলেজ হলে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভার অন্যতম আহ্বায়ক ছিলেন ভিন্নু জিনরত্ন মহা খেয়া এবং সেই সভায় তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন খৃষ্টান ধর্মযাজক রেভাঃ সন্তোষকুমার বিশ্বাস। মানবতা পূজারীর অসম্মানে মানব সমাজই ব্যথিত।

আমরা যতদূর জানি, লেখক ও প্রকাশকের শাস্তি আজও হয়নি। অপরাধীর শাস্তি অবশ্যই প্রাপ্য অন্যথায় অপরাধীর অপরাধের মাত্রা বাবে বেড়ে। ভবিষ্যতে এরূপ অপকর্মের প্রয়াসী যাতে কেউ না হয় সে শিক্ষা জন্যেও তাঁদের শাস্তি হওয়া উচিত। তাই আমরা যদি কণ্ঠে সরকারের কাছে দাবী জানাই—লেখক প্রকাশকে শাস্তি চাই, সংস্কৃত কলেজ থেকে তাঁর পদচ্যুতি চাই প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্রের কলেজের অমূল্যমুক্ত তিনি দেশের সমস্ত পত্র-পত্রিকা ও সকল সভা-প্রতিষ্ঠানে উদ্দেশ্যে আমাদের আবেদন—এই পুস্তকের প্রতিবা

করুন আপনারা, লেখক প্রকাশকের শাস্তির দাবী তুলুন। প্রেম-প্রীতি করুণাপূর্ণ মানব ধর্মের প্রচারকই শুধু ছিলেন না শ্রীগৌরাঙ্গ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের পথ বেছে নেওয়াও তাঁর শিক্ষার অঙ্গ। লেখক ও প্রকাশকের শাস্তি না হলে আন্দোলনের পথ ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না আমাদের।

হিন্দুধর্মের উপর কোন আঘাতের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ—এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়েছে পরিষদের প্রয়াগ সম্মেলনে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখার্জী মহাশয়ের উদ্দেশ্যে আমাদের আবেদন বিষয়টির প্রতি পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। আততায়ীর কলেজ হলে অনুষ্ঠিত সভায় যদিও ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি তবুও এই অপকর্মের প্রতিবাদ হওয়া উচিত সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে। কারণ, শ্রীগৌরাঙ্গ শুধু বাংলার প্রাণের ঠাকুর নন, সমগ্রভারত তথা পৃথিবীর হৃদয়ের দেবতা তিনি।'

হরিদাসবাবুর বেদনার সঙ্গে বেদনা মিলিয়ে আমরা যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরাট ব্যক্তিত্বকে বুঝতে শুধু বুদ্ধির সাহায্য নিতে চলবে না, প্রাণের সাযুজ্যের কণামাত্রও যদি থাকে তা বলেই শুধু আমরা তাঁকে বুঝবার চেষ্টা করতে পারি, বুদ্ধির খোঁচায় তাঁকে মন্দ প্রমাণিত করলে তাঁর কিছু হবে না, কিন্তু মহৎকে, বিরাটকে বুঝতে না পেরে নিজেদের যে আমরা হীন করে ফেলছি, ভগবান আমাদের সে হীনতা থেকে রক্ষা করুন।

"অনাদি প্রাণের মন্ত্র
তোমার নব কিসলয়ের মর্মে এসে মেলে—
বিশ্বহৃদয়ের সেই আনন্দমন্ত্র—
'ভালোবাসি'।
↑ ↑ ↑ ↑
ঊর্ধ্বলোক থেকে কানে আসে সৃষ্টির শাশ্বত বাণী
'ভালোবাসি'।
↑ ↑ ↑ ↑
জীবনের শেষ বাণীতে হ'ক উদ্ভাসিত—
'ভালোবাসি'।"

—রবীন্দ্রনাথ

সংসার কাহাকেও বাধা দেয় নাই, সংসার সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা, মিথ্যা বিভীষিকাই আমাদের বাধা দিতেছে।...বিশ্বকে ভালবাসাই যে সংযম, ব্রহ্মচর্য; অথচ এ ব্রহ্মচর্যে শুষ্কতা নাই; যে অর্থে "নিরোধ" আমরা বুঝি, সে নিরোধও নাই। উপনিষদ্ বলিয়াছেন--অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিতে হয়, "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা" সংসার বিচরণই মরণ জয়। যারা অবিদ্যার ক্ষেত্র হইতে ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে সরাইয়া লইবার জন্য কাম ক্রোধের সঙ্গে কুস্তি করিল তাহারা লৌকিক চক্ষে ধড় ব্রহ্মচারী হইলেও পুরুষোত্তম-রাজ্যে "মরা" সন্দেহ নাই। সংসারময় জীবন ছড়াইয়া না দিলে লক্ষ বৎসরেও ব্রহ্মচর্য্য বজায় থাকিবে না। চিত্তকে সংসার হইতে গুটাইয়া লইতে চাহিলেই সে বিদ্রোহ করে, তখন তাহাকে নিরোধ করার চেষ্টা ব্যর্থ। খাইতে পরিতে না দিয়া কাহাকেও পোষ মানানো যায় না: ইন্দ্রিয়ের খাদ্য স্বরূপ ও বিশ্বরূপ। তুমি যদি বিশ্বরূপের খাদ্য দিবে না, সে মরিবে বটে কিন্তু তাহার ভূত তোমায় ছাড়িবে না।

কামের ভূত আজ ব্রহ্মচারীদের ঘাড়ে চাপিয়াছে। তাহারা যে মরিয়া আছে তাহা বুঝা কি খুব কঠিন? নরনারায়ণের কাজ তাই গুরুতর, গুরুতম। এই মৃত ব্রহ্মচর্য্যকে জীবন্ত ব্রহ্মচর্য্যে গড়িয়া তোলার জন্যই তোমাদের ব্রহ্মচারিণীরূপে আমি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই। যিনি জীবনচারিণী, তিনিই ব্রহ্মচারিণী; জীবনই ব্রহ্ম। জীবনহীন ব্রহ্ম নরনারায়ণের উপাস্য নয়। ভারতবর্ষ অইতো ব্রহ্মেরও পর পর-ব্রহ্মের স্তর স্থাপন করিয়াছেন। স্বরূপ ও বিশ্বরূপে প্রেম হইলে কাম নিয়া ঠেলাঠেলি করিতে হয় না। দুই ভাবে সংযম থাকিলে কামের সকল ফাঁক বন্ধ হইয়া যায়। বিশ্বরূপের দিক বন্ধ থাকিলে কাম স্বরূপের দিক দখল করিবে, বিশ্বরূপের দিক খোলা থাকিলে বিশ্বরূপের ক্ষেত্র দখল করিবে। দুই দিক খুলিয়া দিলে কামের দাঁড়াইবার স্থান পায় না। সব জীবন মধুময় হয়। সেই জন্যই বলি "অহং" ছাড়িয়া দাও। অহং দুইটির একটীকে নিয়া দাঁড়াইতে চায়। দুইটীর সমন্বয় "অহং" জানে না। আমির কাছে হয় বিশ্ব সত্য, নয় ঈশ্বর সত্য। আমি যদি হন্ পুরুষোত্তম তখনই বিশ্ব ও ঈশ্বর দুইই সত্য। তখন হয় বাস্তব ব্রহ্মচর্য্য। এ যে কলিযুগ। এখানে "বাস্তবম্ বস্তু বেদ্যম্"—কলি-যুগে যে বাস্তব বস্তু জানিবার যুগ। কোনো তত্ত্ব নিয়া ফাঁকি বা অভিনয় চলিবে না। সব আজ পুরুষোত্তমের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)
- ১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী) ১৷৷৩
- ২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত) ৮৲
- ৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত) ৬৲

ঈশোপনিষৎ ২৲
কেনোপনিষৎ ২৲
কঠোপনিষৎ ৩৲
প্রশ্নোপনিষৎ ১৷৷৫
ঐতরেয়োপনিষৎ ১৷৷০
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ
শ্রীনিত্যগোপাল জীবনে ও দর্শনে
স্বরাজের পূর্ণরূপ
গীতাজয়ন্তী
উদ্ধবভাবত (পুস্তিকা)
মুণ্ডকোপনিষৎ
মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-মূর্তিতে আলোচনা ৩৲
(গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

পাণ্ডুলিপি

১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
৪। দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি

শ্রীযুতী প্রতিভা রায়ের

নারী-প্রগতির জন্মকথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ও শিল্প নিত্যগোপাল ও শিল্পী সুধার কথা
৩। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীযুতী রেণু মিত্রের

সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল ৷৷৵০
রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲
শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন ৩৲
৪। রবীন্দ্র-জন্মর ৫৲
৫। প্রাথমিক শিক্ষা ৪৲

নরনারায়ণ আশ্রম

ফোন নম্বর ৫৭-২৫৪০

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

প্রতি সংখ্যা ৪৪ পয়সা বার্ষিক পাঁচ টাকা

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয় দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

শ্রীনিত্যগোপাল

শ্রাবণ-ভাদ্র ১৮৮৭, ১৩৭৩, সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র ১৯শ বর্ষ, ৭ম-৮ম সংখ্যা

আমি বৈষ্ণব নহি বাহ্য তাহাতে তিলক কেটে কেন নিতে হয়, আমি বৈষ্ণবের দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। দাড়ী আছে বটে কিন্তু কাজি মৌলভির নিকট কলমা পড়ে মুসলমান হই নাই, মুসলমান দলের মুসলমান কেবল মুখে বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। ব্যাপটাইজড না হইলে খৃষ্টান দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না, বাহ্যিক অপতপ পূজার্চনাও নাই, কুলগুরুর কাছে কাণে ফোঁকা মন্ত্রও লইতে চাহি না— ইহাতে সাধারণ হিন্দুরা আমাকে নাস্তিক বলিবেন। বাহ্যিক পূজা অর্চনা অপই আস্তিকের কার্য তাঁহারা বলেন। এখন কোন্ দলে ত আমাকে লইবে না, আমিও দল চাই না। দল গেড়ে ডোবাতেই, পচিল পঙ্ক পরিপূর্ণ পূতিগন্ধযুক্ত পল্বলেই হইয়া থাকে; স্বচ্ছ সরোবরে, প্রবাহিনী স্রোতস্বিনী নদীতে হয় না। তবে আমি কি? আমি সকল দলের ভিখারী। ভিখারীর জন্য সকল দ্বারই উন্মুক্ত। আমাকে প্রেম ভক্তি ভিক্ষা সকল দলের সাধুরাই দিয়া থাকেন। আমি সকল দলের ভিক্ষা পাই। সেইজন্য আমার সকল দল লয়ে এক অখণ্ড দল।'

—শ্রীনিত্যগোপাল

ঃঃঃ ১৫ই আগস্ট ঃঃঃ

স্বাধীনতাই এনে দিয়েছে

দেশবাসীর উন্নততর জীবনযাপনের সুযোগ

সমাজবিরোধী কাজের দ্বারা এই সুযোগ

কিছুতেই নষ্ট হ'তে দেব না

পশ্চিমবংগ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত

সূচীপত্র, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৩, ১৮৮৭

প্রার্থনা (প্রাচীন ভারত) ৩৩

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

২। ভারতী সাহিত্যের ভূমিকা (২) ৭২

অধ্যাপিকা মীরা রায়

৩। সন্ধ্যা (কবিতা) ৭৯

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার রায়

৪। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (৫৪) ৮০

১৯৫৩

৫। সিদ্ধান্ত দর্শন (পূর্বানুবৃত্তি) ৮৮

শ্রীনিত্যগোপাল

৬। শ্রীকবির লেফাফায় ৯০

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

গীতা-তরঙ্গী ৯১

শ্রীপ্রতিভা রায়

৯। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ (পূর্বানুবৃত্তি) ৯১

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

উজ্জ্বলভারত (মাসিক পত্র, ১৯শ বর্ষ)

উজ্জ্বলভারতের বার্ষিক মূল্য ৫৲। প্রতি সংখ্যা ৪৪ প.।

মাঘ থেকে উজ্জ্বলভারতের বর্ষারম্ভ। ৬ মাসের কম গ্রাহক করা হয় না। রচনা মনোনীত হোক বা না হোক ফেরত নিতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট দরকার।

বিভিন্ন লেখকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার আকার ৬″×৮″।

উজ্জ্বলভারত কতকগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন রচনার অসম্বদ্ধ সমষ্টি হবে না। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি জীবনের সকল দিকই ব্যষ্টি ও সমষ্টির দৃষ্টিতে আলোচিত হবে এবং সে সবের মধ্যে জীবনের একটি সমগ্রতার ও যুগদর্শনের খোঁজ পাওয়া যাবে।

ব্যবস্থাপক—উজ্জ্বলভারত, নরনারায়ণ আশ্রম

ফোন : ৫৭-২৫৪০

গ্রাম: সাগুইআটি, পো: অশ্বিনীনগর

জি: ২৪ পরগণা

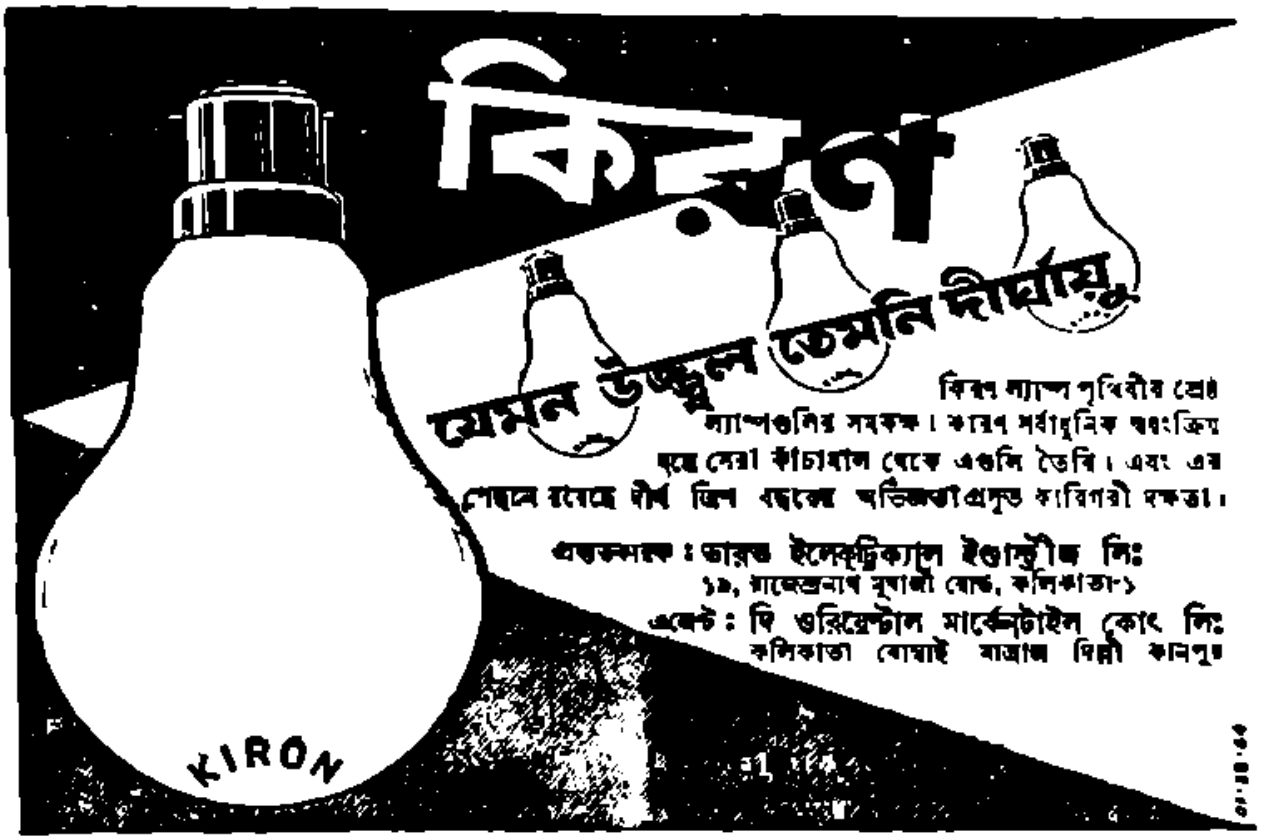

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০
কর্মবাণী	১·২৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
Soul of India Speaks	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	২·২৫

সুলেখক শ্রীঅমিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
জীবন গড়া	৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি

সাহিত্যের গল্প	
বিদ্যাসাগর	

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী :: ১৫, কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

টাটার ইস্পাত কর্মীদের 'শ্রমবীর' জাতীয় পুরস্কার লাভ

১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকার দিল্লীতে এক অনুষ্ঠানে আজকের ভারতের শিল্পজগতের 'নয়া জওয়ান'—টেকনিশিয়ান ও কারিগরদের 'শ্রমবীর' জাতীয় সম্মানে ভূষিত করেছেন। শ্রমশিল্পে খরচ কমিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর উপায় যাঁরা দেখাতে পারবেন তাঁদের প্রতিবছর এই সম্মান ও পুরস্কার দেওয়া হবে।

এ বছর মোট ২৭টি পুরস্কারের মধ্যে সর্বোচ্চ দুটি পুরস্কার সমেত পাঁচটি টাটা স্টীলের কর্মীরা পেয়েছেন—এ দেশে আর কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান এত বেশী পুরস্কার পাননি।

জামশেদপুরে গত বিশ বছরে কর্মীরা ছোটখাটো নানারকম ব্যবস্থার দ্বারা যাতে উৎপাদন বাড়ানো যায় এরকম ১২,০০০ প্রস্তাব পেশ করেছেন, তার মধ্যে ১০০০টি কাজে লাগানো হয়েছে। এই প্রস্তাবগুলি উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া কারখানার কাজকর্মে নিরাপত্তা এনেছে আর দেশজ মালমসলা ও কর্মকুশলতাকে কাজে লাগিয়ে দেশের শিল্পকে আত্ম-নির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

কারখানার দাবতীয় শ্রমিকদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্যে 'সাজেশন বক্স' স্কীম আজ আমাদের দেশের শ্রমশিল্পে প্রচলিত হয়ে গেছে। এই স্কীমের প্রবর্তক হিসেবে টাটা স্টীলের গৌরব কম নয়।

আর. সি. ভকৎ :
সর্বোচ্চ পুরস্কার ২০০০৲ পেয়েছেন।

এম. এম. মজুমদার :
সর্বোচ্চ পুরস্কার ২০০০৲ পেয়েছেন।

টাটা স্টীল

কে. বি. দুবে :
৫০০৲ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন।

কলবন্ত সিং :
৫০০৲ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন।

আফজল হুসেন :
৫০০৲ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন।

The Tata Iron and Steel Company Limited

[WTTN 2274]

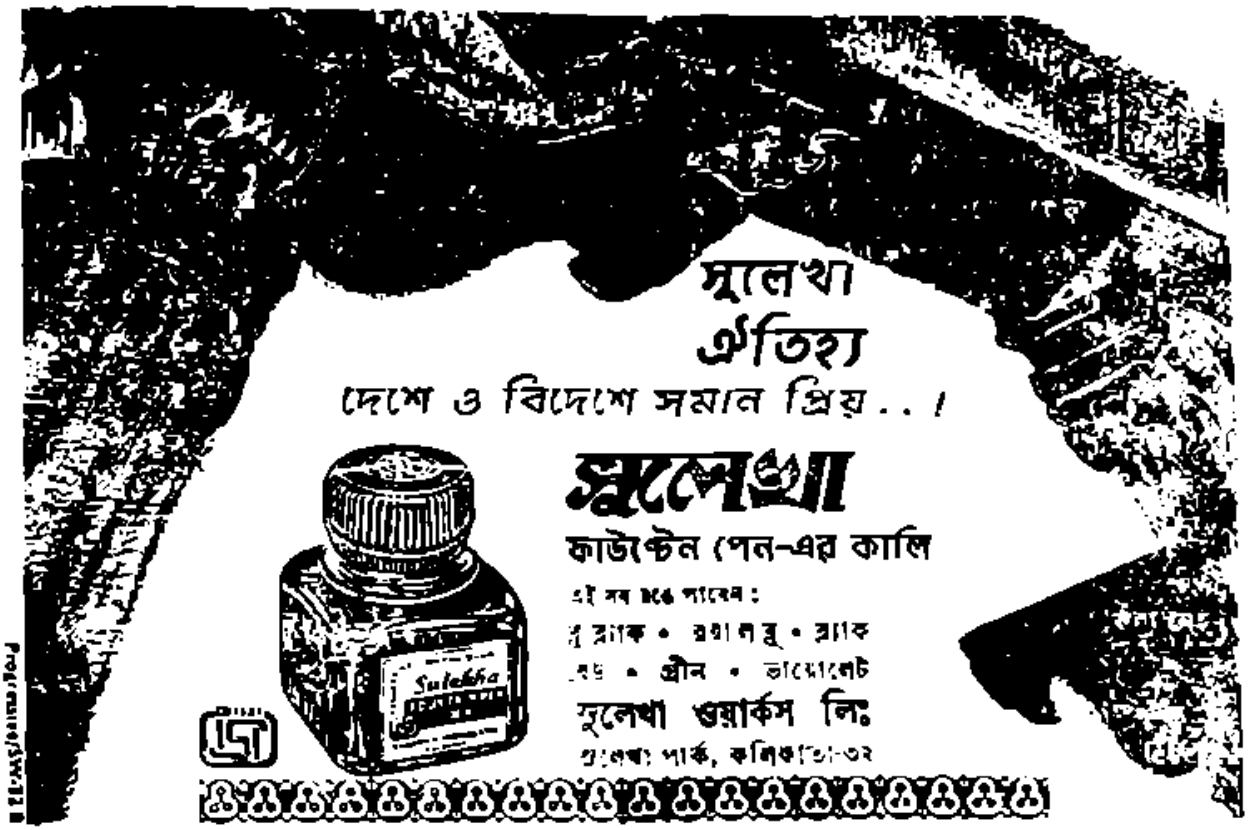

দ্বিবিধ উপকারী
কেশ তৈল

- মাথা ঠাণ্ডা রাখে
- স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কেশবর্দ্ধনে সাহায্য করে

জীবনের বিভিন্ন স্তরে যাঁরা নরনারী নির্বিশেষে সকলকেই মাথা খাটাতে হয়, তাই তাঁদের পক্ষে এমন কেশ তৈলই বিশেষ উপযোগী যা একাধারে তাঁদের মাথা ঠাণ্ডা রাখবে এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কেশবর্দ্ধনে সাহায্য করবে। আয়ুর্বেদীয় মতে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রস্তুত কৃষ্ণরাজ সত্তা ও অন্যান্য স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কেশ তৈলের গুণসম্পন্ন সেই অতুলনীয় কেশ তৈল হল

ক্যালকেমিকোর
ভৃঙ্গল
সুরভিত
মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল
ক্যালকাটা কেমিকেল কর্তৃক প্রস্তুত

CBF-18a-66

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৬৫ সালে
ভারতীয় বাটা প্রতিষ্ঠান থেকে
মোট ২১৮,০০০ জোড়া
জুতো কিনেছেন **Bata**

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

উদ্বোধন

শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৮৮৭ শকাব্দ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

১৯শ বর্ষ, ৭ম-৮ম সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৬৩)

কিন্তু তফাৎ আছে...সংসারীদের মত চলেও আমি কোথায় অসংসারী এটা এতদিনে জানলে ভাল হত। কৃষ্ণ এত বড় একটা সংসার চালিয়েও সন্ন্যাসী।...বাইরের কাজে তফাৎ তেমন নেই—তফাৎটা ভাবে—কৌশলে—চং-এ।...নিত্যগোপাল যে সন্ন্যাসের কথা বলে গেছেন তা অধিকতর কঠিন এবং এতদিনের সন্ন্যাস থেকে আরও ব্যাপক গভীর। সংসারীরা বাবা মা স্ত্রী পুত্র নিয়ে সংসার করে ..। সন্ন্যাসীরা যে সংসার করে তা শুধু বাবা বা স্বামীর সংসার নয়—তা বিশ্বনাথের সংসার...। সে বিশ্ব কোন দুই একটী বিশেষ বাড়ী নিয়ে নয়...বিরাট বিশ্ব। বাবার সংসারে রক্ত এক—এখানে আমাদের এই কয়জনই সাত জায়গায়...রক্তের সম্পর্ক নাই।...সংসারের মত সহোদর ভাইবোন না হয়েও আপন হতে হবে—কতখানি চিত্তের উদারতা দরকার? চিত্তের দুয়ার খোলা রাখতে হবে...সংসারে আমার সংসার রক্ষার জন্য ভগবানকে মানি..সন্ন্যাসে আমি কেন্দ্র নয়, কেন্দ্র গোবিন্দ—উদ্দেশ্য সেবা। সংসারী আহুতি দেয় নিজের পেটকে...সন্ন্যাসী রামপ্রসাদ আহুতি দেন শ্যামা মাকে।...সেবা তোমার উদ্দেশ্য কি না সেইটে সবচেয়ে বড় কথা। গুরুর কাজ করে থাকা সন্ন্যাস—নিজের আত্মীয় ত্যাগ হয়ে যাবে—এইভাবেই গোত্রান্তর হয়ে যায়—গুরুর গোত্রে তার আত্মীয় স্থির হয়—মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলে যেমন গোত্রান্তর হয়। ...সন্ন্যাসীর সব কিছু স্থিরীকৃত হবে গুরুর দিকে চেয়ে—তার সব গুরুর জন্য, বিশ্বের জন্য।...আপন ভাই তোমার তো তোমার গুরুভাইকে আপন মনে করে না—তাই তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যবহারিক...। নিজের বুকের মধ্যে চেয়ে দেখো...আপন মনে কর কাকে?...আজকাল মেয়েদের বিয়ে হলেও গোত্রান্তর হয় না—বাপের বাড়ীর নামে জিভে জল পড়ে—দেওর ননদ কেউ না...। সন্ন্যাসীকে—এখানে যারা এসেছ তাদের—কৃষ্ণের গোত্রে রূপান্তরিত হতে হবে।...আমাকে দেখতে জানলে বুঝতে পারতে একটা মানুষ বিশ্বের জন্য—বিশ্বসেবার জন্য সমস্ত নারী জাতির জন্য কি রকম ভাবে সারা জীবন চেষ্টা করে গেল। ...গোবিন্দ সেবা যারা করে তাদের উৎসাহের অন্ত নেই...কিন্তু সংসারীর উৎসাহ কোথায়? কিসের তালে চলে তারা?...বাবা মা স্বামী বদল হয়ে যাওয়ার নাম সন্ন্যাস—আগের বাবা ছিলেন সাধারণ একজন মানুষ, এবার বাবা শিব, এবার মা দুর্গা, এবার স্বামী কৃষ্ণ।...গোবিন্দ সেবার ভাব এলেই তা বোঝা যায় চালে চলনে...। সন্ন্যাস অর্থ সম্যকরূপে ন্যস্ত করা, স্থাপন করা, deposit রাখা। আমি যখন আপনাকে ভগবানের নিকট, গুরুর নিকট স্থাপন করতে পারলাম তখন তা সন্ন্যাস।...নিত্যগোপালের সন্ন্যাসে সংসার থেকেও সন্ন্যাস—দুটোর সমন্বয়। এ খুব বেশী কঠিন। মনে করো না এ সহজ...।

৯, ১১, ৫৬। ওঁ...ওঁ। সমগ্র উপনিষদ্ ন-এর সাধনায় নির্দেশ দিয়েছেন—তিনি অনির্বচনীয়, তিনি

অজ্ঞেয়, তিনি মনোবুদ্ধির অগোচর, তাঁকে জানা যায় না, জানতে গেলেই তিনি অধরা হয়ে যান...। তাঁকে জানি এ কথা বলতে মানুষের অহঙ্কার তৃপ্ত হয়...জানার মধ্যে তাঁর সত্তা বাস্তবে ঠাঁই নেই তীরে দাঁড়িয়ে যেমন নদীর জল মাপা যায় না· ঝাঁপ না দিলে কিছুতেই তাঁকে জানতে পারবে না···অজানার স্পর্শ যে পায় নি, কি করে সে জানবে?...যতটুকু তাঁকে জানা যায় সে শুধু হৃদয় দিয়ে...হৃদয়ের সাধনা দিয়ে· যার জীবনে ভগবান অধরা সেই বস্তু ··। বুদ্ধি তাঁকে ধরে ফেলতে চায় বটে...কিন্তু সে বস্তু তো আজ পর্যন্ত ধরা পড়েন নি···। পরমহংসদেব বলতেন সব উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে, কেবল ব্রহ্মজ্ঞান উচ্ছিষ্ট নয়।...তুমি ধরে রাখবে? অসম্ভব! বিদ্যুতের মত সে পালিয়ে যায়।..অজানাকে ধরতে পার কতটুকু কি রকম করে সে ধরা শ্রীনিত্যগোপাল যেমন।... জীবনে অজানার ডাক এসে ছিল···। পরম শ্রাদ্ধা তুর্গাপ্রসাদ গাইলেন—

কি জানি তাঁহার কোথায় ধাম কি জানি কি তাঁর নাম
এ সব জানায় মোর কিবা কাম সবার যাহারে সঁপিলাম।

—তাঁর ধাম কোথায়? বৈকুণ্ঠাবাড়ীতেও, দেবালয়েও...। সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে হুহু করে চলেছে তাঁর জীবনতরঙ্গ... সেই জীবনতরঙ্গ আমায় স্পর্শ করেছে...ব্রজযৌবনের চাহনী ছেড়েছিলাম যা জানার আহ্বানে।...নিত্যগোপাল, সব তুমি, তুমি শাক্ত, তুমি বৈষ্ণব, তুমি শৈব, তুমি জন্ম, তুমি অজন্ম—কেমন করে তোমায় বুদ্ধিগম্য করব? তুমি যে অসীম, চৌহদ্দী তোমার নাই— কাশীর সীমায় তুমি আটকে নও, বৃন্দাবনের সীমায় তুমি আটকে নও...। কেমন করে এমনই এক অজানা অসীমের সঙ্গে একদিন পরিচয় হয়েছিল—সে কথা আজ থাক। এই অজানার পথে এসে কণ্টক-ক্ষত হয়ে পথ চলছি—বেশ, তাই চলব...। অজানার মধ্যেই ঝাঁপ দিয়েছি—টাকা নেই—কাজ এসেছে ঝাঁপ দিয়েছি সেই কাজ নিয়ে··· উপবাস করে সেদিন মরতে পারতাম—এত দুঃসাহসিকতার কাজও করেছি—তবু অজানা তো উপবাস করতে দেয় নি। ওগো অজানা অসীমের পরিচয় নূতন. তুমি—কাল যা ছিলে আজ তা নও...। যদি আমাকে কেউ চিনে গিয়ে থাকে মনে কর সেইখানেই মরেছে...। আমার জীবনের এই অজানা অচেনার তাকে যদি ভালবাসতে পারতে...তাহলে জীবনে বিশেষ একটা আনন্দ পেতে পারতে.....। অজানাকে ভালবাসি বলে অচেনা রাজেনবিন্দুকে সেদিন ভাল লেগে ছিল—কুলশীল জেনে তো ভালবাসি নি।··· সীমায় তুমি নও···গুণে তুমি নও, কর্মে তুমি নও—এ ন-এর উপাসনা চিরকাল করে যাব—না থাকাই তো আমার গৌরব···। আমি দেহ ন, আমি বুদ্ধি ন—। সব তোমার দেহ—তুমি মহানির্বাণের কারণ—তুমি আমার জীবনে সত্তা হয়ে থাক...। চিনতে যেয়ো না···বুদ্ধি দিয়ে তর্কবার করো না, চক্ষু দিয়ে দেখতে চেয়ো না—তিনি অচক্ষুঃ···তিনি চির অপরিচিতই রইলেন...। কি করে তোমায় পরিচয় দেব ঠাকুর?···কত কাল গেল—সেই অপরিচয়ের সঙ্গে কি জানি একটা···

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি
আমরা দুজনে চলতি হাওয়ার পন্থী—

—বন্ধনহীন গ্রন্থি—গ্রন্থি বটে কিন্তু বন্ধনহীন—এই যে হৃদয়ের কথা এ অনির্বচনীয়ম্...। বুদ্ধি হার মেনে গেল—পরিচিতির বুদ্ধি তোমায় ধরতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল—তুমি এগিয়ে গেলে...। নিত্যগোপাল, তুমি অজানা...অজানাই আমার সত্তা···তা জানি যা চিনি সব মিথ্যা—ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাই মাত্র আছে—ব্রহ্মকে জেনে ফেললেই তিনি মিথ্যা...। ধরে ফেললেই অভিমান আসে...বিনীত হয়েই তাঁকে পেতে হয়—সে তো বাঁধা পড়ে না,ধেনু যেমন করে...বাঁধতে যে চায় না তার কাছে তিনি ধরা দেন··। তোমাদের 'আমি'র নির্বাণ হোক—'আমি'-র গ্রন্থি দিয়ে তাঁকে বেঁধো না—অহং-কেন্দ্রিক করো না। জীবনকে—মানুষ পেলেই বাঁধতে চায়···। তিনি বৃন্দাবন থেকে পিছলে চলে গেলেন, দেবকীর কাছ থেকে গেলেন, ব্রজগোপীর কাছ থেকে গেলেন বাঁধতে চাইলেই পালাবে...। স্ত্রীকে স্বামী বাঁধতে চেয়ো না, স্বামীকে স্ত্রী বাঁধতে চেয়ো না···গুরুকে বাঁধতে চেয়ো না...। বিনীত হও, মস্তক অবনত কর—জানবার মত দুর্গ ছিঁড়ে দূর

কর—বিনীতের কাছে তিনি ধরা দেবেন।···বন্ধন দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় না···মুক্তি দিতে চায় না বলেই মানুষ পায় না। যে মুক্ত হতে চায়, সে মুক্তি দিতে পারে···। এই পুরুষোত্তমতত্ত্ব শ্রীনিত্যগোপাল দর্শনের মধ্যে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাই সাহিত্যে দিয়েছেন···। নিত্যগোপাল আমার সকল ন-এর মূর্ত্ত বিগ্রহ। যিনি ন, তিনিই অ···ইতিবাচক আর নেতিবাচক একই কথা... নিয়ন্তাকারীর কাছে তিনি ধরা দেন···। মুক্তকেই বাঁধা যায়—বন্ধন-রজ্জু দিয়ে বাঁধতে পারবে না...চলতে চলতে ভালবাসতে হবে...স্থির হয়ে চলো না···ছুটতে ছুটতে ভালবাসতে হবে অর্থাৎ বৃহৎ কর্মকে সঙ্গে রাখতে হবে—ভালবাসার সঙ্গে কর্মরূপ সেবা না থাকলে সে ভালবাসা ব্যর্থ···। প্রত্যেকেই ছুটবে—যেখানে দাঁড়াবে, সেখানেই ডুববে...। পতিত্ব শ্রীভগবানকে বাঁশি দিয়ে দেতে হবে···। ধরার ধূলি হবে ব্রহ্ম ধূলি, ধরার মানুষ হবে ব্রহ্ম-মানুষ—নিত্যগোপাল, জগন্নাথ নিত্যগোপাল···।

১০, ১১, ৫৬। ও···ও। মাটির বুকে ছোট্ট একটা ঘর—৮।৬ হাত—ভুলতে তিন দিন থেকে মাপের অন্ত নাই, হিসাবের অন্ত নাই—উপরে নীচে···কত রকম মাপ। এরই জন্য যদি এত মাপ তবে এই দেহ কত মাপের মধ্যে আছে তার খবর রাখে কে? সেই খবর রাখার নাম জ্ঞান। এই সৃষ্টিটার পিছনে কত মাপ—চোখ দুটি মাপ করা—নাক মুখ হাত পা সব মাপ করা···। গরুর আলস করতে এত মাপ, এই 'দেহ দেবালয়' রক্ষা করতে মাপ নেই?···সৃষ্টিও তো একজনার দেহ···। অহংকার যার নেই তার মাপজোক ঠিক হয়···, যার অহংকার নাই তার নারায়ণের মত দেহ হয়। কিন্তু সৃষ্টির পিছনের এই মাপ বুদ্ধিপ্রসূত নয়—কোনো বুদ্ধি করে হয় না··· অহংকার থাকতে মাপের সামঞ্জস্য করতে পারবে না··· মন আর দেহে মিলছে না—বাঁকা হয়ে গেল—এ যে বক্রের দেশ···। ফাঁকি তো কাউকে দিতে পারবে না... অনেক শিখতে হয় সংসারে···। বই পড়েও শিখতে পারবে না, অহংকার থাকতেও শিখতে পারবে না। কেবল বই পড়ে শেখা সেজন্য সভ্যতার ফল বই পড়ে শেখাও ছিল ভারতবর্ষে—গুরুর গৃহে—গুরুগৃহে ছাড়া শিক্ষার কোন নজির নেই ভারতবর্ষে।···মানুষের দেহে শুরু হাল ধরে বসে আছেন—এত বড় দুর্যোগে তুমি নিজে আত্মরক্ষা করবে? অসম্ভব...। ···জলের কল বসাতে আর গরুর ঘর বানাতে এত হাঙ্গামা—তা এ সংসারে কিছুই কি সহজ?...এ সংসারে অহংকার ছাড়তেই হবে।···যতটুকু নিত্যগোপালে দিয়েছি ততটুকু সুখ আছি..যতটুকু নিত্যগোপালে দিয়েছি, ততটুকু কথা আসে···। কথা আসে···নাচ আসে—বুদ্ধি করে নাচা যায় না···। শুনেছি কীর্তন হলে নিত্যগোপাল নাচতেন—সে নাচ এত সুন্দর যে থিয়েটারের নটনটীরা একবার তাঁকে দিয়ে নাচিয়েছিল।...আমার কথাও আসে—আমি বুদ্ধি করে কথা বলি না।···কৃষ্ণ কথা বলতেন তা গান হত, আর তোমরা কথা বল তা বক্তৃতা হয়—কী কর্কশ···। যদি কোনদিকে না হেলে স্থির থাকতে চাও তবে শরণাগত হও...স্থির হয়ে যে দাঁড়াতে পারে, তার জীবনে কল্যাণ আসে। নিত্যগোপাল এই শিক্ষাই দিতে এসেছেন।···নিত্যগোপাল, তুমি অপ্রমেয়—তোমাকে মাপতে চাইব না—আমিও অপ্রমেয়—কত ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনা—তুমি শৃঙ্খলামূর্তি—শ্রীরাধা শৃঙ্খলামূর্তি···। সীতাও অতিরিক্ত পতিভক্তি দেখিয়ে শেষে প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।...নিত্যগোপাল, তোমার চরণে শরণাগত..., আদর্শের সঙ্গে বাস্তবকে মেলাতে গিয়ে আমি ঝরঝরে, গলদ্‌ঘর্ম যে আদর্শ নিয়ে এসেছিলাম—বলে ছিলে সংসারে থাক, কাজ আছে—আমি তো তোমার মত করেই সকলকে গড়তে চেয়েছিলাম···। আমি তো কাউকে গড়তে পারলাম না, হয়তো আমার অহংকার ছিল—আমার অহংকার তুমি নাও। কেউ তো তোমায় চায় না—রাজনীতি ধর্মনীতি মিলিয়ে কেউ তো চলতে চায় না···। আমি শ্রান্ত ক্লান্ত—আজ তুমি আমায় গ্রহণ কর—বয়োজীর্ণ আমি—দেহ জীর্ণ হয়েছে—তুমি আমায় গ্রহণ কর...। ওগো আমার আমি, তুমি আমি, আমি তুমি।

ক্রমশঃ

ফরাসী সাহিত্যের ভূমিকা

দ্বিতীয় অধ্যায়

ষোড়শ শতাব্দী ও রেনেসাঁস

।। অধ্যাপিকা মীরা রায় ।।

মধ্যযুগের ফরাসী-সাহিত্য সৃষ্টির ধারা তৈলাধারবৎ নিরবচ্ছিন্ন ছিল না, তার মাঝে মাঝে বড় বড় ফাঁক বর্তমান দেখতে পাই। তবু, আমরা লক্ষ্য করেছি, মধ্যযুগীয় এই সাহিত্যের নিজস্ব একটা মহিমা ছিল। তার দোষের মধ্যে, কবিরা ছিলেন শিল্প-চেতনা বর্জিত। কাব্যের বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব-সম্পাদনের দিকে তাঁদের আদৌ দৃষ্টি ছিল না। বাগ্‌বাহুল্য, প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যে শুদ্ধতা ও বর্ণ-চেতনার অভাব প্রভৃতি ত্রুটীর দ্বারা এই তথ্য উদ্ঘাটিত হয় যে 'ক্লাসিক' (classique) আদর্শের অনুসরণ এঁরা করতে পারেন নি। গোড়ার দিকের এই সাদামাটা, অতি সরল ভাব মধ্যযুগীয় সাহিত্যের শেষ অবধি অবশ্য বজায় থাকে নি। 'রোমাঁ-দ্য-লা রোজে'ই আমরা দেখেছি, সাহিত্য কেমন অতিপাণ্ডিত্য ও কৃত্রিমতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে,—গতানুগতিক বক্তা পচা ভাবের পুনরাবৃত্তিতে ও রূপকের বোঝায় কবিতার স্বচ্ছন্দ গতি হয়েছে ব্যাহত। (জিঁ অবশ্য সর্বত্রই ব্যতিক্রম।) শেষ অবধি মিলের নিয়মকানুন এমনি জটিল হয়ে পড়েছিল যে কবির সকল মনোযোগ ইহাতেই নিয়োজিত ও নিঃশেষিত হয়ে যেত।

সবচেয়ে বড় কথা এই, রোমান্স সাহিত্যগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব'লে মধ্যযুগের ফরাসী-সাহিত্য সেকালে স্বীকৃতিলাভ করেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফরাসীই হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল খ্রীষ্টান ইয়োরোপের আন্তর্জাতিক ভাব-বিনিময়ের ভাষা, পারস্পরিক যোগাযোগের ভাষা। ইংলণ্ড থেকে ইটালী, স্কটল্যাণ্ড থেকে জেরুসালেম সর্বত্র তার অব্যাহত গতি, নিরংকুশ প্রভাব, অখণ্ড প্রতাপ। জর্মনী ও স্পেনে গোল টেবিলের রোমাঁ এবং মহাকাব্যগুলি দীর্ঘকাল ধ'রে আদৃত হয়েছে; বিশেষতঃ ইটালীতে রোমাঁগুলির প্রভাব হয়েছিল সুদূরতম প্রসারী। ষোড়শ শতকের আরিয়োস্তো বিরচিত 'অর্লান্দো ফিউরিওসো' কাব্যের মূল প্রেরণা রোমাঁগুলির মধ্যেই নিহিত। দুঃখের বিষয়, রেনেসাঁস-উত্তর ফ্রান্স্ নিজে কিন্তু প্রাক-রেনেসাঁস যুগের এই বিশাল সাহিত্য সম্ভারকে বড় অবহেলা করেছিল: অতি দ্রুত এর উপর জমে উঠেছিল বিস্মৃতির ধূলা আবরণ। প্রায় চার শতক পরে আজ বিংশ শতাব্দীতে নতুন কোরে একাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনার আবিষ্কৃতি ও চর্চা আরম্ভ হয়েছে। এদের অস্তিত্বটুকু পর্যন্ত ষোড়শের সময়ে (১৭শ শতাব্দী) অজ্ঞাত ছিল।

রেনেসাঁসের সঙ্গে রোমের ইতিহাস কিছু পরিমাণে যুক্ত, কাজেই আপাততঃ আমরা এ নিয়ে একটু আলোচনা করব। রোমক-সংস্কৃতি মৌলিকতা ও উৎকর্ষের দাবী তেমন রাখে না। রাজনীতি, আইন প্রভৃতি অল্প বিষয়েই রোমানরা কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছিল। তবে সুমহান গ্রীক সংস্কৃতি রোমেরই মারফৎ প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে, সে হিসাবে, অর্থাৎ বাহন হিসাবে রোমের অবদান অবশ্যই স্বীকৃতি-যোগ্য। গ্রীক্ সংস্কৃতিকে রোমই একদিক থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, লুপ্তি ও বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা করেছে।

রোমক-সাম্রাজ্য সারা য়ুরোপ ও এসিয়া-মাইনর জুড়ে আপনাকে বিস্তৃত করেছিল। সাম্রাজ্যের কর্ণধারগণ, আর কিছু না পারুন, বিজিত রাজ্যসমূহে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখতে পেরেছিলেন; লোকে নিশ্চিন্তে বিদ্যা-

চর্চ্চাদিও করতে পেরেছে। দীর্ঘদিন রোমক শাসনে থাকার ফলে ও রোমীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি-ভাষাতে অভ্যস্ত হবার ফলে ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতির ওপর স্বভাবতই রোমক-প্রভাব অঙ্গে অঙ্গে বিজড়িত।

ক্রমে এই মহা-বলী, প্রবল প্রতাপ রোম অন্তঃসার-শূন্য হ'য়ে এল। তার চরিত্রের মধ্যে কোথায় ঘুন ধরেছিল। স্বার্থপরায়ণতা, নিষ্ঠুরতা, বিলাসিতা, দম্ভ, আলস্য আর লাম্পট্য এসে তার পূর্বের অনাড়ম্বর সরলতা, নিষ্ঠা, সততা ও বলিষ্ঠ, সুস্থ, বীরোচিত মানসিকতার স্থান কেড়ে নিল। বিজিত দেশাগত দাসদের সঙ্গে অমানুষিক ব্যবহার করা হ'ত, অথচ সমগ্র শ্রমবিমুখ (কলোনীগুলি থেকে প্রায় বিনা মূল্যেই খাদ্য মিলত) বিলাস-পরায়ণ সমাজটা দাঁড়িয়েছিল এদেরই ওপর নির্ভর করে, এদেরই ঘর্ম-অশ্রু-রক্ত-সলিলা ভূস্তর ওপরকার চোরাবালিতে নির্মিত হয়েছিল 'চিরন্তনী নগরী রোমা'। প্রচুর ক্ষমতা, প্রচুর অবসর, প্রচুর ঐশ্বর্য আস্তে আস্তে রোমানদের দায়িত্বহীন ভোগলালসে অমানুষ বানিয়ে তুলল। পীড়ন-অর্জ্জিত অঢেল ক্রীতদাস এবং অত্যাচারিত দরিদ্র এমনি সময়ে খৃষ্টধর্মের মধ্যে সন্ধান পেল আশ্রয়ের—উজ্জীবিত হ'য়ে গেল আত্মিক শক্তির এক নূতন উৎসমুখ।

অবিমিশ্র পশুশক্তি কোন বস্তুকেই দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখতে পারে না, পশুবল-নির্ভর রোমক-সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে আপনি একদিন ভেঙে পড়ত, আপন মৃত্যুবীজ নিজের অভ্যন্তরে নিজেই সে লালন করছিল। রোমের সেই অনিবার্য ধ্বংসকে শুধু ত্বরান্বিত ও ক্ষততর ক'রে আনল অসভ্য গথ, ফ্রাঙ্ক, ভ্যান্ডল ইত্যাদি বর্ব্বর উপজাতির আক্রমণ। সে আক্রমণে প্রতীচী-স্থিত রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল খান্ খান্ হয়ে। সেই সঙ্গে য়ুরোপের বুকে নামল মধ্য-যুগের দীর্ঘ বিষণ্ণ তিমির-রাত্রি। পূর্বাঞ্চলে কিন্তু রাজধানী কনস্টান্টিনোপ্‌লকে ঘিরে রোমক-সাম্রাজ্য শিবরাত্রির সল্‌তেটির মত টিম্‌টিম্ ক'রে ১৪৫৩ পর্যন্ত কোনরকমে টিঁকেছিল। ১৪৫৩ সালে তুর্কীরা কনস্টান্টিনোপ্‌ল্ দখল ক'রে নিল,—পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যেরও অবসান ঘটল।

কনস্টান্টিনোপ্‌লের রাজসভায় যে সব পণ্ডিতেরা সমবেত হয়ে ছিলেন, তাঁরা তাঁদের হাতে-লেখা, দুষ্প্রাপ্য, অমূল্য গ্রীক্ ল্যাটিন পুঁথিপত্রগুলোকে বুকে কোরে আশ্রয়-সন্ধানে চলে এলেন ইটালীতে।

ইতিমধ্যে ইটালীর সমুদ্র-বন্দর নগরগুলি ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে ঐশ্বর্যবান, স্বাধীন ও শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছিল। প্রাচ্যদেশ থেকে আরবরা সওদা নিয়ে আসতো, অন্যদের সে সব চিত্তহারী পণ্য এসে পড়ত ভেনিস্, জেনোয়া প্রভৃতি ইটালীর নগরের বণিকদের হাতে; এরাই সে-সমস্ত জিনিষ সারা য়ুরোপকে পরিবেশন করত। এই একচেটিয়া বাণিজ্যের সুযোগ পেয়ে তারা বিস্তর পয়সা করল। নানা দেশ দেশান্তর থেকে নব নব ভাবের কম আমদানী করল না। (এদিক থেকে মনে হয়, তাদের অবদান প্রাচীন ফিনিসীয়দের সঙ্গে তুলনীয়।) স্বচ্ছলতা, নিরাপত্তাবোধ, বণিক-রাজপুত্র সম্প্রদায়ের বিদ্যোৎসাহ প্রভৃতির অনুকূল পটভূমিকায় ফেরারা, বোলোনা, পাদুয়া প্রভৃতি ইটালীর নগর-রাষ্ট্রে শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির যে অভিনব ধারা প্রবর্তিত হয়েছিল, তাকে ক্রমে তা একাই হয়তো বা রেনেসাঁসের জন্ম দিতে সক্ষম হ'ত, ১৪৫৩তে কনস্টান্টিনোপ্‌লের পতন না ঘটলেও। যাই হোক, ১৪৫৩কেই রেনেসাঁসের জন্ম-বর্ষ বলে পরিগণনা করা হ'য়ে থাকে,—যেহেতু (কনস্টান্টিনোপলে এতাবৎ সঞ্চিত) গ্রেকো-রোমান (ল্যাটিন) সাহিত্যের পাণ্ডুলিপির বিপুল ভাণ্ডার এমন ব্যাপকভাবে ইতিপূর্বে কখনো ইওরোপে ছড়িয়ে পড়ে নি এবং রেনেসাঁসের মূলে রয়েছে এই ক্লাসিক সাহিত্যের প্রভাব। ক্লাসিক সংস্কৃতির চিরায়ত আলোকে য়ুরোপের চিত্ততল ভাস্বর হল দীপিত হল, এক মশালের আগুন আরেক মশালে বহ্নিমান করে দিল।

মোটের ওপর পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে নতুন কোরে ক্ল্যাসিক-সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের শুভদৃষ্টি ঘটে; এবং এই অভিনব পরিচয়, এই সবিস্ময় শ্রদ্ধা ও অনুরাগে আকর্ষণ ক্লাসিক্ সাহিত্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা অনুকৃতি ও অনুবাদের মধ্য দিয়ে নিজেকে সার্থক করে তুলে

লাগল। এর ফলে মানুষের মনে এল নূতন ভাবে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সাহস। স্বাধীন-চিন্তা, সৌন্দর্যোপাসনা, মানব-মুক্তিস্পৃহা ও মানব-প্রেম মধ্যযুগের অবসান সূচনা ক'রে আধুনিক যুগের জন্ম বরণডালা সাজাল। মানুষের জ্ঞান-পিপাসা ও অনুসন্ধিৎসা হ'য়ে উঠল অসীম ও অদম্য; তার জিজ্ঞাসা অনুভূতি ও মনন সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত হ'ল, তার নবজাগ্রত প্রেরণা চকিত প্রাণশক্তি অসম্ভবকে অসম্ভব বলে মানল না।

য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে রেনেসাঁস বিভিন্ন আকৃতি পরিগ্রহ করেছে। ইংলণ্ডে সে এনেছে বিপুল আত্মপ্রত্যয়, আত্মবিস্তৃতি ও প্রকাশের আকাঙ্ক্ষার মূর্তিতে, সেখানে তরুণ গরুড়ের মতো মানুষ বিশ্বভুবনের পাত্র থেকে জীবন-মধুর শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত নিঃশেষে পান করবার প্রয়াস পেয়েছে। কর্মে মননে অনুভূতিতে সুসম্পূর্ণ এই জিজ্ঞাসা ও দুর্বার জীবনোল্লাস প্রতিফলিত হয়েছে এলিজাবেথীয় রোমান্টিক নাট্য সাহিত্যে,—নিজের ক্ষেত্রে যে সাহিত্য আজো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ইটালীতে রেনেসাঁস যুগান্তর এনেছে ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পে।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, ফ্রান্সে কিন্তু রেনেসাঁস অভীপ্সিত পূর্ণ পরিণতিতে উপনীত হ'তে পারে নি। তার অভিযাত্রার মধ্যপথেই আকস্মিকভাবে ছেদ পড়েছিল: দুরন্ত ও অপ্রতিহতা ফরাসী রেনেসাঁসের এই অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী। যাই হোক্, ফ্রান্সে রেনেসাঁসের গতি প্রকৃতির ধারা অনুসরণ করলে প্রথমেই চোখে পড়ে ইটালীর কাছে তার ঋণ-স্বীকার। রেনেসাঁসের প্রথম আবির্ভাব ইটালীতে,—সুতরাং সেই উচ্চাশায় দীপ্তিতে উজ্জ্বল, নবযৌবনের লাবণ্যে মণ্ডিত ইতালীর সংস্কৃতি ও জীবন ধারা সমকালীন ফ্রান্স তথা অবশিষ্ট য়ুরোপের বিমুগ্ধ দৃষ্টির সামনে প্রতিভাত হয়েছিল আদর্শ বলে। গ্রীক্-ল্যাটিনের সঙ্গে সঙ্গে ইতালীর ভাবধারাতেও ফ্রান্স আপনাকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে দিয়েছিল। (এর পিছনে অবশ্য রাজনৈতিক কারণও যে কিছুটা না ছিল তা নয়।) এদিকে যেমন ফরাসী ধনিক ও শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণী আল্পস্ পারের সুসজ্জিত বিলাসিতাকে জীবন-প্রণালীর অনুকরণে অভ্যস্ত হ'তে লাগলেন, অপরদিকে তেমনি ভিন্‌দেশী শিল্পী, পর্যটক, রাজনীতিক ও ধর্মযাজকের দল দেশে আমদানী করতে লাগল বিচিত্র রীতিনীতি ও চিন্তা-স্রোত।

ক্রমশঃ নিজেদের সাহিত্যের উন্নতি ও সংস্কার সাধনের দিকে ফরাসীদের দৃষ্টি গেল—ইটালীয় ও ক্লাসিক সাহিত্যের প্রভাবে দরিদ্র দেশী সাহিত্য নূতন প্রাণ পেল, নূতন রূপে সে আত্মপ্রকাশ করল; তার এ নবায়ন হল সুগভীর, প্রায় আমূল। প্রাচীনদের আদর্শ অনুযায়ী ভাষার অবয়ব-গত সুষমা-বিধান প্রাধান্য লাভ করতে সুরু করল—সে প্রাধান্যের আসন আজো টলে নি কেন না এইটিই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ফরাসী সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আর্টের সঙ্গে মনের জগতেও এল অদ্ভুতপূর্ব বিপ্লব। আগেই বলেছি—ক্লাসিক সংস্কৃতির সাগ্রহ অনুসরণই রেনেসাঁসের গোড়ার কথা। প্রাক্-রেনেসাঁস যুগে ফ্রান্সের সঙ্গে গ্রীক্-ল্যাটিনের যে মুখ দেখাদেখি ছিল না তা নয়। প্রধানতঃ পরিচিত ছিলেন ভার্জিল ও ওভিদ্, কিন্তু তাঁদের কারু-নৈপুণ্যের অনুভূতি কারো লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে নি তৎকালে, গল্প অথবা তদন্তর্গত নীতিকথাটাই ছিল বড়। এতদিনে এই প্রথম ফরাসী সাহিত্যিকগণ সোজাসুজি প্রাচীন কবিগুরুদের রচনাশৈলী থেকে প্রেরণা আহরণ করতে শুরু করলেন। ল্যাটিনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক্ কাব্য দর্শন জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল। নবানুরাগের প্রমত্ততায় আতিশয্য দোষও এসেছিল। কাজ কাজ সামনে ক্লাসিক সংস্কৃতির অভিকৃত সৃষ্টি মৌলিক অগ্রগমনের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিল। তাঁরা ফরাসীতে লেখেন নি, লিখে গেছেন ল্যাটিনে। অমরত্বের একক অধিকারিণী, গৌরবের উচ্চতম শিখরাসীনা দেবভাষার হাতে আসন ছিনিয়ে সমর্পণ করে তাঁরা নিশ্চিন্ত বোধ করেছেন; অধিকন্তু, গ্রাম্য, অভাজন ফরাসী-ভাষার ওপর তৎকালীন অনেক কবি ও ঐতিহাসিকই ভরসা রাখতে পারেন নি, এবং গ্রীক্-ল্যাটিন সাহিত্যে শিল্প-দর্শন-বিজ্ঞান-নীতি ইত্যাদির চরম হ'য়ে গিয়েছে;

এমনটি আর হয় না, হবে না, এই ছিল তদানীন্তন কালের ধারণা।

রেনেসাঁস মানুষকে আর্ট এবং জীবন রসের রসিক ক'রে তুলেছিল; রেনেসাঁস-যুগের মানুষ নতুন ক'রে নিজেকে জানতে চেয়েছে, নিজের ভেতরে এবং বাইরে প্রগাঢ় বিস্ময় ও কৌতূহলের আলোকসম্পাত করেছে: বাস্তব জীবন-প্রেম, জগৎ ও জীবনকে জানবার জন্য ঊর্ধ্বাবেগ, প্রোজ্জ্বল, অবাধ আগ্রহ ও ঔৎসুক্য, জাতীয়তাবোধ এবং ব্যক্তি বাদ, এইগুলোই রেনেসাঁসের প্রাণ-স্বরূপ। জীবন-সম্ভোগের ধারা কখনও একমুখী না হওয়াতে তা ব্যাধি-বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে নি কোনো সময়,—মানুষের প্রাণবহ্নি সে সময় সহস্রশিখা হয়ে জ্বলে উঠেছে, অজস্রবিধ প্রবনর কর্মে চিন্তায় নিজেকে চরিতার্থ করেছে, অকৃপ বলিষ্ঠ জীবনোল্লাসের প্লাবনে ছোট ছোট বিধিনিষেধ জাল মন্থের খড়িমাটি কেঁদে গেছে অনেক সময়।

ক্যাথলিসিজমের পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক "সংস্কার আন্দোলন" হ'ল রেনেসাঁস-সম্ভূত সংস্কারমুক্ত, বিদ্রোহী, স্বাধীন চিন্তার প্রত্যক্ষ ফল। (অথচ রেনেসাঁস হচ্ছে গ্রেকো-ল্যাটিন পৌত্তলিক সংস্কৃতিরই প্রভাব-জাত সন্তান, ফলশ্রুতি!) এই উপলক্ষে শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্কের ঘূর্ণিঝড়ে জনমানসে বিভ্রান্তি ও বিমূঢ়তার সৃষ্টি হয়েছে সত্য, তেমনি আবার উন্মুক্ত হয়েছে নবযুগের তোরণদ্বার, অবারিত হয়েছে দুঃসাহসিক, বিপ্লবী চিন্তার অগ্রযাত্রা-পথ। অবশ্য সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য এই অভিনব মুক্ত চিন্তার প্রবর্তকদের কম নির্যাতন ভোগ করতে হয় নি, বিনা প্রতিবাদে অত দিনের কাথেলী ধর্মের গদী ছেড়েছেড়ের নি রোমান ক্যাথলিক মোহান্ত-সম্প্রদায়।

তৎকালীন যে সকল গ্রীক-ল্যাটিনবিদ্ মনীষী ও শিল্পীর প্রভাব ফ্রান্সের ওপর সর্বাধিক কাজ করেছিল তাঁদের মধ্যে আছেন পেত্রার্ক ধ্রুপদী ও বোকেচিও। ইটালীবাসী পেত্রার্ক সনেট অবলম্বনে চতুর্দশ পদী কবিতাবলী রচনা ক'রে ফরাসী জোদাক্যা দ্য বেলে'র গুরুস্থানীয় হয়ে ওঠেন; তেমনি আবার ওলন্দাজ দার্শনিক ও ধর্মবেত্তা, লাটিন ভাষায় রঙ্গ ব্যঙ্গ ও শ্লেষাত্মক কথোপকথনের রচয়িতা ইরাসমাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন রাবলে। বোকেচিও গল্পলেখক, মুখ্যত ইতালির ভাষায় ছোটো গল্পের প্রবর্তক হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

রেনেসাঁসের রস ফরাসী জীবনে প্রবেশ করেছে ধীরে ধীরে যুগে যুগে। ১৫১৫র কাছাকাছি প্রথম ফ্রাঁসোয়ার আমলে ইটালীয় লেওনার্দো ডিকির দলে এসেছে আর্টের নবযুগ। ১৫৩৪ নাগাদ গ্রীক-সংস্কৃতি-প্রেমিক রাবলে, বুদে, লাজার ও বাইফ্ প্রভৃতি প্রবাহিত করলেন ক্লাসিক বিদ্যা চর্চার তাণ্ডিরথী স্রোত। আরো পরে দ্য বেলে ও রঁসার 'বেল্ লেত্র' জাতীয় রচনার পত্তন করলেন। ধর্মীয় তর্ক-যুদ্ধের প্রথম অবতারণা করেন কাল্ভ্যা ১৫৩৫ এ; পুনর্বার ১৫৬০ এর পর রঁসার, দ্য বার্তা, দোবিঞে প্রমুখ কবিকুলের অধিনায়কত্বে এই বাগযুদ্ধ প্রবল ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, যদিও শেষ পর্যন্ত রণরত যোদ্ধৃগণ ক্লান্তি বশত শান্তি-স্থাপন ক'রে ফেলেন। এ যুগের বিখ্যাত 'এসেয়িস্ট্' মন্তেইঞের জীবন-দর্শন ছিল পরম সহিষ্ণু, স্নিগ্ধ, সরস ও নির্মোহ; অকারণ হানাহানির বিভীষিকা তাঁকে সহিষ্ণুতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল। এসব ছাড়া, সমর-নায়কদের লেখা যুদ্ধের স্মৃতিকথারও এ যুগে অভাব নেই।

মধ্যযুগের কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে ষোড়শ শতাব্দী বিশেষ কিছু পায় নি, অথবা বলা যায় নি। তবে মধ্য যুগের শেষভাগের লোকসাহিত্যে যে চিত্রাঙ্কিত স্থূল বাস্তবধর্মিতার আমরা সাক্ষাৎ পেয়েছি, মায়ো এবং রাবলের ভেতর দিয়ে যেন সেই ধারাটিই প্রবাহিত দেখতে পাই। বাস্তব-বিমুখতা এবং প্রগতি ও বৈচিত্র্যহীন রূপকের যে যুগীতে মধ্যযুগীয় অভিজাততন্ত্র কাব্যসাহিত্য অনুশীলন যুগপাক খেয়ে মরছিল শেষদিকে, ষোড়শ শতাব্দী তা থেকে তাকে মুক্তি দিল। গ্রীক্-ল্যাটিন সাহিত্যের অনুসরণে সাহিত্য নতুন প্রাণ ও

গতি লাভ করতে লাগল। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ক্লাসিক সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি নব-পরিচয়ের আত্যন্তিক অনুরাগে ফরাসী নিজেদের দেশজ সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে অশ্রদ্ধা করল এবং পরিশেষে তাকে বিস্মৃত হ'ল। মধ্যযুগের খ্রীস্টীয় ভাবাদর্শ ও শিভালরীর ঐতিহ্য বিলুপ্ত ক'রে সেই স্থানে সমাসীন হল ক্লাসিক পুরাণ, ক্লাসিক আদর্শ। অবশ্য শুধু বাহ্যিক বিজাতীয় আবরণের অন্তরালে থেকে জাতির অধিকৃত অন্তঃপ্রকৃতিটিই উঁকি মেরেছে,—জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য এত বিপুল ভরঙ্গ-অভিঘাতেও হারিয়ে যায় নি। এই প্রসঙ্গে মন্তেইন্, ছ্যুবেলে ও রঁসারের নাম উল্লেখযোগ্য। ক্লাসিক সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণের অভিযোগ এঁদের বিরুদ্ধে করা হয় বটে, এঁরা কিন্তু বহুই সাহসিকতার সঙ্গে মননের ক্ষেত্রে গ্রীক্-লাটিনের একাধিপত্যকে অস্বীকার ও প্রতিরোধ করেছেন, জাতীয় সংস্কৃতি ও ভাষাকে পারম্পর্য মুক্ত করেছেন, রক্ষা করেছেন। সচরাচর যেমন দেখা যায়, কোন নূতন বা প্রথম প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে ত্রুটিহীন হ'তে পারে না, কিন্তু না পারলেও, বিচিত্র সফলতার সম্ভাবনা সে বহন করে, ওইখানেই তার কৃতিত্ব। রেনেসাঁস যুগে জীবনের নবনব ক্ষেত্রে যে সকল নব-প্রয়াস, নব-সৃষ্টি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার আয়োজন হয়েছিল, সেগুলির মধ্যেও দুর্বলতা ছিল প্রচুর: ভাষা আকার-বিহীন, বিস্তৃত, পাঁচমিশালী, সেই সঙ্গে ছিল দাসসুলভ অনুকরণ স্পৃহা ও পাণ্ডিত্যপ্রিয়তা; রচনা-পদ্ধতি ছিল শিথিলবন্ধ। সপ্তদশ শতাব্দীর তীব্রোজস দীপ্তির পাশে এ যুগের অধিকাংশ লেখককে নিতান্ত হীনপ্রভ ঠেকে, কিন্তু তবুও আমরা দেখব, কম বিপ্লবাত্মক সংস্কার, পরিবর্তন ও উন্নতি এঁরা সংসাধিত ক'রে যান নি। সাহিত্যের চৌহদ্দী বিস্তৃততর, ব্যাপকতর হয়েছে এঁদের কল্যাণে। কাব্যে বিচিত্র অনুভবের মুক্ত অভিব্যক্তি, নৈতিক, ধর্মতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক আলোচনা, নাট্যসাহিত্যের আত্মবিকাশ, প্রত্যেকটিই এঁদের এক একটি সফল ও স্থায়ী কীর্তি। বাংলা কাব্যে প্রধান এবং মূল ছন্দ যেমন 'পয়ার', ইংরেজীতে যেমন 'আয়াম্বিক্ পেন্টামিটার', ফরাসীতে তেমনি 'আলেক্সান্দ্রিন্'। 'আলেক্সান্দ্রিনে'র জয়যাত্রা এ যুগ থেকেই সুরু হয়েছে। 'আমিও'র কল্যাণে ফরাসী-ভাষাও এই সময় থেকে একটি গ্রামাণ্য, সামান্য ও মার্জিত রূপ নিতে সুরু করল,—আকস্মিক উপভাষার বহুরূপী অজ্ঞান মুক্ত হ'য়ে একটি এক এবং অদ্বিতীয় ষ্টাণ্ডার্ড্ ফরাসী-ভাষা এতদিনে সৃষ্ট হ'তে চল্‌ল। সাহিত্যের যে সমস্ত বিভাগে ফরাসী নিজেকে শাশ্বায়িত ক'রে তুলবে, এ যুগেই তারা সুনির্দিষ্ট সুনির্ণীত হ'য়ে গেল। আর নির্দিষ্ট হ'ল সাহিত্য-রীতি, সাহিত্য-ধর্ম; ক্লাসিক-সাহিত্যের রাজপথই যে ফরাসী-সাহিত্যেরও অনুগমন পথ, গুরুগম্ভীরভাবে ঘোষিত ও প্রতিষ্ঠিত হ'ল এই মূলনীতি। প্রাচীনদের অনুকরণ কি পদ্ধতিতে করতে হবে মন্তেইন্ তাও দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন—দেখিয়েছেন কিভাবে প্রাচীন ধ্যান ধারণা ভাবনার উত্তরাধিকারকে মুক্ত-আলোচনা ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আয়ত্ত ক'রে নিজস্ব ক'রে নিতে হয়। উপরি উক্ত এই সকল সংস্কার ও পরিবর্তনের সফলতাশ্রী হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দী। (কিয়দংশে তৎপরবর্তী শতাব্দী সমূহও) তবে, ভাষার বর্ণাঢ্যতা প্রভৃতি এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এবং স্বকীয়তাও এ যুগের ছিল ষোড়শ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গেই যারা অন্তর্ধান করেছে। যে গীত-রস রঁসারের কাব্যে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে, বা রাব্‌লের পাতায় পাতায় যে বলিষ্ঠ বাস্তব-মুখিতা বিদ্যমান, পরবর্তী সাহিত্যে তার পুনরাবৃত্তি কমই ঘটেছে।

ক্লেমাঁ মারো (১৪৯৬-১৫৪৪) ষোড়শ শতাব্দীর সাহিত্য-গগনে প্রথম জোরাই-পাখী। মারো রাজ-দরবারের কবি ছিলেন; যথার্থ শিল্পী তাঁকে বলা না গেলেও তাঁর রচনা-নৈপুণ্য ও ক্রীড়া-চপলতা আজো পাঠকের চিত্ত-বিনোদনের ক্ষমতা রাখে। কাব্য-সাহিত্যে রেনে-সাঁসের সোনার কাঠির স্পর্শ লেগেছিল বিলম্বে। জটিল ছন্দের কারাগারে কবিরা বহুকাল নিজেদের স্বেচ্ছাবন্দী ক'রে রেখেছিলেন। ভাবের দিক দিয়ে মারো এই দলের থেকে খুব একটা পৃথক নন। তবে তিনি পরিচ্ছন্নতর শিল্প-দৃষ্টির অধিকারী, স্বাভাবিকতা ও সহজ রসবোধও তাঁকে একটি বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে।

মারো নরমানডি অঞ্চলের লোক ছিলেন। মার্গেরিত ও নাভারও প্রথম ফ্রাঁসোয়ার অধীনে চাকরী করতেন।

বহুবার ফেলে গিয়েছেন, ঘৃণায় নির্বাসন ব্রত ভোগ করেছেন, শেষটায় নির্বাসিত অবস্থাতেই মারা যান। দরবারের কবি হিসাবে অনেক 'ব্যালাড' 'রন্দো' ইত্যাদি তাঁকে লিখতে হয়েছে, যেগুলির বক্তব্য অকিঞ্চিৎকর কিন্তু গঠন-ভঙ্গি পরিপাটি, নিখুঁত। পৃষ্ঠপোষক রাজা রাজড়াদের কাছে লেখা তাঁর পত্রাবলীও কোন কোন দিক থেকে আদর্শ স্থানীয়। পত্র-প্রাপকের সকৌতুক সহানুভূতি ও মনোযোগ কিভাবে আকর্ষণ করতে হয় তা এই অজস্র মধ্যে রহস্যে ভরা, সরসোজ্জ্বল পত্রগুচ্ছের লেখকের ভালই জানা ছিল। প্রধানত অবথা শব্দ-চাতুরী, ছন্দের কলরব, রূপক-প্রীতি ও সহজাত চাপল্য দোষের জন্য গাম্ভীর্যের রচনা তাঁর হাতে তত ওতরায় নি। তাঁর কারাজীবনের বর্ণনা 'উকের' নিতান্তই সাধারণ ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ। তাজিলের কাব্য ও বাইবেলের অংশ বিশেষ অনুবাদ করেছেন—কিন্তু স্বভাব-সিদ্ধ চটুলতা বা চ্যাংড়ামীর জন্য সব মাটি হয়ে গেছে। (এ থেকেই বোঝা যায় ক্লাসিক সৌন্দর্য মহিমার অনুভব তখনো মানুষের অনায়ত্ত।) মহৎ কবির উপাদান মারোর মধ্যে একান্ত অনুপস্থিত, তাছাড়া স্বভাবের দরুণ কোন গভীর অনুভূতিকেই তিনি রূপায়িত ক'রে তুলতে পারেন নি। ধর্ম-সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটি উক্তি অবশ্য কিছুটা বলিষ্ঠতা দ্যোতক; নিজের শৈশব লীলার বর্ণনাও যথেষ্ট সজীব, সন্তোষ। তাছাড়া হরন্ত কৌতুকে তাঁর অনস্বীকার্য পটুত্ব স্বয়ং বোয়ালো কর্তৃক সমাদৃত। রচনা স্বচ্ছ ও কৃত্রিমতা-বর্জিত, নিজের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তিগুলি সহজ, সরল, কৌতুকোদ্দীপক। রচনা পদ্ধতিতে যে সব ছেলেমানুষী আছে, এবং প্রচুর পরিমাণেই তা আছে, সেগুলির জন্য দায়ী সেকালের প্রচলিত রীতি। (তবু এরই মধ্যে মারো কিছু কিছু উদ্ভাবনী বুদ্ধিরও পরিচয় দিয়েছেন।) নিজের জীবনের দুর্ঘটনা-দুর্ভোগের কাহিনীকে মজাদার ক'রে পরিবেশন করার বিচিত্র ক্ষমতা আছে মারোর। তাঁর গাল্‌কইঞের খানসামাটি কিভাবে তাঁকে সর্বস্বান্ত করেছিল, কিভাবে যা তিনি বন্ধী হয়েছিলেন, পুলিস তাঁকে কেমন বিদ্রূপ করেছিল তার মত সমাদরে নিয়ে যাচ্ছিল এসব কথা রসিয়ে রসিয়ে বলতে তাঁর জুড়ি নেই।

রাব্‌লে (১৪৯৪—১৫৫৩)। বিশুদ্ধ দেশজ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে রেনেসাঁসীয় ক্লাসিক-বিদ্যার সমন্বয় সর্বপ্রথম সাধিত হয়েছিল ফ্রাঁসোয়া রাব্‌লের চেষ্টনাতেই। গার্গান্ত্যুয়া এবং পান্তাগ্রুয়েলের প্রহসনে ফরাসী (গোলোয়া) কৌতুকরস, উৎসাহ ও প্রাণোচ্ছ্বাসের সঙ্গে মিলিত হয়েছে গ্রীক্-ল্যাটিন-চর্চা-সঞ্জাত পাণ্ডিত্য।

একাধারে মঠচারী সাধু, চিকিৎসক, সাহিত্য-ব্রতী, জ্ঞানতত্ত্বী ও ভোগবাদী রাব্‌লের জীবন বহু-বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। নির্বিরোধে পাশাপাশি সহাবস্থান করেছে জ্ঞান-সাধনা ও জীবন-সম্ভোগ। রাব্‌লে গোড়ায় ছিলেন বেনেডিক্টীয় সাধু, অতঃপর তাঁকে দেখি চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরূপে এবং জীবনের বাকী অধ্যায়টা কেটেছে মোটের পুরোহিত হয়ে। মন্ত্পেলিয়ে, লিয়ঁ, রোমেন, ইটালীর পথে পথে 'হুযুরের শিয়াসী' এই চকল চরিত্র এত্তিয়েনভাবের নেশায় মেতে ঘুরে বেড়িয়েছেন। প্রধান আকর্ষণের বস্তু ছিল প্রকৃতি-বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রাচীন ভাষাসমূহ। তাঁর রচনা প্রহসন-জাতীয়, কিন্তু সেটাই এর শেষ কথা নয়। ১৫৩৩—১৫৩৫ এবং ১৫৪৬ এ পাঁচ খণ্ডে গারগান্ত্যুয়া ও পান্তাগ্রুয়েলের জীবনচরিত প্রকাশিত হয়; কৌতুকে পাণ্ডিত্যে পূর্ণ এই রস-রচনাটিকে সব জড়িয়ে প্রহসনাত্মক মহাকাব্য আখ্যা দিলে ভুল হয় না।

গারগান্ত্যুয়া একটি উদ্ভট রামায়ণ-বিশেষ। পিকরা-লোকের পরাজয়, থেলাম্ মঠের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি এতে বিবৃত হয়েছে। এই মঠ তথা বিদ্যামন্দিরটি বড় ভাল; যা খুশী তাই করা যায় সেখানে। পান্তাগ্রুয়েলের প্রধান চরিত্র কিন্তু পান্তাগ্রুয়েল নয়, সে-সম্মান প্রাপ্য পান্তাগ্রুয়েলেরই অভিন্নহৃদয় প্রাণসখা হুচতুর পান্তার্জের। বিবাহেচ্ছু পান্তার্জের পরামর্শদাতা অনেক—কবি রামিনা-গ্রোবি, গলংকার হেদ ত্রিপ্‌পা, ডাক্তার রন্দিবিলি, দার্শনিক জাইরোগী, এবং পাগলা ত্রিবুলে। বিবাহ সমস্যা সমাধানের জন্য পান্তার্জ নৌকা চড়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করল এবং এই অভিযানে অনেক কীর্তিই সে করল।

পাস্কার্ল অত্যন্ত আমুদে ও রসিক; সে খোশগোল্প, চতুরালীতে দুই, বুদ্ধিতে ওস্তাদ, কিন্তু মহা ভীতু এদিকে প্রঁশুভিয়ে ও গাগেস্তুয়া পিতাপুত্র, প্রকৃতিতে দু'জনই শান্তিপ্রিয়, অমায়িক। রাজা হিসাবেও গাগেস্তুয়া অতি চমৎকার। পান্তাগ্রুয়েল গাগেস্তুয়ার সন্তান এবং প্রঁশুভিয়ের পৌত্র। সে বেশ খোশমেজাজী, দিলদরিয়া এবং পরম আশাবাদী; কাকেও চিন্তায় কোন ধারই ধারে না। কৌতুকের উপাদান রাব্‌লের রচনাতে অজস্র। কতকগুলি উক্তি তো রীতিমত প্রবাদে পরিণত হয়েছে। পাত্র-পাত্রীদের আকৃতি অতি-মানবীয়। সেই দৈত্যতুল্য শক্তি দিয়ে যে সমস্ত কর্ম তারা সংঘটিত করে সেগুলি কিন্তু নিতান্ত আকিঞ্চিৎকর। 'সাধা' এবং 'সাধিতে'র মধ্যে অসঙ্গত তারতম্য। স্থানে স্থানে মহাকাব্যোক্ত ঘটনা সমূহের ব্যঙ্গময় অনুকরণ রয়েছে—যথা নরক দর্শন। (প্রাচ্যের মহাকবিদেরও এটি একটি প্রিয় বিষয় বলে মনে হয়, বেদব্যাস থেকে মধুসূদন অনেকেই স্ব-স্ব নায়ককে নরক ঘুরিয়ে এনেছেন। রবীন্দ্রনাথের সোমকও বাদ যায় নি।) উদ্ভট কল্পনা, অদ্ভুত রসাশ্রিত বর্ণনা প্রচুর আছে আগেই বলেছি, রহস্যচ্ছলে রাব্‌লে উচ্চ ও সত্যতর তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। রাব্‌লেকে এপিকিউরাস্-পন্থী (এপিকিউরাসবাদ চার্বাক-বাদেরই উন্নততর প্রতীচ্য সংস্করণ) বলা চলে এবং এই এপিকিউরাসীয় নীতিই তাঁর রচনার ভিত্তিস্বরূপ। তাঁর পান্তাগ্রুয়েলিজম্ অর্থাৎ স্ফূর্তি, সুরাপান এবং প্রাণখোলা হাসিতে বিশ্বাসী, 'কারণ হাসতে পারাটাই মানবজাতির বৈশিষ্ট্য'; জ্ঞানানুশীলনের পাগল-করা, অসংযত, দুর্বার নেশার সঙ্গে চাই উদ্দাম প্রমোদ। আকস্মিক বা দৈব-দুর্ঘটনায় বিচলিত হবার কিছু নেই, শাশ্বত চিরন্তন ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে নিয়ে মাথা ঘামানো নিরর্থক, হোক্ তা মানুষের ভুলত্রুটি অনিচ্ছাচার, হোক্ তা নিজেরই কোন ঈপ্সিত বস্তু। খানিকটা 'যা হবেনু তা হবেন'র মত। ফলের ভাবনা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই। এই সুখবাদী অথচ বৈরাগী জীবন-দৃষ্টির সঙ্গে রাব্‌লের রচনায় অধিকন্তু হয়েছে রাশিকৃত পাণ্ডিত্য, প্রাচীন ইতিহাস ও প্রকৃতিবিজ্ঞান-ঘটিত শব্দ সম্ভার। রাব্‌লের রচনা-ভঙ্গি অত্যন্ত জটিল, মৌলিক, সেই সঙ্গে বাস্তবধর্মী, প্রাচুর্যে ঐশ্বর্যে তাঁর শব্দভাণ্ডার তুলনারহিত। তাঁর কল্পনাও নির্ভীক, দুর্ধর্ষ, আনন্দ-চঞ্চল; বিবিধ বিষয়ে বিস্ময়কর তাঁর জ্ঞান। ভাষা অবশ্যই বা অপরিচ্ছন্ন বটে, কিন্তু জল-প্রপাতের মতই অজস্রধারা ও অকৃপণ, উচ্ছ্বসিত বন্যাবেগের মতই কূলপ্লাবিনী। সর্বজাতের সর্বপ্রকারের শব্দ রাব্‌লে নির্বিচারে ব্যবহার করেছেন, প্রতিশব্দের পিছনে প্রতিশব্দ জুড়ে সুদীর্ঘ মালা গেঁথেছেন, অসংকোচে ব্যবহার করেছেন অনন্তার বাগ্‌ভঙ্গি। ল্যাটিন বাক্য-রীতির অনুসরণ ক'রে বাক্যান্তর্গত পদ-সমূহের অবস্থান উলটে পালটে দিয়ে এবং ক্রেয়াসংকারের চালাও প্রয়োগে রচনাকে বিচিত্র কৌতুকাবহ করে তুলেছেন তিনি। কিন্তু স্থানে স্থানে চমৎকারিত্ব ও প্রাণরসে পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, সামগ্রিক বিচারে এ লেখাকে রসোত্তীর্ণ বলা চলে না কারণ পাণ্ডিত্যের ভার সাহিত্যের পক্ষে অনেক সময়ই দুর্বহ হ'য়ে ওঠে। তাছাড়া রসিকতাগুলি অনেক স্থলে স্থূল এবং অমার্জিত। রাব্‌লে রেনেসাঁসীয় বিদ্যার একটি সজীব বিশ্বকোষ ছিলেন বল্লেই চলে: সে যুগের উৎসুক আগ্রহাধীর জ্ঞানস্পৃহা এবং তাহা সম্পর্কিত জ্ঞান দুই-ই তাঁর মধ্যে পুরোমাত্রায় বর্তমান। ছিল না যেটা, সেটা হ'ল মাত্রাজ্ঞান, সংযম ও পরিমিতিবোধ; প্রাচীনদের যে নিখুঁত শিল্প-চেতনা ছিল সেটি তখনো ধর্মাদী-সাহিত্যের আয়ত্তাতীত।

বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণে রাব্‌লের আগ্রহ ও নৈপুণ্য সীমাহীন। শ্রীজাতি, সাধু সন্ন্যাসী, বৃদ্ধ ব্যবসাদী, ধর্মদ্রোহী, কেউই তাঁর লক্ষ্যভেদী মর্মঘাতী বাক্যের হাত থেকে নিস্তার পায় নি। সমাজের যে-সকল শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ তীব্রতম আকার ধারণ করেছে, ধর্মান্ধ, ষণ্ডীকর্মতুল্য পরমত-অসহিষ্ণু 'সরবন্'-বিহারী শাস্ত্রবাগীশ সম্প্রদায় তাদের অন্যতম। বিচার-ব্যবস্থাকেও রেহাই দেন নি রাব্‌লে। রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর মতামত খুব স্পষ্ট নয়। জ্ঞানপিপাসু সারস্বত ব্রতধারীদের যে সমাজে

কোন রকম আগন্তুক অশান্তি ও ক্লেশে জর্জরিত হ'তে হবে না তেমনি একটা সমাজ-ব্যবস্থায় তিনি আগ্রহী। গার্গীস্ত্যায়ার রাজত্বই সম্ভবতঃ তাঁর দৃষ্টিতে আদর্শ স্থানীয় অর্থাৎ রাজা হবেন শান্তি-প্রয়াসী, পিতৃতুল্য, প্রায় বীতোদাস্ত। বাস্তব-বিমুখ 'টুঁলো' শিক্ষার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না। তখনকার দিনের বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা কেবল ধর্মতত্ত্ব, আইন এবং ন্যায়শাস্ত্রের কতকগুলি বস্তুনিরপেক্ষ দুরূহ তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। রাব্‌লের নায়ক 'গারগান্ত্যুয়া'র বালা-শিক্ষক 'সনোক্রাত্' কিন্তু শরীরচর্চা ও বিজ্ঞানপাঠের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাছাড়া প্যারিসে পাঠনিরত গান্তাগ্রুয়েলকে বৃদ্ধ গারগান্ত্যুয়া যে চিঠি লিখেছিল, তা থেকেও রাব্‌লের শিক্ষা-দর্শন সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা হয়। বিজ্ঞানচর্চা থেকেও তিনি অধিকতর মূল্য দিয়েছেন যে জিনিষের চর্চাকে,—সেটি হচ্ছে বিবেক-বোধ, কেন না, 'বিবেক-বঞ্চিত পরা-বিদ্যা মানবাত্মাকে শুধু বিকার এবং বিনাশের পথেই চালিত করে'! নৈতিক চেতনার উদ্বোধন ভিন্ন, সাহিত্য-বুদ্ধির বিকাশ-ও তাঁর মতে শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ।

জোয়াকীম্ দ্যু বেলে। ফরাসী কাব্যের আকাশে রেনেসাঁস-বিচ্ছুরিত সোনার আভায় মণ্ডিত যে দীপ্তোজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ এই সময় ফুটে উঠেছিল, এবং যার অবিসংবাদিত নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন রঁসার, সেই 'সপ্তর্ষি' (নামান্তরে 'প্লেইয়াদ্') কবিগোষ্ঠির সারথ্য বা অগ্রদৌত্যের গৌরব জোয়াকীম্ দ্যু বেলেরই প্রাপ্য।

সত্য

॥ শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার রায় ॥

দুই সত্য দেখি,—নহে তাহা—
একই সত্য দুইরূপে এ বিশ্বে নিয়মি।
এক, যাহা রহে স্থির,
সকল চাঞ্চল্য মাঝে রহিয়াছে ধীর,
পরিবর্ত্তনের মাঝে সদা চিরন্তন,
নিত্য ও শাশ্বত সনাতন।
সৃষ্টি তার আদিকাল হতে
তথা হতে উৎসারিত বিলয় তাহাতে।
তাহাতেই রয়েছে বিধৃত,
তাহাতেই কেন্দ্র করি চির আবর্ত্তিত।
আর সত্য সে যে লীলাময়
রূপে রূপে বিভাসিত সারা বিশ্বময়,
সাগরের তরঙ্গের মতো
বিরাম বিহীন সে যে অতন্দ্র নিয়ত।
সংখ্যাহীন অজস্রতা কে করে গণনা।
অনাদি অতীত হতে চলিয়াছে তাহার সাধনা
প্রতি পলে পলে
অণুপরমাণু মাঝে অশান্ত হিল্লোলে
উঠিতেছে তার কলরোল
সমুদ্র কল্লোল সম অশান্ত উল্লোল।
এই আমি।
চির স্থির, সুচির চঞ্চল,
কখনও প্রশান্ত ধীর, কভু বা উদ্বেল;
ঘোর মাঝে পাই যে আকাশ
একই সত্যের দুই বিভিন্ন প্রকাশ।
এই বিশ্বে যাহা কিছু রাজে
দুই সত্য অন্তরে বিরাজে
নিত্য বিবর্ত্তন সাথে যাহা রহে স্থির,
চির পরিবর্ত্তনেও অচল অধীর।
নিত্য ও লীলায় এই সত্যের বিকাশ—
যে পেরেছে বুঝিবারে, কভু তার নাহিক বিনাশ।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৩—

(৫৫)

সে যাওয়ায় পর প্রেসে যায়। মঠের কার্যসূচী ও সাধারণ সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ চিঠি ছাপাইবার জন্য যায় ও কয়েকটী ফোন করে।...ঔষধিটী খবর দেয়...। সব ঘটনাই দেখিতে হইবে। ভাসিয়া পড়িলে তো আমার চলিবে না। সমস্ত অবস্থার মধ্যে থাকিয়া মীমাংসা করিতে হইবে, গন্তব্য পথে চলিতে হইবে। যে পথে নামিয়াছি সে পথে ইহা অস্বাভাবিক নয়। সমস্ত ঝড় আমার চতুর্দিকে ঘনীভূত। কোথায় দাঁড়াই ?...

১৮ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, আমার চতুর্দিকে আবেষ্টন, ঘটনাসমূহ এমন-ভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে যে, আমি যেন দাঁড়াইতে পারিতেছি না তোমার শরণাগতির মধ্যে ছাড়া। প্রকৃতির বুকে ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ না হইলে অপরা প্রকৃতিতে পরা প্রকৃতিতে গড়িয়া তুলিব কি করিয়া ? সব ঘটনার চরম পরিণতি তুমি, সমস্ত মন্থনের ঘনীভূত ফল তুমি। তাই তোমার দিকে চাহিয়া থাকিব, তোমার চরণে পড়িয়া রহিব, ঘটনাসমূহ আমার শরণাগত জীবনে আছাড় খাইয়া খাইয়া পরা প্রকৃতিতে গড়িয়া উঠিবে—এই আশায় বসিয়া আছি। আমি চলিব, সবাই ছাড়িয়া যাইতেছে—তবুও চলিব। তোমার জয় হউক। সকালে সেবানন্দ ফুল দিয়া যায়, আগামী শনিবারের সভার জন্য নোটিশ নিয়া আসে। ...তাহার (সত্যেনের) নিকট কৃষ্ণের আমার জীবনে প্রবেশ করিবার ও আকর্ষণ করিবার কথা (সেই স্বপ্ন) বলি। (স্বপ্নে) মৈলদহবাসী আমার বুকে উঠিয়া আমার পুরুষাঙ্গ লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া কেমন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোর কাম নাই'—তাহাও বলি।...

১৯শে সেপ্টেম্বর

শ্রীগৌরসুন্দর আমার, তুমি ধরায় ধূলায় লুটাইলে, পরিণামের বুকে অপরিণামীর রসলীলার প্রতিষ্ঠা করিলে, সকল নিপীড়িত, সকল লাঞ্ছিতদের গর্ব প্রতিষ্ঠা করিলে, ধরার ধূলিকে বৈকুণ্ঠের চিৎ সত্তায় গড়িয়া তুলিলে। সেই তুমিই আবার এলে নিত্যগোপালরূপে তাহার উপযোগী দর্শন লইয়া। শক্তিই ব্রহ্ম, পরিণামীই অপরি-ণামী, চঞ্চলতাই অচল—ইহার দর্শন তুমি প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলে। এই দর্শন প্রচারিত না হওয়ায় জন্য এতদিন বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া মহাপ্রভু পর্যন্ত কাহারও dynamism দানা বাঁধিতে পারে নাই। ফলে পরিবার সমাজ রাষ্ট্রে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পায় নাই। এইবার তোমার অবতরণে সেই অসুবিধা দূর হইল। এইবার গতির বুকে স্থিতির রসলীলা আস্বাদিত হইবে। চৈতন্য আসে কিছু ফুল লইয়া...।...কাল সকালে সত্যব্রত বেহালা যাইবে। আনিয়াছিলাম, মুগ্ধ হইয়া গেল—ইহাই আমার তৃপ্তি। সকলেই চিন্তার কর্মপন্থায় এমন করিয়া সরিয়া গিয়াছে যে, আমার আজ একা চলা ছাড়া দ্বিতীয় কাহারও কথা ভাবিবারও সুযোগ নাই।

২০শে সেপ্টেম্বর

নিত্যসুন্দর আমার, তুমি আমি এমন ভাবে এক-মিশ্রণ হইয়া রহিব আমার ব্যষ্টি-জীবনের ও বিশ্ব-জীবনের সকল সমস্যা যাহাতে আছাড় খাইয়া খাইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হইবে, জীবনে লীলারসাস্বাদন ঘন হইয়া উঠিবে। তুমি-আমি একপ্রাণ। তোমার মধ্যেই আমি জুড়াইতে চাই। তুমি আসিয়াছ এক-বিশ্ব গড়িয়া তোলার উপযোগী এক দার্শনিক রাসচক্র সৃষ্টি করিবার দুর্জয় সংকল্প লইয়া। দার্শনিক রাসচক্রের চক্রেশ্বর তুমি। সর্বমতবাদ, সর্বমতবাদের প্রবর্তকগণ অন্যোন্যবদ্ধবাহু হইয়া দাঁড়াইবে, তুমি প্রতি দুইটী মতবাদের মধ্যে গৃহীতকণ্ঠ হইয়া

দাঁড়াইবে। তোমার এই রাসলীলার জয় হউক। সত্যব্রত বিশ্বনাথের সঙ্গে ট্যাকসীতে ৬।০ টায় চলিয়া যায়। রেণু ৯টার পর একবার বাহির হইয়া ১টায় আসে, আবার যাইয়া বাহির হয়, ফেরে প্রায় ৫টায়।... সত্যেন শাস্ত্রী আসিয়াছে...কার্যকরী সমিতি গঠন ও কাজকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সর্বকে কেন্দ্র করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। 'চৌদিক চাপিয়া বোল'—জনসাধারণকে চাপিয়া ধরিতে হইবে, বালীগঞ্জের এ দিকটাকে প্রথমে আলোকিত করিতে হইবে। প্রতি সপ্তাহে বা ১৫ দিনে সভার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বরিশালের ভাষায় 'খোলা কাগজে' (?) আরম্ভ করা হইবে। সেবা করার যে সুযোগ ও সময় আসিয়াছে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। প্রাণপণ করিব। সত্যেনের যাতায়াত খরচ দিব—সত্যেন উহা শতবার্ষিকী কমিটি হইতে নিতে বলে। উহা আমার পক্ষে undigoified। এইটুকু খরচের সামর্থ্য না থাকিলে সভাপতি হওয়া উচিত নয়। ছোটখাট খরচ আমার করা উচিত।...

২১শে সেপ্টেম্বর

ওগো গন্ধোন্মাদিত মাধবী শ্রীরাধারাণী আমার, তোমার জীবনের সুগন্ধে সুবাসে আমার মাধব উন্মাদ। এমন তুমি আমাকে অযাচিত করুণায় তোমার আপনার করিয়া লইয়াছ। ওগো সৌভাগ্যরেখাচ্যা পরাণপুতলী আমার, তোমার সৌভাগ্যের এক কণা তুমি আমাকে দিয়াছ। বলিবার আমার কিছু নাই। তোমার সর্বশ্রেষ্ঠতম তত্ত্ব ও রসস্বরূপ বুঝিবার ও উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য আমাকে দিয়াছ। আমি কেমন করিয়া তোমাকে পাইলাম! এমন সার্বজনীনরূপে কেহ তো তোমাকে পায় নাই! তোমাকে আমি কোথায় রাখিব?...তোমার জয় হউক!...সত্যেন আসে ২টায় পর। তাহার কাছে ঠাকুরের সম্বন্ধে সেই স্বপ্নের কথা বলি, 'পরং মনোহরপুকুরে এসে থাকুক'। আমি তো মঠের সেবা করিতে চাই। পথ যে পাই না। ঠাকুরের সেবা বই আমার দেহপ্রাণের আর মূল্য কি? যে সুযোগ ও মর্যাদা থাকিলে সেবাব্রত সুসম্পন্ন হয়, তাহা আমার কই? প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেবা করা যায় না, সেবা করিয়াই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হয়—ইহা আমি বুঝিয়াছি।...

২২শে সেপ্টেম্বর

নিত্যগোপাল, স্বামী আমার, মনে পড়িতেছে সেই অনেক দিনের আগের স্বপ্নের টেলিগ্রাম—'ঠাকুর কাবা-মেলে বলিলেন, পরং মনোহরপুকুরে এসে থাকুক'। আমি তো আসিয়াছি। আমার দেহ মন প্রাণ বুদ্ধি অহঙ্কার সব তুমি লও। আমি তোমার আমি বনিয়া যাইব। তোমাকে গর্ভে ধারণ করিব, আমার সকল অঙ্গের নিংড়ানো রস সিঞ্চন করিয়া তোমাকে পোষণ করিব, বিশ্বের সামনে তোমাকে প্রকাশ করিব। আমি নিত্যগোপাল প্রকাশিনী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিব—ইহাই আমার সার্থকতা। আমাকে সার্থক কর। আমি কোন দিন কিছু চাই নাই। প্রতিষ্ঠা চাই নাই, সেবাই চাহিয়াছি। কংগ্রেসের সভাপতির পদ তো আমি নিলেই নিতে পারিতাম। সাধ্য জিনিষ আমি ছাড়িয়াছি। আমি সাধ দিটাইয়া সেবা করিয়াছি। 'শূকরী বিষ্ঠা'র মত প্রতিষ্ঠার পথ আমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছি। তুমি এস আমার জীবনে, প্রকাশিত হও। রেণু সকালে বাহির হইয়া ৯।টায় পর আসে, আবার ১২।টার পর বাহির হইয়া ৫টার পর আসে। সত্যেন আসে ২টায়। দীর্ঘ আলোচনা হয়, পাঠ হয় না। ঠাকুরের দিব্য দর্শন ও ভক্তদের কাছে তাহাদের সম্বন্ধে ঠাকুরের 'আমার যারা দেখিবে, তাহারা মুক্তি পাইবে'—এই সকলের সামঞ্জস্য কোথায় তাহার আলোচনা হয়। ঠাকুর সকলের সামনে 'পাওয়ার' একটা আস্বাদন দিয়া গিয়াছেন, সেই হিসাবে যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাঁহারাই পাইয়াছেন। কিন্তু সেই পাওয়াকে সাধনার ভিতর দিয়া আবার না পাইলে সে পাওয়া যে না-পাওয়ায় পরিণত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত সর্বত্র রহিয়াছে। 'সব ভার আমার উপর রহিল'—ইহা যদি কেহ সত্যই বিশ্বাস করে, তবে তাহার জীবনে যে প্রেম-প্লাবন নামিয়া আসিবে—ইহা নিঃসন্দেহ। তাঁহার কথায় বিশ্বাস করি না, শুধু ঐ সব উক্তি উদ্ধৃত করিয়া নিজেদের অলসতা ও কর্ম-বিমুখতায়

পরিচয় দিতেছি। দেবদেবীগণ স্বপ্নলোকের ধন, জাগ্রতের ক্ষেত্রে অবতরণ করিবার জন্যই শুধু প্রকাশিত। জাগ্রতের স্তরে না নামাইলে তাঁহারা আর আসেন না।...

২৩শে সেপ্টেম্বর

ওগো নিত্যগোপাল, প্রাণ আমার, সেই ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের চাকুরী ছাড়ার পর হইতে তোমায় অন্বেষণ পথ বহিয়া চলিয়াছি। ডুবিয়া যাইতে পারিতাম, শত আসক্তির বন্ধনে আটকাইয়া যাইতে পারিতাম, শত অভাব অভিযোগের মধ্যে নিষ্পেষিত হইতে পারিতাম, তুমি কূল দিয়াছ, রক্ষা করিয়াছ, আগাইয়া নিয়া আসিয়াছ; আবার নূতন করিয়া নবোদ্যমে সেবার কাজে নামিবার জন্য চঞ্চল করিয়া তুলিতেছ। তুমি চির বৈরাগী, চির সংসারী। আমার অন্বেষিত প্রাণ, তোমাকেই চাই। তুমিই অন্বেষিতকে জানিবার ছুঁইবার কৌশল জান। তোমার মধ্যে বাক্‌চক্ষুশ্রোত্রমনের মহানির্ব্বাণ হইয়াছে। সকলের সম্পদ তোমার মধ্যে কেন্দ্রীভূত। আমার জীবনে অন্বেষিত তোমার জয় হউক। বেলু সকালে যাইয়া বাহির হয়...ফেরে ৫টায়।...সন্তোষের সঙ্গে আমার জীবন-ধারার কিছু কথা হয়। আমাকে মানুষের জীবনের প্রতিটী টিকি অন্যের জন্য কি সংগ্রামই না করিতে হইতেছে! শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া ছিলেন, মহাপ্রভু কত ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছেন, ঠাকুরের কত বিভূতি ছিল, বিবেকানন্দ ভারতের বাহিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এ দেশকে নাড়াচাড়া দিয়াছিলেন। আমার এতটুকু ঐশ্বর্য্য নাই। কি তর্কের সম্মুখীন আমাকে অতি ছোট ব্যাপারের জন্য হইতে হয়। ঠাকুর চুড়োর সর্ব্বিষ পরিপাক করিয়া নির্বিষ করিয়াছিলেন। সন্তোষ প্রতিবাদে দেখাইয়া বলে—আপনার এখানে না আসিলে কবে মরিয়া যাইত। হয়তো সত্য। কিন্তু তাহা তো উপলব্ধি ও স্বীকৃতির উপর নির্ভর করে। চুড়োকে নির্বিষ করা তো প্রত্যক্ষ সত্য—মাষ্টারমশাই, কেশবানন্দ দুই-ই তাহা জানিতেন। কাহারও জীবনের সূচাগ্র জমিও বিনা সংগ্রামে আমার সামনে সঁপিয়া দেয় নাই। আমি যে আর পারি না। ঐশ্বর্য্য তো চাই না। শক্তির চাপ দিয়া হাসি আনিয়া আমার কি তৃপ্তি হইবে? নীলুর নিকট এক পোষ্টকার্ড নেই—'তোমার দুঃখ একটুকুও দূর করিতে পারিলাম না এই দুঃখ রহিল। তবে দুঃখের সঙ্গে আছি—এই আমার সান্ত্বনা।...

২৪শে সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, যাহাদের নিয়া একদিন তোমার সামনে নরনারায়ণ আশ্রম স্থাপন করিয়া ২৪।২৫ সাহানগর রোডে বসিতাম, আজ তাহারা সরিয়া পড়িয়াছে। আমি আজিও আছি। সেদিন ঘর ভরতি লোক ছিল। আজ কেবলানন্দ আস্বাদন করিতেছি। 'সজনে] নির্জনে থাকি' তোমাকে লইয়াই থাকিব। বুকটা আমার ভাঙিয়া যাইত যদি না আমার বুকে তুমি থাকিতে। সব শূন্যতাকে তুমি পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ। কোনও একটিকে লইয়া টিকিয়া থাকা continue করা কি কঠিন ব্যাপার। পরিণাম-ধর্ম্মী প্রকৃতির স্তরে থাকিলে এইরূপ তো হইবেই। অপরিণামী পুরুষের সংস্রব থাকিলেই না 'সৎ' (existence) continue করা সহজসাধ্য হয়। তুমি বুকে আছ তাই চলিতে পারিতেছি, চলিব। তোমার জয় হউক। বেলু যাওয়ার পর বাহির হয়...সন্ধ্যার সময় ফেরে।...বিষয় চলিতেছে কাড়াকাড়ি—ভগবান লইয়া কাড়াকাড়ি, গুরু নিয়া কাড়াকাড়ি, কে বেশী সেবা করিল কে কম সেবা করিল ইত্যাদি লইয়া, ধন লইয়া কাড়াকাড়ি, পদ লইয়া কাড়াকাড়ি। ঠাকুর, আমাকে এই কাড়াকাড়ির মধ্য হইতে মুক্ত কর। —র আজ মামলার কথা ছিল। আবার তারিখ পড়িল কবে তাহা জানাইল না। আমাকে জানাইবার দরকার কি? আমার শুধু self-imposed দায়িত্ব পালন করিবার জন্য প্রাণপণ করিতে হইবে।...

২৫শে সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, আমার জীবন-রথের সারথি, তুমি আবরণ করিয়া রাখিয়াছ বলিয়াই না আজও আমি আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াও নিষ্পেষিত হইয়া ধরার ধূলিতে মিশিয়া যাই নাই? আমি অপ্রতীকার, অশস্ত্র, নিরস্ত্র, কাহারও বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে

না। আমি কত বিষ খাইয়াছি, বিষের জ্বালায় পুড়িয়া যাই নাই। কত আঘাত আমার সর্ব শরীরে, তবুও ক্ষতবিক্ষত হই নাই। সে শুধু তোমার মহিমা। আমি বিষ্ণুহাত; তাই তোমার দ্বারা রক্ষিত আমার এই দেহমনপ্রাণ সব তুমি লও। আমাকে বস্তু করিয়া লও। কাড়াকাড়ির রাজ্য হইতে, তর-তম উচ্চ-নীচের রাজ্য হইতে আমাকে মুক্ত কর। আমাকে বুকিতে দেও তোমার আলোকে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই মন্ত্রের তাৎপর্য।...আমি মঠে নামি, বেণু প্রেসে যায়।... আজিকার preamble-এর আমার আলোচনা খুব impressive হইয়াছে। জনরঞ্জনবাবু আসিয়াছিলেন। বলিলেন, 'কাজ দানা বাঁধিতেছে'। ৪০ জনের উপর হইয়াছিল।...

২৬শে সেপ্টেম্বর

শ্রীরাধা, কৃষ্ণপ্রণয় বিকৃতি আমার, সকল বিকারের, সকল পরিণামের সফলতা ও সার্থকতা তুমি। তোমাকে বুকে লইয়া আমি সকল বিকারকে পরিশাস্ত করিব, বি-কারে গড়িয়া তুলিব, সকল পরিণামকে গায়ে মাখিয়া রসময়ী হইব, তোমার রসলীলায় স্নান করিব। তোমার জীবনে সকল বিকার ও নির্বিকার গলিয়া একাকার হইয়াছে। তাই তুমি নৈর্গুণী, নৈর্বাণী। তোমার দেহ চিজ্যোতিঘন। আমি চিন্ময়ী-মৃন্ময়ী রূপকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে চাই, আদর করিতে চাই। বিশ্বভুবনে তোমার দিব্য রূপের জয় হউক। ১২টার পূর্বে মহেন্দ্র দত্তের সঙ্গে বিক্সায় তাহার বাসায় যাই।.. গৌরগোপালের নিত্যগোপাল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হয়। গৌরকে অবলম্বন করিয়া একদিকে বর্ণাশ্রম, অপর দিকে বিচিত্রবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থানুসারে সহজিয়া ধর্ম সমভাবে প্রকাশিত হয়। গৌরসুন্দর আবার না আসিয়া ইহার সমাধান না করিলে অন্য কাহার পক্ষে ইহা সম্ভব? দর্শন ক্ষেত্রে 'নিত্য সত্য' ও 'অনিত্য সত্য' শব্দগুলির প্রবর্তন করিয়া নিত্যগোপাল ভারতবর্ষে দার্শনিক শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত হইবেন। 'প জয়তম্, যে চিম্ চিম্, নি চুপ'—নিত্যগোপালের মৌন ভাঙিবার দিন সমাগতপ্রায়। প্রত্যেক তত্ত্বের মেয়াদ আছে। সেই মেয়াদ পূর্ণ না হইলে অপর তত্ত্ব আসে না। পুরুষ-প্রকৃতির সমন্বয় আনিয়া গৌর অমর, সেই পুরুষ প্রকৃতির সমন্বয়কে দার্শনিকভাবে বর্তমান যুগের উপযোগী করিয়া প্রচার করিয়া নিত্যগোপাল সকলই অবতার-বরিষ্ঠ। সব একদিন নিত্যগোপাল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারই অংশ ও বিকাশ রূপে পরিগণিত হইবেন।.. সন্ধ্যায় প্রথমে চৈতন্য ও প্রকাশানন্দ, পরে চিদানন্দ আসে। নবদ্বীপের বিজ্ঞানানন্দ সভা না থাকিবার কথা জানাইয়াছে।...

২৭শে সেপ্টেম্বর

নিত্যগোপাল, গৌরগোপাল আমার, গৌরগোপাল-জীবন অবলম্বন করিয়া যে যে সমস্যা—বর্ণাশ্রম ও সহজিয়া, ভক্তিবাদ ও অদ্বৈতবাদ তলিলে জীবের হয় সর্বনাশ, বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় নাস্তিক ও আর্য ধর্ম সম্বন্ধীয় সমস্যাসমূহ উদ্ভূত হইয়াছিল। তাহার তুমি সমাধান দিয়া আসিয়াছ নিত্যগোপাল-রূপে। রাসবিলাসের পরিণতি গৌরগোপালে, গৌরগোপালের পরিণতি নিত্যগোপালে। 'প্রকৃতিশ্চ—প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধা...', 'অভিধ্যোপদেশাৎ চ', 'সাক্ষাৎ চ উভয়ায়ানাৎ'—ব্রহ্মসূত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রাধাভাব চুরি করিয়া গৌর হওয়ার তত্ত্ব রহিয়াছে। গৌরগোপাল আবার কাল বিবর্তনে নিত্যগোপাল হইলেন। যে দর্শন প্রচারিত হইলে ভারতীয় স্মৃতি ধর্ম আর্যধর্মের সঙ্গে যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগের মানুষের dynamism সমন্বিত হইতে পারে, নিত্যগোপাল তাহাই দিতে আসিলেন। তোমার জয় হউক। শরীরটা আজ ভাল নয়।...৯টায় দশগ্রামের গোপাল দাস আসে। রাজনীতির অনেক কথা হয়।—কে আমার কাছে জিজ্ঞাসা না করিয়া (শতবার্ষিকীর কার্যকরী সমিতিতে—ঊঃ তাঃ সঃ) চুকাইয়াছে। সকলেই আমার সততার সুযোগ নিতে চায়। আমার আর সত্য মনোনয়ন দায়িত্ব আমার উপর রাখা উচিত হইবেনা। সত্যেন আমার সম্বন্ধে বলে, আসন করিয়া বসিয়া থাকিলে মনে হয় নিত্যগোপাল কায়া। আমার কায়া তাঁহারই ছায়া।...

২৮শে সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, আমার সমস্তাসঙ্কুল জীবনের সঙ্গী আমার, তুমি নিজ হাতে আমার সকল সমস্যার সমাধান করিতেছ। তুমি বলিয়াছ, 'শরৎ, তুমি যখন যেখানে আছ, আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি'। তুমি সত্য সত্যই সঙ্গে সঙ্গে আছ। তুমি তোমার কথা রক্ষা করিয়া আসিয়াছ। আরও বলিয়াছিলে নবদ্বীপ ধামে জলমগ্নতার স্বরে—'আর কি, টেনে তুলব'। ডুবিয়া তো যাইতে পারিতাম। কোথায় ডুবিয়া যাইতাম যদি না তুমি প্রত্যক্ষভাবে আমার জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকিতে। আচ্ছা, লোকে কেন বলে যে বলিয়া থাকিলে তোমার ও আমার শরীরের ঝোল একই রকম। লজ্জাও করে, গর্বও বোধ করি। কোথায় তুমি আর কোথায় আমি! আমার দেহে তোমার প্রকাশ? সত্য হউক; আমার সর্ব দেহে মনে প্রাণে তোমার প্রকাশ জন্মিয়া উঠুক। আজ অনেক মাস পরে হরিতকী খাইলাম। রেণু সকালে খাইয়া বাহির হয়, ফেরে ৫টার পর।...৪।৫টার পর সন্তোষ আসে। তাহার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়—ঠাকুরের উপর সম্পূর্ণ আস্থা না থাকিলে কি ভাবে সে প্রচার করিবে। মঠে থাকিতে হইলে কি ভাবে থাকা উচিত, ঠাকুরের জীবনে যে নরের পরিচ্ছিন্নতা ও নারায়ণের অপরিচ্ছিন্নতা মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়াছে, তিনি যে মহাপ্রভুর 'অচিন্ত্য'-এর সঙ্গে যুচাইয়া সহজ বেশ ধারণ করিবার পথ পরিষ্কার করিবার জন্য মঠে মেয়েদের স্থান দিয়াছেন, 'অবধূত' হইয়াছেন—ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। সন্তোষকে চিঁড়া, দই, রসগোল্লা খাওয়ানো হয় তাহার জন্মদিন বলিয়া। আমি বলিলাম, তোমাদের—সন্তান-সন্ততিদের—জন্মোৎসব তো করিতে চাহিয়াছিলাম। দিলে কই? ইহাতে সে বিহ্বলতা প্রকাশ করে। ইহাদের অপেক্ষা করিয়া জীবন কাটাইলাম। পাইলাম না। সন্ধ্যার পর নিত্যানন্দ আসে। তাহার সঙ্গে প্রাণখোলা আলোচনা হয়।...

২৯শে সেপ্টেম্বর

নিত্যগোপাল, নরনারায়ণ আমার, অপরিছিন্ন তুমি অথচ পরিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্রে শুচিশুভ্র শৃঙ্খলামুক্ত আচরণ করিয়া গিয়াছ। সমাধিমগ্ন হও তুমি ক্ষণে ক্ষণে, অথচ তুমি কেমন কিটফাট নর্ম ব্যবহারে! তোমার মত সমাধিস্থ পুরুষের এমন লোকব্যবহারজ্ঞ আর তো কাহাকেও দেখি না। তুমি অদ্ভুত। মহাভাবে মগ্ন তুমি, অথচ তোমার কোমরের কাপড় খসে না; তুমি মূর্তিমান ছন্দ, তুমিই বেদমূর্তি। এমন ব্যাপক জীবন এমন ভাবে গণ্ডীর মধ্যে বিচরণ করিতে পারে, ইহা কল্পনার অতীত ছিল। তোমার জীবনে তাহাই বাস্তব হইয়াছে। ছোট পেনসিলটি, বুকপোকেটের সুতাটুকু, উঠানের দুর্বার ঘাস তুমি কি যত্ন করিয়াই না রাখিতে। অথচ তুমি সমাধিমগ্ন হও ক্ষণে ক্ষণে। তোমার জয় হউক আমার দেহে মনে প্রাণে।...কিছু পাঠ হয়। ঠাকুরের কথা আলোচিত হয়।...নবদ্বীপ মহানির্বাণমঠের অসহযোগিতার কথা, জনরঞ্জনবাবুর প্রায় সরিয়া দাঁড়ানোর পরও কি করা যায় তাহার আলোচনা হয়। তারিণীবাবু স্বীকার করেন যে বহির্জগতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত না হইলে মহানির্বাণ মঠের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বর্তমান যুগে বিশ্বের কাজ না করিয়া কেহ মঠের মধ্যে থাইয়া দাইয়া টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।... ঠাকুরের ছোট আট পৃষ্ঠার একটু জীবনী লেখার কথা বেণুকে বলি। মাঝে মাঝে জনসাধারণের মধ্যে কাগজ ছড়াইতে হইবে। হাজার হাজার কর্মসূচি ছড়াইয়া দিতে হইবে। পূর্বে নিত্যগোপাল তত্ত্ব লোকে জানুক, পরে জীবনের কথা শুনিবে।

৩০শে সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, সারা জীবনের সঙ্গী আমার, দুর্যোগময় দুর্দিন এই পথ-যাত্রায় তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ, ইহা নিশ্চিত সত্য। নচেৎ এই পথে কবে কোথায় নিষ্পেষিত হইয়া যাইতাম। সংসারের সকল চাপই তো আমার উপর পড়িয়াছে, কিন্তু তাহা তো গায়ে লাগিতে দেও নাই। তুমিই সে চাপ আমার জন্য সহ্য করিয়াছ। তুমি যে বলিয়াছিলে তুমি ২।১০ বৎসর পর আসিবে, তাহার অর্থ কি এই যে ১০×১০=১০০ বৎসর পর অর্থাৎ শতবার্ষিক উৎসবের বন্যা দিয়া আগ্রত হইবে? দুই দশ অর্থ দুইবার দশ অর্থাৎ ১০০। তাহাই হউক, তুমি একবার জাগো।

নইলে সমাজ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। আগো আগো নারায়ণ !···মাখনবাবু আসিয়া···। রেণু ১১টায় বাহির হয়। ১।। পৃষ্ঠা নূতন বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে। ডিরিতে ৬টা হয়। আমি মঠে রওনা হইয়াছি, পথে দেখা। মঠ পর্যন্ত আগাইয়া দেয়। কিছুটা পাঠ হয়। 'পাইয়া সাধনা' ও 'না-পাইয়া সাধনা' বৃহতঃ (দুর্বোধ্য—সঃ উঃ বাঃ) একরূপ হইলেও উহাদের মধ্যে বহুত অন্তর রহিয়াছে। প্রথমটী একান্ততা হইতে, দ্বিতীয়টী বিচ্ছিন্ন বৃদ্ধি হইতে যাত্রা করে। নিত্যগোপাল পাওয়ার পরে সাধনার কথাই আগাগোড়া বলিয়াছেন। তাই তিনি বলিতে পারেন, 'যা পায় আর না পায় সব ভার আমার উপর রহিল'। ছয়টায় চিত্ত (দক্ষিণেশ্বরের) আসে। সে ৭০০০৲ টাকা ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে loan নিয়াছে, ব্যবসা করিবে ···মঠে আলোচনা হইল। প্রত্যেকে সেখানে প্রত্যেকের দোষ দর্শন করে। একান্ত হওয়ার প্রসঙ্গই সেখানে নাই চরমে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখনও আবহাওয়া বিষাক্ত না হইলে অচিরাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। যিনি আসিলেন প্রাণ লইয়া, সেই প্রাণের উপরই চলিতেছে তথায় নির্যাতন

১লা অক্টোবর

ঠাকুর, ছদ্মবেশী ভগবান তোমাকে তো পাইয়াছি। যদি পাইয়া পাওয়ার সাধনা দ্বারা তোমাকে ঘন করিয়া পাইতে চাহিতাম, দেহমনপ্রাণ তোমার চুম্বনে সার্থক হইত। কিন্তু আমরা চাহিয়াছিলাম তোমাকে না-পাইয়া পাওয়ার সাধনাদ্বারা পাইতে। তাই পাইয়াও তোমাকে হারাইয়াছি সকলে। অতীতের কর্ম্ম সাধনা, জ্ঞান-সাধনা ও ভক্তি-সাধনার সংস্কারাচ্ছন্ন আমরা 'পাই নাই পাইব' ভাব লইয়া যাত্রা করি। বিচ্ছেদ শুধু তাহাতে আরও বাড়িয়াই যায়। তোমার সুখই আমার সুখ, তোমার প্রয়োজনই আমার প্রয়োজন, তোমার অবতরণ প্রয়োজনকে ফুটাইয়া তোলাই তো আমার প্রয়োজন, তোমার আরম্ভেই আমার আরম্ভ। আমি তো সর্বারম্ভ পরিত্যাগী। তোমার জয় হউক। 'প্রাণসাধনা' লিখিতে থাকি। রেণু নকল করিয়া দেয়।···আজ আদি লীলা শেষ হয়। অবশ্য সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষদের নাম পড়া হয়। সত্যেন বলে, 'বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই এই ইতিহাসের অবতারণা'। সত্যই তিনি বাঁচিবেন। সাম্প্রদায়িক ধারা কবে হইতে চলিয়া আসিয়াছে, অনন্ত কাল চলিবে—ইহা বলিবার জন্যই এই ধারার উল্লেখ।···

২রা অক্টোবর

ঠাকুর, তুমি প্রাণ-দর্শন লইয়া আসিলে, প্রাণের ভাষা প্রবর্ত্তন করিয়া গেলে, প্রাণধারা প্রবাহিত করিলে। সব উচ্চ নীচ ভাবের কঠিন ব্যবধান গলাইয়া স্ব স্ব ব্রহ্ম-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইল, সব কার্যকারণ সম্বন্ধের মধ্যে ওলটপালট আসিয়া পড়িল। তুমি আমার কাছে আমি হইতেও নিকটতম। তোমার ভালবাসা আমার জীবনে সার্থক হউক। তোমার কাছে যেন আমি ধরা দেই। আমার আবার পাওয়া কি? তোমার পাওয়াকেই যেন জীবনে বরণ করিয়া লইতে পারি। তুমি আমাকে পাইও—ইহাই আমার একমাত্র কামা রেণু ভাত না খাইয়া বাহির হয়। প্রথমে প্রেস, পরে অন্যান্য জায়গায়। ফেরে ৩টায়। ৯টায় ভরদেব রায় ও ধীরেন ডাকায় আসে।···বাংলার রাজনীতিতে কোনও construction-এর গন্ধ নাই, ইহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। রাশিয়ার communismও ব্যর্থ হইবে। কেননা উহাও one-sided। Matter creates spirit ইহা সম্পূর্ণ সত্যের অর্দ্ধেক মাত্র। Spiritও matter create করে। আমি 'প্রাণসাধনা' লিখি। সত্যেন আসে ২।।টায়। পাঠ হয়।···

৩রা অক্টোবর

ঠাকুর, প্রাণসাধনার চরম পরিণতি তোমাকে নিজ জীবনে সৃষ্টি করা, গড়িয়া তোলা।···তুমি আসিয়াছ তোমার সৃষ্টিশক্তি জীবকে সমর্পণ করিতে, ধরাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে। তুমি আসিয়াছ বিশ্বসঙ্ঘ রচনা করিতে, এবং সেই বিশ্বসঙ্ঘের সকল দেহ প্রাণ মন নিংড়াইয়া নিজে সৃষ্ট হইতে। তোমার ইচ্ছা আমার ভিতর দিয়া সফল হউক।...মঠে পত্রবাহিকীর কাজ করিবার মত কেহ নাই। করিতে হইলে নিজেদের করিতে হয়। নিজেরাই বা কে? চতুর্দ্দিকে সব অসাড়, জড়। কোন

সাড়াশব্দ নাই। প্রায় ২শত চিঠি ছাড়া হইয়াছে। উত্তরও তো বেহু দেয় নাই।...

৫ঠা অক্টোবর

ঠাকুর, তোমার জীবনে আমি জীবন লাভ করিব, তোমার ছন্দে আমার ছন্দ মিলাইব, তোমার আচরণ অনুসরণ করিয়া চলিব, তোমাময় হইব—ইহাই আমার জীবনের সার্থকতা। তোমার মত এমন ব্যাপক গভীর জীবন বর্তমান যুগে কাহার আছে? জড়ের ক্ষেত্রে এতবড় সার্থক পুরুষ, সঙ্ঘগঠনের বীজদাতা শিভা কে আর আছে? তুমি আমার শরণ, আমার আশ্রয়।...সুবোধ মুখার্জী আসেন...।...আমরা মঠে যাই।...মঠ হইতে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া প্রতিভা ২৫খানা ও সত্যেন ৪০ খানা কর্মসূচী লইয়া যথাক্রমে দক্ষিণে ও বামে যায়। শ্রীরাধা ছিন্নকুড়ে যাহার আশীর্বাদে জল আনিয়াছিলেন, আমাদেরও আজ তাঁহারই করুণায় এই লোক-না-থাকা, টাকা-না-থাকা সত্ত্বেও কার্য সাধন করিতে হইবে। তিনিই কলঙ্ক-নিবারণ, কলঙ্ক-ভঞ্জন। প্রতিভার সঙ্গে মেয়েদের কিছু কিছু আলোচনা হয়।...দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামে আমরা ফিরি।...সন্ধ্যার পর বরদাবাবুর জগদীশ চ্যাটার্জীর পুত্র সুশীল আসে। সে 'পূর্বাশা'র পরিবর্তে চায়। তাহাকে ছাপাইবার জন্য শতবার্ষিকীর কর্মসূচী দেই। সে ছাপাইবে বলিল। উদ্বোধনের চৈত্র হইতে দেওয়া হয়।

৭ই অক্টোবর

রাধারাণী, প্রাণবল্লভা আমার, তুমিই আমার স্বরূপ নিরঞ্জন দিব্যরূপ। তোমাকে চিনিয়াই আমি আমাকে চিনি, তোমাকে পাইয়াই আমি আমাকে পাই। তোমার বাহিরে আমি মিথ্যা। তুমিই নিত্যগোপালরূপে আসিয়াছ, আমাকে আগুলিয়া রাখিয়াছ। আমার লজ্জানিবারণ, ছিন্নকুড়ের মত আমার জীবন শতছিদ্রযুক্ত। ছিদ্রপথই আমার পথ। সংসার আমি মানি, কাম-কর্ম মানি। সূত্রসাক্ষী তুমি যদি ধরিয়া না রাখিতে, কামকর্মের আবর্তনে কোথায় ভাসিয়া যাইতাম, কাহার সঙ্গে জড়াইয়া পড়িতাম তাহার ঠিক নাই। তুমি ধন্য। আমি সকল দেহপ্রাণমন লইয়া তোমাকে জড়াইয়া থাকিব। জয় তোমার। বেণু সকালে গ্রুপ দেখে। ২টায় বাহির হইয়া...ফেরে ৭টার পর।... তাহার বাক্স রাখিয়া যায়। -কে বলি—নিত্যগোপাল ভুলিও না। আমার বাবা শেষের বয়সে বলিয়াছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূকে—'নিত্যগোপাল বড় প্রত্যক্ষ দেবতা। এই সংসারে যখন যাহা কিছু আসিবে নিত্যগোপালকে না দিয়া যেন খান না'। একদিন রাত্রিতে ২টা হইতে ভোর ৫টা পর্যন্ত উঠিয়া বসিয়া নাম জপ করিয়াছিলেন—"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" "কালী করুণাময়ী" "কালাচাঁদ কালাচাঁদ" "নিত্যগোপাল নিত্যগোপাল"। আর একবার বলিয়াছিলেন, 'যেই কালাচাঁদ সেই নিত্যগোপাল, যেই নিত্যগোপাল সেই কালাচাঁদ'। ভগবান তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি এই সৃষ্টিক্ষমতা মানুষকে দিবার জন্য ব্যগ্র। যে মানুষ সৃষ্টি করে সে ভগবানের প্রিয়। তোমরা একটি dairy সৃষ্টি কর। আমি আশীর্বাদ করি। আমি তোমাদের ভালবাসি।

৯ই অক্টোবর

ঠাকুর, তোমাকে সৃষ্টি করিব, ইহাই ছিল আমার সাধ।...তুমি ছাড়া কে আমি, কি আমি? তোমার বাহিরে আমি কিছু নই। আমি তোমার সঙ্গে অর্ধ-নারীশ্বরের মত থাকিব।...আগামী শনিবার কার্যকরী সমিতি—(শতবার্ষিকী) র সভা হইবে।...যতটুকু পারিলাম ঠাকুরের দর্শনকে বিশ্বের সামনে দিবার চেষ্টা করিব। 'শতবার্ষিকীর প্রস্তুতি'তে ঠাকুরের একটি স্থান গড়িয়া তোলার প্রচেষ্টা হইয়াছে। ঠাকুরের আসন যে সকলের সামনে। তাঁহার দর্শনের মত, তাঁহার জীবনের মত এমন ব্যাপক জীবন ও দর্শন বর্তমান যুগে কাহার আছে?...

৭ই অক্টোবর

মা, সারা জীবন তুমি কোলে করিয়া রাখিয়াছ, নইলে আমি কি এই দুর্গম পথে চলিতে পারিতাম? জড় অজড়ের মাঝখান দিয়া, জড় ও শক্তির টানাটানির মাঝে আজিও যে আমি বুক উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছি, আদর্শ বজায় রাখিয়া চলিয়াছি, সে তো তোমার ঐ

কোলেরই মহিমা। তুমি আমার সাক্ষাৎ জননী। তুমি আমার হৃদয়ে আছ, তাই আমার হৃদয় শত আঘাতেও মুসড়াইয়া যায় নাই। আমার বুকের উপর দিয়া কি অল্প আঘাত গিয়াছে? মানুষকে বুক দিয়া ভালবাসিয়াছি, আজও তাহাদের পাইতে চাই। কিন্তু তাহারা আঘাত হানিয়া চলিয়া গিয়াছে। একদিন যে তাহাদের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ ছিল, তাহা যেন ধুইয়া গিয়াছে। কিন্তু বুকটা আজিও ভাঙিয়া যায় নাই। তুমি আমার বুকে আছ, তাই ইহা ভাঙে নাই। তুমি আমার, মা, আমি তোমার, মা। তুমি আমি আমি তুমি। তোমার রক্ত-মাংসই তো আমি। আমি আবার কি তুমি ছাড়া? রেণু সকালে উজ্জলকারত ঠিক করে ও বিল লেখে, ১১।টার পর পত্রিকা লইয়া বিক্রয়ার পোষ্টাফিসে যায়, পরে ১১ আয়গায় উজ্জলকারত দিয়া আসে। ফেরে ৫টায়। দুপুরে ভাত খায় নাই, সেই সময় খায় মঠে যাই···। প্রতিভা বৈকালে জিতেশ গুহ, বিরজা ও দীনেশ রায়ের বাসায় উজ্জলকারত দিয়া আসে।

৮ই অক্টোবর

ঠাকুর...তুমি যে অচ্যুত। তোমার সর্বস্ব দিয়া আমাকে সুন্দর করিয়া আমাকে তোমার সেবার উপযুক্ত করিয়া লইতে হইবে। ...প্রতিভা গোলাম মহম্মদ রোডের উজ্জলকারতগুলি বিলি করিয়া আসে। রেণু ১০ টার পর রিক্সায় পোষ্টাফিসে পত্রিকা দিয়া··· ফেরে ৩ টার পর। সত্যেন আজ আসে নাই। প্রতিভা বৈকালে কর্মসূচী মহানির্বাণ রোড ধরিয়া বিলি করিয়া আসে। বাড়ী বাড়ী ঠাকুরের আলোচনা হয়।... একদিন গোপা এক ভাগের অঙ্ক করিতে বার বার ভুল করিয়া বলিতেছে, 'ঠাকুর, এ কি রকমের অঙ্ক দিয়াছ?' অর্থাৎ ঠাকুরই ভুল অঙ্ক দিয়াছেন, সে ঠিকই করিতেছে। সব মানুষই তো এইরূপ করে। নিজে স্ত্রীপুত্র টাকাকড়ি লইয়া 'ভুল' করে, শেষে বলে, 'ভগবান, একি মায়ার জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ? মানুষের দীনতা ও বিনয় থাকিলে, নিজের চলার ভুল, বুদ্ধির ভুল বুঝিবার সাহস থাকিলে সংসারটা 'মায়া' হইত না।···

৯ই অক্টোবর

ঠাকুর, যাহাদের লইয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম, তাহারা একে একে আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে, আজ একা আমি পথের মাঝখানে বসিয়া আছি—আকাশবৎ নিরালম্বঃ বায়ুবৎ নিরাশ্রয়ঃ। তোমার রাতুল চরণই আমি মাথায় বহন করিয়া চলিয়াছি। ঐ চরণই আমার অবলম্বন, আমার আশ্রয়। দেশে কালে আমার স্থান নাই। তোমার চরণ দেশ-কাল অতীত অথচ সর্ব দেশে ও সর্ব কালে প্রসারিত। সতীশিরোমণি শ্রীরাধাকে অঙ্কে জড়াইয়া, ঘন হইয়া তুমি আসিয়াছ। শ্রীরাধা আমার পরাণপুতলী···। আমি ও রেণু মঠে যাই: আজ কার্যকরী সমিতির সভা ৪টায়।···জনরঞ্জনবাবু বলেন—৪।৫ বার পরপর চেষ্টা করিয়াও আমাকে ট্রাস্টী তিনি করিতে পারেন নাই। তাঁহার আমার উপর আস্থা আছে। খগেন বাবু বলেন—এই বালীগঞ্জ অঞ্চলে যাহাতে ঠাকুরকে সকলে চেনে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। বাড়ী বাড়ী যাওয়া, মঠে সভাসমিতি করা—প্রভৃতি হইবে বলিলাম। বাড়ী বাড়ী যাওয়া আরম্ভ হইয়াছে।···আমি বলিলাম—'শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীনিত্যগোপাল' এবং 'শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীনিত্যগোপাল' নামক ২খানি বই লিখিবার ইচ্ছা আছে। সত্যেন designation-এর জন্য চিদানন্দকে খুব পীড়াপীড়ি করিতেছে।...৭টার পূর্বে আমি ও রেণু ফিরি।

১০ই অক্টোবর

রাধারাণী, বিশ্ব-বিধনাথকে গড়িয়া তুলিবার উপযোগী আত্মনিবেদনাত্মক শক্তি তুমি, আমার জীবনের আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছ। আত্মনিবেদনের মধ্যে তুমিই আত্ম উপলব্ধির শক্তি—তুমিই শ্রীনিত্যগোপালরূপে আমার কাছে প্রকট হইয়াছ। শ্রীনিত্যগোপালের দিব্য জীবন ও দিব্য দর্শনের মাঝে এই মড়া বিশ্ব বাঁচিয়া উঠিবে, শোধণে শোধণে জর্জরিত এই বিশ্ব পুষ্ট হইয়া উঠিবে···। ক্রমশ

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় জন্যই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দ্দেশিত "সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

অষ্টাদশ সিদ্ধান্ত

বেদান্ত মতে ব্রহ্ম যে নির্ব্বিকার ও নিত্য-সত্য, ইহা বারম্বার স্বীকার করা হইয়াছে। নির্ব্বিকার নিত্য সত্য যে ব্রহ্ম, তাঁহার কোন পরিবর্ত্তনই হইতে পারে না। নানা প্রকার পরিবর্ত্তনকেই নানাপ্রকার বিকার বলা যাইতে পারে। অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের পঞ্চবিংশ শ্লোকে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,

'উপাদানং প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রপঞ্চোঽয়ং ব্রহ্মৈবাস্তি ন চেতরৎ॥'

উক্ত শ্লোকানুসারে অবিদ্যা ও ব্রহ্ম অভেদ স্পষ্টই স্বীকার করা হইয়াছে। ঐ শ্লোকানুসারে ব্রহ্মই সর্ব্ব প্রপঞ্চ বলিয়া ব্রহ্মও বিকারগ্রস্ত স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ সর্ব্ব প্রপঞ্চ অবিকার নহে। ঐ সর্ব্ব-প্রপঞ্চের নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন বশত আরও কত বিকার বিকশিত হইয়াছে। সর্ব্ব প্রপঞ্চ অবিদ্যারই নানাপ্রকার বিকাশ। সুতরাং সর্ব্ব-প্রপঞ্চ, অবিদ্যা ও ব্রহ্ম অভেদ। ঐ তিন অভেদ স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া ঐ তিনই এক। বেদান্ত এবং শঙ্করাচার্য্যের নানা বৈদান্তিক গ্রন্থমতে ব্রহ্ম নিত্য-সত্য। সর্ব্ব-প্রপঞ্চ এবং অবিদ্যার সহিত ব্রহ্মের অপার্থক্য-বশত সর্ব্ব-প্রপঞ্চ এবং অবিদ্যাকেও নিত্য-সত্য বলিতে হয়।

একোনবিংশ সিদ্ধান্ত

অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের মতে 'সর্ব্বমাত্মেতি' স্বীকার করা হইয়াছে। ঐ গ্রন্থানুসারে সমস্তই আত্মা বলিয়া ব্যাপ্য-ব্যাপকতাও আত্মা স্বীকার করিতে হয়। ব্যাপ্য-ব্যাপকতাও আত্মা স্বীকৃত হইলে ব্যাপ্য-ব্যাপকতাও মিথ্যা বলা যায় না। বৈদান্তিক মতানুসারেই সর্ব্বভূতও অনাত্মা-অবিদ্যার নানাপ্রকার বিকাশ। অথচ পরমহংস

শঙ্করাচার্য অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকে

ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব তদ্ভীত্যবধারয়েৎ ॥

বলিয়াছেন। ঐ শ্লোকানুসারে সর্ব্ব-ভূতেই ব্রহ্ম স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মেরও ব্যাপ্য-ব্যাপকতা আছে প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইয়াছে। বায়ুও সর্ব্ব-ভূতের মধ্যে এক ভূত, তুমি কি সেই বায়ুর ব্যাপ্য-ব্যাপকতা বুঝিতেছ না? শঙ্করাচার্যের উক্ত একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে বায়ু-ভূতও ব্রহ্ম। সুতরাং ব্রহ্ম-বায়ুরও ব্যাপ্য-ব্যাপকতা নিশ্চয়ই আছে। অগ্নি-ভূতেরও ত ব্যাপ্য ব্যাপকতা দেখিয়াছ। ঐ একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে অগ্নি-ভূতও ব্রহ্ম। সুতরাং সেই ব্রহ্মাগ্নিরও ব্যাপ্য-ব্যাপকতা নিশ্চয়ই আছে। জল-ভূতেরও ত ব্যাপ্য-ব্যাপকতা দেখিয়াছ। ঐ একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে জল-ভূতও ব্রহ্ম। সুতরাং সেই ব্রহ্ম-জলেরও ব্যাপ্য-ব্যাপকতা নিশ্চয়ই আছে। উক্ত একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে সর্ব্বভূত হইতে যে সকল বস্তু প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকলও সর্ব্ব-ভূত। ঐ একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে সর্ব্ব-ভূত ব্রহ্মোৎপন্ন বলিয়া সর্ব্ব-ভূতকেও ব্রহ্ম যে প্রকারের বলা হইয়াছে, সেই প্রকারেই সর্ব্ব-ভূতই যে সকল বস্তু হইয়াছে, সে সকল বস্তুকেও ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে।

দ্বিংশ সিদ্ধান্ত

অপরোক্ষানুভূতির ষট্‌চত্বারিংশ শ্লোকে সমস্তই আত্মা স্বীকৃত হইয়াছে। ঐ শ্লোকে সমস্তই আত্মা স্বীকার জন্য ঐ শ্লোকেই আত্মার বহুত্বও স্বীকার করা হইয়াছে। তদ্দ্বারা আত্মা বহু-প্রকারও স্বীকার করা হইয়াছে। বেদান্তমতে অবিদ্যারই বহুত্ব। বেদান্তমতে অবিদ্যারই বহু-প্রকারতা। কিন্তু অপরোক্ষানুভূতির ষট্‌চত্বারিংশ শ্লোকে পরমাত্মা-ব্রহ্মেরও বহুত্ব এবং বহু-প্রকারতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তবেই বলিতে হয় পরমাত্মা-ব্রহ্ম এবং অবিদ্যা অভেদ। শঙ্করাচার্যের মতানুসারে পরমাত্মা ব্রহ্ম ও অবিদ্যা যে অভেদ তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

একবিংশ সিদ্ধান্ত

শঙ্করাচার্যের 'সর্ব্বমাত্মেতি' বলায় আত্মা যে বহু এবং বহু প্রকার ইহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। তবে সেই আত্মার সেই আত্মাসম্বন্ধে ভেদজ্ঞানের অবসর নাই কি প্রকারে বলা যাইবে? সেইজন্যই অপরোক্ষানুভূতি অনুসারে

'ব্যাপ্যব্যাপকতা বিদ্যা সর্ব্বমাত্মেতি শাসনাৎ।
ইতি জ্ঞাতে পরে তত্ত্বে ভেদজ্ঞানবসরকৃৎ ৪৬ ॥'

বলা উচিত হয় নাই।

দ্বাবিংশ সিদ্ধান্ত

শঙ্করাচার্যের 'সর্ব্বমাত্মেতি' মতানুসারে তাঁহার সপ্তচত্বারিংশ শ্লোকোক্ত শ্রুতি-নিরূপিত-বিশ্বাত্মার নানাত্ব নিবারণ স্বীকার করা যায় না। শ্রুতিমতেই ত বলা হইয়াছে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,' তবে সেই ব্রহ্মাত্মার নানাত্ব অস্বীকার্য্য হইবে কেন?

ত্রয়োবিংশ সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য

'ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব তদ্ভীত্যবধারয়েৎ ॥'

বলায় তিনি ব্রহ্মেরই নানাত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি উক্ত শ্লোকের পূর্ব্ব শ্লোকে

'ঘোষোঽপি বিহিতঃ শ্রুত্বা মৃত্তোর্দ্ভ্যাং ন গচ্ছতি।
ইহ পশ্যতি নানাত্বং মায়য়া বঞ্চিতো নরঃ।'

বলিয়া নানাত্ব স্বীকারকারীদিগকে ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন কেন? এই জগতেরও নানাত্ব দেখি। শঙ্করাচার্য্যও 'সর্ব্বমাত্মেতি' বলিয়া আত্মারও নানাত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে শঙ্করাচার্য্যের কোন কোন শ্লোকে নানাত্বে দোষারোপ করা হইয়াছে কেন?

চতুর্ব্বিংশ সিদ্ধান্ত

অপরোক্ষানুভূতির একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে পরমাত্মা ব্রহ্মই সর্ব্ব-ভূত। ঐ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তিও ভূত ব্যতীত অন্য কিছু নয়। উহা ক্ষিতি নামক ভূতই আকারে পরিণত। সুতরাং ঐ একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে শ্রীকৃষ্ণের পার্থিবী প্রতিমূর্ত্তিও পরমাত্মা ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য্যের সেই শ্লোক এই প্রকার— ক্রমশঃ

গ্রীককবি সেফারিস

॥ শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ॥

কবিতা যে কোলাহলের বস্তু নয়, ব্যক্তিগত অনুভূতির রঙ, উপলব্ধির রসে জারিত হ'য়ে একটি সচেতন হৃদয়ের শিল্পনৈপুণ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই যে প্রকাশিত হ'তে পারে, তার উদাহরণ জর্জ সেফারিসের কবিতা। ১৯৬৩ সালে এই কবি যখন নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন তখন চারদিকে সকলে চমকে উঠেছিল। কারণ সেফারিসের নামই কারও জানা ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর সমারোহ ছিল না। চাকরি করেছেন গ্রীসের কূটনৈতিক দপ্তরে। ১৯৩৮ সাল থেকে বৈদেশিক দপ্তরের কাজে যুক্ত রয়েছেন। দীর্ঘদিন বিদেশে কেটেছে। কাজের মধ্যে মধ্য থেকেও তিনি কবিতা লিখেছেন। তাঁর দেশ ও দেশের মানুষের ইতিহাস মূর্ত হয়ে উঠেছে সেই সব কবিতায়।

গ্রীক-সাহিত্যের আধুনিক কালে জনপ্রিয়তায় সেফারিসের সমকক্ষ আর কেউ নেই। যিনি সাহিত্যকে গতানুগতিক ধারা থেকে মুক্ত করে' আপন সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্পর্শে সঞ্জীবিত করলেন, যিনি স্বকীয় প্রগতিশীল মননের সাহায্যে সমকালীন বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করলেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ভুল করেনি গ্রীসের সাহিত্যানুরাগী পাঠকবৃন্দ। সেফারিসের জনসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর নিরলস অধ্যবসায়। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা অনেক। ইলিয়ট প্রমুখ কবিদের রচনা থেকেও তিনি প্রচুর অনুবাদ করেছেন। এবং তাঁর অত্যন্ত ব্যস্ত কর্মজীবনের মাঝখানে থেকেও দেশ ও সাহিত্যকে তিনি গভীরভাবে ভালোবেসেছেন।

১৯০০ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী গ্রীসের স্মার্ণা (Smyrna)তে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু মহাযুদ্ধের সময় তাঁকে দেশত্যাগ করে এথেন্সে উঠে আসতে হয়। ১৯২৪ সাল পর্যন্ত তিনি প্যারিসে ছিলেন তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্য। ১৯২৬ সাল থেকে তাঁর কর্মজীবন সুরু। পুরো নাম Giorgos Seferiades। তাঁর প্রথম কবিতা সংকলন Turning Point ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৪০-এ সেফারিস "William Foyle" কবিতা পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর কবিতা গ্রন্থগুলির মধ্যে Mythistorema (১৯৩৫), Log Book (১৯৪০ ও ১৯৪৪), Collected poems (১৯৫০) ও The Wilderness (১৯৪৪) উল্লেখযোগ্য সংকলন।

১৯৬৩ সালে নোবেল পুরস্কার তাঁকে দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য সেফারিসের নাম এই প্রথম সারা বিশ্বে প্রচারিত হ'লো। অথচ কবি হিসাবে সেফারিস অগ্রগণ্য। স্টেট্‌স্‌ম্যানের সংবাদদাতা সেদিন মাত্র একটি লাইনে সেফারিসের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন "His work epitomized the history of Greece with all its triumps tragedies and courage"। গ্রীস একদা ইউরোপের আদর্শ ছিল। দর্শন সাহিত্য নাটক—সকল বিষয়েই গ্রীসের অসাধারণ দান স্মরণযোগ্য। কিন্তু গ্রীসের ওপর বৈদেশিক আক্রমণের প্রচণ্ড আঘাত পড়েছে। সেফারিস নিজেও সেই উন্মূলিত মানবসমাজের একজন। তাঁর মনের সহজাত বেদনাবোধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে নিসর্গপ্রেম ও ঐতিহ্যপ্রীতি। তাঁর আধুনিক মনোভাব তাঁকে ঐতিহ্যবোধ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। সমগ্র গ্রীসদেশকে তিনি নতুন করে তুলে ধরেছেন তাঁর কাব্যে। সেই জলেভাসা পাহাড় আর ভাগ্যান্বেষী নাবিকের দুঃখের অভিযান, সেই প্রাচীন সংস্কারের বাঁধনে আবদ্ধ জনমন ও ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস, এবং অন্তবিহীন উদার প্রকৃতিশোভা সমানভাবেই তাঁর মনকে টেনেছে। তাঁর চিন্তাধারা যেমন মূলবিচ্যুত নয়, অর্থাৎ ঐতিহ্যাশ্রয়ী, তেমনি আধুনিক ও সংস্কারমুক্ত। তাঁর আঙ্গিক ও রচনাশৈলী স্বতোৎসারিত এবং মোটেই দুর্বোধ্য নয়! ভাষার মধ্যে সেই নিরাভরণ প্রকাশভঙ্গি—যা' আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের কবিতাগুলিতে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁর সজীব চিন্তাধারা এবং গভীর অনুভূতি-প্রবণতা। জীবনের প্রতি মুহূর্তের অনুভূতিগুলিকে হৃদয়ের রসে জারিয়ে নিয়ে তিনি পরিবেশন করেছেন। তাঁর Log Book শুধু তাঁর নয়, সকল পাঠকের।

সেফারিসের কবিতা থেকে মাত্র দুএকটি পংক্তি উদ্ধৃত করে এই নিবন্ধ শেষ করছি। অনুবাদের মধ্যে দিয়ে কখনও কোন কবির সঠিক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। এবং কোন কবির সম্বন্ধে ধারণা করতে গেলে তাঁর একটি দুটি কবিতা নয়, অন্ততঃ একটি সংকলন পুরোপুরি পাঠ করা উচিত। নীচের উদ্ধৃতিগুলো নিবন্ধ লেখকের স্বকৃত অনুবাদ থেকে নেওয়া।

"সমুদ্রের পাখির নাচানো জলে সাঁতার দিলাম;
স্পর্শের মধ্যে অনুভব নেই হৃদয়ের।
বিজন আজ সে দেশের মাটি
যে দেশ আর আমাদের নয়।

"জেনেছিলাম, কি রমণীয় ছিল এই দ্বীপ।
আমরা দেখেছিলাম—এইখানেই
কাছাকাছি কোথাও···
আমরা এখনও খুঁজে চলেছি—
হয়ত একটু নীচে অথবা ওপরে,
হয়ত একটুও দূরে নয়॥

But what are they looking for
Our souls that travel···

চমকে উঠলাম হঠাৎ
জানিনা তখনও পথ চলছিলাম কিনা;
আমি একবার পাখির দিকে তাকালাম,
আকাশের গায়ে গায়ে পাথরে গড়া ছবি,—
আমি সেই উজ্জ্বল আকাশের দিকে চাইলাম।
আমি দেখলাম—তাদের মাঝখান দিয়ে
• • •
একটি জ্যোতিঃপুঞ্জের ঝাঁকা মুখ।
গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের ঢেউ তার পিঠে।
চোখের ভুরুতে এক উড়ন্ত বুলবুলির ডানা
দুটি সবুজে টানা ঠোঁটের ওপরে
স্ফুরিত নাসারন্ধ্র।
তার নগ্ন বক্ষের তরঙ্গিত ছন্দে কোন চাঞ্চল্য নেই;
পরিপূর্ণ নিরাবরণ দেহে—
সেই জনতার ঊর্ধ্বে সে উঠে দাঁড়ালো।
(Engomy—the plain was wide and level)

শব্দকে এক নতুন ব্যঞ্জনা দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর কাব্যে একদিকে অনুভবের জগৎ আর একদিকে সঙ্গীতময় শব্দ। তাঁর চিন্তায় একদিকে ইতিহাসের রূপময়তা আর একদিকে কল্পনার চিত্রবিস্তার। অথচ কি এক করুণ বেদনায় আচ্ছন্ন তাঁর সমস্ত কবিতা, সকল অনুভূতি!

গীতা-জয়ন্তী

(বালীতে শ্রীসুনীতি চক্রবর্তীর গৃহে সাপ্তাহিক
গীতা-পাঠে পঠিত)

॥ শ্রীপ্রতিভা রায় ॥

আজ গীতা জয়ন্তী। গীতার জন্ম দিন। এই শুভ দিনটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক এই গীতা রূপ উপনিষৎ কথিত হইয়াছিল। আপনারা আমার গুরুদেবী শ্রীমতী সুনীতি চক্রবর্তীকে কেন্দ্র করিয়া এই দিনের যে এই শুভ অনুষ্ঠানটী করিয়াছেন ইহাতে আমি বিশেষ আনন্দিত এবং এই অনুষ্ঠানে আমাকে সভানেত্রী করিয়া আহ্বান করায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি এবং সেই সঙ্গে নিজের অযোগ্যতার কথা স্মরণ করিয়া লজ্জাও বোধ করিতেছি। যাহা হউক, আপনারা যখন আমাকে আহ্বান করিয়াছেন তখন আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের নিকট গীতার যে অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনিয়াছি তাহাই কিছু বলিব।

মুখে বলিবার অভ্যাস না থাকায় আমার যাহা বক্তব্য তাহা লিখিয়া জানাইয়াছি।

আজ পঞ্চমীর শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল যে অপরূপ অমৃত, আমরা [illegible] আজ সেই অমৃত সাগরে অবগাহন করিয়া জুড়াইব, ধন্য হইব। গীতার বহু ব্যাখ্যা বহু জন বহু ভাবেই করিয়াছেন, কিন্তু কেহই হয়তো যে শ্রীভগবানের কথা সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন নাই, সেজন্য সব ব্যাখ্যাই মানুষের নিজ নিজ মনোমত-ব্যাখ্যা হইয়াছে বলিয়া গীতার যে উদ্দেশ্য তাহা ব্যাহত হইয়াছে। নারায়ণের কথা ভাগবত-শাস্ত্র নরের স্তরে দাঁড়াইয়া ব্যাখ্যা করায় ইহা নরের শাস্ত্রই হইয়াছে, ইহাতে মানুষের জীবন জুড়াইতেছে না। গীতার বহু ব্যাখ্যা বহু আলোচনাই তো হইতেছে কিন্তু গীতার যে জীবনের কথা শ্রীভগবান নিজের জীবন সামনে রাখিয়া বলিয়া গিয়াছেন তাহা কি কাহারও জীবনে ফুটিয়া উঠিতেছে? উঠিতেছে না বলিয়া তখনই প্রশ্ন আসে গীতার ব্যাখ্যাতেই গোলমাল আছে। গীতার শেষে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতিঃ ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং ধনুর্ধর পার্থ যেখানে সেখানেই সত্যকার জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়। আদর্শ এবং বাস্তব যেখানে মিলিত হয় সেখানেই সত্যিকার বিজয়, সত্যিকার ভূতি, সত্যিকার নীতি সম্ভব হয়। নর তাহার মনের স্তরে দাঁড়াইয়া যে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে, তাহাতে ভগবানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাত হয় না। মানুষের ব্যাখ্যায় এই জগতের সবই মিথ্যা মায়া তাই যশঃ ঐশ্বর্য্য সবই মিথ্যা মায়া, শ্রীভগবানই একমাত্র সত্য ইহাই তাহারা প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত; কিন্তু ভগবান তো তাহা চান না। তিনি আসিয়াছিলেন ধরার বুকে নরের গৌরব দান করিতে তিনি তাই গীতায় নরের গৌরব জগতের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিলেন। একা একা নরের স্তরে দাঁড়াইয়া নর এই জগতের যে ব্যাখ্যা করিল তাহাও সত্য নয়, আবার নারায়ণের স্তরে দাঁড়াইয়া নারায়ণ যদি তাঁহার ব্যাখ্যা দিতেন তাহাও সত্য হইত না। তাই না নারায়ণ আসিয়া নর অর্জুনের রথের সারথী হইলেন? নর এবং নারায়ণ মিলিয়াই এই জগৎ। গীতা তাই নর-নারায়ণ সংবাদ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং নর-অর্জুন একই রথে সমাসীন থাকিয়া বিরাট যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুক্তির শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছিলেন। চক্ষু বুজিয়া মনে মনে কোনের ধর্ম শ্রীকৃষ্ণ বলেন নাই, তিনি বলিয়া গিয়াছেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ধর্মের জীবন যাপন কেমন করিয়া করিতে হইবে সেই কথা। ভগবানকে বাদ দিয়া মানুষ যে সংসার করে সে সংসার সত্যই মায়া মিথ্যা হয়, কিন্তু জগতের স্বরূপ তো তাহা নয়, বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণুতে যে ভগবান বিরাজিত আছেন। এই দৃষ্টিতে দেখিয়া সংসার করিলে এই জগৎই সত্য হয়। শ্রীভগবান যেখানে বিরাজিত থাকেন, সেই স্থান তো গোলোক বৈকুণ্ঠ। বিশ্বনাথ যিনি তাঁহার বিশ্বকে মায়া মিথ্যা বলিয়া বাদ দিলে যে বিশ্বনাথই বাদ পড়িয়া যান। নারায়ণ বলেন, নর তুমি আছ, আমি তোমার ভিতরে তুমি হয়ে আছি। এই স্থানেই তো নারায়ণের গৌরব, বড় যখন ছোটর মধ্যে ছোট হইয়া থাকেন তখনই তো বড়র গৌরব প্রতিষ্ঠা হয়। আবার নর বলেন, আমি নাই তুমি আছ—তখনই নরের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়। অণু যখন মহানের ভিতর এক হইল, তখনই তো তাহার সার্থকতা মিলিল। এই নর নারায়ণের মিলনের শাস্ত্র গীতা, ইহ জগৎ ও পর জগতের সমন্বয় শাস্ত্রই গীতা। আসুন আমরা পরস্পরের গলা ধরিয়া বুকে বুক মিলাইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই বিশ্বের ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গমের সকল ক্ষেত্রে আমাদের সেই প্রাণবল্লভ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া বাহির করি, এই বিশ্বকে বৃন্দাবনে গড়িয়া তুলি। এই শিক্ষা এই সাধনা শিক্ষাতেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের এই ধরার বুকে অবতরণ এবং ভ্রাতৃ দ্বন্দ্বের মাঝে দাঁড়াইয়া গীতা শাস্ত্রের অবতারণা। শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপ-সঙ্গাবৃত। তিনি সঙ্গ বড় ভালবাসেন। একা একা সাধনা করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না অর্থাৎ

পরিপূর্ণরূপে তাঁহার রস আস্বাদন করা যাইবে না। আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব তাই বার বার সম্বন্ধ হইতে বলিয়াছেন। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জীবনী আলোচনা করিলে দেখিবেন তিনি একা বসিয়া নিজের জন্য সাধনা করেন নাই। তাঁহার সাধনা ছিল গতির বুকে স্থির আস্বাদন—স্থিতি-গতির সমন্বয়, আদর্শ বাস্তবের সমন্বয়। একদল ব্রহ্মবিৎ পুরুষ যেমন করিয়া সকল বস্তাটকে বরণ করিয়া লইয়া ভাগবত জীবন যাপন ও ভাগবত রস আস্বাদন করিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি ইহাই গীতার জীবন। তাঁহার ভাষায় বলি—ধরার ধূলি হউক ব্রহ্ম ধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম মানুষ। এই জীবন যাপন করাই মানুষের পরম সার্থকতা। নিজের জীবনে বিশ্বের জীবনে শ্রীভগবানকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য মানুষের এই মনুষ্য জন্ম গ্রহণ। তিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার আমরা তাঁহার সৃষ্ট জীব হইয়া সেই স্রষ্টা নারায়ণকে এই ধরার বুকে সৃষ্টি করিব। এই সৃষ্টি করিবার অধিকার আমাদিগকে দিয়াই তো তিনি আমাদের গৌরব প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ভক্তের জীবনেই তিনি রস লাভ করেন। ভক্তের হৃদয়ে মোর সতত বিশ্রাম। বিশ্বের ঈশ্বর হইয়া তাই তিনি নন্দ-যশোদা-দুলাল। আসুন আজ শুভ দিনে সেই প্রাণ-বল্লভকে প্রাণ ভরিয়া স্মরণ করি, মনন করি, কীর্তন করি। শ্রীগুরুদেবের ভাষায় আবার বলি ধরার ধূলি হউক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম-মানুষ। ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি ওঁ হরি ওঁ

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

॥ শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

আনন্দঃ [যিনি সত্য, জ্ঞান, অনন্ত বলিয়া ব্যাখ্যাতিনি] আনন্দাৎ এব [পিতামাতার যুক্তরস আনন্দের মন্থনের মধ্য হইতেই] ইমানি ভূতানি জায়ন্তে—অবশিষ্ট পূর্ববৎ।] সা এষা [সেই এই] ভার্গবী [ভৃগুকর্তৃক সম্যক বিদিত] বারুণী [বরুণ কর্তৃক প্রেরণাপ্রাপ্ত] বিদ্যা [বিদ্যা] পরমে ব্যোমন্ [হৃদ্ আকাশে, নিষ্কল-কলাষন পুরুষোত্তমে পরমানন্দ] প্রতিষ্ঠিতা [অন্ন-প্রাণ-মন-বিজ্ঞান-আনন্দময় কোশসমূহ স্ব স্ব বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকিয়া অন্যোন্যসক্ত ও অনবিপ্রযুক্ত ভাবে পরমানন্দ-ঘন পুরুষোত্তমে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, মিথ্যাত্বের অপবাদ হইতে চিরমুক্ত হইল, পুরুষোত্তম কোশে পরিণত হইল] যঃ [যে কেহ] এবং [এই গোপন কৌশল] বেদ [জানেন] সঃ [তিনি] প্রতিতিষ্ঠতি [সর্বস্তরের সর্ব আশা আকাঙ্ক্ষাকে পুরুষোত্তমের ছাঁচে বৃহত্তম করিয়া, সবটুকু যেমন তেমন রাখিয়া, শুধু ইহাদিগের পুরুষোত্তমত্ব ফুটাইয়া তুলিয়া (transforming) প্রতিষ্ঠিত হইলেন; যাহা এতদিন 'কাম' বলিয়া ছিল জুগুপ্সিত, হেয়, তাহাও অকাম-সর্বকাম পুরুষোত্তমে পূর্ণ কামরূপে প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতিতে কামের আপ্তি শুধু ফলশ্রুতি নহে, শিশুকে লোভ দেখানো নহে, উহা আনন্দ-ব্রহ্মেরই গভীরতা ও বিস্তারের লক্ষণ মাত্র। ভাবুকের কাছে গভীরতা পাপ; অথচ কামই গভীরতার খোঁজ দেয়; পক্ষান্তরে ভাবহীন 'কাম' জ্ঞানবিজ্ঞান-নাশন মহাশন, মহা পাপ্মা। তাই "অকামেন কাম কামনা" গোপালতাপনী শ্রুতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন] অন্নবান্ [প্রকৃত অন্নবান্] অন্নাদঃ ভবতি [অন্নভোক্তা হন্, অন্নবান

হইয়াও রাগবশতঃ বা অন্য কারণে অন্নভোজন সামর্থ্য নাও থাকিতে পারে। কিন্তু আনন্দ-ব্রহ্মের উপাসনা মানুষকে সর্বক্ষেত্রে সর্বকোণে এমন "অগ্নি" প্রতিষ্ঠা করেন যে অন্ন-ভোজনের সব অন্তরায় সব বন্ধন দূর হইয়া যায়; ইহা শুধু আনন্দ-সাধককে প্রস্তুত করা নয়; বাস্তব জীবনে অন্নের মত প্রয়োজন আর কিসের আছে? অন্নদান ও অন্নাদ হইতে না পারার দুঃখ কি অল্প? আদর্শবাদের নামে এই এমন গুরুতর অন্নকে গৌণ করিয়া দেখার পাপ বিশ্বকে আজ অন্নের ভাণ্ডারে সাজাইয়াছে, যাহাদের কিছু আছে তাহারাও ভোগে বঞ্চিত। অন্নবান্-অন্নাদ হওয়া আনন্দ-ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম অবদান; অন্ন যাহাদের নাই, অন্ন ভোজনের সামর্থ্য যাহাদের নাই, তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞানও নাই।] মহান্ ভবতি [বিস্তীর্ণ হন্] প্রজয়া [প্রজা, সন্তান-সন্ততি সহায়ে] পশুভিঃ [গরু, অশ্ব প্রভৃতি সহ] ব্রহ্মবর্চসেন [ব্রহ্মের আলোদ্বারা] মহান্ কীর্ত্যা [কীর্তিতেও মহান হন; যিনি ভগবান্ তাঁহার তো ঐশ্বর্য-বীর্য-যশঃ শ্রী-জ্ঞান-বৈরাগ্য নিত্যযোগ চাই-ই; দুই সীমান্তে অবস্থিত ঐশ্বর্য-বৈরাগ্য দুই-ই সমন্বিত; ঐশ্বর্য ও বৈরাগ্যের মাঝে রক্ষিত হইতেছে বীর্য-যশঃ-শ্রী-জ্ঞান; ঐশ্বর্যহীন-বৈরাগ্য ক্লীবত্ব আনিয়া দেয়, বীর্য কাড়িয়া লয়, শ্রীহীন করিয়া তোলে, কলঙ্ক কালিমা মুখে লেপিয়া দেয়। বৈরাগ্য ও জ্ঞানের চেয়ে শ্রী-যশঃ কম মূল্যবান হইবে কেন? আনন্দ-ব্রহ্মোপাসকের কাছে বিশ্বের সবই ব্রহ্মরূপে তাহার "পাওনা"।

আনন্দই ব্রহ্ম ইহা জানিলেন, কারণ আনন্দ হইতেই এই ভূতসমূহ জাত হয়, জাত হইয়া আনন্দের দ্বারাই রক্ষিত হয়, অবশেষে আনন্দে প্রয়াত হয় ও লীন হয়। ভৃগুকর্তৃক বিদিত ও বরুণ কর্তৃক প্রেরিত এই বিদ্যা পরম ব্যোমে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠিত হন, অন্নবান্ হন, অন্নাদ হন, প্রাক্-পশুসমূহ-ব্রহ্মজ্যোতিতে মহান্ হন, কীর্তিতেও মহান্ হন।

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্ ব্রতম্। প্রাণো বা অন্নম্। শরীরমন্নাদম্। প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন মহান্ কীর্ত্যা॥ ৩৭

ইতি ভৃগুবল্ল্যাখ্যায়ে সপ্তমোঽনুবাকঃ।

অন্ন-প্রাণ-মন-বিজ্ঞান-আনন্দকে পর পর রাখিয়া যে একটী সিঁড়ি খাড়া করান হইয়াছে তাহার নীচের ধাপ অন্ন, উচ্চ ধাপ আনন্দ বলিয়া প্রতিভাত হইয়া উচ্চ-নিম্নের মধ্যে একটী অন্তরালকে ঘনাইয়া রাখিবার আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠিতে পারে, এই অভিনবের ধারণা দূর করিবার জন্য শ্রুতি শুনাইতেছেন যে নিম্ন-উচ্চ দুই-ই দুইয়ের অন্ন, দুইই দুইয়ের অন্নাদ, দুইই দুইয়ে প্রতিষ্ঠিত] অন্নং ন নিন্দ্যাৎ [অন্ন অপকৃষ্টরূপে কখনও উপস্থিত হইলেও নিন্দা করিবে না; অন্নরূপিনী মায়া-প্রকৃতিকে ব্রহ্মের তুলনায় হেয় বলিয়া কখনও নিন্দা করিবে না, মায়া ব্রহ্মেরই মত সমকক্ষ] তৎ ব্রতম্ [পুরুষোত্তমদাসদের ইহাই ব্রত] প্রাণো বৈ অন্নম্ [প্রাণই অন্ন, যে যাহার আধার সেই তাহার অন্ন; আধারই অন্ন; আধেয়ই অন্নাদ। অন্ন-প্রাণ শরীর-প্রাণ দুইই দুইয়ের আধার ও আধেয়।] শরীরং অন্নাদং [অন্নের অন্ন ভোক্তা; অন্ন প্রাণ দুইই দুইয়ের অন্ন ও অন্নাদ, দুই-ই দুইয়ের অনুগমন করিয়া চলিয়াছে] (তাইতো) প্রাণে শরীরম্ প্রতিষ্ঠিতম্ [যে প্রাণ ছিল অন্ন হইতে সিঁড়ির এক ধাপ উপর, সেই প্রাণই অন্নে প্রতিষ্ঠা খুঁজিতেছে] শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ [শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত; শরীর-প্রাণ অন্যোন্য মৈথুনে পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত] তৎ [সুতরাং] এতৎ অন্নম্ [শরীর-প্রাণরূপ অন্ন] অন্নে [শরীর-প্রাণরূপ অন্নে] প্রতিষ্ঠিতম্ [প্রতিষ্ঠিত; শরীরও প্রাণের ভিতর দিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠ, প্রাণও শরীরের ভিতর দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ] যঃ বঃ [সেই যিনি] অন্নম্ অন্নে [শরীরকে প্রাণে প্রাণকে শরীরে, শরীরকে শরীরে এবং প্রাণকে প্রাণে] প্রতিষ্ঠিতং বেদ [প্রতিষ্ঠিত জানেন] প্রতিতিষ্ঠতি [শরীর প্রতিষ্ঠা ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, অন্নস্থিতে, অন্নাত্মরূপে স্থিতি লাভ করেন] অন্নবান্-

অন্নাদঃ ভবতি [পূর্ববৎ] (অন্যান্য সব কোশেরই এইরূপ অন্নোক্ত সাপেক্ষত্ব বুঝিতে হইবে।)

উক্ত ব্রহ্মবিদের ব্রত এই যে, অন্ন নিন্দা করিবেন না। প্রাণই অন্ন শরীর অন্নাদ, কেননা প্রাণ-আধারে শরীর প্রতিষ্ঠিত। শরীর আধারে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং (অন্নোক্ত সাপেক্ষ অন্ন ও প্রাণরূপ) অন্নই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যে কেহ অন্নে অন্নকে প্রতিষ্ঠিত দেখেন, তিনি প্রতিষ্ঠিত হন, অন্নবান অন্নাদ হন, তিনি সন্তান সন্ততি, প্রজা, পশু, ব্রহ্মতেজে মহান্ হন, কীর্ত্তিতেও মহান্ হন।

অষ্টম অনুবাক

অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্ ব্রতম্। আপো বা অন্নম্। জ্যোতিরন্নাদম্। অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা॥ ৩।৮

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং অষ্টমোঽনুবাকঃ।

অন্নং [আগত অন্নকে] ন পরিচক্ষীত [রাগদ্বেষযুক্ত হইয়া হেয় বুদ্ধিতে পরীক্ষা করিবেন না, পরিহার করিবেন না, উপেক্ষা করিবেন না] আপঃ বৈ [জলই] অন্নম্ [অন্ন] জ্যোতিঃ [তেজ] অন্নাদঃ [অন্নভক্ষক, শোষক] অপ্সু [শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস গুণযুক্ত জলে] জ্যোতিঃ [শব্দ-স্পর্শ-রূপ এই ত্রিগুণযুক্ত তেজ] প্রতিষ্ঠিত [অবস্থিত আছে] (এবং) জ্যোতিষি [তেজো মধ্যে] আপঃ [জল মেঘ বারি] প্রতিষ্ঠিতাঃ [অবস্থিত আছে ; পঞ্চকৃত পরস্পরের মধ্যে বিনিময় ধর্ম অটুট রহিয়া চলিয়াছে ; পঞ্চকৃতই অন্যোন্যসাপেক্ষ হইয়াই স্বপ্রতিষ্ঠ ও অন্য সকলের প্রতিষ্ঠানে গড়িয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর] তৎ [সেই হেতু] এতৎ অন্নম্ [পরস্পরসাপেক্ষ জল ও তেজকে] অন্নে [তেজ ও জলে] প্রতিষ্ঠিতং বেদ [স্থিত বলিয়া দেখে] স য—ইত্যাদি পূর্ববৎ।

উক্ত উপাসকের পক্ষে এই ব্রত যে, অন্নকে হেয়বুদ্ধিতে পরীক্ষা করিবে না, পরিহার করিবে না। জলই অন্ন, তেজই অন্নাদ। জলে তেজ প্রতিষ্ঠিত। তেজে জল প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই অন্ন অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যে কেহ অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত জানেন, তিনি অন্নরূপে ও অন্নাদরূপে স্থিতি লাভ করেন। তিনি অন্নবান্ হন্, অন্নভোক্তা হন্। তিনি সন্তান, পশু, ব্রহ্মতেজে বলীয়ান্ হন্, কীর্ত্তিতেও মহান্ হন্।

নবম অনুবাক

অন্নং বহু কুর্বীত। তদ্ব্রতম্। পৃথিবী বা অন্নম্। আকাশোঽন্নাদঃ। পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা। ৩।৯

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং নবমোঽনুবাকঃ।

অন্নম্ [অন্নকে] বহু [প্রচুর] কুর্বীত [করিবেন] তদ্ব্রতম্ [অন্ন ও তেজকে অন্ন-অন্নাদরূপে উপাসনাকারীর ইহাই ব্রত] পৃথিবী বৈ অন্নম্ [পৃথিবীই অন্ন] আকাশঃ অন্নাদঃ [আকাশই অন্নভোক্তা] পৃথিব্যাম্ [পৃথিবীতে] আকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ [আকাশ প্রতিষ্ঠিত] আকাশে [আকাশে] পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা ; (আকাশ ও পৃথিবী সামান্যাধিকরণ সমব্যাপ্য, সম-ব্যাপক। উভয়ই উভয়ের প্রতিষ্ঠা গড়িতেছে। আকাশই যে পৃথিবীর 'পর', পৃথিবীকে ব্যাপিয়া পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া অতিষ্ঠং। পৃথিবীও আকাশের পর, আকাশকে ভিন্নাইয়া অতিষ্ঠং। আকাশ ভাবের ক্ষেত্রে পৃথিবীর 'পর' ; পৃথিবী রসক্ষেত্রে আকাশের 'পর'] তৎ এতৎ এর ব্যাখ্যা পূর্ববৎ।

উক্ত উপাসকের পক্ষে ব্রত এই যে, অন্নকে বর্দ্ধিত করিবেন। পৃথিবীই অন্ন। আকাশ অন্নাদ। পৃথিবীতে আকাশ প্রতিষ্ঠিত। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই অন্ন অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যে কেহ এই অন্নে প্রতিষ্ঠিত অন্নকে জানেন, তিনি অন্ন ও অন্নাদরূপে স্থিতি লাভ করেন। তিনি প্রচুর অন্নের অধিকারী হন্, অন্নভোক্তা হন্। তিনি সন্তান, প্রজা, পশু ও ব্রহ্মতেজে মহীয়ান হন্, কীর্ত্তিতেও মহান হন্।

দশম অনুবাক

ন তনন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্ব্রতম্। তস্মাদ্ যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ। অরাধ্যাস্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে এতদ্বৈ মুখতোঽন্নং রাদ্ধম্। মুখতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্বৈ মধ্যতোঽন্নং রাদ্ধম্। মধ্যতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্বা অন্ততোঽন্নং রাদ্ধম্। অন্ততোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। ৩১০।১

হীত তৃতীয়ব্যাখ্যায়ে দশমোঽনুবাকঃ।

কদন [বাটীতে আগত কাহাকেও] বসতৌ [বসতি-স্থানে, গৃহে] ন প্রত্যাচক্ষীত [প্রত্যাখ্যান করিবেন না] তৎ ব্রতম্ [উক্ত পৃথিবী ও আকাশ উপাসনাকারীর ব্রত] তস্মাৎ [সুতরাং] যয়া কয়া চ [যে কোনও] বিধয়া [প্রকারে] বহ্বন্নং [প্রচুর অন্ন] প্রাপ্নুয়াৎ [সংগ্রহ করিবেন] (এইরূপ উপাসক অতিথিকে দেখিয়া) অরাধি [রন্ধন করা হইয়াছে] অস্মৈ [ইহারই জন্য] অন্নম্ [অন্ন] ইতি আচক্ষতে [এইরূপ বলেন] এতৎ বৈ [এই যে] মুখতঃ [প্রথম বয়সে অথবা মুখ্যবৃত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মসহকারে] অন্নং রাদ্ধম্ [অন্ন রাঁধিয়া ভোজন করান হইল] মুখতঃ বৈ [মুখ্য প্রকারে বা প্রথম বয়সেই] অস্মৈ [এই অন্নদাতার জন্য] অন্নং রাধ্যতে [অন্ন রান্না করা হয়, অন্ন উপস্থিত হয়] এতৎ বৈ [এই যে] মধ্যতঃ [মধ্য বয়সে বা মধ্যম ব্রহ্মসহকারে] অন্নং রাদ্ধম্ [অন্ন রন্ধনাদি দান করা হইল] মধ্যতঃ [মধ্যম প্রকারে অথবা মধ্যম বয়সে] অস্মৈ [ইহার জন্য] অন্নং রাধ্যতে [অন্ন রান্না হয়, সমুপস্থিত হয়] এতৎ বৈ [এই যে] অন্ততঃ [শেষ বয়সে বা অপকৃষ্ট প্রকারে] অন্নং রাদ্ধম্ [অন্ন রান্না হইল, ও খাওয়ান গেল] অন্ততঃ [শেষ বয়সে বা অপকৃষ্ট প্রকারে] অস্মৈ [ইহার জন্য] অন্নং রাধ্যতে [অন্ন রান্না হয়]

উক্ত উপাসকের এই ব্রত যে, সমাগত কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবেন না। সুতরাং যে কোনও প্রকারে প্রচুর অন্ন যোগাড় করিবেন। অভ্যাগত থাকিলে তিনি এইরূপ বলিবেন—ইহার জন্য অন্ন রন্ধন করা হইয়াছে। অন্নদাতা এই যে মুখ্যবৃত্তি হইতে অন্ন রান্না করিয়া দিলেন, ইহার ফলে তাহার জন্য মুখ্যপ্রকারে অন্ন রান্না হয়। এই যে তিনি মধ্যবৃত্তিসহকারে অন্ন রন্ধন করেন। মধ্যম প্রকারেই তাহার জন্য অন্ন রান্না করা হয়, এই যে তিনি অধমবৃত্তি সহকারে অন্ন রান্না করেন অধম প্রকারে তাহার জন্য অন্ন রান্না করা হয়।

য এবং বেদ। ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ। কর্মেতি হস্তয়োঃ। গতি রিতি পাদয়োঃ। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। অথ দৈবীঃ—তৃপ্তিরিতি বৃষ্ট্যাং। বলমিতি বিদ্যুতি। ৩১০।২

য এবং বেদ [যিনি এইরূপ অন্ন ও অন্নদানের মহিমা অবগত আছেন, তিনি পূর্বোক্ত ফল লাভ করেন] (এখন ব্রহ্মোপাসনার প্রকারবিশেষ বলা হইতেছে) ক্ষেম ইতি [প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ রূপে ব্রহ্মই ক্ষেম ; ক্ষেম আধেয়, বাক্ তাহার আধার। বাক্‌শক্তি ক্ষেম-ব্রহ্মের আধার হইলে সমস্ত লব্ধবস্তু সংরক্ষিত হয়। বাক্‌শক্তিদ্বারাই সংরক্ষণ-শক্তি সহজ, সম্ভবপর।] বাচি [বাক্য] যোগক্ষেমঃ ইতি [যোগ অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ এবং ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধবস্তুর সংরক্ষণ রূপে] প্রাণাপানয়োঃ [প্রাণ ও অপানে। ব্রহ্মই যোগক্ষেমরূপে প্রাণ-অপান-আধারে অবস্থিত]। কর্ম ইতি হস্তয়োঃ [হস্তদ্বয়ে কর্মরূপে] গতি ইতি পাদয়োঃ [পাদদ্বয়ে গতিরূপে] বিমুক্তি ইতি পায়ৌ [পায়ুতে পরিত্যাগ রূপে] (প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে) ইতি [এই সমুদয়] মানুষীঃ [মনুষ্য সংক্রান্ত] সমাজ্ঞাঃ [উপাসনা] অথ [অনন্তর] দৈবীঃ [দেবতা সম্পর্কিত উপাসনা সমূহ] (বলা হইতেছে) তৃপ্তিঃ ইতি [তৃপ্তি রূপে] বৃষ্ট্যাং [বৃষ্টিতে] বলম্ ইতি [বলরূপে] বিদ্যুতি বিদ্যুতে]

ক্রমশঃ

সংসার কাহাকেও বাধা দেয় নাই, সংসার সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা, মিথ্যা বিভীষিকাই আমাদের বাধা দিতেছে।···বিশ্বকে ভালবাসাই যে সংযম, ব্রহ্মচর্য; অথচ এ ব্রহ্মচর্যে শুষ্কতা নাই; যে অর্থে "নিরোধ" আমরা বুঝি, সে নিরোধও নাই। উপনিষদ্ বলিয়াছেন--অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিতে হয়, "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা" সংসার বিচরণই মরণ জয়। যারা অবিদ্যার ক্ষেত্র হইতে ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে সরাইয়া লইবার জন্য কাম ক্রোধের সঙ্গে কুস্তি করিল তাহারা লৌকিক চক্ষে বড় ব্রহ্মচারী হইলেও পুরুষোত্তম-রাজ্যে "মরা" সন্দেহ নাই। সংসারময় জীবন ছড়াইয়া না দিলে লক্ষ বৎসরেও ব্রহ্মচর্য্য বজায় থাকিবে না। চিত্তকে সংসার হইতে গুটাইয়া লইতে চাহিলেই সে বিদ্রোহ করে, তখন তাহাকে নিরোধ করার চেষ্টা ব্যর্থ। খাইতে পরিতে না দিয়া কাহাকেও পোষ মানানো যায় না: ইন্দ্রিয়ের খাদ্য স্বরূপ ও বিশ্বরূপ। তুমি যদি বিশ্বরূপের খাদ্য দিবে না, সে মরিবে বটে কিন্তু তাহার ভূত তোমায় ছাড়িবে না।

কামের ভূত আজ ব্রহ্মচারীদের ঘাড়ে চাপিয়াছে। তাহারা যে মরিয়া আছে তাহা বুঝা কি খুব কঠিন? নরনারায়ণের কাজ তাই গুরুতর, গুরুতম। এই মৃত ব্রহ্মচর্য্যকে জীবন্ত ব্রহ্মচর্য্যে গড়িয়া তোলার জন্যই তোমাদের ব্রহ্মচারিণীরূপে আমি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই। যিনি জীবনচারিণী, তিনিই ব্রহ্মচারিণী; জীবনই ব্রহ্ম। জীবনহীন ব্রহ্ম নরনারায়ণের উপাস্য নয়। ভারতবর্ষ তাইতো ব্রহ্মেরও পর পর-ব্রহ্মের স্তর স্থাপন করিয়াছেন। স্বরূপ ও বিশ্বরূপে প্রেম হইলে কাম নিয়া ঠেলাঠেলি করিতে হয় না। দুই ভাবে সংযম থাকিলে কামের সকল ফাঁক বন্ধ হইয়া যায়। বিশ্বরূপের দিক বন্ধ থাকিলে কাম স্বরূপের দিক দখল করিবে, বিশ্বরূপের দিক খোলা থাকিলে বিশ্বরূপের ক্ষেত্র দখল করিবে। দুই দিক খুলিয়া দিলে কামের দাঁড়াইবার স্থান পায় না। সব জীবন মধুময় হয়। সেই জন্যই বলি "অহং" ছাড়িয়া দাও। অহং দুইটির একটীকে নিয়া দাঁড়াইতে চায়। দুইটীর সমন্বয় "অহং" জানে না। আমির কাছে হয় বিশ্ব সত্য, নয় ঈশ্বর সত্য। আমি যদি হন্ পুরুষোত্তম তখনই বিশ্ব ও ঈশ্বর দুইই সত্য। তখন হয় বাস্তব ব্রহ্মচর্য্য। এ যে কলিযুগ। এখানে "বাস্তবম্ বস্তু বেদ্যম্"—কলি-যুগে যে বাস্তব বস্তু জানিবার যুগ। কোনো তত্ত্ব নিয়া ফাঁকি বা অভিনয় চলিবে না। সব আজ পুরুষোত্তমের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

মানুষকে বাদ দিয়ে যেমন উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অসম্ভব, তেমনি অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan.

—ধর্মিত কি করে ধর্মী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)	
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	১৷৩
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্য্যন্ত)	৮৲
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত)	৬৲
ঈশোপনিষৎ	২৲
কেনোপনিষৎ	২৲
কঠোপনিষৎ	৩৲
প্রশ্নোপনিষৎ	
ঐতরেয়োপনিষৎ	
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	
শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ	
শ্রীনিতাগোপাল ভাবনে ও ভজনে	
স্বরাজের পূর্ণরূপ	
গীতাজয়ন্তী	
উদ্ধবসংবাদ (পুস্তিকা)	
মুক্তকোপনিষৎ	
মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-মূর্তিভঙ্গিতে আলোচনা (গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)	৩৲
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	

পাণ্ডুলিপি

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
ছান্দোগ্য উপনিষৎ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি

শ্রীযুতী প্রতিভা রায়ের

নারী-প্রগতির রূপরেখা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ও শিশু নিতাগোপাল
ও শিক্ষা সুধার কথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীযুতী রেণু মিত্রের

সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল
রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে
শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন
রবীন্দ্র-হৃদয়
ও ৷ প্রাথমিক শিক্ষা

2 SEP 1968

নরনারায়ণ আশ্রম

ফোন নম্বর ৫৭-২৫৪০

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

উড্ডীয়মান ভারত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয় সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

শ্রীনিত্যগোপাল

শারদীয়া সংখ্যা ১৮৮৭, ১৩৭৩, সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র ১৯শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

নরনারায়ণ আশ্রম পরিচালিত কর্মসমূহ

—সংস্কৃতিমূলক—

১। **উজ্জ্বল ভারত** মাসিক পত্র - ১৯ বর্ষ। ধার্মিক কি করিয়া বিপ্লবী হইতে পারে তাহা পাইবেন। **উজ্জ্বল ভারতের** গ্রাহক হউন।

২। **ব্রহ্মসূত্র, গীতা ও প্রধান প্রধান উপনিষদের অবধূত-ভাষ্য এখান হইতে প্রকাশিত হইতেছে।** —এই সকল পুস্তক পাঠ ও আলোচনা করিয়া সমন্বয়ের আলোকে নূতন জীবন-চেতনাকে বুঝুন।

৩। **অন্যান্য বই** —পড়িয়া চিন্তা ও আনন্দ দুইয়েরই সন্ধান পাইবেন।

৪। **রবিবার বৈকালে গীতা পাঠ হয়।** —পাঠে যোগদান করুন।

৫। **প্রতিদিনের ঠাকুর-সেবায় যুক্ত হউন।**

—সমাজসেবা মূলক—

১। **গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার**—ভাল ভাল সকল রকমের বই আছে। স্কুল কলেজের বইও পাওয়া যায়। ইহার সভ্য হউন।

২। **মহিলা জীবন শিক্ষা কেন্দ্র**—(ক) সাধারণ সেলাই বিভাগ (খ) লেডী ব্রাবোর্ণ ডিপ্লোমা বিভাগ—অতি অল্প বেতনে জামা, প্যান্ট প্রভৃতি কাটছাট ও সকল প্রকার সেলাই শেখান হয়। সাধারণ বিভাগে সেলাইর যাবতীয় সরঞ্জাম প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করে, ডিপ্লোমা বিভাগে উহা শিক্ষার্থীকে বহন করিতে হয়। পরীক্ষার ফল অতি সন্তোষ জনক।

৩। **নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়**—(১ম—৫ম শ্রেণী)—অবৈতনিক—। হাতের কাজ সহ আনন্দের মধ্য দিয়া ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিক্ষা দিয়া থাকেন। ছেলেমেয়েদের ভর্ত্তি করুন।

৪। **প্রতিভামিত্র শিশু নিকেতন** (**প্রাক্-বুনিয়াদী**)—তিন হইতে পাঁচ বৎসরের শিশুদের গান ও খেলাধূলার মাধ্যমে উপযুক্ত শিক্ষাস্থান।

৫। **চরকা ও তাঁতকেন্দ্র**—আপনার বাড়ীতে বসিয়া দৈনিক ২।১ ঘণ্টা নিয়মিত সূতা কাটিলে আপনার বস্ত্র স্বাবলম্বনে অনেকটা সাহায্য করিবে। নিজের বস্ত্র নিজে তৈরী করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ যোগাযোগ করুন।

কার্যাধ্যক্ষ

নরনারায়ণ আশ্রম

পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

ফোন : ৫৭-২৫৪০

শারদোৎসবে আমাদের আন্তরিক

শুভেচ্ছা ও অভিবাদন

গ্রহণ করুন।

সুভাষ লাইব্রেরী

১২, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

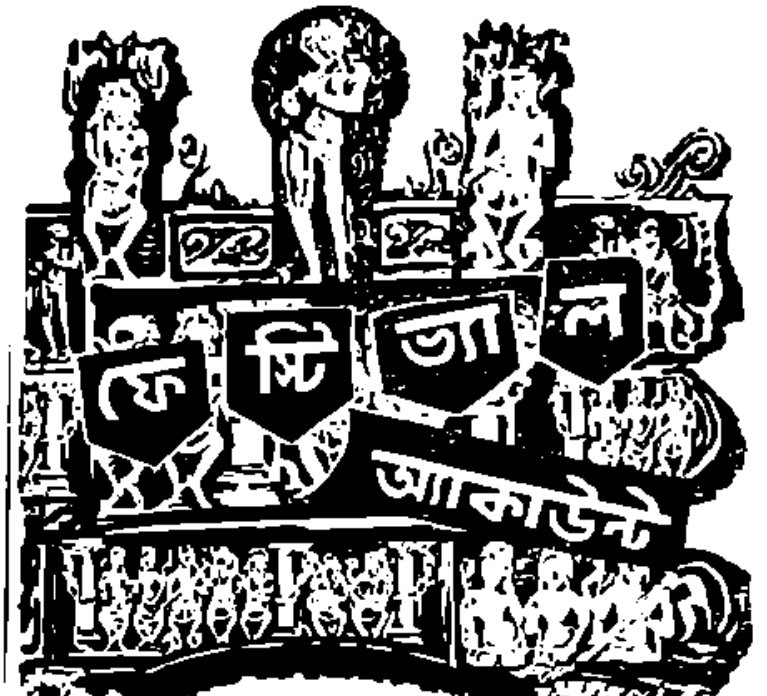

আগামী বছরের পূজার খরচের জন্য **ফেস্টিভ্যাল অ্যাকাউন্ট** খোলার এখনই উপযুক্ত সময়।

প্রতিমাসে টা. ৫ জমা দিলে আগামী পূজার সময় টা. ৬১.৭৫ হবে। পাঁচ টাকার গুণিতক অধিক পরিমাণ টাকাও জমা লওয়া হয়।

আমরা সেবার সাথে দিই আরও কিছু

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিস্টার্ড অফিস:
৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১

পূজোয় চাই
নতুন জুতো

Bata

টাটার ইস্পাত কর্মীদের 'শ্রমবীর' জাতীয় পুরস্কার লাভ

১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকার দিল্লীতে এক অনুষ্ঠানে আজকের ভারতের শিল্পজগতের 'মহা ভগবান'—টেকনিশিয়ান ও কারিগরদের 'শ্রমবীর' জাতীয় সম্মানে ভূষিত করেছেন। শ্রমশিল্পে খরচ কমিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর উপায় যাঁরা দেখাতে পারবেন তাঁদের প্রতিবছর এই সম্মান ও পুরস্কার দেওয়া হবে।

এ বছর মোট ২৭টি পুরস্কারের মধ্যে সর্বোচ্চ দুটি পুরস্কার সমেত পাঁচটি টাটা স্টীলের কর্মীরা পেয়েছেন—এ দেশে আর কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান এত বেশী পুরস্কার পাননি।

জামশেদপুরে গত বিশ বছরে কর্মীরা ছোটখাটো নানারকম ব্যবস্থার দ্বারা যাতে উৎপাদন বাড়ানো যায় এরকম ১২,০০০ প্রস্তাব পেশ করেছেন, তার মধ্যে ১০০০টি কাজে লাগানো হয়েছে। এই প্রস্তাবগুলি উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া কারখানার কাজকর্মে নিরাপত্তা এনেছে আর যেসব মাথাগুলো ও কর্মকুশলতাকে কাজে লাগিয়ে দেশের শিল্পকে আত্ম-নির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

কারখানার স্বাধীন প্রতিনিধিদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্যে 'সাজেশন স্কীম' আজ আমাদের দেশের শ্রমশিল্পে প্রচলিত হয়ে গেছে। এই স্কীমের প্রবর্তক হিসেবে টাটা স্টীলের গৌরব বড় কম নয়।

আর. সি. গুরুৎ :
সর্বোচ্চ পুরস্কার ২০০০৲ পেয়েছেন।

এম. এম. মজুমদার :
সর্বোচ্চ পুরস্কার ২০০০৲ পেয়েছেন।

টাটা স্টীল

কে. বি. দুবে :
৫০০৲ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন।

বলবন্ত সিং :
৫০০৲ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন।

আকবর হুসেন :
৫০০৲ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন।

The Tata Iron and Steel Company Limited

[WITH REGRET]

বাংলার ও বস্ত্রশিল্পের লক্ষ্মী

বঙ্গলক্ষ্মী

মাতৃপূজায় ও নিত্যপ্রয়োজনে

বঙ্গলক্ষ্মীর

ধুতি — — — শাড়ী

অপরিহার্য্য

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ

হেড অফিস : ৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

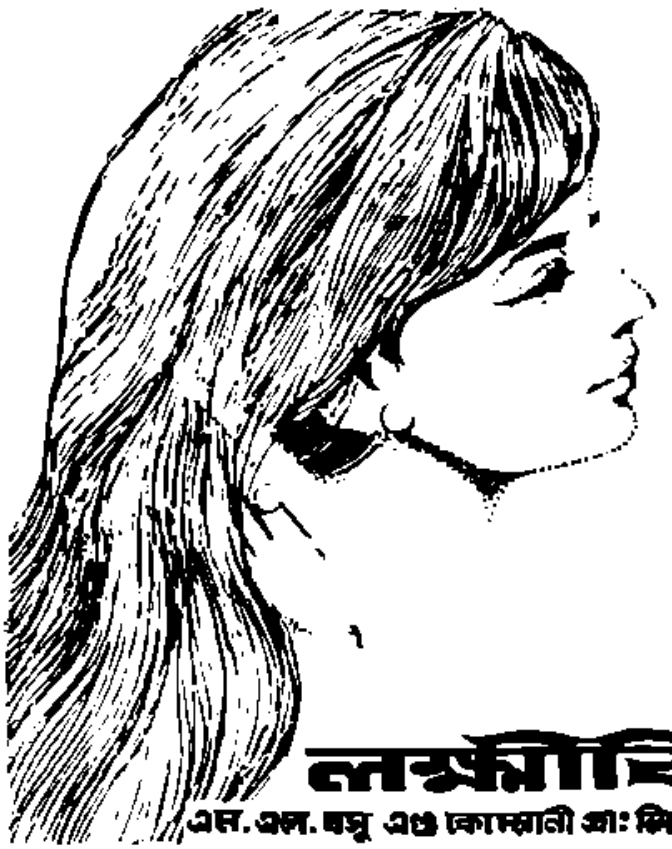

আরও সুন্দর আরও উজ্জ্বল
ক'রে তুলুন আপনার চুল
একমাত্র লক্ষ্মীবিলাস
নিয়মিত ব্যবহারেই
তা সম্ভব।

এখন থেকে ৩ রকম সাইজে পাওয়া যাচ্ছে

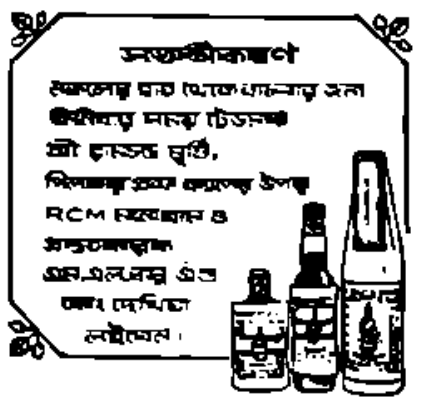

লক্ষ্মীবিলাস

এস. এল. বসু এণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ □ লক্ষ্মীবিলাস হাউস · কলিকাতা-৯

FOR YOUR REQUIREMENT OF

EXPANDED METAL

PLEASE CONTACT :

ACME MANUFACTURING CO.,

'JAIN HOUSE',

8/1, ESPLANADE EAST,

CALCUTTA-1

Phone : 23-5594 (3 lines)
Gram : Nature Cure.

শারদোৎসবে
আমাদের আন্তরিক
শুভেচ্ছা ও অভিবাদন
গ্রহণ করুন।

হাওড়া মোটর কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা

শারদোৎসবে

বৃহত্তম

বিভাগীয় বিপণি

কমলালয় ষ্টোর্স

প্রাইভেট লিমিটেড

ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট : : কলিকাতা-১৩

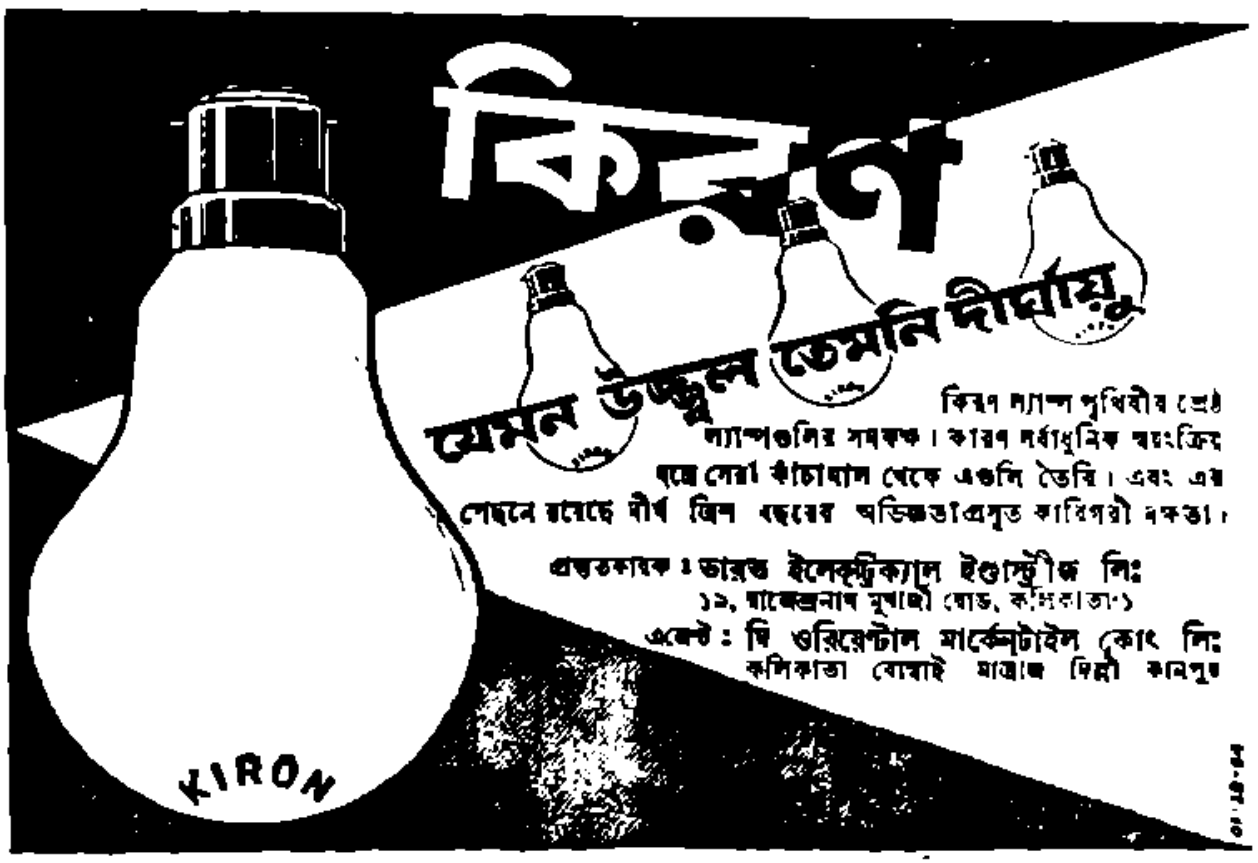

পূজার অভিনন্দন গ্রহণ করুন

বেলেঘাটা ভ্যারাইটী ষ্টোর্স

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

১৩৪, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড,

কলিকাতা-১০

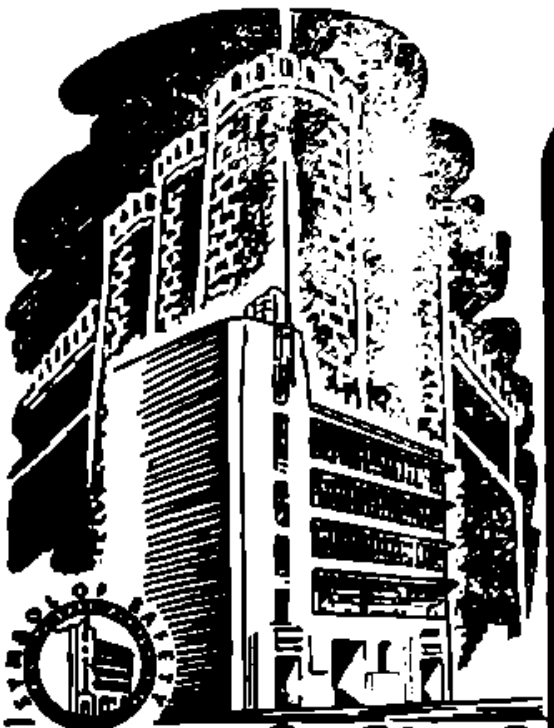

কলিকাতা সেফ ডিপোজিট কোং লিঃ

সি কি উ রি টি হা উ স

৭৯-বি, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

ঔন-পঞ্চাশে বাঁচবার সর্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান

মানুষের জীবনে বিপদ-আপদ আসবেই— তবুও মানুষ নির্ভাবনায় ও শান্তিতে থাকতে চায় ও চেষ্টা করে। আপনার অলঙ্কারাদি, দলিলপত্রাদি ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিষ আমাদের জিম্মে রেখে দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকুন। আমাদের জিম্মে আপনার মূল্যবান দ্রব্যাদি সম্পূর্ণ গুপ্ত ভাবে নিরাপদ অবস্থায় থাকবে। বিশেষ বিবরণের জন্য আমাদের অফিসে নিম্নে অনুসন্ধান করুন

ফোন : 22-5477

স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের জন্য

পূজা-স্পেশাল ট্রেনগুলিতে ভ্রমণ করুন—এগুলি নির্ধারিত সময়ে সুনিয়মিতভাবে চলাচল করবে।

ট্রেন ধরতে না পারার হতাশা বা চলন্ত ট্রেনে উঠবার ঝুঁকি এড়াতে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে স্টেশনে পৌঁছবেন।

ভীড় এড়াবার জন্য নিকটতম সিটি বুকিং অফিস থেকে টিকিট কিনুন।

আপনার সহযাত্রীর সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

টিকিট কেনার জন্য লাইনে দাঁড়ান এবং সঠিক ভাড়া গুণে দিন—তাড়াতাড়ি কাজ হবে। প্রয়োজনে দেখাবার জন্য টিকিট হাতে রাখুন।

কম মালপত্র নিয়ে ভ্রমণ করুন। ভারী মালপত্র ল্যাগেজ ভ্যান-এ বুক করুন।

পূজার অভিনন্দন

পূর্ব রেলওয়ে

Phone : 23-9990
23-2428

With best Compliments

S. K. KAHANSONS & CO.

29, Waterloo Street,
Calcutta-1

Ask for

Lime, Lime Stones, Coal, Fire bricks
&
Other Materials

SPACE DONATED

by

The Oriental Metal Industries Private Ltd.

Manufacturers of "DIPTI" Lantern, Enamel Ware,
& Khas Janata Kerosine Cooker.

CALCUTTA-12

পোড়া ··· কাটা ··· পোকার কামড়
এই সব আকস্মিক **দুর্ঘটনায়**

হাতের কাছে রাখুন

এ্যাক্রিমেণ্ট

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
চর্বিবর্জিত এ্যান্টিসেপটিক মলম
সংক্রমণ প্রতিরোধক
সত্বর আরামদায়ক

শিশুদের কোমল ত্বকের পক্ষেও নিরাপদ দাগ লাগে না

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৭·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০
কর্মবাণী	১·২৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
Soul of India Speaks	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	২·২৫

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
জীবন গড়া	০·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি

মানুষের মত মানুষ	০·৭৫
বঙ্কিমের গল্প	১·২৫
সাহিত্যের গল্প	১·৫০
বিদ্যাসাগর	২·২৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি

শিশু রামায়ণ	০·৬১
শিশু মহাভারত (শিক্ষা-বিষয়ক বই)	০·৭৫
শিক্ষা— শ্রীরমণী রঞ্জন সেনগুপ্ত	৭·৫০
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	১·০০
আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি	১০·০০

শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত ও শ্রীরমণী সেনগুপ্ত

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা	১০·৫০

শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত

শিক্ষা-বিজ্ঞান— শ্রীযতীন্দ্র চৌধুরী	০·৫০
শিক্ষার ইতিহাস— শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বক্সী	৩·২৫

ভূপর্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাসের

তরুণ তুর্কী	২·৫০
ভয়ঙ্কর আফ্রিকা ১ম, ২য়	৩·২৫
বেদুইনের দেশে	১·৭৫

ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের

শরীর ও শক্তি	১·২৫
নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন	১·২৫
সরল যোগ ব্যায়াম	১·২৫
যোগ-ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	১·৪০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	১·৪০
যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৩·০০

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তীর (মহারাজ)

জেলে ত্রিশ বৎসর ও ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম	

শ্রীরমেশচন্দ্র সরকারের

বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী	৩·৫০

Student's Own Dictionary (of Words Phrases & Idioms) 7·50

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১০·০০

সর্বদা ব্যবহার্য মধ্যমাকৃতি অভিনব বাংলা অভিধান। পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। শব্দসংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার

শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী (বহুচিত্র শোভিত পূর্ণাঙ্গ জীবনী) ৩·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

সি, সি, কোম্পানী

—কন্টিনেন্টাল কম্যার্শিয়াল কোং লিঃ—

৮।১, ডালহৌসী স্কোয়ার,

কলিকাতা।

যাবতীয় অফিস-ষ্টেশনারী ও

ছাপাই-এর কাজ :

টাইপরাইটার—ফাউণ্টেন পেন

বিক্রয় ও মেরামত :

—ষ্টীল ফারনিচার—

গ্রাহকের সন্তোষ আমাদের লক্ষ্য

ফোন—২২-১২৬৩

যে কোন রকমের গৃহাদি

নির্মাণে

বেঙ্গল বিল্ডার্স এণ্ড ট্রেডার্স

প্রাইভেট লিঃ

-এর

পরামর্শ লউন।

২৭, রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি রোড,

কলিকাতা—১

ফোন : ২৩-৩৭২৮

উৎকৃষ্ট সেলাইয়ের জন্য

ঊষা কলে সেলাই করুন

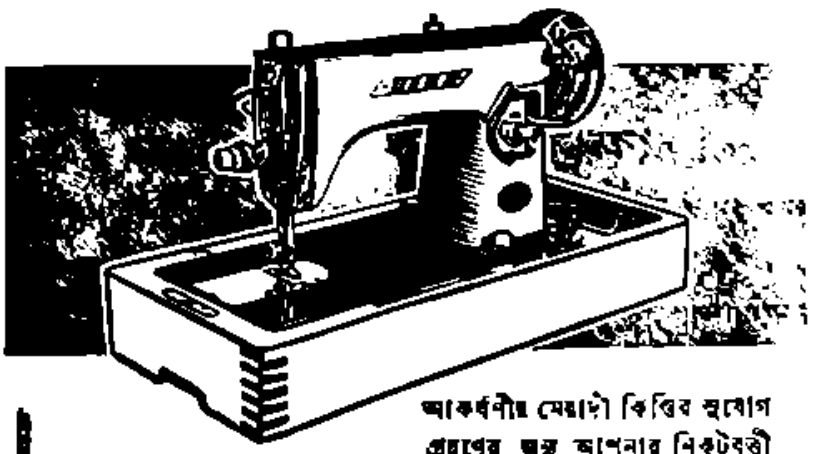

আকর্ষণীয় মেয়াদী কিস্তির সুযোগ
গ্রহণের জন্য আপনার নিকটবর্ত্তী
বিক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করুন

ঊষা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, কলিকাতা-৩১

Zonal Office : 26, R. N. MUKHERJEE ROAD, CALCUTTA-1

॥ গান্ধী স্মারক নিধির বই ॥

মহাত্মা গান্ধী বিরচিত

সত্যই ভগবান	৩·০০
পল্লী-পুনর্গঠন	৩·০০
নারী ও সামাজিক অবিচার	৪·৫০
গীতাবোধ	১·৫০
পঞ্চায়েত রাজ	০·৭৫
মোহনমালা	৩·৫০
সর্বোদয়	৩·০০
আমার সমাজবাদ	১·০০
অহিংসার পথে বিশ্বশান্তি	১·০০
উৎপাদক শ্রম	০·৬০
ট্রাস্টিবাদ	০·৬১

*

প্রকাশের অপেক্ষায়

আত্মকথা

গান্ধীজীর প্রসিদ্ধ আত্মজীবনীর প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ

অনুবাদ : শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

*

গান্ধী-রচনা-সংকলন

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু সংকলিত

ও

শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত

*

প্রকাশন বিভাগ,

গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা),

১২ডি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

পাঠাগারের অপরিহার্য বই—

বিপ্লবী রাসবিহারী বসু	মণি বাগচি	৪·০০
জননায়ক জওহরলাল	মণি বাগচি	৪·০০
সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী	মণি বাগচি	৩·০০
সেই বিশ্ববরেণ্য সাধক	মণি বাগচি	৩·০০
লোকমাতা নিবেদিতা	মণি বাগচি	২·৫০
বাংলার বাঘ আশুতোষ	ভবেশ বিশ্বাস	২·০০
ইন্দ্রনীলা	নমিতা চক্রবর্তী	২·০০
অচেনা আকাশ	নগেন দত্ত	৩·০০
মোহ থেকে মুক্তি	নারায়ণ চৌধুরী	৯·০০
মুক্তিস্নান	হীরেন মুখোপাধ্যায়	২·৫০
কেমন করে এল এরা	ইন্দিরা দেবী	১·৩৫
সাপ	অবনীভূষণ ঘোষ	৮·০০
বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে	অবনীভূষণ ঘোষ	৩·৫০

দেশ'পত্রে-দেশে মূর্ত বিগ্রহ

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অগ্নিগর্ভ আলেখ্য

মণি বাগচি প্রণীত

দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র দাম ৪ টাকা

শিক্ষা ভারতী

৯/৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বজায় রাখিতে চাই

বিশুদ্ধ

মাখন ও ঘৃত

*

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সরকার ডায়েরী

ঘৃত ও মাখন প্রস্তুতকারক

৩২, ভূপেন বসু এভিনিউ

কলিকাতা ৪

নিখুঁত ব্লক
রঙিন ছাপা
মনোরম ডিজাইন

★

এই তিনের উপর নির্ভর করে
ছবির সৌন্দর্য

★

এই তিনেতেই আমাদের উপর
নিশ্চিন্ত নির্ভর করা যায়

★

ষ্টাণ্ডার্ড ফটো এন্‌গ্রেভিং কোং

১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট

ফোন : ৩৪-১৩৬১ : : কলিকাতা ৯

ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেইণ্ট এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ

কলিকাতা • আসানসোল • শিলিগুড়ি • মাদ্রাজ

আন্তরিকতাপূর্ণ সৌজন্যে

জেনারেলের ধর্মগ্রন্থ

জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত

স্বামী বেদান্তানন্দের
ভক্তি প্রসঙ্গ ৩·০০
রামকৃষ্ণ-কথামৃতের আলোকে নারদীয় ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যা

মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত
ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত
অভয়ের কথা ৫·০০
আচার্য যজ্ঞেশ্বর ঘোষের গীতা ও হিন্দুধর্ম ৪·০০
গীতা ও গীতার ভাবার্থ ৩·০০

স্বামী নিত্যানন্দের শ্রীম দর্শন (২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড)
রামকৃষ্ণ-কথামৃতকার কর্তৃক কথামৃতের ভাষ্য প্রতি খণ্ড ৫·
উমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত অমিয় বাণী ২·০০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও তাঁহাদের ষোলজন
সন্ন্যাসী-সন্তানের বাণী সঞ্চয়ন

জেনারেল বুকস্

এ-৬৮, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

গৌরাঙ্গভক্ত শ্রীবৈষ্ণবদাস বিরচিত

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্

ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত লোচন দাস ঠাকুরের গৌরাঙ্গলীলা, চৈতন্যদাস ও কৃষ্ণ দাস কবিরাজের গৌরকৃষ্ণলীলা টীকার ভাবার্থ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর বহুসংখ্যক বাংলা পদ সম্বলিত। সচিত্র শোভন সংস্করণ মূল্য বার টাকা।

গৌরপ্রীতিতে নয়নের দুটী খুলিয়াছে এমন ভক্তিমতী সুধা সেন কর্তৃক রচিত মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর সরল ও প্রাণ স্পর্শী ভাষায় এবং এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বসুন্দরতার প্রতিমূর্তি নদীয়া বিনোদিয়ার রূপ-গুণ-লীলা-মাধুর্যের সংবাদ এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্যবান চিত্র সম্বলিত। মূল্য আট টাকা।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক রচিত বাংলার চিরায়ত সাহিত্যের সম্ভার

পৌরাণিকী

ভারত আত্মার সর্বকথা পৌরাণিকী। যোগবাসনা বিরচিত ভাগবতবিনায় সমুজ্জ্বল এ পুরাণ কথাগুচ্ছ অনাঘ্রাত পুষ্পের মত নির্মল, গঙ্গাবারির মত পবিত্র। শোভন সংস্করণ। মূল্য ছয় টাকা।

পৌরাণিকীর আখ্যায়িকাগুলি স্বতন্ত্রভাবেও প্রকাশিত হইয়াছে।

দেবযানী	১·৬০
ভরতভরত	১·৫০
সুন্দরা	১·৪০
সতী	১·৩০
ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ	১·২০
রামায়ণী কথা	২·৪০

জিজ্ঞাসা

১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-২৯

১, কলেজ রো, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

সূচীপত্র, আশ্বিন ১৮৮৭, ১৩৭৩

১।	শ্রীশ্রীদুর্গা—শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল	৯১
২।	দেবীসূক্ত—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	৯৮
৩।	পূজার কথা—শ্রীরেণু মিত্র	১০১
৪।	মাতৃমাধুর্য-দশকম্—ৎ ল, চ, ঠাকুর	১০৫
৫।	মনস্তত্ত্বে অবচেতনবাদ ও ক্রিয়াবাদ	১০৬
	শ্রীমনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম,এ, বি, টি ডি, এস, ই	
৬।	প্রার্থনাকালীন স্তবন (৮৩)	১১২
	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত	
৭।	ভৈক্তিরীয়োপনিষৎ (পূর্বানুবৃত্তি)	১১৫
	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অনুবৃত্ত	
৮।	জাতীয় সঙ্কটে সাহিত্যের ভূমিকা	১১৮
	শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়	
৯।	তেলিয়াগাড়ী—শ্রীসবিৎশেখর মজুমদার	১২৩
১০।	সিদ্ধান্ত দর্শন (পূর্বানুবৃত্তি)	১২৬
	শ্রীনিত্যগোপাল	
১১।	অগীমমোহিনী—(একাঙ্কিকা)	১২৮
	নাট্যকার সুব্রত রায়	
১২।	চলমান জগৎ (কবিতা)	১৩১
	শ্রীজগদানন্দ বাজপায়ী	
১৩।	একবার ঘুরে আসি—শ্রীবারিদবরণ দে	১৩২
১৪।	তোমরা ও আমরা (কবিতা) শ্রীবাসুদেব দাস—১৩৫	
১৫।	উজ্জয়ন্তারত কি দেখিব না	১৩৬
	শ্রীনলিনীবিনোদ গুহ	
১৬।	আগমনী (কবিতা)—শ্রীতারাপ্রসাদ গুহ	১৩৮
১৭।	রবীন্দ্রনাথের নাটকে একটি বৌদ্ধ কাহিনী	১৩৯
	ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য	
১৮।	কঠোপনিষৎ (কবিতা)—শ্রীচিরেন্দ্রা তরফদার—১৪৫	
১৯।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (৫৩)	১৪৬
	১৯৫৩ —	
২০।	জনমানস নেত্রে—জনাব কেরামত আলি	১৫৩
২১।	কীর্তন—পদকর্তা—শ্রীসন্তোষকুমার দে	১৫৭

উত্তরভারত

আশ্বিন, ১৮৮৭ শকাব্দ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ ১৯শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদুর্গা

॥ শ্রীনিত্যগোপাল ॥

শ্রীদুর্গা দীনতারিণী পরমা জননী,
আনন্দময়ী অভয়া পরমা শিবানী।

মহাজ্যোতির্ময়ী তিনি চৈতন্যদায়িনী,
শিবানন্দ প্রদায়িনী শিবস্বরূপিণী,
মুক্তকেশী মনোরমা, কভু তিনি শ্যামা,
আত্মাময়ী অনুপমা অনন্তরূপিণী।
সারদা বরদা তিনি ত্রৈলোক্যতারিণী।

হিমালয়ে হেমাঙ্গিনী গৌরী গিরিবালা,
ভক্তের হৃদয়াকাশে চিন্ময়ী চপলা,
কমলাসনে কমলা পুরুষোত্তমে বিমলা,
পরাভক্তি সুনির্ম্মলা মানসরঞ্জিনী।

মেনকা-মনোসরসে উমা আদরিণী,
মেনকার মনোরমা অতনুমোহিনী,
কভু বালা ভগবতী, কমলিনী ক্রীড়াবতী
স্নেহময়ী স্নেহবতী তিনি ঔষধারিণী,
মহাভাবময়ী শ্যামা, শ্রীকৃষ্ণকাদিনী।

(তাঁর) সুচারু কটিতে শোভে সুবিচিত্র বস্ত্র,
শ্রীকর দশকে শোভে দিব্য দশ অস্ত্র,
দিব্য ভূষণে ভূষিত, দিব্য শ্রীঅঙ্গ শোভিত,
তিনি দিব্য কিরীটিনী সুমনী মালিনী,
নিত্যজ্ঞান সরোবরে দিব্য সরোজিনী!
দক্ষিণ শ্রীপদ তাঁর ধর্ম্ম সিংহোপরে,
রিয়েছেন বামপদ অধর্ম্ম অসুরে,

কত তাঁহার করুণা, অধর্ম্মে ঘৃণা করে না,
অধমে তারিতে তিনি অধমতারিণী,
পতিত উদ্ধার হেতু পতিতপাবনী।

মায়াকুহকিনী তাঁর শ্রীকর অধীনে,
বদ্ধ করিবারে নারে তাঁহা কভুজনে
বিষম বিষ অজ্ঞান, তাহা করে উদ্দীপন,
মহাদেবী দুর্গা নিলে সে বিষবারিণী,
সে বিষে মরিলে তিনি মৃত্যুসঞ্জীবনী!

ব্রহ্মময়ী ব্রহ্ম তিনি সত্য সনাতনী
করুণাময়ী শ্রীকালী পরমকল্যাণী,
হয়ে মনসা রূপসী, বিতরেন সুধারাশি,
(তিনি) অজ্ঞান-বিষহারিণী সুধা স্বরূপিণী,
নিরুপমা নিত্যময়ী নিত্যা নিরঞ্জনী।

গৌতমীয় তন্ত্র মতে তিনি কালাচাঁদ,
গোপিনী হরিণী-ধরা প্রেমময় ফাঁদ,
তিনি পরমা সুন্দরী, শিবচন্দ্রে সুমাধুরী,
তিনি পরা শান্তি সুধা ভুবনমোহিনী।

ভারতের মহাশক্তি তিনি আদ্যাশক্তি,
রহুক আমার তাঁর শ্রীচরণে ভক্তি,
কবে বা তাঁর কৃপাতে হত হবে মতি তাঁতে,
স্বদেশের তরে কবে হবে উন্মাদিনী?
আমার স্বদেশ তাঁর শ্রীপদনলিনী
(যা চরণ সুখানি)! *

[* ন্যূনাধিক আশি বৎসর পূর্বে লিখিত এবং পুনর্মুদ্রিত।]

দেবী সূক্ত

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

(পুনর্মুদ্রিত)

ঋগ্বেদোক্ত দেবীসূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হইতেছেন প্রচলিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বেদে অনধিকারী একটি নারী। ইনি ছিলেন মহর্ষি অম্ভৃণের কন্যা; নাম ইহার 'বাক্'। এই মহীয়সী নারীর জীবন দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে বিশ্বের যাবতীয় নারী শক্তির স্বরূপের কথা; নারীই 'সৃষ্টেঃ হেতুভূতা সনাতনী'। সৃষ্টির হেতুভূতা সনাতনী এই নারীশক্তি ব্যষ্টি ও সমষ্টি। নারী শুধু খণ্ডপ্রসবিনীই নহেন; তাঁহার এই ব্যষ্টিরূপ সার্থক হইতে পারে তাঁহার বিশ্বপ্রসবিনী স্বরূপের সমন্বয়েই। নারী বস্তুতঃ ব্যষ্টি-প্রসূতিই; কিন্তু ভাবতঃ তিনি বিশ্বপ্রসূতি। বিশ্বপ্রসূতি না হইলে ব্যষ্টিপ্রসূতি হওয়ার কোনও পারমার্থিক মূল্যই থাকে না; তখন ব্যষ্টি-সৃষ্টি হয় নারীর পক্ষে এক মহাবন্ধন,—পুরুষের পক্ষেও। দেবীসূক্তের মধ্যে নারী-প্রকৃতির সমষ্টি স্বরূপের খোঁজ আছে। আজ এই মহাপূজার অবসরে দেবীসূক্তে আখ্যাদিত নারীজাতীর সমষ্টিপ্রকৃতিকৃত তত্ত্বকথা মাটির মেয়েদের কাছে উপস্থিত করিতেছি।

ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহ
মাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহ-
মিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১

অহম্ [আমি দেবীসূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা, মহর্ষি অম্ভৃণের দুহিতা ব্রহ্মবিদুষী বাক্] রুদ্রেভিঃ [একাদশ রুদ্ররূপে] বসুভিঃ [অষ্ট বসুরূপে] চরামি [এই বিশ্ব সৃষ্টির অন্তরে বাহিরে বিচরণ করিতেছি, আমার ব্যষ্টি-জীবনকে বিচরণপথে, গতিপথে বিশ্বব্যাপ্ত করিয়া অনুভব করিতেছি]। অহম্ [আমি] আদিত্যৈঃ [দ্বাদশ আদিত্যরূপে] উত [আর] বিশ্বদেবৈঃ [সকল দেবতা-রূপে বিচরণ করি] অহম্ উভা [উভৌ; উভয়] মিত্রাবরুণা [মিত্রবরুণকে] বিভর্মি [সকলের সব বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া ভরণ করি, ধারণ ও পালন করি] অহম্ [আমিই] ইন্দ্রাগ্নী [ইন্দ্র ও অগ্নিকেও ভরণ করি] উভা [উভয়] অশ্বিনা [অশ্বিনৌ; অশ্বিনীকুমারদ্বয়কেও ভরণ করি]। (মাটির জগতের একটি রক্তমাংসের মানুষ আজ সর্বদেবময়ী বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হইয়া বিশ্বমাতৃত্বের আস্বাদন করিতেছেন। ইহা ভারতীয় নারীপ্রগতির তত্ত্বকথা]

আমি একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য এবং সকল দেবরূপে বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কে বিভরণ করি। আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে বিভরণ করি। ১

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং
ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ২

অহম্ [আমি] আহনসং [(দেব) শত্রুহন্তা] সোমং [সোমদেবকে] বিভর্মি [বিভরণ করি] অহম্ ত্বষ্টারম্ [ত্বষ্টা নামক দেবতাকে] উত [এবং] পূষণং [পূষাদেবকে] ভগং [ভগদেবকে ভরণ করি] হবিষ্মতে [হবিষ্মৎ] সুপ্রাব্যে [উপরোক্ত দেবতাগণের তৃপ্তি-বিধানকারী] সুন্বতে [(সোমরস) প্রস্তুতকারী] যজমানায় [যজমানের জন্য] অহম্ দ্রবিণং [যজ্ঞফল স্বরূপ বিশ্বপ্রসাদরূপ বিশ্বজীবন, 'যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ'—গীতা] দধামি [বিধান করি] (বিশ্বরূপের সেবায় যে যজমানের সব কিছু সমর্পিত, বিশ্বরূপের প্রসাদে সে বিশ্বজীবনই প্রাপ্ত হয়)।

আমি দেবশত্রু হন্তা সোমদেবকে, দ্রষ্টা নামক দেবতাকে, এবং পূষা, ভগনামক সূর্যদ্বয়কে ভরণ করি। প্রচুর হবিযুক্ত দেবগণের তৃপ্তি-বিধানকারী এবং সোমরস প্রস্তুতকারী যজমানের জন্য যজ্ঞফলরূপে ধন আমিই বিধান করি। ২

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্। ৩

অহম্ [আমি] রাষ্ট্রী [বিশ্বের ঈশ্বরী] বসূনাং [ধনসমূহের] সংগমনী [প্রাপয়ত্রী ; সর্বকিছু ধনই বিশ্ব-সম্পদ ; আমি এই বিশ্বসম্পদকে বিশ্বের প্রতি মানবের কাছে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বণ্টন করি] চিকিতুষী [স্বাত্মরূপে বিশ্বের পরতে পরতে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞা] (তাই) যজ্ঞিয়ানাং [যজ্ঞার্হগণের মধ্যে] প্রথমা [মুখ্যা ; আমিই প্রথমে নিজেকে বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের সেবায় বিলাইয়া দিয়া বিশ্বপ্রসূতিত্ব আস্বাদন করিয়াছি] ভূরিস্থাত্রাং [কলেবরের মাংস এই প্রসঙ্গরূপে বহুভাবে অবস্থিত] ভূরি-আবেশয়ন্তীম্ [সর্বজীবে অনুপ্রবিষ্ট] তাং মা [সেই আমাকেই] পুরুত্রা [বহু দেশে, সর্বদেশে] দেবাঃ [দেবগণ (Natural forces) এবং সুর-নরাদি যজমানগণ] ব্যদধুঃ [নানাভাবে আরাধনা করে]।

আমিই সমস্ত জগতের ঈশ্বরী, ভক্তজনের ধনপ্রদাত্রী দেবী ও পরম জ্ঞানবতী। অতএব যজ্ঞার্হগণের মধ্যে আমিই প্রধান। আমিই প্রাণরূপে বহুভাবে অবস্থিত ও সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট ; আমাকেই সর্বদেশে সুর-নরাদি যাজ্ঞিকগণ বিবিধভাবে আরাধনা করেন। ৩

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥ ৪

যঃ [যে পুরুষ] অন্নং [ভোজ্য পদার্থ] অত্তি [ভোজন করে] যঃ [যে] বিপশ্যতি [বিশেষের দর্শন করে] যঃ [যে] প্রাণিতি [প্রাণক্রিয়া সম্পন্ন করে] যঃ [যে] উক্তং [কথিত বিষয়, শব্দাদি] শৃণোতি [শ্রবণ করে] সঃ [সে পুরুষ] ময়া [সমষ্টিমূর্তি আমা দ্বারাই, তাহা সম্পাদন করে, সমষ্টির পরিপোষণেই ব্যষ্টির অস্তিত্ব, চৈতন্য ও আনন্দাস্বাদন সম্ভব। সমষ্টির গুণগানে করিয়াই ব্যষ্টি ব্যষ্টিরূপে বাস্তব] (হইয়া) ঈং [বিশ্বভূমিরূপে অবস্থিত ঈদৃশ] মাং [আমাকে] অনন্তবঃ [অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত প্রাণরূপে জানে না] তে [তাহারা] উপক্ষিয়ন্তি [জীবনের সকল ক্ষেত্রে উপক্ষীণ হয়] শ্রুত [হে বিশ্রুত সখা] শ্রুধি [শ্রবণ কর] বদামি [বলিব, যেমন বলিয়াছিলাম কেনোপনিষদে উমা হৈমবতীরূপে ইন্দ্রের কাছে]

পুরুষ যে অন্ন আহার করে, প্রাণনক্রিয়া সম্পাদন করে, কথিত বিষয় শ্রবণ করে, তাহা আমারই শক্তিতে। যাহারা আমাকে অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত প্রাণরূপে জানে না, তাহারা উপক্ষীণ হয়। হে কীর্তিমান সখা, আমি তোমাদিগকে শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মতত্ত্ব বলিব, শ্রবণ কর। ৪

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং
দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্। ৫

দেবেভিঃ [দেবগণ কর্তৃক] উত [এবং] মানুষেভিঃ [মনুষ্যগণ কর্তৃক] জুষ্টং [সেবিত] ইদং [এই ব্রহ্মতত্ত্ব] অহম্ এবং স্বয়ং [আমি স্বয়ংই] বদামি [বলিতেছি, কেননা আমিই মানুষী পরব্রহ্মমহিষী। মা ছাড়া পিতার সত্য পরিচয় প্রদান আর কাহার দ্বারা সম্ভব ?]। (এবম্বিধ ব্রহ্মস্বরূপিণী মানুষী আমি) যং [যাহাকে] কাময়ে [কামনা করি] তং তং [তাহাকে] উগ্রং [শ্রেষ্ঠং] কৃণোমি [করি] তং [তাহাকে] ব্রহ্মাণং [ব্রহ্মা] তং [তাহাকে] ঋষিং [ঋষি] তং [তাহাকে] সুমেধাং [পুরুষোত্তম মেধার মেধাবী করি]।

দেব ও মানবগণের দ্বারা সেবিত ব্রহ্মতত্ত্ব মানুষী আমি স্বয়ংই উপদেশ করিতেছি। আমি ঈদৃশ ব্রহ্মস্বরূপিণী ; আমি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে তাহাকেই

সর্বশ্রেষ্ঠ করি, কাহাকে ব্রহ্মা, কাহাকেও ঋষি করি, এবং কাহাকেও বা ব্রহ্মজ্ঞানী করি। ৫

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোমাহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ॥ ৬

অহং [আমি] (যুগে যুগে) ব্রহ্মদ্বিষে [ব্রহ্ম-পূজাবোত্তন-বিদ্বেষী] শরবে [হিংস্র প্রকৃতির জনগণকে] হন্তবৈ [হনন করিতে] উ [পাদ পূরণে]; রুদ্রায় [রুদ্রের] ধনুঃ [ধনুকে] আতনোমি [গুণ যোগ] অহম্ [আমি] জনায় [ভক্তগণের কল্যাণের জন্য] সমদং [সংগ্রাম] কৃণোমি [করি] অহং দ্যাবাপৃথিবী [স্বর্গে ও পৃথিবীতে] আবিবেশ [রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট আছি, দুইয়ের মধ্যে দুইয়ের সমন্বয় করিয়া]।

হিংস্র প্রকৃতির জনগণের বধার্থ রুদ্রের ধনুকে আমি জ্যা সংযোগ করি, ভক্তগণের জন্য আমিই যুদ্ধ করি, স্বর্গে ও পৃথিবীতে আমিই অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছি। ৬

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্
মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো-
তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি॥ ৭

অহম্ [যোগমায়া আমি] পিতরম্ অস্য [এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পিতৃস্থানীয় কারণোপাধি ঈশ্বর পরমাত্মাকে] মূর্ধন্ [মূর্ধার অর্থাৎ সকল শ্রেষ্ঠ স্থানে সৃষ্টিকালে] সুবে [প্রসব করিয়াছি]; মম যোনিঃ [আমার যোনি হইতেছে] অপ্সু-অন্তঃ সমুদ্রে [অপ্ স্থানীয় হৃদয়ের অন্তঃস্থলে সমুদ্রবৎ প্রেম সমুদ্রে; এই বিশ্বপ্রেম-যোনি, প্রেম-কারণ]। ততঃ [সেই হেতুতেই] বিশ্বা ভুবনা [সর্ব ভুবনে, সর্ব ভূতে] অনু বিতিষ্ঠে [প্রেম দ্বারা বিবিধরূপে বর্তমান আছি] উত [আরও] অমূং [ঐ দূরবর্তী] তাং [স্বর্গকে] বর্ষ্মণা [আমার প্রেমময়ী যোগমায়া শক্তিদ্বারা] উপস্পৃশামি [স্পর্শ করিয়া ব্যাপিয়া আছি; সবকিছু বড়র হৃদয় আলোড়ন করিয়া তাহাদিগকে ছোটদের মধ্যে ছোট হইয়া মিশিবার উপযোগী প্রাণ সঞ্চার করি]।

আমি যোগমায়ারূপে পিতৃস্থানীয় পরমাত্মাকে সর্ব যোগ্যতার সহিত প্রসব করিয়াছি। অপ্ স্থানীয় হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যে প্রেমসমুদ্র তাহা আমারই যোনি। আমি বিশ্বভুবনে প্রেমদ্বারা বিবিধরূপে বর্তমান আছি। ঐ যে দূরবর্তী স্বর্গ, উহার মধ্যেও প্রেম স্পর্শ দ্বারা সর্বভূতের ক্ষেত্রে অবতরণোপযোগী প্রাণসঞ্চার করি। ৭

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যা-
রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ-
তাবতী মহিনা সং বভূব॥ ৮

অহম্ এব [আমিই] বিশ্বা ভুবনানি [ভূতসমূহ] আরভমাণা [আরম্ভ করিয়া, সৃষ্টি করিয়া] বাতঃ ইব [বয়নকারী বায়ুর মত] প্রবামি [সকলকে বয়ন করিয়া, বুনিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছি] পরঃ দিবা [আকাশের পর] এনা পৃথিব্যা পরঃ [এই পৃথিবীরও পর] (বলিয়াই আমি) মহিনা [স্বমহিমায়] এতাবতী [এই রসঘন জগদ্রূপে] সংবভূব [সম্ভূত হইয়াছি; 'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্য অমৃতং দিবি'; তিনিই সমগ্র, ষোল আনা; যার আনা যাহার স্বর্গে, তাঁহারই চারি আনা এই বিশ্বভুবন। কারণোপাধি পরমাত্মাও তাঁহার সন্তান, কার্যোপাধি জীবও তাঁহারই কোলের শিশু। তিনিই নিরুপাধি প্রেমঘন যোগমায়া শক্তি]।

আমিই বিশ্বভুবন সৃষ্টি করিয়া বয়নকারী বায়ুর মত ইহাদিগকে বুনিয়া চলিয়াছি; আমি আকাশের পর, এই পৃথিবীরও পর বলিয়াই রসঘন জগদ্রূপে সম্ভূত হইতেছি।

পূজার কথা

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

আজ নয়, পঞ্চাশ বৎসর আগে নয়, পাঁচশ বৎসর আগেও নয়—কত কত বৎসর আগে তাহার সঠিক হিসাব করিবার উপায় নাই, ভারতবর্ষের মানুষ মাতৃ-পূজার কল্পনা করিয়াছিল। মায়ের ভীষণা রূপ, মায়ের কল্যাণী রূপ।

মায়ের কল্পনা কেন?

দুঃখের দিনে যখন আমার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পরিকল্পনা-মত কিছু হয় না, চারিদিকে যখন কেবলই গোলমাল, যখন পেটে অন্ন নাই, পরণে বস্ত্র নাই, তখনই কি শুধু ভগবানের কথা, বিশ্বমায়ের কথা মনে পড়ে? একথা পুরাপুরি সত্য নয়। নিজের হাতে মানুষ যখন শান্তি পায় না, সাধারণতঃ সে সময় ভগবানের কথা তাহার মনে পড়ে এমন একটা অবস্থা আছে বটে কিন্তু ইহার অন্যথা রূপও বাস্তব। আজিকার দিনে চারিদিকে চাহিলে স্পষ্ট দেখা যায় সহস্র দুঃখকষ্টেও মানুষের ভগবানের কথা মনে পড়ে না কিংবা যুগযুগান্তের অভ্যাসবশতঃ ভগবানের নামোচ্চারণ করিলেও ভগবানের সত্যকার উপলব্ধি বা বিশ্বাস বলিয়া কিছু নাই। তাই নিজের ব্যক্তি সত্তার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে পারা এবং বৃহত্তর ব্যাপকতর কিছুকে স্বীকৃতি দেওয়া ইহা দুঃখানুভূতির ফলই নয় ইহা মানুষের একটা বিশেষ প্রবণতা—যাহা সুখের দিনেও আসিতে পারে, দুঃখেও জাগে। কেন কখন কাহার ভিতরে যে এ প্রেরণা আসিবে তাহার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। বাস্তব জীবনটা আজই শুধু কঠিন নয়, বা অসুন্দর নয়, চিরদিনই তাহা কমবেশী আদর্শ হইতে অন্য-রকম। আজ চারিদিকে দেখি হিংসা বিদ্বেষ বাধাদাতা—সেই সুপ্রাচীন কালেও তো হিংসাবিদ্বেষ আর শক্তি লইয়া কাড়াকাড়ি অনুপস্থিত ছিল না। অন্নাভাবই নাকি মানুষের স্বভাব নষ্ট করে—কিন্তু পৃথিবীর সভ্যতার প্রথম দিনগুলিতে আজিকার মত অন্নাভাব ছিল না এ কথা মোটামুটি সত্য, তথাপি সেদিনও তো রাজার স্ত্রী-পুত্র অমাত্যগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া রাজাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল কেবল রাজাকেই তাড়ায় নাই এক বৈশ্যকেও তাহার স্ত্রী-পুত্রেরা সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। তাহা হইলে সেই হাজার হাজার বৎসর আগেও মানুষের জীবনে দুঃখের কারণ বহুবিধই ছিল। অর্থাৎ দুঃখলাঞ্ছনার কারণ বাহিরেই নাই—উহা মানুষের অন্তরে মনুষ্যত্বের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান। সৃষ্টির প্রথম দিন হইতেই মানুষের মধ্যে সৎ বৃত্তি ও অসৎ বৃত্তি উভয়ই রহিয়াছে—মানুষ সৎ বৃত্তিদ্বারা আনন্দপূর্ণ জীবনের অধিকারী হইবে, না অসৎবৃত্তিদ্বারা জীবনকে অসুন্দর করিয়া তুলিবে এইটুকু স্থির করিয়া লইবার স্বাধীনতা ভগবান মানুষকে দিয়া দিয়াছেন। সেই স্থির করার ইতিহাসই মানুষের সভ্যতার ইতিহাস।

তাড়িত হইয়াও রাজা বা বৈশ্য তাহাদের আত্মীয় পরিজনকে বিস্মৃত হইতে পারিল না কেন? কেন না, এই যে যাহা কিছু—সম্পদই হউক বা স্ত্রীপুত্রাদিই হউক—মানুষের জীবনে ইহা এমন মৃত বস্তু নয় যে ছাড়িয়া দিলাম বলিলেই ছাড়া হয়—উহারা প্রত্যেকে ব্রহ্মমূলে মূল্যবান। তাহারা জীবন্ত বস্তু বলিয়াই আকর্ষণ করিবার শক্তি রাখে। তাই রাজা বা বৈশ্যের পক্ষে উহাদিগকে বিস্মৃত হওয়া তো সম্ভব হয়ই নাই, বরং উহাদের প্রতি আসক্তি রাজা ও বৈশ্যকে পীড়িত করিল। কিন্তু আসক্তিতে পীড়িত থাকাই মানব-জীবন-কাহিনীর শেষ অধ্যায় নয়। তাই উহারা মেধস মুনির কাছে যাইয়া নিজেদের অবস্থা বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন এমন হয়, কী ইহার সমাধান?

মুনিবর মায়ের পূজার কথা বলিলেন। বলিলেন,

মহামায়া যোগমায়ার পূজায় এ সমস্যার সমাধান মিলে।

মা কে? কেন মাকে প্রয়োজন? রাজার ঐশ্বর্য বা বৈশ্যের সম্পদ দিয়া মায়ের প্রয়োজন মিটে না কেন?

মেটে না। অন্নের সমস্যা বা অর্থের অসচ্ছলতাই যদি সকলের অপেক্ষা বড় সমস্যা হইত তাহা হইলে রাজা বা বৈশ্যের কোন সমস্যা থাকিত না। অর্থ দিয়া তাহারা তো সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই। মানুষে মানুষে যে হিংসা-দ্বেষ ক্রোধ তাহা তো অর্থে সমাধান লাভ করে নাই। সেদিনও করে নাই—আজও করিতেছে না। হিংসা-বিদ্বেষ-আসক্তি-ক্রোধ হইতে মুক্তি পাইয়া ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ঘোর আবর্তকে কমাইয়া আনাই মানুষের জীবনে সকলের অপেক্ষা বড় সমস্যা। সেই হাজার হাজার বছর আগে রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি এই আসক্তিবদ্ধ মানসিকতা হইতে মুক্তি চাহিয়াছিলেন, আজিকার মানুষের চাওয়াও এই রকম মানসিকতা হইতেই মুক্তি।

যেমন মুনি বলিলেন মায়ের পূজা করিতে।

মানব শিশুর বাস্তব জীবনে মা তাহার স্থিতি, মাতৃত্বকে নির্ভর করিয়া সে আত্মবিকাশ লাভ করিতে থাকে। দেহ যখন পরিণতি লাভ করিল, বুদ্ধি যখন কিছু পরিমাণ বুঝিল—তখন তাহার মাতৃত্বের স্থিতির প্রয়োজন কি ফুরাইল? জীবনের স্তরে ফুরায় বটে—বিড়ালী তাহার কচি ছানার জন্য কি আকুলতা প্রকাশ করে আমরা তাহা দেখিয়াছি, কিন্তু একটু বড় হইলে, খাইতে শিখিলে, তখন বিড়ালী আর তাহার ছানাকে সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু সে তো জীব—মানুষ তো জীব নয়। তাহার প্রয়োজন কেবল দেহগত নয়, কিংবা কেবল instinct-গতও নয়, তাহার হৃদয়-মনের বৃত্তি অনেক সুদূর প্রসারী। এইখানেই তাহার সৌন্দর্য। অবশ্য সকল মানুষের হৃদয়-মনের স্তর একই রকম নয়। যাক সে কথা। দেহের বিকাশ বা বুদ্ধির পরিণতি মাতৃত্বের প্রয়োজনকে ফুরাইয়া ফেলিতে পারে না, জীবনের স্তরে সে প্রয়োজন-বোধ লোপ পাইলেও মনুষ্যত্বের এইটাই সবটুকু কথা নয়—এই কথাটা মনুষ্য-সভ্যতার বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। 'ঘরে আমার মা আছে যে'—এ কথা বলিতে পারা যেমন শৈশবের পক্ষে প্রয়োজন, যৌবন বার্ধক্যের পক্ষেও তেমনই। এইজন্যেই মায়ের পূজা। আমার স্থূল দেহকে যে মাতৃত্ব ধারণ করিয়াছিলেন সেই মাতৃত্বকে বহুগুণিত করিয়া, সে গভীর একাত্মতা আস্বাদনকে জীবনের ব্যাপকতর চেতনাদ্বারা বহু মানিত করিয়া যে মাতৃত্ব-বোধ তাহাতে আমি নিজেকে প্রস্থাপন করিতে পারি—উহা এমন কিছু যাহা আমার স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহকে, যাহা আমার হৃদয়-মনের ব্যাপক-গভীর প্রসারকে, যাহা আমার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎকে ধারণ করিতে পারে। এই মাতৃত্বই আমার স্থিতি। পরিচ্ছন্ন দেশ-কাল-পাত্রের বাহিরে গভীর ব্যাপক এমন একটা কিছু না থাকিলে আমি দাঁড়াই কিসের উপর? এই মাতৃত্বকেই ভারতীয় ঋষিগণ সেই সুপ্রাচীন কালে উপলব্ধি দ্বারা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এই মাতৃত্বে নিজেকে প্রস্থাপন করিয়াই তাঁহারা সেই কালে শান্তি সোয়াস্তি আনন্দ ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই মাতৃত্ব-ধ্যানই আমাকে ছাড়াইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। আমার মত সৃষ্ট এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও কোন একটা তত্ত্ব বা সত্যের মধ্যেই বিধৃত হইয়া আছে। সেই বিধায়িত্রী শক্তির প্রকাশকে বিশ্বের সর্বত্রই দেখিতে পাই—তাহাতে বিশ্বাস আনি, তাহা আমাকে যেন ভীত সন্ত্রস্ত করিয়াই তোলে—কিন্তু অন্তরের মধ্যে তাহাকে একেবারেই পাই না কি? যতটুকু উপলব্ধি করি যে আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও আমি বিশ্বের সেই বিধায়িত্রী শক্তি-ধাত্রী, তিনি আর আমি একাত্ম—ততটুকুই আমি নিশ্চিন্ত নির্ভয়, ততটুকুই আমি আনন্দিত। অদ্ভুত এই মানবাত্মা—এক-দিকে সে অনন্ত স্বাধীনতার উপাসক, আবার তাহারই মনস্তত্ত্বের গভীরে রহিয়াছে অন্যের ভিন হইতেই কোন কিছুর উপরে একটা স্থিতিলাভ করিবার অন্তর্নিহিত প্রবণতা। এই স্থিতিই ধারণ করিয়া রাখে—এই স্থিতিকেই ভারতের সাধকের প্রাণ মাতৃ নামে অভিহিত করিয়াছে, এই মাতৃ-স্থিতিকে ভিত্তি করিয়া বিশ্বের বিচিত্র আয়াসনকে জমাইয়া তুলিয়াছে। এই পদেই সত্য কথা এই যে,

এই ব্যাপক গভীর স্থিতি-চেতনা তাহার স্বাধীন সত্তাকে এতটুকু নিষ্পেষিত করে নাই, বরং তাহাকে ধীরপদক্ষেপে সামনের দিকে অগ্রসরই করাইয়া দিয়াছে। আশ্রমের ক্ষেত্রে কত কলরোল, কত জঞ্জাল, কত ঝঞ্ঝাট—তাহাদের অস্বীকার করি না, মিথ্যা বলি না- সেই যিনি সমস্ত কলরোলের বাহিরে, সমস্ত জঞ্জাল সমস্ত ঝঞ্ঝাটের বাহিরে কিংবা তাহান্তরে এই সব কিছুরই যে অপর অপরিহার্য দিক নিশ্চলতা, স্থৈর্য, ঝঞ্ঝাটহীনতা কিংবা তাহারও পরের কথা যে লীলা-বৈচিত্র্য তাহারই বিকাশ—ইহা সত্য—তাঁহার মত চিরন্তন সত্য—তবু ইহারই মধ্যে সেই অতীত অনুস্যূত নিগত সত্তা তাঁহাতে স্থিতিলাভের উপলব্ধি প্রয়োজন—অপরিহার্য প্রয়োজন। মাকে তাই প্রয়োজন। জীবন দিয়া জীবনের আচরণ দিয়া তাই মায়ের পূজা প্রয়োজন—ভাল-ভাত কাপড়ের মতই প্রয়োজন। বিশ্বের অণু পরমাণুতে অনুস্যূত মহাপ্রাণের সঙ্গে আমার একাত্মতার যে একটি নিবিড় আস্বাদন তাহারই নাম মাতৃ-পূজা।

সেই সুপ্রাচীন কালে মাকে তাঁহারা কি ভাবে আস্বাদন করিয়া এই মাতৃপূজার প্রচলন করিয়াছিলেন?

তিন দিনে মায়ের পূজা—সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিথিতে। এই বিশ্বে মানুষকে প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি করিয়া বাঁচিতে হয়—আগাইয়া যাইতে হয়, নূতনকে জন্ম দিতে হয়, নূতনকে বরণ করিয়া লইতে হয়। কি ভাবে সৃষ্টি করিব? সৃষ্টির নিয়ম কি? মানুষ নূতনকে চায়, নূতনের মোহে সে মুগ্ধ হয়, নূতনের আকর্ষণ নূতনের ডাক তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে; অথচ মানুষ অতীতের ফল, অতীতের সঙ্গে তাহার বন্ধনও চিরন্তন। নূতন পথে চলিতে নূতনকে বরণ করিয়া নিতে অতীতের সংস্কার বাধা দেয়—পথ আগলাইয়া দাঁড়ায়—মনে হয় সবই বুঝি গেল! পূজার প্রথম দিনে এই অতীতের সংস্কার হইতে মুক্তি পাইবার জন্য, নূতন সৃষ্টি করিবার জন্য সাধনা। মধু কৈটভরূপ অতীতের দু ও কু সংস্কার হইতে মুক্তি পাইলে নূতন সৃষ্টির তত্ত্ব জীবনে উদ্ভাসিত হইবে। মনস্তত্ত্বের কথা হইল কোন নূতন জীবন আরম্ভ করিতে হইলে মাতৃগর্ভে মানুষ যে অবস্থায় ছিল—যেখানে ছিল আলোর অভাব অথচ ছিল তাপ, ছিল না কোন শব্দ কোন উত্তেজনা—অনুভূতির সেই গভীরে একবার ডুব দিয়া নূতন সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করিতে হয়। সেই ডুব দেওয়ার জন্যে মায়ের পূজা। আমাদের চারিদিকে আজ প্রচণ্ড আক্রমণ—সমাজ-জীবন খান খান হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অর্থনীতি রাজনীতি কোন খানেই অতীতের জানাশোনা পথ-চলা এতটুকুও নাই। এই প্রলয় নূতন সৃষ্টির জন্যই। মহাকালীর যে তাণ্ডব নৃত্য এই আক্রমণের মধ্যে দেখিতেছি তাহাতে পরবর্তী অবস্থা কল্পনায় আনা সহজসাধ্য নয়—কিন্তু সৃষ্টি যদি থাকে তবে তাহার পথ-রেখা এই-ই। এ তাণ্ডব পরবর্তী স্তরে মহালক্ষ্মীর অষ্টমী পূজায় একটা স্থিতি লাভ করিবে। সৃষ্টি ব্যক্তিগত বুদ্ধিতে হয় না—সমষ্টি বুদ্ধি দিয়া সকলের সঙ্গে মিলিয়া এক হইয়া নূতন সৃষ্টি হয়। দেবতারা যতক্ষণ মিলিতে পারেন নাই, ততক্ষণ তাঁহারা অসুরের কাছে পরাজিত—যখনই তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইলেন, তখনই সেই সঙ্ঘবদ্ধতার মধ্য হইতে মায়ের আবির্ভাব হইল—অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধতাই শক্তি। শক্তিই মা। এই সঙ্ঘবদ্ধতার দ্বারাই দেবতারা বিজয় লাভ করিলেন। সঙ্ঘবদ্ধতার শক্তিতে শক্তিমান হইতে হইবে অথচ তাহার পিছনে থাকিবে দেবত্ব অসুরেরাও সঙ্ঘবদ্ধ—এবং ইহাই তাহাদের বিশেষ গুণ। কিন্তু অসুরের সঙ্ঘবদ্ধতার পিছনে কোন সামগ্রিক কল্যাণ-বুদ্ধি থাকে না—সেখানে থাকে শুধু ব্যক্তি বা একটা দলের বা অংশের স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা। তাই তাহা ব্যর্থ। কিন্তু দেবতাদের কল্যাণ বুদ্ধি ছিল কিংবা তাহান্তরে যাহাদের কল্যাণবুদ্ধি আছে, তাহারাই দেবতাপদবাচ্য, আর কল্যাণ-বুদ্ধিহীনতাই অসুরত্ব পদবাচ্য। সত্যকার পরিণতি এইখানে যে সঙ্ঘবদ্ধতার সঙ্গে রক্ষা করিতে হইবে সামগ্রিক কল্যাণ-বুদ্ধি—কোন এক জনের নয়, এক দলের নয়—সকলের। এই কল্যাণ-ময়ী সঙ্ঘবদ্ধতায় নূতন সৃষ্টি সম্ভব হইল।

পরের দিনে নবমী তিথি পূজায় সৃষ্টিকে কল্যাণময়ী করিয়া রাখার পথের খোঁজে মায়ের আরাধনা। যে সৃষ্টি সম্ভব হইল তাহাকে বিকৃত পরিণতির হাত হইতে রক্ষা

করিতে অহং-এর বিলুপ্তি প্রয়োজন। বিশ্বের অহং-কেন্দ্রিক প্রজা সৃষ্টিতে ভোগ করিতে প্রয়াসী হয়—সেবা বুদ্ধিতে সে সৃষ্টি করে নাই—ভোগই তাহার সৃষ্টির কথা। সেই ভোগ-মনোবৃত্তি হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া সৃষ্টির পিছনে সেবা-বুদ্ধি জাগ্রত করিবার জন্যই মহাসরস্বতী জ্ঞানদেবীর পূজা।

এইভাবে তিনদিনে প্রথমে নিজ ব্যক্তি সত্তাকে শুদ্ধ করিতে বিশ্বমাতৃ-গর্ভে প্রবেশ করা—যেমন অতীতের জ্ঞানমন্থের বাহিরে যাইতে হয়, ইহার পর কল্যাণময়ী সজ্ঞবদ্ধতাদ্বারা সৃষ্টি, তাহার পর সৃষ্টিকে ভোগবুদ্ধিতে না দেখা—এইভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি ঘটনায় চলিতে হইবে, তাহা হইলেই ব্যক্তির জীবনে, জাতির জীবনে বিজয় লাভ হইবে—তাই তিন দিন পূজার পরে বিজয়া। বিশ্ব জয়ের আনন্দে কোলাকুলি—মানুষকে পাওয়ার তৃপ্তিতে কোলাকুলি।

প্রাচীনেরা শ্রীদুর্গাপূজার পিছনে অনেক কথা, অনেক তত্ত্ব, অনেক সামাজিক জীবন-চেতনা, জাতীয়তা-বোধ রাখিয়া গিয়াছেন—আমরা তাঁহাদের সবখানি কথা ধারণ করিতে নাও যদি পারি, শুধু কেবল উপরের খোসাটুকু লইয়াও যদি আজিকার দিনে আমরা পূজা করিতাম, সার্থক হইত সে পূজা। কিন্তু বর্তমানে যাহা চলিতেছে তাহাকে সহস্র দিক—দুর্গাপূজার তত্ত্ব নাই, অর্থ নাই—শুধু সংস্কার রক্ষা তাহাও আবার বিকৃত রূপে। বর্তমান পূজাদি জন-জীবনের যে বিকৃত রসের পরিচয় দিতেছে, তাহা হইতে জাতিকে উদ্ধার করিতে প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তি সচেষ্ট হউন—পূজা না করাও বুঝি এই বিকৃত পূজা হইতে ভাল। আজ ভারতবর্ষে যে নৈতিক ব্যভিচার, যে অসত্য, যে স্বার্থান্ধতা প্রতি ক্ষেত্রে চলিতেছে তাহারই ফলে পূজার এই বিকৃত রূপ। কিন্তু রক্ষাকর্তাও আজ জন-চিত্তই। সেইখানে আমাদের আবেদন জানাই—রসের বিকৃতি হইতে জাতিকে, বীভৎস কামুকতা হইতে সমাজকে রক্ষা করুন। পূজার পিছনে একটা শুদ্ধচিত্তের প্রার্থনা—ব্যক্তি ও জাতির জন্য একটা পথের খোঁজের আকুতি জাগ্রত হউক—মায়ের পূজা সার্থক হউক।

"মা দুর্গা, বিজয়া, ঘরে বাইরে সর্বক্ষেত্রে পরাজিত বিশ্ব বিজয় লাভ করুক। ইন্দ্রিয়ের কাছে আমরা পরাজিত, রূপরসগন্ধের ক্ষেত্রে পরাজিত। মুক্তি দিব, মুক্তি পাইব—ইহাই বিজয়। পুরুষোত্তম-ছাঁচে বিশ্ব গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প লইয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম, বিশ্ব-বিজয়-সঙ্কল্প সার্থক হউক। বিশ্বময় কোলাকুলি প্রতিষ্ঠিত হউক। ভাইয়ে ভাইয়ে, পরিবারে পরিবারে, সমাজে সমাজে, জাতিতে জাতিতে প্রতিষ্ঠিত হউক কোলাকুলি; বিশ্বের ধূলি হউক ব্রহ্ম রজ, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম-মানুষ।"

—বিজয়া দশমী দিনে ১৩৬০, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ দিনপঞ্জীতে

মাতৃমাধুর্য-দশকম্

॥ শ্রীল চ ঠাকুর ॥

(পুনর্মুদ্রিত)

বদনং মধুরং রদনং মধুরং
হসিতং মধুরং নয়নং মধুরং
হৃদয়ং মধুরং চরিতং মধুরং
মধুরং মাতুঃ সর্ব্বং মধুরম্ ॥ ১

পাদৌ মধুরৌ হস্তৌ মধুরৌ
নখং মধুরং খস্থং মধুরং
যোগঃ মধুরঃ ধ্যানং মধুরং
মধুরং মাতুঃ সর্ব্বং মধুরম্ ॥ ২

রূপং মধুরং তিলকং মধুরং
শিরসি কেশবন্ধ-শ্চ মধুরম্
লালনং-তাড়নং-হরণং মধুরং
মধুরং মাতুঃ সর্ব্বং মধুরম্ । ৩

ভোজ্যং মধুরং ভুক্তং মধুরং
সন্ততি হস্তেন প্রদীতঞ্চ মধুরং
ধৃতি র্মধুরা স্মৃতির্মধুরা
মধুরং মাতুঃ সর্ব্বং মধুরম্ ॥ ৪

জাগরঃ মধুরঃ স্বপ্নং মধুরং
সুপ্তং মধুরং চিত্রং মধুরং
দৃষ্টং মধুরং শিষ্টং মধুরং
মধুরং মাতুঃ সর্ব্বং মধুরম্ । ৫

গীতং মধুরং বাদ্যং মধুরং
ছন্দো মধুরা তালং মধুরং
কণ্ঠ মধুরং লয়ং মধুরং
মধুরং মাতুঃ সর্ব্বং মধুরম্ ॥ ৬

বিধির্মধুরা নিষেধং মধুরং
বপনং মধুরং চলনং মধুরং
বাচ্যা মধুরা শ্রবণং মধুরং
মধুরং মাতুঃ সর্ব্বং মধুরম্ ॥ ৭

প্রশংসা মধুরা ভর্ৎসনং মধুরং
আহ্বানং তাত মাতুর্মধুরং
লীলা মধুরা লীলং মধুরম্
মধুরং মাতুঃ সর্ব্বং মধুরম্ ॥ ৮

প্রসাদঃ মধুরং প্রস্থানং মধুরং
ক্ষেপণং মধুরং স্থাপনং মধুরং
ক্ষমা মধুরা আশিসং মধুরং
মধুরং মাতুঃ সর্ব্বং মধুরম্ ॥ ৯

সত্যং মধুরং তত্ত্বং মধুরা
প্রলপালাপনঞ্চ মধুরং
গৃহীতং মধুরং ত্যক্তং চ মধুরা
মধুরং মাতুঃ সর্ব্বং মধুরম্ ॥ ১০

[নিবেদনম্—গীতমিদং 'ভাষাভারতী' নাম সর্বভারতে যোগদায় আধুনিক 'বেসিক' সরল সংস্কৃতেন রচিতম্। আ'খরম্' আদি শব্দ প্রয়োগং সম্ভাব্যতে ইতি।]

মনস্তত্ত্বে অবয়ববাদ ও ক্রিয়াবাদ

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি টি ; ডি, এস, ই

মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রটা মূলতঃ মনের শাস্ত্র হলেও উনবিংশ শতকের শেষ দিক থেকে সেটা "চৈতন্য তত্ত্ব" এবং পরে "আচরণ তত্ত্ব" বা মানুষের কাজকর্মের তত্ত্ব হিসাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই দুটি দৃষ্টি-ভঙ্গী অর্থাৎ (১) মনের রহস্য বোঝবার জন্য চৈতন্যের (conscious experience) উপাদানগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং (২) মানুষের ক্রিয়া কর্মের কারণ প্রভৃতির ব্যাখ্যা, এই দুটি জিনিস থেকে মনস্তত্ত্বের দুটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।—একটি হচ্ছে "অবয়ববাদ" (Structuralism) এবং আর একটি ক্রিয়াবাদ (Functionalism) প্রথমটির সৃষ্টি হয়েছে জার্মানীতে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ নাগাদ, এবং দ্বিতীয়টির সৃষ্টি হয়েছে আমেরিকায় ১৮৯৮খৃষ্টাব্দে।

কালানুক্রমিক আলোচনা করলে অবয়ববাদ নিয়েই আলোচনা আরম্ভ করা উচিত। তবে আমরা ক্রিয়াবাদ ও অবয়ববাদের খানিকটা তুলনা-মূলক আলোচনার মাধ্যমেই এই মতবাদ দুটি বোঝবার চেষ্টা করবো।

অবয়ববাদ ও ক্রিয়াবাদ—প্রবেশক

মানুষের ক্রিয়া কর্মের শেষ নেই। সে বোধ হয় অসংখ্য রকমের কাজ কর্ম করে। একটি নবজাত শিশুর কথাই ধরা যাক্। সে কাঁদে, চিৎকার করে, স্তন পান করে, নিদ্রা যায়, নিশ্বাস ফেলে, হাঁচে, হাত পা ছোঁড়ে ইত্যাদি। তারপর ক্রমশঃ সে দেখতে শেখে, বুঝতে শেখে, ধরতে শেখে, হাসতে শেখে, কথা কইতে শেখে ইত্যাদি। তার কাজের তালিকা বেড়ে যায়। ব্যাকরণ বা অভিধানে ক্রিয়াপদের সুদীর্ঘ তালিকা দেখলে অভিভূত হতে হয়। নবুলেশ্বরের বাংলা ব্যাকরণেই (১৩৪১ সালের সংস্করণ) ১৪১৮টি ক্রিয়ার তালিকা আছে। সেটাও সম্পূর্ণ নয়।

এই সব ক্রিয়া-কলাপের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করতে হলে তিনটি প্রশ্ন আছে—সে "কি" করছে "কি ভাবে" করছে এবং "কেন" করছে। এই কি (what), কি ভাবে (how) এবং কেন (why) এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর পেলেই কাজটি সম্বন্ধে খানিকটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

একটা কাজ "কি ভাবে" করা হচ্ছে, এই প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক উত্তরটা শরীরতত্ত্ব পদার্থবিদ্যা রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রের সাহায্যে পাওয়া যায়। কাজটা "কেন" করছে তার উত্তরটা পাওয়া যায় জীববিদ্যা সমাজবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্র থেকে। মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রটা দর্শন শাস্ত্রের অভিভাবকত্বে লালিত পালিত হলেও বর্তমানে সেটা বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানের মতই কাজ করছে এবং শরীর তত্ত্ব, পদার্থ বিদ্যা, জীব বিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্রের সহায়তায় মানুষের কাজ কর্মের "কি", কি ভাবে", কেন", "কি জন্য" প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করছে।

তবে মনস্তত্ত্বের কোন কোনও সম্প্রদায় "কি" এবং "কি ভাবে" প্রশ্ন দুটির বহস্য নিয়েই তাদের গবেষণা চালিয়ে যায়। আবার অন্য কোনও সম্প্রদায় "কি" এবং "কিভাবে" এই প্রশ্ন দুটির পর "কেন" এবং "কি জন্য" এই প্রশ্ন দুটিরও উত্তর দেবার চেষ্টা করে। প্রথম দলের মনোবিদ্যাকে বলা হয় "অবয়ববাদী" (Structural) মনোবিদ্যা, আর দ্বিতীয় দলের মনোবিদ্যাকে বলা হয় "ক্রিয়াবাদী" (Functional) মনোবিদ্যা।

অবয়ববাদী মনোবিদ্যা মানুষের সজ্ঞান অভিজ্ঞতার (conscious experience) অবয়ব বা গঠনের উপাদান গুলির সন্ধান ও বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেষ্টা করে। তারা বুঝতে চায় কি ভাবে ঐ সমস্ত উপাদান মিলিত হয়ে ঐ অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করেছে; আর ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্যা অভিজ্ঞতার চুল চেরা বিচার বিশ্লেষণ না করে নিছক কাজ কর্মগুলির সম্বন্ধেই "কি" "কি ভাবে" "কেন"

প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করে।

অবয়ববাদী মনোবিদ্যা "কেন" এবং "কি জন্য" এ দুটি প্রশ্নের উত্তর না দিলেও "কি" এবং "কিভাবে" এই প্রশ্ন দুটির উত্তর দেয়। অবয়ববাদী মনোবিদ্যার এই "কি" ও "কি ভাবে" প্রশ্ন দুটির বাঙ্গনা হচ্ছে "কি কি উপাদানে অভিজ্ঞতাটি তৈরী হয়েছে" (what are the elements) এবং "কি ভাবে ঐ উপাদানগুলি মিলিত হয়ে জটিল অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করেছে" (how they are combined)।

অবয়ববাদী মনোবিদ্যা বলে "আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতাই হচ্ছে জটিল ও যৌগিক ব্যাপার। কতকগুলি মৌলিক সংবেদন (sensation) এবং মৌলিক অনুভূতি (feeling) দিয়ে তৈরী হয় এই সমস্ত অভিজ্ঞতা। এই সব অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যাই হচ্ছে মনস্তত্ত্বের কাজ"।

ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্যা বলে "অভিজ্ঞতার চুলচেরা বিচারে প্রয়োজন কি? সব অভিজ্ঞতাই ত কোনও না কোনও কাজের ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং সেই সমস্ত কাজগুলি এবং তার কারণ প্রয়োজন প্রভৃতি নিয়েই মনস্তত্ত্ব মাথা ঘামাক।"

এই দুটি সম্প্রদায়ের বিবর্তনের গোড়ার কথা

অধ্যাপক J. C. Flugel তাঁর A hundred years in Psychology গ্রন্থে দেখিয়েছেন অবয়ববাদ ও ক্রিয়াবাদের বিরোধটা হচ্ছে উনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদের অর্থাৎ Brentano-র যুগের "Content Psychology" এবং "Act Psychology"র বিরোধ। কি ভাবে এই বিরোধটির সৃষ্টি হলো, সেটা বুঝতে হলে আরও অনেকটা প্রাচীনতর যুগের কথা স্মরণ করতে হবে। প্রথমে তাই করা যাক।

(ক) শক্তিবাদ ও অনুষঙ্গবাদ

অতীতের মনোবিদ্যাতে "কি" এবং "কি ভাবে" প্রশ্ন দুটির উত্তর দেওয়া হতো "শক্তিবাদের" (Faculty) সাহায্যে। মানুষ কি করে? উত্তর হচ্ছে "স্মরণ করে"। কি ভাবে স্মরণ করে? উত্তর হচ্ছে স্মরণ শক্তির সাহায্যে স্মরণ করে।" মানুষ কি করে? উত্তর হচ্ছে "কল্পনা করে"। কি ভাবে কল্পনা করে? উত্তর হচ্ছে "কল্পনা শক্তির সাহায্যে কল্পনা করে"। এই ভাবে মানুষের সব কাজের ব্যাখ্যা করা হতো শক্তিবাদের সাহায্যে। কিন্তু এই শক্তিবাদ থেকে কোনও নূতন কিছু খবর পাওয়া যায় না। তা ছাড়া মানুষ যত রকমের কাজ করে, তত রকমেরই বিভিন্ন শক্তির (faculty) অস্তিত্ব আছে কিনা, এ সম্বন্ধেও পণ্ডিতদের মনে সন্দেহ এলো। তাঁরা ভাবতে লাগলেন মানুষের অসংখ্য রকমের কাজ কর্মের কারণ হিসাবে একটি অথবা দু চারটি মূল নিয়ম কাজ করে যায়। এইটেই হচ্ছে অনুষঙ্গবাদের (Associationism) মূল কথা। এই অনুষঙ্গবাদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই শক্তিবাদ (Faculty Psychology) পরিত্যক্ত হয়েছে। অনুষঙ্গবাদের প্রথম পরিকল্পনা বীজাকারে দেখা গেছলো এ্যারিষ্টটলের "স্মৃতি" নামক প্রবন্ধে। তাঁর বক্তব্য ছিল "ক"কে দেখে যদি "খ"-এর স্মৃতি মনে জাগে, তাহলে বুঝতে হবে "ক"-এর সঙ্গে "খ"-এর সাদৃশ্য আছে, অথবা বৈসাদৃশ্য আছে অথবা "খ" ঘটনাটা "ক"-এর কাছাকাছি ঘটেছে। পরবর্তী যুগে এই সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য ও নৈকট্য এই তিনটি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই "অনুষঙ্গবাদ" গড়ে উঠেছে। অনুষঙ্গবাদীরা বলেন মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকলাপই এই তিনটি নিয়মের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে অথবা এই তিনটি নিয়ম দ্বারাই মানুষের সব কাজ কর্মের ব্যাখ্যা করা যায়।

উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে যে সমস্ত মনোবিদ্‌রা মানুষের মনটিকে একটা যন্ত্র হিসাবে দেখতেন, তাঁরা বলতে লাগলেন মানুষের মনোযন্ত্রটি সংবেদনের (sensation) কাঁচা মাল নিয়ে উপরুক্ত তিনটি নিয়মেই মানুষের মনের নানা জাতীয় অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে।

(খ) Content Psychology বনাম Act Psychology

এর পর পদার্থ-বিদ্যা শারীর-বিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্র দিয়ে যখন মানুষের মনের রহস্যগুলির পরীক্ষা (experiment) হতে আরম্ভ হলো, তখনও মনোবিদ্‌গণ ঐ অনুষঙ্গবাদের

হৃষিত পথেই সংবেদনের বিশ্লেষণ করে অর্থাৎ চৈতন্যের উপাদানগুলির সন্ধান করে মনের তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা করতে লাগলেন। এইটিই হ'লো তথা কথিত "Content Psychology"র কাজ।

এই Content Psychology একটা বড় রকমের আঘাত পেলো Brentano-র Act Psychologyর কাছ থেকে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিখ্যাত পুস্তকে মনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সংবেদনের উপর গুরুত্ব না দিয়ে কাজের (Act) উপর গুরুত্ব দিলেন। তাঁর সময়ের মনোবিদরা অন্তর্দর্শনবাদের দর্শিত পথে সংবেদনের বিশ্লেষণ (Combination) উপরই গুরুত্ব আরোপ করতেন। তিনি বল্লেন, সংবেদনটা আছে, ঠিক কথা, তবে সংবেদনটা যখন কাজের ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়, তখনই আসে মনের ব্যাপার, নতুবা নিছক সংবেদনের মধ্যে মনের লীলা কিছু নেই। তিনি বলেন "Sensations exist, but they themselves are not mental; what is mental is the activity then occurs when a man "sees" a colour, "hears" a sound or "smells" an odour"

Brentano-র এই প্রয়োজনীয় তত্ত্বটি আজ খুব বেশী লোক মানে না। তবে এ কথা অনস্বীকার্য্য যে তাঁর "Act Psychology"টিই ২৪।২৫ বছর পরে "ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্যা" নামে বিঘোষিত হয়েছে আমেরিকায়।

(গ) সাধারণ মনোবিদ্যা বনাম বিশেষ মনোবিদ্যা

"সাধারণ-মনোবিদ্যার" (General Psychology) জিনিসগুলিকে ব্যক্তিগত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার জন্য আমেরিকার মনোবিদ্‌দের একটা প্রবণতা ছিল। এই প্রবণতার ফলেই Differential Psychology তথা Functional Psychology-র উৎপত্তি হয়েছে।

(ঘ) ভুণ্ড ও তাঁর শিষ্য বর্গ

বর্ত্তমান পরীক্ষামূলক (Experimental Psychology) মনোবিদ্যার মূলপতি ভুণ্ড (Wundt) ছিলেন "সাধারণ-মনোবিদ্যার" পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু তাঁর আমেরিকান শিষ্যদের (Cattel, Stanly Hall প্রভৃতি) মধ্যে সাধারণ মনোবিদ্যার চেয়ে "বিশেষ মনোবিদ্যার" (Differential Psychology) দিকে প্রবণতা বেশী ছিল। Wundt-এর ইংরাজ শিষ্য Titchner কিন্তু Wundt-এর পদাঙ্কই অনুসরণ করে গেলেন নিষ্ঠার সঙ্গে। তাই তিনি স্বাভাবিক (normal) মানুষেরই ক্রিয়া কলাপ নিয়ে গবেষণা করেছেন, তার বিকৃতি বা বিচ্যুতির দিক্‌গুলি, অর্থাৎ যেগুলি ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত মানুষের, অথবা অস্বাভাবী (abnormal) মানুষের ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়, সে দিকে Titchner-এর আগ্রহ ছিল না।

(ঙ) আমেরিকান্ দৃষ্টি ভঙ্গী

Titchner-এর সঙ্গে তুলনা করলে Wundt-এর আমেরিকান শিষ্যদের কয়েকটি বিশেষত্ব সহজেই ধরা পড়ে, যথা (১) জনি পদ্ধতি (genetic) মূলক দৃষ্টিভঙ্গী (২) অন্তর্দৃষ্টির (Introspection) প্রতি অবিশ্বাস এবং (৩) ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি অধিকতর আগ্রহ। এগুলির মধ্যে প্রথমটি এসে ডারউইনের (Darwin) এবং স্পেন্সারের (Spencer) উত্তরাধিকার সূত্রে, দ্বিতীয়টির চরম পরিণতি হয়েছে "ব্যবহারবাদে"র (Behaviourism) সৃষ্টিতে এবং তৃতীয়টি অভিব্যক্ত হয়েছে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের অন্বেষণের জন্য নানা জাতীয় বুদ্ধি-পরীক্ষার মধ্যে।

Titchner এবং তাঁর সতীর্থ আমেরিকান্‌দের দৃষ্টি-ভঙ্গীগত পার্থক্যটা সহজেই বুঝতে পারা যায় যদি প্রতিক্রিয়াগত সময়ের (Reaction time) পার্থক্য নিয়ে Titchner এবং Baldwin-এর ব্যাখ্যার তুলনা করা যায়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে Baldwin বল্লেন Reaction time এর পার্থক্যটা হচ্ছে ব্যক্তিগত পার্থক্যের ব্যাপার। Titchner বল্লেন, এটা সাধারণ মানুষেরই প্রতিভাসের (attitude) ব্যাপার, ব্যক্তিগত পার্থক্যের ব্যাপার নয়।

ক্রিয়াবাদ

বর্ত্তমান ক্রিয়াবাদের (Functionalism) সূত্রপাত হয়েছে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে "জন্ ডিউই" লিখিত "The Reflex

Arc Concept in Psychology" নামক প্রবন্ধের প্রকাশনার সঙ্গে। এই গ্রন্থে ডিউই দেখালেন উদ্দীপক (stimulus) প্রতিক্রিয়ার (response) ব্যাপার দিয়ে প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার যে ব্যাখ্যাটা প্রচলিত আছে, তার চেয়ে সহজ-বোধ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে আসল কাজের (function) ব্যাখ্যা। উদ্দীপকের কোনও অর্থই হয় না, সেটা যদি কোনও কাজের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত না হয়। একটা বিশেষ রকমের প্রতিক্রিয়ার জন্যই ত উদ্দীপকের প্রয়োজন। নতুবা প্রতিক্রিয়াহীন উদাসীন নিরাসক্ত অভিজ্ঞতা সৃষ্টির জন্য উদ্দীপকের প্রয়োজন কি? জীব-তাত্ত্বিক প্রয়োজনে জগৎ-পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের (Adaptation) জন্যই ত সকেন্দ্রিকের সৃষ্টি হয়েছে শুধু অভিজ্ঞতা বা সংবেদন তৈরী করবার জন্য সকেন্দ্রিকের অথবা তৎ সংশ্লিষ্ট উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়নি। কাজের জন্যই কাজের যন্ত্র হিসাবে পাঁচটি বা ততোধিক ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং ঐ কাজ বা আচরণ (বা চেষ্টা) নিয়েই মনোবিদ্যা মাথা ঘামাক, অন্য বিষয় নিয়ে তার মাথা ঘামাবার কোনও প্রয়োজন নেই।

পরবর্তী কালে অর্থাৎ বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এই মনোভাবটিই চেষ্টিতবাদের (Behaviourism) সৃষ্টি করেছিল।

ডিউই দ্বারা ক্রিয়াবাদের সূচনা হলেও J. R. Angel (জন্ম ১৮৬৯) প্রকৃত প্রস্তাবে ক্রিয়াবাদের প্রধান প্রবক্তা।

অবয়ববাদ ও ক্রিয়াবাদের পার্থক্যটা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে অভিব্যক্ত হলেও কয়েকটি ব্যাপারে ক্রিয়াবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি চিরন্তন ভাবেই ফুটে উঠেছে। (১) ক্রিয়াবাদীরা দর্শন শ্রবণ আস্বাদ গ্রহণ প্রভৃতি কাজ গুলিরই ব্যাখ্যা করেন ; ঐ সমস্ত কাজের উপাদান হিসাবে কি কি সংবেদন (Sensation) এবং কি কি অনুভূতির (Feeling) মিশ্রণ ঘটেছে, সেটা নিয়ে মাথা ঘামান না। (২) তা ছাড়া ক্রিয়াবাদ মানুষের চৈতন্য (consciousness) জিনিসটাকে একটা জীবতাত্ত্বিক উদ্দেশ্যের প্রক্রিয়া হিসাবেই অর্থাৎ নূতন নূতন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের (adaptation) ব্যাপার হিসাবেই গণ্য করে।

এ ছাড়া ক্রিয়াবাদের আরও দুটি বৈশিষ্ট্য আছে। সে দুটিকে প্রথম দুটির অনুসিদ্ধান্ত হিসাবেই গণ্য করা যেতে পারে। সে দুটি হচ্ছে এই (১) ক্রিয়াবাদে— মানুষের কাজকর্মের অর্থের (meaning) দিকটাও বিচার করে, এবং (২) মানুষের কাজ কর্মের জীবতাত্ত্বিক ব্যঞ্জনার জন্য সজ্ঞান অভিজ্ঞতা ছাড়া তাদের স্বয়ংক্রিয় (automatic) এবং চিরাভ্যস্ত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াগুলি (অর্থাৎ যে সব ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে সচেতন মনের নির্দেশ বিশেষ কিছু থাকে না) নিয়েও আলোচনা করে।

আচার্য উডওয়ার্থ তাঁর মনস্তত্ত্বের অভিধান গ্রন্থে ক্রিয়াবাদী মনস্তত্ত্বের সংজ্ঞা হিসাবে বলেছেন,

"Functional Psychology is a type of Psychology which emphasises the function rather than the mere facts of mental phenomena with reference to the part they play in the life of the organization, rather than to describe or analyse the facts of experience or behaviour or a Psychology that approaches its subject-matter from a dynamic rather than a static point of view". বলা বাহুল্য, ক্রিয়াবাদের এই সংজ্ঞাটি থেকে অবয়ববাদ সম্বন্ধেও ধারণাটা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অবয়ববাদ

অবয়ববাদ হচ্ছে মূলতঃ অন্তর্দর্শন (introspection) মূলক মনোবিদ্যা, যার লক্ষ্য হচ্ছে সজ্ঞান অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করে তার উপাদান সমূহের বিচার করা। অভিজ্ঞতার ক্রিয়াকলাপের জীবতাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা নিয়ে সে অনুসন্ধান করতে চায় না।

অবয়ববাদ সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় সেই যুগের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাটার আলোচনা করা দরকার। তখনও "রীতিবদ্ধ মনোবিদ্যার" (systematic psychology), অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রাশ্রিত মনোবিদ্যার যুগ চলেছে। এই মনোবিদ্যাকে আমেরিকানরা "আরাম কেদারার মনোবিদ্যা" (arm-chair psychology)

বলে বিবৃত করতেন। এই যুগের মনোবিদ্যা অন্তর্দর্শনের সাহায্যে মনের ভিতরের জিনিসগুলির বিচার বিশ্লেষণেই অভ্যস্ত ছিল।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে Sully তাঁর বিখ্যাত মনস্তত্ত্বের গ্রন্থে মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের পার্থক্যটা বোঝাবার জন্য বলেছেন বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের পদ্ধতি হচ্ছে বাইরের জিনিসের পর্য্যবেক্ষণ (observation) ও পরীক্ষণ (experiment), আর মনস্তত্ত্বের পদ্ধতি হচ্ছে মনের ভিতরের জিনিসের অর্থাৎ চৈতন্যমূলক অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ বা অন্তর্দর্শন (introspection)।

"মনস্তত্ত্ব" জিনিষটা তখনও "চৈতন্য-তত্ত্ব" হিসাবেই ব্যাখ্যাত হতো, "আচরণ তত্ত্বের" ধারণাটা তখনও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জেমস্ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে বলেছিলেন, "The definition of Psychology may be best given···as the description and explanation of stream of consciousness."

সেই জন্যই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ব্যবহারিক মনোবিদ্যার আদি গুরু Wundt-এর সংজ্ঞার মধ্যেও Sulley-র সংজ্ঞাটাই যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি বলেন, "Psychology has to investigate that which we call internal experience i. e., our own sensation and feeling our thought and volition—in contradiction to the objects of external experience, which from the subject matter of natural sciences".

এই internal experience-এর বা চৈতন্যের তত্ত্বটি কি ভাবে জানা যাবে? Wundt বলেছেন internal experience এর তত্ত্বটি জানতে চাও? তা হলে তার উপাদানীভূত জিনিসগুলি কি ভাবে মিলিত ও সংযুক্ত হয়ে নূতন নূতন এককের সৃষ্টি করছে, সেটা লক্ষ্য করে দেখো। তাঁর মতে আমাদের অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করলে দুটো প্রধান উপাদান পাওয়া যায়, একটা হচ্ছে সংবেদন (sensation), যার আবেদনটা আসে বহির্জগৎ থেকে, আর একটা হচ্ছে অনুভূতি (feeling) যেটা মনের ভিতরের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপার।

Wundt বলেন এই দুই জাতীয় উপাদানের নানাভাবে মিশ্রণের ফলেই নূতন নূতন প্যাটার্ণ-এর সৃষ্টি হয়। সেই গুলিই হচ্ছে বিভিন্ন রকমের মানসিক ক্রিয়া হিসাবে পরিচিত; যেমন প্রক্ষোভ বা আবেগ (emotion) হচ্ছে অনুভূতি (feeling) এবং দৈহিক সংবেদনের (sensation) ব্যাপার, সংকল্প (willing) হচ্ছে আবেগ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তে অনুভূতির পরিবর্তন ইত্যাদি।

অভিজ্ঞতার বিভিন্ন উপাদানের বিভিন্ন মাত্রার মিশ্রণ ও সমবায়ে কি ভাবে নূতন নূতন প্যাটার্ণের জিনিস তৈরী হয়, সেই সম্বন্ধে Wundt-এর সূত্রটির নাম হচ্ছে "Law of Psychic resultants" অথবা "Principle of creative synthesis'। এই সূত্রটির মূল বক্তব্য হচ্ছে "বিভিন্ন উপাদানে গঠিত যে কোনও যৌগিক অভিজ্ঞতা যৌগিক উপাদানগুলির যোগফল মাত্র নয়, সেটা হচ্ছে একটা নূতন এককে"। বলা বাহুল্য, এই সূত্রটির সঙ্গে প্রাচীন "অনুষঙ্গবাদের" এবং পরবর্তীকালের "গেসটাল্ট্ মতবাদের" অনেক খানি সাদৃশ্য আছে। শুধু সাদৃশ্যই নয়, Wundt-এর creative synthesis বা সৃষ্টি মূলক সংশ্লেষণ তত্ত্বটি অনুষঙ্গবাদী Thomas Brown-এর "মানসিক রসায়ন" (mental Chemistry) তত্ত্বটির সঙ্গে অভিন্ন বস্তু।

এই হিসাবে অনুষঙ্গবাদ হচ্ছে অবয়ববাদের পূর্ব্ব সূরী এবং গেসটাল্ট্ বাদ হচ্ছে অবয়ববাদের উত্তর সাধক।

প্রকৃত প্রস্তাবে Wundt-ই অবয়ববাদের প্রতিষ্ঠাতা; তবে তিনি তাঁর সুবিস্তীর্ণ রচনাবলীর (মোট ৫৩,১০৫ পৃষ্ঠা) কোন যায়গাতেই তাঁর মনস্তত্ত্বকে অবয়ববাদ (Structuralism) এই আখ্যা প্রদান করেন নি।

Structuralism (অবয়ববাদ) এবং Functionalism (ক্রিয়াবাদ) এই শব্দ দুটি James-র কাছ থেকে গ্রহণ করে মনস্তত্ত্বের সাহিত্যে প্রথম প্রবর্ত্তন করেছেন

Wundt-এর অনুগত ইংরাজ শিষ্য Fitchner (১৮৬৭—১৯২৭)। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি ডাইরেক্টর পান। ইংলণ্ডে অবস্থান করেই তিনি Wundt প্রবর্তিত ব্যবহারিক মনোবিদ্যার প্রচার করতে পারতেন। কিন্তু তা করেন নি। ইংলণ্ড হচ্ছে প্রাচীন-পন্থী দেশ। সেখানে দর্শন শাস্ত্রের পক্ষচ্ছায়া থেকে মনোবিদ্যাকে সরিয়ে এনে পদার্থ বিদ্যা রসায়ন প্রভৃতির মত ব্যবহারিক শাস্ত্র হিসাবে মনোবিদ্যার আলোচনাটা জনপ্রিয় হবে কিনা, এই সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ছিলেন না। তাই তিনি আমেরিকাতে চলে এলেন এবং Cornell বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে একদল নিষ্ঠাবান্ শিষ্যের সহযোগিতায় আমেরিকার বুকে বসেই ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্যার প্রতিবাদে অবয়ববাদী মনোবিদ্যার প্রচার আরম্ভ করলেন।

দুটি মতবাদ পরস্পরের অনুপূরক

সেদিন এটার প্রয়োজন ছিল। কারণ অবয়ববাদ এবং ক্রিয়াবাদ পরস্পরের অনুপূরক। আচার্য্য উডওয়ার্থ বলেছেন "আমরা একটা যন্ত্রের গঠনের (structure) কথাও বলি, আবার তার কাজের (function) কথাও বলি।...একটি যন্ত্রের structural আলোচনাটা বুঝিয়ে দেয় "জিনিসটা আসলে কি" এবং তার functional আলোচনাটা বুঝিয়ে দেয় "এটা কি কাজ করে," "এর প্রয়োজনীয়তা কি"?

বলা বাহুল্য, এই দুটি দৃষ্টি-ভঙ্গীরই প্রয়োজন আছে। মনস্তত্ত্বকে যদি চৈতন্যের বিজ্ঞান (Science of Consciousness) হিসাবে ধরা হয়, তাহলে ঐ চৈতন্যের গঠন তত্ত্ব (structure)-টাও জানতে হবে এবং তার আচরণ-তত্ত্বটাও জানতে হবে (যেমন কোনও প্রাণীকে জানতে হলে তার anatomy এবং physiology দুটোই জানতে হয়)

Woodworth বলেছেন, The structure of consciousness will be what consciousness is 'as such' and the function of consciousness will be what it does, what use it has in the life of the individual and of the social group. Structural study should have priority over functional, for until we know thoroughly what conscious processes are, we are not equipped to investigate what they do for the organism—(Contemporary Schools of Psychology)।

টিচনারের মতে "ক্রিয়াবাদ" হিসাবে একটা শাস্ত্র থাকতে পারে, তবে সেটা মনস্তত্ত্ব নয়, সেটা হচ্ছে জীবতত্ত্বের শাখা শাস্ত্র। জীবতত্ত্বটা হিসাব করে দেখতে চায় প্রাণীরা তাদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কি ভাবে কাজ কর্ম করে, জীবনের প্রয়োজনে কি ভাবে জগতের সঙ্গে কারবার চালায়। মনস্তত্ত্ব কিন্তু পরিবেশ নিয়ে মাথা ঘামাবে না, সে দেখবে মনোযন্ত্রের মধ্যে চৈতন্যের রাজ্যে কি ঘটছে, তার স্নায়ুতন্ত্রে কি অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হচ্ছে এবং কি ভাবেই বা সেটা হচ্ছে। এর বেশী কিছু জানবার অধিকার মনস্তত্ত্বের নেই।

টিচনারের যুক্তির গুরুত্বটা অস্বীকার করা কঠিন। সেই জন্যই তিনি খাঁটি মনস্তত্ত্বের সঙ্গে আচরণ তত্ত্বের (তথা অবয়ববাদের সঙ্গে ক্রিয়াবাদের) একটা সীমারেখা টেনেছেন। তবে এই সীমারেখা টানলেও টিচনার এই দুটো জিনিসকে খুবই নিবিড় ভাবে সম্পর্কিত বলেই মনে করেছেন।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৬৪)

তব্ দেব প্রার্থনা ধরার ধূলি হোক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম-মানুষ, ...সকল মুখ তোমার আলয় হউক। উপনিষদ্ বলছেন দেবাঃ দেবালয়ঃ—ব্রহ্ম-মানুষ হওয়া ছাড়া মানুষের আর তো কিছু হওয়ার অর্থ নেই... জগন্নাথ মানুষ তোমার মত হউক—জগন্নাথ, আমার জগন্নাথ...।

১১. ১১. ৫৬ ॥ওঁ...ওঁ। নিত্যগোপাল বিশ্বের বুকে যে বিশেষ জীবন ও তত্ত্ব নিয়ে প্রকাশিত হয়েছেন, সে প্রকাশের গূঢ় প্রয়োজন সেই তত্ত্বানুযায়ী বিশ্বকে গড়ে তোলা—এ গড়ে তোলার ভার নরনারায়ণ আশ্রমের উপর পতিত হয়েছে—এ দায়িত্ব পালন না করলে আমাদেরও প্রত্যবায় হবে, উঁরও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তিনি এসেছেন সকলের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতে—সর্ব ধর্ম, সর্ব আশ্রম ইত্যাদি স্থাপনার পিছনে সকলের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করাই উঁর অবতরণের উদ্দেশ্য।...পরস্পর সহিষ্ণু হওয়া ও পরস্পরকে স্বীকার করাই নিত্যগোপালের পরম প্রয়োজন...এতে মাৎসর্য থাকে না—ঈর্ষা থাকে না।...মাৎসর্য আসে কিসে—সন্তীর্ন মনে করে' সে অন্যকে স্থান দেবে না—তার স্থান বুঝি বা গেল...। একটা কথা দিয়ার কর—তুমি যদি তোমার নিজের স্থানে স্থির থাকতে পার নিজের কর্তব্য বজায় রেখে—কোনদিন কোন রকমেই তোমার স্থান যাবে না...। তিনি কোন শিষ্ট করেন না—কিন্তু সে বুঝবার ক্ষমতাই কি তোমার আছে?...কোনো মানুষই সব পায়ে কিংবা সব পায়ে না এমন হতেই পারে না...। একটা পরিবারের ছবিটা দেখ—প্রত্যেকের নিজ কাজ একত্র করলেই একটা পরিবার। সব পাওয়া ও সব না পাওয়া মিলিয়ে একজন—এটুকু তত্ত্বজ্ঞান যদি আশ্রমের কর্মীদের না থাকে তবে এ আশ্রম যত শীঘ্র ভেঙে যায় ততই ভাল।...বড় ছোট নেই—প্রত্যেকেরই পাওয়ার একটা ক্ষেত্র আছে।...সেবক কোনদিন ছোট হয়ে থাকে না... সেবাদ্বারা যে স্থান অর্জিত হয়, কেউ কোনদিন তা কেড়ে নিতে পারে না...। যা কিছু কর, সেবাবুদ্ধিতে কর... রোজ আত্মপর্যালোচনা কর।...ফাঁকি দেবে কাকে? যে কাউকে ফাঁকি দেয় নি, তাকে ফাঁকি দেবে কি করে?... যারা কোনদিন একটুও মাধবীকে (নবাগত গরু) সেবা করেছে, মাধবীর দুধ হলে তাদের একটু দিতে প্রাণ চায়—এই যেখানে আমার প্রাণের অবস্থা সেখানে আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।...আশ্রমোচিত বুদ্ধি তোমাদের হউক...। সকাল সন্ধ্যায় প্রত্যেক ঘটনাকে ব্রহ্মমূল্য দিতে চেষ্টা কর...। ছিন্ন পরিমল গন্ধ দিল নিজেদের রক্ষিত করে—গুরুর কাছে যে আটকা পড়ি। কোনদিন কারো সেবা পেয়ে আমি মুখ বুজি না—ফিরিয়ে দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করি...যেটুকু পারি না ঠাকুরকে বলি তুমি করো।—প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকে কৃতজ্ঞ হও..অপরের সেবা নেবে, দাদাদিদি ভাববে—অথচ প্রাণের মধ্যে দাদাদিদি মনে করবে না—এ ফাঁকি দিয়ো না। এখানে থেকে মন পড়ে থাকবে বাড়ীর দিকে—এ ফাঁকি দিয়ো না—দিলেও থাকতে পারবে না—একদিন যেতেই হবে।... প্রতি ঘটনায় মিলেমিশে করতে হবে...যেখানে আমি বিশ্বসেবার ভার দিতে চাই সেখানে যদি তোমরা এই ছোট খাট ব্যাপারে মিলতে না পার...! ছেলেমেয়ে স্বামী বাবা তাই নিয়ে বেশী মাতামাতি করো না...। জগদ্ধাত্রী তিনি, শুধু তোমার আমার ধাত্রী নন—তাই জগতের সঙ্গে মিলেমিশে সেবা করতে হবে—জগন্নাথ নিত্যগোপাল... ধরার ধূলি হউক ব্রহ্মধূলি...।

১৩, ১১, ১৯৫৬। ওঁ...ওঁ॥ নর নারায়ণের সম্বন্ধ উলটা কিম্বা এক অপরের পরিপূরক— নর নারায়ণের দিকে যায়, নারায়ণ নরের দিকে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, তুমি অরূপ থেকে রূপে আস, আমরা রূপ থেকে অরূপে যাই।

তিনি এক ছিলেন, বহু হলেন···। এক পিতা বহু সন্তানে হলেন—সন্তানদের কর্তব্য পিতার মধ্যে এক হওয়া···। সৃষ্টির এক অর্ধেক নারায়ণ, আর এক অর্ধেক মানুষ—নারায়ণের সৃষ্টি, মানুষের বিশ্বটি বিশেষ সৃষ্টি। নারায়ণ তিল বানিয়েছেন...নর তৈল বানায়।·· তিনি কি তৈল বানাতে পারেন না?···তাহলে মানুষ করবে কি?... নিত্যগোপাল বললেন তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই ··এর অর্থ অনুগতদের জন্য অসাধ্য কিছুই নেই—যোগক্ষেমং বহাম্যহম্। কিন্তু অনুগত না হলে অনেক কিছুই তাঁর পক্ষে অসাধ্য···। তাঁর যে অসাধ্য নেই তা হল ভক্তের টানে বা ভক্তির টানে ···গরুর দুধ যে আসে তা বাছুর না টানলে আসে না।...বাছুর অর্জুন—দুগ্ধ গীতামৃত —গোরূপ কৃষ্ণের নিকট হইতে বাহির করিয়াছিলেন।... ভগবানের অসাধ্য নেই অনুগতের জন্য...অবাধ্য শরণাগতিহীনের জন্য তাঁর অনেক কিছুই সাধ্য নেই।··· অনুগত পুত্রের জন্য বাপ মা সবই পারেন।...পারেন তিনি সব করতে, কিন্তু করবেন কেন? তুমি যে চাও কি যোগ্যতায়?...জোর করলে রক্ত বের হতে পারে, কিন্তু দুধ বের হয় না।...তুমি আমার আশীর্বাদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, আর আমি চিরকাল আশীর্বাদ করে যাব—তা হয় না।...ব্রজ-গোপীদের কৃষ্ণ বুঝিয়ে দিয়ে ছিলেন যে তাঁর করুণা নিয়ে অহঙ্কৃত হওয়া চলে না···। ভগবানের প্রথম সৃষ্টি, মানুষের দ্বিতীয় সৃষ্টি। আমাদের প্রথম মানুষ হওয়া মানে কৃষ্ণ হওয়ার অনন্ত সম্ভাবনা নিয়ে আমি জন্মেছি—আমাকে একটা সামগ্রিক জীবন যাপন করে কৃষ্ণ হতে হবে।...তুলা তিনি করেন, কাপড় মানুষ করে...নর এবং নারায়ণ দুজন যখন সত্যিকার মিলিত হয় তখনই পরিপূর্ণ সৃষ্টি হয়। 'স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত'।··· তিনি সৃষ্টি করেছেন আমাদের, আমরা সৃষ্টি করব তাঁকে।...দ্বিতীয়বার আমি আমাকে সৃষ্টি করব, নতুন সৃষ্টি করব, সত্যের ভিতর দিয়ে তাঁকে recreate করব ...দিন গেল, বেশীদিন থাকব না... সারাজীবন চেষ্টা করলাম মানুষের মধ্যে ব্রহ্মকে জাগ্রত করতে কর্মে জ্ঞানে ভক্তিতে প্রেমে মানুষ হও মানুষের ভেতর সর্বোৎকৃষ্ট অনন্ত সম্ভাবনার জন্ম···।

এমন গৌরাঙ্গে যার রতি না জন্মিল
লোচন বলে সেই পাপী এল আর গেল...।

বিল্বমঙ্গল বলেছিল, দিন গেল, তবু আজও তো কৃষ্ণ এলেন না...। তেমনি দিন যায় তবু মানুষ তো হলে না।...এই প্রার্থনা—আমার জীবনের যত সম্ভাবনা আছে, নিত্যগোপাল তুমি তা বিকশিত কর···অন্তর ময় বিকশিত কর···। নিত্যগোপাল, দিন গেল, দিন গেল, নিত্যগোপাল—এদেরকে মানুষ কর, মানুষ কর, ভক্তি দান কর···।

১৪, ১১, ৫৬ ওঁ...ওঁ এর আগে যে লেখাটুকু পড়া হল সেটা নিত্যগোপাল নিজের সম্বন্ধে নিজে লিখে গেছেন নিত্যবর্ষপঞ্জিকায়। ঐ লেখাটীর মধ্যে তাঁর ভগবত্ত্ব সম্বন্ধেও লিখেছেন এবং তাঁর ভক্তত্ব সম্বন্ধেও লিখেছেন—শ্রীনিত্য গোপাল পরম প্রেমিক···। নিজের সম্বন্ধে বড় বড় কথা যে তিনি লিখে গেলেন—হয় তিনি উন্মাদ, নয় এর গভীর অর্থ আছে। তাঁর এই কথা আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি।···রামকৃষ্ণ কথামৃতে আছে—রামকৃষ্ণদেব বলছেন নিত্য, তুই এসেছিস, আমিও এসেছি...। কেন এলেন? সমন্বয় করতে। সমন্বয় সম্বন্ধে কিন্তু এ দেশের লোক জানত—তবু শ্রীরামকৃষ্ণ থেকেই এর ব্যাপক প্রচার···। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় ও শ্রীনিত্যগোপালের সমন্বয়ে তফাৎ আছে—রামকৃষ্ণ দেব antithesis—জড়বাদসর্বস্ব, ভোগসর্বস্ব মানুষের জন্য এ antithesis দরকার...। তারপরে নিত্যগোপালদেব এসে জড় অজড় সমন্বয় দার্শনিকভাবে দিয়ে গেলেন···জড়কে এড়িয়ে অজড়বাদ দাঁড়াতে পারে না...। শ্রীকৃষ্ণ এ দেশের প্রাণ-পুরুষ, তিনি প্রমাণিত করে রেখে গেছেন কেমন করে জড়কেই অজড়ে পরিণত করা যায়···ব্রজলীলায় তা আছে।··· রাসের প্রস্তুতি হিসাবে ভাগবতের প্রথম নয়টী অধ্যায়

বুঝতে হবে—সেগুলি না বুঝলে রাস বুঝবার কোনো সম্ভাবনা নাই—মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যে divine সম্বন্ধ সেইটে রাসে প্রমাণিত হয়েছে ··নিত্যগোপালের জড়াজড় সম্বন্ধ দ্বারাও এই divine সম্বন্ধই প্রস্তাবিত হয়েছে। ভারতবর্ষ নূতন করে শুনল যে পূর্ণজ্ঞানের এক শাখা আত্মজ্ঞান, পূর্ণজ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান, সর্ব জড় ও অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণ জ্ঞান...। জড়ের divinity ও অজড়ের divinity নিত্যগোপাল দিয়েছেন—ব্রহ্ম জড় ও ব্রহ্ম অজড়ের harmony ।...পাশ্চাত্ত্য একটা জড়ের রাজ্যে এনে দিয়েছেন...কিন্তু জড় যে আজ হেসে বসেছে—তার জবাব দেবে কে? শ্রীনিত্যগোপাল জড় ও অজড়ের যথা যান নির্দেশ করে যে জবাব দেবে গেছেন।··· Religion can wait, but rice problem cannot wait...অথচ at heart আমরা সেই আত্মজ্ঞানীদের রক্তে জন্ম নিয়েছি religion-এর থেকে rice problemকে যারা ছোট করে দেখে।...কথায় আছে scratch a Russian and you will find a Tartar, তেমনি scratch an Indian, you will find an idealist —সে idealist realism যে ছোট মনে করে।···মনের সাধ্য নাই দুটোকে মিলায়—মনের ধর্মই either-or-এর ধর্ম—সেখানে মানুষ হয় জড়বাদী নয় অজড়বাদী..দুটোকে সমানভাবে সার্থক করা মনের দ্বারে সম্ভব নয়।...শ্রীভগবান তাই যার যার বলেছেন মন আমায় দাও।... যুগপৎ-ধর্ম—simultaneity—মনের ধর্ম নয়।...আলো আঁধার মেলে না বলছ—তাহলে halftone হয় কি করে? ...আজকের বিজ্ঞানে either-or নাই—আছে degree —how much shade and how much light—একান্ত শৈত্য কিছু নাই, একান্ত আগুন কিছু নাই—সব digree-র ব্যাপার। বিজ্ঞানও বলে, রূপবিজ্ঞানও বলে—প্রত্যেক নরে নারী আছে, প্রত্যেক নারীতে নর আছে, প্রত্যেক মানুষে পশুর আছে... ; একই সময় মানুষ হাসে কাঁদে···। বুদ্ধি fail করেছে জীবনের জটিলতা বুঝতে, বুদ্ধি হাসে পারি পায় নি...পাশ্চাত্ত্য ধরে ফেলেছে—বুদ্ধিদ্বারা post mortem dissection হয়...তখনই হয়ে দাঁড়ায় এটা হিন্দুর, এটা ইসলামের; এটা জড় ওটা অজড়। কিন্তু অনন্তবুদ্ধি বুঝল সব মিলিয়ে একটা সমগ্র মানুষ... ছেলেবাপ মিলিয়ে একটা organic whole...। বর্ণাশ্রমের আরম্ভ পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তি সত্তা হইতে, ভাগবতের আরম্ভ ভগবান হইতে।···অগ্রহায়ণের উদ্বোধনভাবত পড়ে দেখো ব্রহ্ম সত্যং জগৎ সত্যং প্রবন্ধ···। ভগবানের কথাই হচ্ছে, মন আমাকে দাও, না হলে কিছুতেই আমার সৃষ্টি বুঝবে না। সৃষ্টি একটা organism—বীজের থেকে অঙ্কুর হওয়া একটা life process—mechanism নয়। প্রত্যেক স্তরের একটা আলাদা রূপ···creative evolution...। Self-centred জগৎ মিথ্যা···। বড় ছেলের ব্যাখ্যাত সংসার মিথ্যা যখন ছোট ছেলের স্বার্থ সেখানে ক্ষুণ্ণ হয়—কিন্তু বাপের কাছে উভয়ের স্বার্থ রক্ষিত হয় তাই বাপের সংসার সত্য...। পুরুষোত্তম L.C.M.— একটা বড়র মধ্যে সেখানে প্রত্যেকেই আছে···সেখানে উৎকট আকারবাদ নাই, উৎকট নিরাকারবাদ নাই···। নদীর গতি বুঝতে চাও—জলে ঝাঁপ দেও...। ফটোগ্রাফী আগে স্থির বস্তুর ফটো নিত...এখন নাচেরও ফটো হয়। গতিশীল জগৎকে স্থির করিয়ে ফটো নেওয়া যায় না···। প্রচলিত মায়াবাদ জগৎকে স্থির করিয়ে ছবি নিতে চায়, তাই সে জগৎ মিথ্যাত্বে পর্যবসিত হয়···।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

॥ শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

যিনি এই প্রকার জানেন (তাহার ঐ ফল হয়) (ব্রহ্মকে) ক্ষেমরূপে বাক্যে, যোগক্ষেমরূপে প্রাণ ও অপানে, কর্মরূপে হস্তদ্বয়ে, গতিরূপে পাদদ্বয়ে, পরিত্যাগরূপে পায়ুতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উপাসনা করিবে।—এই সমস্ত মানুষ সম্বন্ধীয় উপাসনা। অনন্তর দৈবী কথা হইতেছে—তৃপ্তিরূপে বৃষ্টিতে, বলরূপে বিদ্যুতে—

যশঃ ইতি পশুষু। জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু অমৃতানন্দ ইত্যুপস্থে। সর্বমিত্যাকাশে তৎ প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত। প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত। মানবান্ ভবতি। ৩১০৩

যশঃ ইতি [যশরূপে] পশুষু [পশুগণ মধ্যে] জ্যোতিঃ ইতি [জ্যোতি রূপে] নক্ষত্রেষু [নক্ষত্রগণ মধ্যে] প্রজাতিঃ [প্রজনন রূপে] অমৃতানন্দ ইতি [অমৃতানন্দময় রূপে] উপস্থে [জননেন্দ্রিয়ে] সর্বম্ ইতি [সর্বরূপে] আকাশে [সর্বাধার আকাশে] (উপাসনা করিবে) তৎ [সেই আকাশ রূপ ব্রহ্মকে] প্রতিষ্ঠা ইতি [প্রতিষ্ঠা রূপে] উপাসীত [উপাসনা করিবে] প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি [ঐ উপাসনার ফলে উপাসক সকলের প্রতিষ্ঠাস্থানীয়, আশ্রয়স্থানীয় হন্] তৎ [উক্ত আকাশ-ব্রহ্মকে] মহঃ ইতি [মহত্ত্ব গুণযুক্তরূপে] উপাসীত [উপাসনা করিবে] মহান্ ভবতি [মহান হন্] তৎ মনঃ ইতি [তাহাকে মনোরূপে] উপাসীত [উপাসনা করিবে] মানবান্ ভবতি [মান মানে (measure) মানী হন্, প্রতি বস্তুর মানদণ্ড (measuring rod) হন্।]

যশোরূপে পশুগণ-মধ্যে, জ্যোতিঃরূপে নক্ষত্ররাজির মধ্যে, অমৃতানন্দরূপ প্রজনন-ক্রিয়ারূপে জননেন্দ্রিয়ে, সর্ব রূপে আকাশে উপাসনা করিবে। আকাশরূপী ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠারূপে উপাসনা করিয়া উপাসক প্রতিষ্ঠাবান হন্, সর্বাধার হন্। তাঁহাকে মহঃ রূপে উপাসনা করিলে সাধক মহান্ হন্ তাঁহাকে মনরূপে উপাসনা করিলে সকলের সব মানদণ্ডের আশ্রয় হন্।

তন্নম ইত্যুপাসীত। নম্যন্তেঽস্মৈ কামাঃ তদ্ব্রহ্মেত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান্ ভবতি। তদ্ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। সর্বেঽস্মৈ স্নিগ্ধে স্নিগ্ধাঃ সপত্নাঃ পরি ম্রিয়ন্তে। স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। ৩১০৪

তৎ [তাহাকে] নমঃ ইতি [নম নোয়াইয়া দেওয়া, সব নমনধর্মশীল করা (flexible) সমর্পণ করিবার যোগ্যতারূপে] উপাসীত [উপাসনা করিবে ; "মাং নমস্কুরু"—গোটা জীবনকে সেই আনন্দঘন পুরুষোত্তমের কাছে নোয়াইয়া দিতে হইবে আমার সবটুকুকে আত্মসাৎ করিবার জন্য ; নমনীয়তাই (flexiblity) "নমঃ" উপাসনার ফল] নম্যন্তে [মাথা নোয়াইয়া আসিবে ; অবনত হইবে, অধীন হইবে, তদ্ভাবভাবিত হইবে] অস্মৈ [নমস্কার-সাধকের কাছে, নমনধর্মশীল উপাসকের কাছে] কামাঃ [সর্ব কাম্য বস্তু] তৎ ব্রহ্ম ইতি [নমস্কার-সাধনাকে বৃহত্তম, প্রধানতম সাধনারূপে] উপাসীত ব্রহ্মবান্ ভবতি [যে জীবনের সব কিছু নোয়াইয়া দিয়াছে, বিশ্বের সব তাহার কাছে নুইয়ে আসে, সে-ই সত্যসত্য সর্বার্থে ভজনীয় ব্রহ্মরূপে গুণবান্ হন্, তাঁহার কাছে ভজনীয় ব্রহ্মগুণসমূহ অর্থাৎ ঐশ্বর্য-বীর্য-যশ-শ্রী-জ্ঞান বৈরাগ্য সব নুইয়া আসে, তাহার ভাবে ভাবিত হয়,

সে-ই হইয়া যায়] তং [আকাশ-ব্রহ্মকে] ব্রহ্মণঃ [ব্রহ্মের] পরিদয়ঃ ইতি [সংহার ক্রিয়ার ময়রূপে ; বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, চন্দ্রমা, আদিত্য ও অগ্নি এই সব দেবতা বায়ুতে লীন হয় বলিয়া বায়ু "সম্বর্গা" (ছা ৪।৩।১-২) ; সুতরাং বায়ুই ব্রহ্মের সংহার ক্রিয়ার দ্বার বা পরিদয় বায়ু আকাশ-সম্ভূত বলিয়া বায়ু-আকাশ এক, আকাশও তাই পরিদয়] উপাসীত। এনম্ বিদ্বাংসঃ [এই উপাসকের বিদ্বেষকারীগণ] সপত্নাঃ [প্রতিদ্বন্দ্বীবর্গ] পরিদ্রবন্তে [প্রাণ ত্যাগ করে] যে [যাহারা] অপ্রিয়াঃ [বিদ্বান্ জনের] (কিন্তু) ভ্রাতৃব্যাঃ [শত্রু] যঃ চ অয়ম্ [এই যিনি] পুরুষে [পুরুষ মধ্যে] যঃ [তিনি] যঃ চ অসৌ [এবং ঐ যিনি] আদিত্যে [সূর্য্যমণ্ডলে] সঃ এষ [অভিন্ন ; একই অখণ্ডের দুইটী আধারের মাত্র]

তাঁহাকে নমস্কাররূপে, নোয়াইয়া দেওয়ারূপে উপাসনা করিবে। কাম্য বস্তুসকল তাহার কাছে মাথা নোয়াইয়া আসিবে। তাঁহাকে বৃহত্তমরূপে উপাসনা করিলে ব্রহ্মবান হন্। তাঁহাকে ব্রহ্মের সংহার ক্রিয়ার দ্বাররূপে উপাসনা করিলে দ্বেষকারী প্রতিদ্বন্দ্বীগণ এবং দ্বেষহীন বিদ্বেষ জনের শত্রুগণ প্রাণত্যাগ করে। যিনি এই পুরুষে, যিনি ঐ আদিত্যমণ্ডলে, তিনি এক, অখণ্ড।

স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। ইমাঁল্লোকান্ কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্। এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। হা ও বু, হা ও বু, হা ও বু ৩।১০।৫।

সঃ য এবংবিৎ [সেই পুরুষ, যিনি এইরূপে সত্য, জ্ঞান, অনন্ত দেবকে জানেন] অস্মাৎ লোকাৎ [ধাপের পর ধাপ খাড়া করিয়া, প্রতি সামনের ধাপকে ব্যাপক ও সূক্ষ্মতর এবং পিছনের ধাপকে অণু সামনের ধাপের ব্যাপ্যরূপে সন্নিবেশরূপে দেখিয়া ; সামনের ধাপদ্বারা পিছনের ধাপ শোষিত হইবার সর্ব্ববিধ সুযোগ বাঁচাইয়া রাখিয়া যে 'লোক'-ব্যবহার সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা হইতে] প্রেত্য [প্রকৃষ্টরূপে ঊর্দ্ধে গমন করিয়া, উঠিয়া] এতম্ অন্নময়ম্ [এই অন্নময়কে] আত্মানম্ [আত্মতাদাত্ম্য-প্রাপ্ত অন্নময়কে] উপসংক্রম্য [সম-সাক্ষাৎ ভাবে সমীপস্থ হইয়া সংক্রমণ করিয়া, চড়িয়া বসিয়া, অন্নময়ের পরতে পরতে সম সাক্ষাৎ ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া] এতং প্রাণময়ম্ আত্মানম্ [আত্মতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত এই প্রাণময়কে] উপসংক্রম্য [সমসাক্ষাৎ ভাবে সংক্রমণ করিয়া] এতং মনোময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য [এই মনোময় আত্মাকে সমসাক্ষাৎ ভাবে সংক্রমণ করিয়া] এতম্ আনন্দময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য [এই আনন্দময় আত্মাকে সম সাক্ষাৎ রূপে সংক্রমণ করিয়া] ইমান্ লোকান্ [এই লোকসমূহ] কামান্নী [ইচ্ছানুরূপ ভোগ প্রাপ্ত হইয়া] কামরূপী [তত্তদ্ ভোগ-যোগ্য ইচ্ছানুরূপ দেহবান হইয়া ; 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'—ভগবৎপ্রোক্ত সূত্র ধরিয়া ভক্ত ও 'তথা এব' অর্থাৎ ভজনযোগ্যরূপ ধারণ সক্ষম] অনুসঞ্চরন্ [বিশ্বের প্রতি অণুর মধ্যেও অণুরূপে, সমভাবে চরণ করিয়া, প্রতি বস্তুটি 'যথা' ঠিক 'তথা' (তাহারই মত) ভগবৎ রূপকে তাহার মধ্যে সঞ্চার করিয়া ভগবল্লোক পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিবার বাসনা লইয়া] এতৎ সাম [এই সাম অর্থাৎ ধর্ম্মমোহনিমুক্ত অন্ন ও অন্নাদের সমতাপূর্ণ যোগঘন পুরুষোত্তম-বস্তুকে] গায়ন্ [গাহিতে গাহিতে, লোকের অন্তর্নিহিত পুরুষোত্তম-যোগ অর্থাৎ কৌশললাভে ধন্য হইয়া, বিলসিয়া হইয়া, ঋষির প্রিয়তমের সমস্বরূপের গুণগান করিতে করিতে] আস্তে [অবস্থান করেন] হা ও বু, হা ও বু, হা ও বু [অহো, অহো, অহো ! মহান্ আশ্চর্য্য বুঝাইবার জন্য, ভাবের আবেগে এই আবৃত্তি সহজই হইতেছে—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগঃ দ্রুতচিত্তউচ্চৈঃ।
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়ত্যু-
ন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ। ভাগবত ১১।

যিনি এই প্রকার জানেন, এই লোকের ঊর্দ্ধে উঠিয়া এই অন্নময় আত্মাতে উপসংক্রমণ করিয়া, প্রাণময় আত্মাতে

উপসংক্রান্ত হইয়া, মনোময় আত্মাতে উপসংক্রমণ করিয়া, বিজ্ঞানময় আত্মাতে উপসংক্রমণ করিয়া, আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রমণ করিয়া যথেচ্ছ অন্ন ও যথেচ্ছ রূপ প্রাপ্ত হইয়া এই লোকসমূহ অনুসঞ্চরণ করিয়া, পর্যটন করিয়া, এই সামগান গাহিতে গাহিতে বিরাজ করেন—অহো, অহো, অহো।]

অহমন্নমন্নমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদোঽহমন্নাদোঽহমন্নাদঃ। অহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃৎ। অহমস্মিপ্রথমজা ঋতস্য পূর্বং দেবেভ্যোঽমৃতস্য নাভায়ি। যো মা দদাতি স ইদেব মা ঽবাঃ। অহমন্নমন্নমদন্তমা ঽদ্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবাম্। সুবর্ণ জ্যোতীঃ য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ॥ ৩।১০।৬

ইতি ভৃগুবল্ল্যাখ্যায়ে দশমোঽনুবাকঃ।

অহম্ [আমি] অন্নম্ [অন্ন] অন্নাদঃ [অন্নভোক্তা] অহম্শ্লোককৃৎ [অন্ন ও অন্নাদের শ্লোককর্ত্তা, যথাযোগ্যমুক্ত সমন্বয় কর্ত্তা; বস্তু গৌরবে বিস্ময় ও আত্ম-কৃতার্থতার পরম আস্বাদনের জন্য যার যার আবৃত্তি যুক্তিযুক্ত] অহম্ অস্মি [আমি হই] প্রথমজা [প্রথমোৎপন্ন] ঋতস্য [সৎ-তাৎযুক্ত বিশ্বের] পূর্বং দেবেভ্যঃ [দেবগণ হইতেও পূর্ব্ববর্ত্তী] অমৃতস্য [অমৃতের] নাভায়ি [নাভিঃ—নাভি, মধ্যদেশ, প্রতিষ্ঠা] যঃ [যিনি] মা [অন্নরূপ আমাকে] দদাতি [অন্নার্থীকে দান করেন] সঃ [তিনিই] ইৎ এব [এই প্রকারেই] মা [আমাকে] অবাঃ [অবতি, রক্ষা করেন] অহং অদন্তং [যিনি অন্ন দান না করেন তাঁহাকে] অহম্ অন্নম্ [অন্নরূপী আমিই] অদ্মি [ভক্ষণ করি] অহম্ বিশ্বম্ [সর্ব্ব] ভুবনম্ [জগৎকে] অভ্যভবাম্ [অভিভবামি, উপসংহার করি] (আমাদের) জ্যোতীঃ [জ্যোতিঃ] সূর্যঃ ন [আদিত্যের ন্যায়] যঃ এবং বেদ [যিনি এইরূপ জানেন] ইতি উপনিষৎ [ইহাই পরমাত্ম জ্ঞান]

আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন। আমি অন্নভোক্তা, অন্নভোক্তা, অন্নভোক্তা আমি অন্ন-অন্নভোক্তা মহা-মিলনের ঘটক, আমি মিলন ঘটক, আমি মিলন ঘটক। আমি প্রথমজ—মূর্ত্ত-অমূর্ত্ত জগৎ ও দেবগণের পূর্ব্ববর্ত্তী। আমি অমৃতত্বের নাভিস্বরূপ। যিনি অন্নার্থীর নিকট অন্নরূপী আমাকে দান করেন, তিনি এই প্রকারেই আমাকে রক্ষা করেন। যিনি অন্নদান না করেন অন্নরূপী আমি তাঁহাকে ভক্ষণ করি। আমি সমস্ত জগতের অভিভব করি। যাঁহারা এইরূপ জানেন, সেই আমরা জ্যোতি আদিত্যের ন্যায়—ইহাই উপনিষৎ।

সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

'মানুষের জন্য ধর্ম এবং ধর্মের জন্য মানুষ—দুই-ই সত্য হইতে পারিত যদি ধর্ম বলিতে বিশেষ কোন ধর্ম না বুঝাইয়া সর্বধর্মসমন্বয়ই বুঝাইত। সর্বধর্মসমন্বয়ই মানুষের স্বধর্ম। প্রতি মানুষ এই হিসাবে স্বধর্মী, সর্বধর্মী। .....ইহাও সত্য যে প্রত্যেকটি ধর্মই স্বয়ংপূর্ণ, উহা ঐ সম্প্রদায়ের সকল স্তরেরই আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও তুল্যভাবেই সত্য যে, কোনও বিশেষ দেশ-কাল-পাত্র বা বিশেষ দৃষ্টিকোণের মধ্যে সমগ্র মানবসমাজকে, এমন কি কোনও বিশ্বরূপ ব্যষ্টি মানুষকেও আটকাইয়া রাখা যাইবে না। সব বিশেষত্বকে ছাপাইয়া অখণ্ড বিশ্বরূপ ব্যষ্টি মানব ও মানবসমাজ আগাইয়াই চলিয়াছে, চলিবেও।'

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-কৃত মহাত্মাজীর গঠনকর্ম পদ্ধতি

জাতীয় সঙ্কটে সাহিত্যের ভূমিকা

॥ শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় ॥

উনিশ শো বাষট্টি সন, অক্টোবর নভেম্বর মাস ভারতের রাজনৈতিক আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা। ভয়ঙ্কর লালচীন ভারতের উত্তর সীমান্ত আক্রমণ করেছে। এ আকস্মিক আক্রমণে ভারতীয় বাহিনী সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত। সারাদেশ গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় মহা আশঙ্কা ঘনিয়ে মৌন মন্থরে। প্রতিদিনই যুদ্ধ-সীমান্ত থেকে আসছে দুঃসংবাদ। একটির পর একটি ভারতীয় ঘাঁটির পতন ঘটছে। দলে দলে ভারতীয় জোয়ান বন্দী হচ্ছে চীনাদের হাতে। পূর্বসীমান্তে বস্তিলার পতন আসন্ন। ষাট সত্তর মাইল দূরবর্তী শহর তেজপুর থেকে শুনা যায় সুদূরাগত কামান গর্জন। ভারতীয় বাহিনী পশ্চাদপসরণে ব্যস্ত। বহু ভারতীয় সৈন্য ও সেনাপতি চীনাদের হাতে নিহত হয়েছে। আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতীয় জোয়ানরা একটি চীনাকেও বন্দী করতে পারে নি। চীনা বাহিনীর কেউ নিহত বা আহত হয়েছে এমন কোন সঠিক সংবাদ নেই। তবে অনুমানকে কল্পনা করা হচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে। জাতির জাগো এতবড় অপমান ও কলঙ্কের একমাত্র তুলনা চলে সেই বহুল প্রচলিত কিংবদন্তীর সঙ্গে 'সপ্তদশ তুর্কী অশ্বারোহী বর্তৃক নদীয়া বিজয়, এবং খিড়কীর দুয়ার দিয়ে লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন'। সেদিন বখ্‌তিয়ার খিলজীর অতর্কিত আক্রমণে বৈদগ্ধ গণ্যকার-প্রকাশিত বঙ্গেশ্বর রাজা লক্ষ্মণসেন যেমন অপ্রস্তুত ছিলেন, ঠিক তেমনি চীনা আক্রমণের মোকাবিলায় উদ্যোগহীন ও অপ্রস্তুত ছিল ভারত। মহামূল্যবান পনেরটি বৎসর আমরা কেন এক অন্ধ আত্মতুষ্টির মোহে মশগুল হয়ে ছিলাম। ভেবে-ছিলাম অহিংসা নীতির দৌলতে মধুরে বহিবে বায়ু কেলে যাব যবে, কেউ আমাদের গায়ে আঁচড় কাটতে আসবে না। এদিকে যে শমন শিয়রে খাড়া সেদিকে হুঁশ নেই। এই বিরাট দেশ—হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত যার সীমান্ত রেখা—তার নিরাপত্তার জন্য যথোপযুক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করা হয় নি স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী পনের বৎসরের মধ্যে। ভারতেতিহাসের এক গ্লানিকর পুনরাবৃত্তি - অ-রক্ষিত সীমান্ত পথে বিদেশী শত্রুর আক্রমণ। এ লজ্জাকর পরিস্থিতির জন্য যারা দায়ী ভবিষ্যতের ইতিহাস তাদের মার্জনা করবে না।

যা হোক্, আসন্ন বিপদের মেঘ আপাততঃ কেটে গেল। চীনারা বস্তিলা দখল করেও আবার কী যেন ভেবে, ফিরে গেল। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। একটা প্রশ্ন উঠল—এ-হেন পরিস্থিতিতে দেশের লেখক সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা কি ভাবে দেশকে জাগাতে পারে, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এবং দেশ রক্ষার গুরুদায়িত্ব বহনে দেশের জনসমাজকে যোগ্য করে তুলতে পারে। কলকাতার লেখক-সাহিত্যিক মহলে এ-নিয়ে দু'চারদিন বেশ একটু গরম ভাব দেখা গেল। কার বা কাদের উদ্যোগে জানিনা,—রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সরকারী বাসভবনে একদিন এক সান্ধ্যসভা আহূত হ'ল। সভায় উপস্থিত ছিলেন অনেকেই। যাঁদের বই (গল্প, উপন্যাস) বাজারে বেশ বিকোয়, এবং যাঁরা বই লেখা ও বই বেচা একই সঙ্গে চালিয়ে বেশ পয়সা রোজগার করছেন তাঁরা অনেকেই এসেছিলেন। দেখে বুঝা গেল যে বই-লেখা আর বই-বেচা উভয় ব্যবসাই বেশ ফলাও হয়ে উঠেছে। আগন্তুকেরা অনেকেই উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত এবং ঘরোটর বিহারী। সাহিত্য-ব্যবসায় যে অর্থকরী ও লাভজনক হয়ে উঠেছে তা এঁদের কথাবার্তা ও চাল-চলনেই সুস্পষ্ট।

মুখ্যমন্ত্রী সভাগৃহে এলেন। আলোচনা শুরু হ'ল। আলোচ্য বিষয়—দেশের এই সঙ্কট-সময়ে লেখক ও

সাহিত্যিকেরা প্রতিরক্ষার কাজে কি সাহায্য করতে পারেন। প্রথমেই যিনি মুখ খুললেন সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য ছিল: সারা দেশ শত্রু-প্রতিরোধে প্রস্তুত হয়েই আছে, অতএব কেবল নেতৃবৃন্দের সঠিক নির্দেশের, অর্থাৎ নেতৃবৃন্দ যদি এগিয়ে এসে জনসাধারণকে কি করতে হবে বলে দেন তা'হলেই তারা শত্রু রুখতে তৎপর হয়ে উঠবে। কথাটার মধ্যে নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ মন্ত্রিগণের প্রতি প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ নিহিত ছিল, তা অনেকেরই মনঃপূত হয়নি; ফলে এ-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা আর বেশীদূর এগুল না। আলোচনা অন্য দিকে মোড় নিল। জনৈক নামকরা সাহিত্যিক প্রস্তাব করলেন যে, সীমান্তে সীমান্তে জোয়ানদের মনোবল সুদৃঢ় করার জন্য লেখক ও সাহিত্যিকদের দল পাঠান হোক। অবশ্য মনোবলবর্ধক সাহিত্যিকগণের নিরাপত্তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যেন করা হয়। আর একজন প্রস্তাব করলেন যে অবিলম্বে "রেজল রেজিমেন্ট" গঠন করা হউক। তৎক্ষণাৎ একজন রসিক সাহিত্যিক ফোড়ন কাটলেন, "আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করি তবে একটু সংশোধনসাপেক্ষে। আমি বলি "রেজল রাইটার্স রেজিমেন্ট" গঠন করলে আরও ভাল হয়। ইতোমধ্যে চা-মিটার পরিবেশন শুরু হয়ে যাওয়ায় বাচনিক প্রতিক্রিয়ার স্থান অধিকার করল দক্ষিণ হস্তের কাজ। যে বিষয় আলোচনার জন্য সভা আহূত হয়েছিল তা যেন পিছনে পড়ে রইল। শেষটায় অবশ্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল যে, দেশাত্মবোধক গানের একটা সঙ্কলন প্রকাশ করা হোক। সে দিনের মিটিংএর সেখানেই ঘটল পরিসমাপ্তি। কিন্তু যে কথাটা সেদিনের সভায় বেশ ভালভাবেই বুঝা গিয়েছিল তা' হচ্ছে এই যে, দেশের নিরাপত্তা নিয়ে সাহিত্যিকরা শুরু করতে পারেন, কিন্তু সত্যিকারের ব্যাকুলতা বা সুনিবিড় অনুভূতি নেই বললেই চলে। এবং সে কারণেই যে ক'খানা স্বদেশী কবিতা-সঙ্কলন কিছু দিন পর প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে লিখলেন অনেকেই, কিন্তু কাউকেই চেতিয়ে মাতিয়ে তোলা গেল না।

চীনা ও পাকিস্তানী আক্রমণের সময় অল-ইণ্ডিয়া রেডিও কিছুদিন স্বদেশী গান প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু সবই সাধেকী—দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান,—যা আমরা প্রায় ভুলেই দিয়েছিলাম, আবার বিপদের দিনে সে পুরানো সুরে গলা সাধবার দরকার হল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সঙ্কটের দিনে দেশের কবিকুল, সাহিত্যিকবৃন্দ থাকলেন প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে। যা দু'চারজন দু'একটি রচনা সৃষ্টি করলেন তা'হল নেহাৎ মামুলী, প্রাণহীন ও জোলো। পাকিস্তানী হামলার অব্যবহিত পরেই বাংলা দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যাগুলি নানা বিচিত্র বর্ণবৈভবে আত্মপ্রকাশ করল, কিন্তু এই দেশের সেই ঘোর সঙ্কটও সাহিত্যিকদের মনে যেন কোন সাড়াই জাগাতে পারল না। পরন্তু কোন এক সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ল এক অবনত বিকৃত রুচির বৃহদাকার যৌন গল্প—যা নিয়ে আবার কিছুদিন চলল সংবাদ পত্রে বাদানুবাদের ঝড়।

সঙ্কটকালে দেশ বা জাতি তার জাতীয় কবির দিকেই ফিরে তাকায় আশা, ভরসা ও প্রেরণা লাভের জন্য। ইতিহাসে এর নজীর আছে। রাজপুতনার চারণ কবি আর মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ফ্রান্সের Troubadour-দের ঐতিহাসিক কাহিনী সর্বজনবিদিত। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় রচিত হয়েছিল সুবিখ্যাত Marseillaise সঙ্গীত। সে প্রাণ-মাতানো সঙ্গীতের তালে তালে পা ফেলে ফ্রান্সের মুক্তি-ফৌজ বহিঃশত্রুর আক্রমণ রুখেছিল সেদিন। সাম্প্রতিক কালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের সঙ্কটে সঙ্কল্পচ্যুত জার্মান জাতি স্মরণ করেছিল তাদের জাতীয় কবি গোটেকে। মহাকবি গোটের জন্মস্থান উইমার (Weimer)। স্বল্পখ্যাত এই ছোট্ট শহরটিই সেদিন জাতীয় সংস্কৃতির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যুদ্ধোত্তর জার্মানীর নূতন সাধারণ-তান্ত্রিক সংবিধানের নাম দেওয়া হয়েছিল উইমার সংবিধান। পরবর্তী সময়ে অনুরূপ ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। এ যুদ্ধ শুরু করেছিল জঙ্গীবাদী নাৎসীরা, আর এর পরিসমাপ্তি ঘটেছিল জার্মানীর শোচনীয় পরাজয়ে। এ দুর্দিনেও জার্মান জাতি স্মরণ করল তাদেরই শ্রেষ্ঠ সুরকার বীঠোভেনকে। বীঠোভেনের

জন্মস্থান অতি ক্ষুদ্র, নগণ্য গ্রাম। শতক ধরে (Donn) ধরে পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী। এখানেই শুরু হয় জার্মানীর পুনর্গঠনের পালা।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যেখানেই যখন বিপ্লব সংঘটিত হয়, বুদ্ধিজীবীরা রচনা করেন সে বিপ্লবের পশ্চাদ্‌ভূমি। কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক প্রভৃতিরা সাধারণ মানুষের গতানুগতিক বিশ্বাস ও ভবিতব্যতার উপর আঘাত হানেন। রক্ষণশীল ধারণাগুলিকে সমূলে নাড়া দেন। নূতন চিন্তাধারার প্রবাহে মানুষের চিত্ত হয় অভিসিঞ্চিত। প্রথমে মানুষের মনোমূলে নূতন চিন্তা ও প্রত্যয় অঙ্কুরিত হয়। তারপর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের বৈশিষ্ট্যে সামগ্রিক বিপ্লব বা পরিবর্তন হয়ে উঠে অনিবার্য। বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কাই হউক, অথবা রাজনৈতিক নির্যাতন, নিষ্পেষণ বা সামাজিক অন্যায়-অবিচার ও আর্থিক দোষত্রুটি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারই হউক, বুদ্ধিজীবিগণই এ-সবের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ তোলেন। বুদ্ধিজীবিগণের সক্রিয় সহানুভূতি এবং প্রেরণা ছাড়া কোন ব্যাপক বিপ্লব সফল হতে পারে না। একজন সভ্যিকারের বুদ্ধিজীবীকে বলা হয় মুক্ত-চেতা (free spirit) পুরুষ। কোন বিশেষ সম্প্রদায়, শ্রেণী অথবা সময়ের গতানুগতিক ভাবধারাকে প্রকৃত বুদ্ধিজীবী নির্বিচারে গ্রহণ করে না। তবে অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী, অর্থাৎ লেখক, কবি, শিল্পী, শিক্ষাব্রতী, বৈজ্ঞানিক ও সাংবাদিক প্রভৃতিরা, রাষ্ট্র ও সমাজ-কর্তৃপক্ষের যাকিংগের উপর প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষে হোক নির্ভরশীল। সৃষ্টির নানা ক্ষেত্রে এঁরা স্বকীয় প্রতিভার স্বাক্ষরও রেখে যান। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যমণি মহাকবি কালিদাসের প্রতিভার কাব্য-জগৎ চির উজ্জ্বল। কিন্তু রাজানুগৃহীত কবি ও সাহিত্যিকের রচনায় বিপ্লবের সুর ধ্বনিত হতে পারে কি? বিপ্লব-চিন্তার ধারক ও বাহকেরা চিরকালই নিগৃহীত, নয় উপেক্ষিত। কিন্তু ওঁদের চিন্তা ও সৃজনী মানুষের মনে যে ভাবালোড়ন জাগিয়ে তোলে তারই পরিণামে আসে বিপ্লব, তারই ফলশ্রুতি নূতন সমাজ ও নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থা। সাধারণ মানুষের চাইতে বুদ্ধিজীবীরা অধিক ক্ষিপ্রচেতা ও অনুভূতিপ্রবণ। জাতীয় জীবনের হীনতা, দীনতা, সামাজিক অন্যায় ও অসাম্য এবং মানুষের নীচতা ও নির্মমতায় এঁরা সবচেয়ে বিচলিত হন। এঁদের প্রতিক্রিয়া হয়ে উঠে মুখর ও দুর্বার। সাধারণ মানুষ স্বভাবতঃ গতানুগতিকতাকেই মেনে নিতে অভ্যস্ত। মনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষকে প্রকাশ করার ক্ষমতাও তাদের কম। জনতার মৌন অসন্তোষ ও বিক্ষোভ বাণীর রূপ নিয়ে উঠে কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠে অথবা লেখনীর মুখে।

ষাট পুরুষের স্বেচ্ছাচারী বুরবো (Bourbon) রাজবংশের সমূল উচ্ছেদ ঘটেছিল ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে। সে ঐতিহাসিক রাষ্ট্রবিপ্লবের ফল হয়েছিল যুগান্তরকারী—সারা পাশ্চাত্য জগতের রাজনৈতিক চেহারা বদলে গিয়েছিল। আর এ-বিপ্লবের পশ্চাদ্‌ভূমি রচনা করেছিলেন ফরাসী এনসাইক্লোপিডিস্ট, ভলটেয়ার, ভিক্টোরট এবং রুশো প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌গণ। এঁদের সুতীব্র লেখনী গণবিক্ষোভকে খরতর ক'রে তুলেছিল। মানুষের চিত্তপটে যে আলোড়ন ঘটে বিপ্লব তারই বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভাবগত পৃষ্ঠপট রচনা করেছিলেন তথাকথিত কেল্টিক পুনরুজ্জীবন (Celtic Revival) আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ—যাঁদের অগ্রণী ছিলেন ইয়েটস্, ও-নীল ও জর্জ রাসেল প্রমুখ কবি ও নাট্যকারগণ। এ শতকের রুশ গণবিপ্লবের বীজ বপন করেছিলেন উনিশ শতকের বিখ্যাত সাহিত্য-স্রষ্টা লিও টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কী, টুর্গেনিভ ও প্রিন্স ক্রোপট্‌কিন এবং পরবর্তী কালে এ বিপ্লবের ব্যাখ্যাতা হিসেবে ম্যাক্সিম্ গোর্কী, আলেক্সি টলস্টয়, বোরিস প্যাস্টারনাক এবং মিখাইল শোলোকভের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কম্যুনিজমের তত্ত্ববেত্তা কার্ল-মার্ক্স্ ও এঙ্গেলস্, কিন্তু কম্যুনিস্ট বিপ্লবের উদ্গাতা হচ্ছেন রুশ সাহিত্যিক ও দার্শনিকবৃন্দ।

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের বুদ্ধিজীবীদের অবদানের মূল্যায়ন করা হচ্ছে নানাভাবে। সিপাহী বিদ্রোহ ঠিক ঠিক স্বাধীনতা সংগ্রাম কিনা সে বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণে কতকগুলি বিক্ষুব্ধ শ্রেণীর রাজ

ভক্তাউনচ্যাত দিল্লীর নামকাওয়াস্তে বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেতনভুক দেশীয় সিপাহীদের অসন্তোষই একটা অপরিকল্পিত এবং নেতৃত্ববিহীন দাঙ্গাহাঙ্গামার সৃষ্টি করেছিল। কোন ঐক্যের ভিত্তিতে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াস বলে সিপাহী বিদ্রোহকে গণ্য করবার স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া দুষ্কর। এ আন্দোলনের পিছনে তদানীন্তন বুদ্ধিজীবীদের কোন সমর্থন ছিল না বলেই মনে হয়। ভারতের নবজাগরণের যুগে বাংলাদেশ নানা কারণেই ছিল অগ্রণী। সিপাহী বিদ্রোহের সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। এঁরা প্রত্যেকেই নব জাতীয় জীবনের পথিকৃৎ। কিন্তু এঁদের কারুর রচনাতেই সিপাহী-বিদ্রোহ তথা স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রসঙ্গের অবতারণা দেখা যায় না। এমনকি উল্লেখ পর্যন্ত নাই। বঙ্কিমচন্দ্র লেখনী ধারণ করেছিলেন পরে। তাঁর লেখাতেও সিপাহী-বিদ্রোহ স্থান পায় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য পরবর্তী কালে স্বাধীনতা প্রয়াসের প্রধান উদ্গাতা ও অনুপ্রেরণা দাতা। বঙ্কিমচন্দ্র যদি একমাত্র "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত এবং 'আনন্দমঠ' উপন্যাসখানা লিখেই তাঁর লেখনী ক্ষান্ত করতেন তা'হলেও তিনি জাতীয় আন্দোলনের মন্ত্রঋষি বলে অমর হয়ে থাকতেন। বিদেশী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং ইতালীর স্বাধীনতাকামী গ্যারিবল্ডী ও ম্যাট্‌সিনি অনুসৃত বিপ্লব-পন্থা অনুসরণের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী। আরও পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষিগণের চিন্তা ও বাণী জুগিয়েছে স্বাধীনতা আন্দোলনের আগ্রহ ও উদ্দীপনা। দক্ষিণ-ভারতের তামিল কবি সুব্রাহ্মণ্য ভারতী এবং বিখ্যাত শিল্পাচার্য আনন্দকুমার স্বামীও ছিলেন অখণ্ড ভারতীয় জাতিত্ব এবং স্বাধীনতার উপাসক। উনিশ শতকের শেষাংশ থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি অবধি ভারতের চিন্তাবিদ্‌গণ মুক্তি-সংগ্রামের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছেন। অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, বর্তমানের কর্তব্যবোধ এবং ভবিষ্যৎ সংগঠনের চিন্তা ও স্বপ্ন জাগরিত হয়েছে চিন্তাবিদ্‌গণের লেখায় ও কথায়। মহাত্মা গান্ধী অনুসৃত মুক্তি-আন্দোলনেও চিন্তাবিদ্ ও মননশীল মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা ছিল পুরোমাত্রায়।

ভারত-পথিক রামমোহন থেকে শুরু ক'রে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র অবধি যে গৌরবময় চিন্তাধারা অক্ষুণ্ণ চলে এসেছিল, তার ব্যতিক্রম ঘটল স্বাধীনতা লাভের পর। স্বাধীনতা লাভ করার যে আহুতি জনচিত্তকে আলোড়িত ও আন্দোলিত করেছিল স্বাধীনতা পাওয়ার পর তা যেন হঠাৎ ক্ষীণ ও তিমিত হয়ে গেল। দেশ-প্রেমের প্রবাহ অকস্মাৎ পাথিব লোভ ও লাভের মরুপথে তার বেগ হারিয়ে ফেলল। স্বাধীনতা যখন পাওয়াই গেল তখন আর স্বদেশ চিন্তার প্রয়োজন কি? তাই কবি ও সাহিত্যিকগণ আজ সহজ অধোগমনের পথ বেছে নিয়েছেন। নানা ধরণাকৌশলে মানুষের যৌন ক্ষুধা ও বিকৃতি প্রবৃত্তির ইন্ধন যোগানই এখন কবি ও সাহিত্যিকের প্রধান কৃত্য। জনতার স্থূল রুচির প্রশ্রয়দান, এবং সে মাধ্যমে অর্থোপার্জনই সাহিত্যিকগণের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাহিত্যের এবম্বিধ সঙ্কট দুর্ভাবিত করেছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে। ১৩০৩ সনে "শিক্ষার বিকিরণ" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে যা লিখেছিলেন তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল। কথাগুলির তাৎপর্য গভীর ও চিরন্তন।

"আমাদের সাহিত্যে রসেরই প্রাধান্য। সেইজন্যে কোনো অসংযম, কোনো চিত্তবিকার অনুকরণের নানা বেশে এই সাহিত্যে প্রবেশ করে তখন সেটাই একান্ত হয়ে ওঠে, কল্পনাকে তত্ত্ব বিলাসিতার দিকে গাঁজিয়ে তোলে। প্রবল প্রাণশক্তি জাগ্রত না থাকলে দেহের ক্ষুদ্র বিকার কথায় কথায় বিষফোড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। আমাদের দেশে সেই আশঙ্কা। এ নিয়ে দোষ দিলে আমরা নজির দেখাই পাশ্চাত্য সমাজের; বলি, এটাই তো সভ্যতার আধুনিকতম পরিণতি। কিন্তু সেই সঙ্গে সকল দিকে আধুনিক সভ্যতার যে সচিন্ত সচল প্রবল বৃহৎ সমগ্রতা আছে সেটার কথা চাপা রাখি।

• • • পৌরুষহীন নারদের দেবত্ব প্রাপ্ত হবার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের সাহিত্যে সমাজে এই-সমস্ত উপাদানের অভাব বাংলা বড়ো বড়ো চিন্তাকে, বুদ্ধির সাধনাকে আশ্রয় করে গভীর গবেষণার দিকে মনের উৎসুক্য জাগিয়ে রাখতে পারে।

• • • রুচির সম্বন্ধে লোকে বেপরোয়া, কেননা ও-জিনিসে কোনো শাসন নেই। অশিক্ষিত রুচিও রসের সামগ্রী থেকে যা-হোক কোনো একটা আনন্দ পায়। আর সে মনে করে তারই বেশি রসবোধের চরম আদর্শ।"

সাহিত্য আজ চক্ষুলজ্জাহীন অর্থকরী পেশায় পরিণত হয়েছে। সিনেমাকে হৌলতে নিম্নশ্রেণীর লেখক-লেখিকারাও বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিচ্ছেন। আজকালকার পেশাদার লেখকেরা লেখেন অনেক। ফুল ফুল তাদের রচনা। এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয় যে, একই গল্প নাম বদলে দ্বিতীয়বার ছাপা হয়। জনৈক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের সম্বন্ধে অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায় যে, তিনি তাঁর পুরনো বইয়ের নাম পালটিয়ে নূতন বই বলে চালাচ্ছেন। আমাদের শেষ কথা—মানুষের মনে শিক্ষা, সংস্কৃতি, রসজ্ঞান ও রুচি বিছিয়ে দেবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সাহিত্য। আমাদের এ বক্তব্যটির সমর্থনে বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক ভদ্, এইচ্ লরেন্সের কয়েকটি কথা তাঁরই ভাষায় উদ্ধৃত করি:

"The Poet's, the writer's privilege is to help man endure by lifting his heart by reminding him of his courage, and honour, and hope and pride and compassion, and pity and sacrifice, which have been the glory of his being. Man will not merely endure, he will prevail. He is immortal because he has a soul, a spirit capable of compassion and sacrifice and endurance."

নির্মল, নিষ্কলুষ আনন্দলোক সৃজন, জীবনের মহত্তী অভীপ্সার পরিপূরণ, ও শিব-সত্য-সুন্দরের অনুধ্যানেই সাহিত্য-কৃতির পরম সার্থকতা।

সঙ্কটে সাহিত্য, শুভ কর্মপথেও সাহিত্য। জাতির মুক্তি-পথে সাহিত্যই জুগিয়েছিল শক্তি ও মন্ত্রের পাথেয়। দেশ আজ স্বাধীনতার নাগপাশমুক্ত, কিন্তু আর্থিক দৈন্য, ব্যাপক বুভুক্ষা ও সামাজিক অনগ্রসরতার শত নিগড়ে আবদ্ধ জাতির পুনর্গঠনের যে নানামুখী প্রয়াস চলেছে তাতে সাহিত্যকে নিতে হবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। জনচিত্তের উদ্বোধন হবে সাহিত্যের সঞ্জীবন মন্ত্রে। আজ জাতির প্রধান প্রধান সমস্যা—দুই বিদেশী রাষ্ট্রের বৈরী মনোভাব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণাশঙ্কা, অর্থনৈতিক সঙ্কট, খাদ্য-ঘাটতি, জনস্ফীতি ইত্যাদি। আমাদের স্বাধীনতাই নিরর্থক হয়ে যাবে যদি এ সমস্যাগুলির সুসমাধান খুঁজে না পাওয়া যায়। জনগণের আত্মিক যোগ ও সক্রিয় সহযোগিতাই হচ্ছে একমাত্র উপায় যার সাহায্যে খাদ্য জাতীয় সমস্যারই সমাধান সম্ভব। দেশ সংগঠনের মহাযজ্ঞে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাব্রতী ও চিন্তাবিদ্ সবাইকেই সমিধ সংগ্রহ করতে হবে। সাহিত্যই হবে এ মহাযজ্ঞের বাণী-মন্ত্র।

তেলিয়াগড়ী

॥ শ্রীসরিৎশেখর মজুমদার ॥

পূর্বরেলের লুপ লাইনের একটি বড় ষ্টেশন সাহেবগঞ্জ। তার দক্ষিণে রাজমহল পর্বতমালার বেণী, উত্তরে গঙ্গার আঁচল। পূব থেকে এঁকে বেঁকে পাহাড় চলে গেছে পশ্চিমে। মাইল সাতেক পশ্চিমে একটা জায়গায় এক কালে পাহাড় আর গঙ্গা পরস্পরকে ছুঁয়ে ছিল। পাহাড়টা যেন ধ্যানমৌন শিব, গঙ্গা যেন ছলাৎছল ভাষায় তাঁর চরণে নিবেদন করছেন বন্দনা। পরে কোন সময়ে গঙ্গা গেছেন সরে, পিছিয়ে গেছেন উত্তরে, শিবের ওপর অভিমান করে। আর সেখানে জাগা-জমির ওপর দিয়ে ইংরেজ পেতেছে রেল লাইন। 'ঝক্‌ঝক্' শব্দে দুরন্ত-গতি ট্রেন যখন ছোটে, তখনই একটা দুর্গের ভিৎ তখন কেঁপে কেঁপে ওঠে। সে-দুর্গের নাম তেলিয়াগড়ী। ঐ গোটা অঞ্চলটার নামও এককালে ছিল তেলিয়াগড়ী, সংকীর্ণ গিরিপথ ছিল অঞ্চলটার ঐতিহাসিক গুরুত্বের প্রধান কারণ। আইন-ই-আকবরী, খুলাসৎ-উল-তোয়ারিখ, ওয়াকিয়াৎ-ই-জাহাঙ্গীর প্রভৃতি গ্রন্থে বাংলার যে সীমানা নির্ধারিত করা হয়েছে, তাতে এই 'গড়ী' হলো তার পশ্চিম সীমান্ত। আকবর-নামা, তোয়ারিখ-ই শেরশাহী, আল-বাদাউনি, রিয়াজ-উল-সালতিন প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থে 'গড়ীর' যত বর্ণনা আছে তা পাঠে একটা কথাই বারবার পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে যে গড়ী ছিল বাংলার ভাগ্য-নিয়ন্তা। গড়ী যার দখলে, বাংলা তার করতলগত। গড়ীকে যে হারিয়েছে, বাংলাকে সে হারিয়েছে। ঐতি-হাসিকরা তাই একে বলেছেন Key to Bengal, বাংলার চাবিকাঠি। জাহাঙ্গীর-নামা তেলিয়াগড়ীকে বলেছেন সমাধিক্ষেত্র। তা, সমাধিক্ষেত্রই বটে। কতো রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধিক্ষেত্র এই বিস্তৃত তেলিয়াগড়ীর প্রাঙ্গন।

হিন্দুযুগেও এ-অঞ্চলটার প্রাধান্য ছিল বলে মনে হয়। হিউয়েনসাং ঐ পথে যেতে পাহাড়ের ওপর এক চূড়া দেখছিলেন। হয়তো কোনো বিহার ছিল এটা, যার প্রাঙ্গনে ধ্বনিত হতো বন্দনার, পারমিতা-নীতি ত্রিশরণ ধ্বনির সুললিত ঝঙ্কার। স্থানীয় লোকেরা কাছাকাছি একটা জায়গাকে এখনও 'যোগীগড়' বলে থাকেন। এই 'যোগীগড়' নামটা আমাদের অনুমানকে সমর্থন করে।

প্রায় ন'শো বছর আগে রামপালের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন পীঠীপতি দেবরক্ষিত। রামচরিতে তাঁর উল্লেখ আছে। তখনকার ইতিহাসের কিছু পুনরাবৃত্তি এই সূত্রে প্রয়োজন। বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর বড় ছেলে মহীপাল রাজা বলেন। কুচক্রীদের কুপরামর্শে মহীপাল তাঁর দুই ভাই শূরপাল ও রামপালকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। হয়তো হত্যাও করতেন তাদের, কিন্তু মায়ের বিচক্ষণ বুদ্ধির জন্য পালিয়ে প্রাণে বাঁচলেন তাঁরা। শূর-পাল ও রামপাল মায়ের সঙ্গে এলেন মাতুলালয়ে। মাতুল ছিলেন 'মহন ইতি প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রকূটতিলক'। ওদিকে বরেন্দ্রীতে ঘটে গেল অনন্ত সামন্তচক্রের বিদ্রোহ, মহী-পালের পরাজয় ও মাহিষ্যপরনামা কৈবর্ত্ত দিব্বোক বা দিব্য কর্তৃক বরেন্দ্রীর শাসনভার গ্রহণ। রাষ্ট্রকূটকুল-তিলক মহনদেব উঠে পড়ে লেগে গেলেন জাগিনেয়দের পুনরধিষ্ঠিত করতে। তিনি অঙ্গদেশের অধিকর্তা। অঙ্গ দেশ থেকে অভিযান চালাতে গিয়ে কিন্তু বাধা পেলেন পীঠীপতি দেবরক্ষিতের কাছে। সে বাধা অতিক্রম করার একমাত্র উপায় হিসাবে নিজের মেয়ে শঙ্করদেবীর বিয়ে দিলেন এই দেবরক্ষিতের সঙ্গে। যে-তেলিয়াগড়ীর কথা এই নিবন্ধে বলা হচ্ছে তা একসময়ে এই পীঠীরাজ্য অন্ত-র্ভুক্ত ছিল। দেবরক্ষিত যে-বংশের ছেলে তাকে বলা হতো হিতোরবংশ। সাহিবগঞ্জের সন্নিকটে এখনও একটি গড় আছে যাকে স্থানীয় লোকেরা বলেন শক্র-

গড়। 'গড়ক' শব্দটা 'ছিক্কোর' শব্দ থেকে এসেছে মনে হয়। শুধু তাই নয়, সাহিত্যগঞ্জের আগের যে-স্টেশনটির নাম সকরিগলি, সেটাও 'গড়রীগলি' অথবা 'ছিক্কোর-গলি' থেকে এসেছে, অনুমান।

গড়ীঘাটের অর্থাৎ তেলিয়াগড়ী-ঘাটের গুরুত্ব বোঝাবার জন্য প্রথম উল্লেখ করা যেতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এই শ্লোক :

রাজবন্দী আমি গড়িঘাট যাইতে না পারি
পুণ্য হবে পর্বত আমা দেহ পার করি।

তবে গোসাঞির সঙ্গে চারি পাইক দিলা
রাত্রে রাত্রে বনপথে পর্বত পার কৈলা।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইরূপ। গৌড়ের মুসলমানরাজ হুসেনশার বিশ্বস্ত সচিব ছিলেন রূপ আর সনাতন। রূপ বৃন্দাবনবাসী হলেন। সনাতন সচিব রইলেন। কিন্তু পরে তাঁরও বৈরাগ্য এল, রাজকার্যে অমনোযোগী হলেন। হুসেন শাহ তাঁকে বন্দী করলেন। অবশেষে একদিন রক্ষীদের উৎকোচ দিয়ে সনাতন পালালেন। উদ্দেশ্য বারাণসী যাওয়া। একমাত্র পথ গড়ীঘাট। কিন্তু সেখানে রাজরক্ষীদের তেনদৃষ্টি। কি উপায়? স্থানীয় ভুঁইয়ার শরণাপন্ন হলেন। ভুঁইয়া সঙ্গে দিলেন চারজন পাইক। গভীর রাত্রে পাহাড়ের গায়ে গায়ে ভিন্ন এক অরণ্যসংকুল পথ দিয়ে রাজবন্দী সনাতন পালালেন বারাণসী। এটা হলো ১৫২২ খৃষ্টাব্দের কথা।

পরবর্তী ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয় তেলিয়াগড়ীর গুরুত্বের। হুমায়ুন তখন বাদশাহ। বাংলাদেশ মাহমুদ শা'র হেফাজতে। তারই আত্মীয় মাকদুম আলম করলো বিদ্রোহ। ডেকে আনলো উজবেগ আফগান বীর শেরশাকে। বাংলাকে রক্ষার জন্য তেলিয়াগড়ীতে সৈন্য সমাবেশ করলেন মাহমুদ শা। এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটে গেল সেখানে কিন্তু শেরশা জয়ী হয়ে সদম্ভে বাংলায় প্রবেশ করলেন। হুমায়ুনের কাছে খবর গেল। শেরশা বুঝলেন গড়ীর কি গুরুত্ব। এই গড়ীঘাটে হুমায়ুনকে আটকাবার জন্য তিনি সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন ও সেখানে মোতায়েন করলেন দুই ছেলে জালাল খাঁ ও খাওয়াস্ খাঁকে।

হুমায়ুন পাঠালেন জাহাঙ্গীর বেগ মুঘলকে তেলিয়া-গড়ীর প্রাঙ্গণে আবার এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হলো। তার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীর বেগ আহত হয়ে ফিরে যান। দ্বিতীয় সৈন্যতরঙ্গ গিয়ে আছড়ে পড়লো তেলিয়াগড়ীতে ও শেষ পর্যন্ত হুমায়ুন বিজয়গর্বে প্রবেশ করলেন বাংলায়। শেরশাহ এক নবাবিষ্কৃত পথে পালিয়ে গেলেন।

পরবর্তী ঘটনা আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে। বাংলার শাসক তখন সুলেমান কারবানি। ইনি আকবরের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। দাউদ খাঁ ছিলেন তাঁর কর্মচারী। কিন্তু বাংলার মসনদে তাঁর লোলুপ দৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত সফলও হয়েছিলেন এই আফগান সর্দার। এবং তারপরই আকবরের কর্তৃত্বকে অস্বীকার। উচিৎ শিক্ষা দেবার জন্য আকবর পাঠালেন মুনায়েম খাঁকে। উড়িষ্যার এক বণিক্ রাজা ও বহু আফগান দাউদের পিছনে ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেলিয়াগড়ীর প্রাঙ্গনে সমাধিস্থ হলো দাউদের স্বপ্ন। তাবাকৎ-ই-আকবরীতে এই যুদ্ধের বর্ণনা আছে। 'আকবরনামা' তেও।

দাউদের পরাজয়ের পর মনে হয়েছিল বাংলার অবস্থা শান্ত হয়ে গেল। খান্-জাহান কিছুদিন বাঙলা শাসন করলেন। তারপর এলেন মুজফ্ফর্ খাঁ। আফগান জায়গীরদের অধীনে রাখা হয় হয়ে উঠছিলো সেই সময়। আকবর তা বুঝতেন। তাই বিশেষভাবে নিযুক্ত করলেন খা মনসুরকে। মনসুর ছিলেন বড় কঠোর। তাঁর প্রযুক্ত কঠোর নিয়মবিধির ফলে বাকশাল গোষ্ঠির মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল রোসন বেগের নেতৃত্বে। তাদের পরবর্তী-নেতা বাবা খাঁ হুবেদারের কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করে বসলো। ফলে পরিস্থিতি ঘোরালো হলো। আকবর পাঠালেন দুর্জয় সেনাদল,সেনাপতি তোডরমলের অধীনে। গড়ীঘাটে যুদ্ধ হলো। বাঙলা এসে গেল বাদশাহ আকবরের মুঠোয়। বাকশাল বিদ্রোহের এইখানেই সমাধি।

জাহাঙ্গীরপুত্র শাজাহানের পিতৃদ্রোহীতার কথা সকলেই জানে। সম্রাটের সৈন্যদল তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ালো প্রদেশ থেকে প্রদেশে। শাজাহান বাঙলায় এসে বর্ধমান দখল করে তড়িৎবেগে এগিয়ে গেলেন বাঙলার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর বিরুদ্ধে। ইব্রাহিম তখন প্রস্তুত হচ্ছেন রাজমহলে। তেলিয়াগড়ীতে যুদ্ধ বাঁধলো। শাজাহান-পক্ষে রুস্তম খাঁ ও দরিয়া খাঁ আশ্চর্য বীরত্ব দেখিয়েছিল। ইব্রাহিম খাঁ গুরুতররূপে আহত হয়ে প্রাণত্যাগ করেছিলেন তেলিয়াগড়ীতে। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বর্ণনা আছে রিয়াজ-উল-সালাতিনে।

শাজাহানের মতো অনুরূপ পিতৃদ্রোহিতা দেখা দিয়েছিল তাঁর সন্তানদের মধ্যে। দারা, সুজা, আওরঙজেব, মুরাদ—সকলের মধ্যে খেয়োখেয়ি। সুজা বনাম আওরঙজেবের যুদ্ধের প্রস্তুতি হচ্ছিল তেলিয়াগড়ীতে। গঙ্গার কিনারা থেকে পাহাড়ের দক্ষিণ কিনারা পর্যন্ত একটা প্রাচীর তুলেছিলেন সুজা। কিন্তু মীর জুমলা সৈন্যসামন্ত নিয়ে অন্য পথে গিয়ে রাজমহলের অপর প্রান্তে লড়াই করলেন ও সুজাকে বিপর্যস্ত করলেন।

এর পরের ঘটনা নবাব সুজাউদ্দীনের কালে। তাঁর সভায় প্রাধান্য লাভ করেন দুই ভাই, হাজি মহম্মদ ও আলিবর্দী খাঁ। বিহার প্রদেশের ভার ন্যস্ত হয়েছিল আলিবর্দীর ওপর ১৭৩৩ সালে। সুজাউদ্দীনের পুত্র সরফরাজ খাঁ যখন গদিতে এলেন তিনি ছুতো খুঁজতে লাগলেন কি করে এই দু'জনের প্রাধান্য খর্ব করা যায়। ওদিক ওরাও তৎপর। ইতিমধ্যে জগৎ শেঠের সঙ্গে একটা ষড়যন্ত্র পাকাপাকি, বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদারী তুলে দেওয়া হবে আলিবর্দীকে। খবরটা ফাঁস হয়ে গেল এবং সরফরাজ ঠিক করলেন ঐ সুবেদারী দেবেন তাঁর জামাই সৈয়দ মহম্মদ হাসানকে। শুধু তাই নয়, আকবরনগরের ফৌজদারী ও তেলিয়াগড়ী ও সকরিগলির কর্তৃত্ব হাজি মহম্মদের জামাই আতাউল্লার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তুলে দেওয়া হবে মীর শরফুদ্দিন বক্সীকে। এইসব ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো যুদ্ধ, তেলিয়াগড়ীর প্রাঙ্গনে। আলিবর্দী জয়ী হলেন। রিয়াজ-উল-সালাতিনে এই যুদ্ধের বর্ণনা আছে।

ব্রিটিশরাও এই গড়ীদ্বারের গুরুত্ব বুঝেছিল। বাংলা বিজয়ের পরিকল্পনাসূত্রে কর্ণেল কট নামক এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী কোম্পানীকে তাঁর গোপন পত্রে লিখেছিলেন, হিন্দুস্থানের সমস্ত শক্তিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে যদি আমরা এই গিরিপথে পাঁচশো সুদক্ষ সৈন্য মোতায়েন রাখি।

দীর্ঘকাল ধরে এই গিরিপথ, এই গড়ীদ্বার কত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কত মিলনাত্মক আর বিয়োগাত্মক নাটক সংঘটিত হতে দেখলো তার মঞ্চে।

এখনও দাঁড়িয়ে আছে সে জরাজীর্ণ অথর্ব দেহ নিয়ে। ভারত সরকারের একটা নোটিশ ছিল একদা, স্থানটি সংরক্ষিত। কেউ যেন কোন ক্ষতিসাধন না করে, কেউ যেন না হাত দেয়।

না, তাঁরা নিজেরাও হাত দেননি। তবুও একদিন তেলিয়াগড়ী যাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে।

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় জন্যই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দ্দেশিত 'সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

'ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদেতানি রূপাণি ব্রহ্মণীত্যবধারয়েৎ ।৪৯'

পুরাণ ও তন্ত্রমতে পার্থিবী নানা প্রকার প্রতিমূর্ত্তি পূজার ব্যবস্থা আছে। সে সকল পূজা করায় পরমাত্মা-ব্রহ্মেরই পূজা করা হয়। কারণ শঙ্করাচার্য্যের মতে পৃথিবী-ভূতও ব্রহ্ম।

পঞ্চবিংশ সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের পঞ্চাশৎ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

'ব্রহ্মৈব সর্ব্বে নামানি রূপাণি বিবিধানি চ।
কর্ম্মাণ্যপি সমগ্রাণি বিভর্ত্তীতি শ্রুতির্জগৌ ॥'

উক্ত গ্রন্থের সকল ভাষ্যকার এবং সকল টীকাকারই উক্ত গ্রন্থেরই পঞ্চাশৎ শ্লোকের এক প্রকার অর্থ করেন নাই। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ঐ শ্লোকের প্রথম চরণের 'ব্রহ্মৈব সর্ব্বে নামানি রূপাণি বিবিধানি চ' অর্থে ব্রহ্মই সর্ব্ব নাম, ব্রহ্মই বিবিধ রূপ স্বীকার করিলে কোন নামকেও অনিত্য অসত্য বলা যায় না, কোন রূপকেও অনিত্য অসত্য বলা যায় না। অদ্বৈতবাদের অনেক শ্রৌত-উপনিষদ্ মতে, অদ্বৈতবাদের বেদান্ত দর্শন মতে, অদ্বৈতবাদের বেদান্তসার মতে, অদ্বৈতবাদের শঙ্করাচার্য্যের নানা গ্রন্থমতে, অদ্বৈত-বাদের অন্যান্য প্রসিদ্ধ মহাত্মাগণের মতে সকল নাম এবং সকল রূপই প্রাকৃত। তাঁহাদের মতে কোন নাম এবং কোন রূপই অপ্রাকৃত নহে। শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের পঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে ব্রহ্মই সমস্ত নাম, ব্রহ্মই বিবিধ রূপ স্বীকার করিলে ব্রহ্মকেও অপ্রাকৃত বলা যায় না। ঐ সকল প্রাকৃতকে ব্রহ্ম বলিতে হইলে ব্রহ্মেরও বিবিধ বিকাশ আছে স্বীকার করা হয়। অদ্বৈত মতের নানা গ্রন্থানুসারে প্রকৃতিরই বিবিধ বিকাশ। সে সকল

এমতে ব্রহ্মকে অপরিবর্ত্তনীয়-নির্ব্বিকার-নিত্য-শুদ্ধ নিরঞ্জন বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে। অথচ শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের পঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে ব্রহ্মকে ঐ সকল বলা যায় না। শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতির উক্ত শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে—

ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব তবস্ত্বীত্যবধারয়েৎ॥ ৪৯

সেইজন্যই 'ব্রহ্মৈব সর্ব্ব নামানি রূপানি বিবিধানি চ' বলিলে ব্রহ্মই সর্ব্ব নাম ও ব্রহ্মই বিবিধ রূপ বুঝিবার পক্ষেও কোন বাধা হয় না। কারণ, কথিত পঞ্চাশৎ শ্লোকের পূর্ব্ব শ্লোকানুসারে বুঝিতে হয় পরমাত্মা-ব্রহ্ম-জাত সমস্তই ব্রহ্ম। সেই জন্য সমস্ত নাম এবং বিবিধ রূপও ব্রহ্ম বলিলে অসঙ্গত হয় না। কাহার কাহার মতে ঐ পঞ্চাশৎ শ্লোকের পর্য্যালোচনা প্রসঙ্গে বুঝিতে হয়, সর্ব্ব নাম, বিবিধ রূপ এবং সমগ্র কর্ম্মনিচয় শ্রুতিমতে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক ধারিত হইতেছে। সেই জন্যই ব্রহ্মকে সক্রিয় বলিতে হয়। কারণ ধারণ করাও এক প্রকার ক্রিয়া। যিনি ধারণ করেন, তিনি অবশ্যই ক্রিয়াবান। নানা শাস্ত্রানুসারে ক্রিয়াবান যিনি, তিনি সগুণ। ব্রহ্মও ক্রিয়াবান প্রমাণিত হইয়াছেন বলিয়া ব্রহ্মকেও অবশ্যই সগুণ বলিতে হয়। ব্রহ্ম ক্রিয়াবান ও সগুণ প্রমাণিত হইয়াছেন বলিয়া স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি মতে ব্রহ্মকে সাকারও বলা যাইতে পারে। কারণ সকলেই আকার অবলম্বনে ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কারণ সকলেই আকার অবলম্বনে ক্রিয়া সম্পাদন করিতে দেখিয়া থাকেন। প্রমাণ করা হইয়াছে ব্রহ্মও সক্রিয়। সেইজন্য তিনিও আকারবিশিষ্ট বা সাকারও অবধারণ করা যায়। শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম আকার বিশিষ্ট বা সাকার অবধারিত হইলে স্মৃতি পুরাণ এবং তন্ত্রের সহিত অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের পঞ্চাশৎ শ্লোকের কোন বিরোধই থাকে না। শঙ্করাচার্য্যের উক্ত শ্লোকানুসারে ব্রহ্ম সাকার স্বীকার করিতে হইলে শঙ্করাচার্য্যকেও সাকারবাদী বলিতে হয়। শঙ্করাচার্য্যের সাকারবাদের অনেক গ্রন্থে অনেক প্রমাণও পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত অনেক স্তোত্রেও তাঁহার সাকারবাদের প্রমাণ আছে। শঙ্কর-দিগ্বিজয়ম্ নামক গ্রন্থানুসারে চণ্ডালরূপী ভগবান বিশ্বেশ্বর দেব নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলে সেই মূর্ত্তি-বিশিষ্ট বা আকার-বিশিষ্ট সাকার বিশ্বেশ্বর শিবের শঙ্করাচার্য্য দ্বৈতবাদ-সূচক ভক্তিরসপূর্ণিত দিব্যভাবে স্তব করিয়াছিলেন। সে স্তবও তাঁহার দ্বৈতবাদের, সে স্তবও তাঁহার সাকারবাদের, সে স্তবও তাঁহার ভক্তি ভাবের প্রমাণ করে। শঙ্করাচার্য্যের দ্বৈতবাদের, শঙ্করাচার্য্যের সাকারবাদের ও শঙ্করাচার্য্যের ভক্তিভাবের অনেক প্রমাণ তাঁহার নিজ রচিত অনেক গ্রন্থেই আছে। সে বিষয়ে তাঁহার আনন্দ-লহরী নামক গ্রন্থেই বিশেষ প্রমাণ করে। শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের একপঞ্চাশৎ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

'সুবর্ণাজ্জায়মানস্য সুবর্ণত্বঞ্চ শাশ্বতম্।
ব্রহ্মণো জায়মানস্য ব্রহ্মত্বঞ্চ তথা ভবেৎ'।

সেইজন্য সিদ্ধান্তদর্শনের নানা সিদ্ধান্তে ব্রহ্মকে নানা প্রকার প্রমাণ করায় জন্য শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে কোন আপত্তি হইতে পারে না। কারণ উক্ত একপঞ্চাশৎ শ্লোকের তাৎপর্য্য—যেমন স্বর্ণ-সম্ভূত বস্তুর নিত্য স্বর্ণত্ব, তদ্রূপ ব্রহ্ম-সম্ভূত যাহা, তাহার নিত্য ব্রহ্মত্ব। শঙ্করাচার্য্যের অনেক গ্রন্থের অনেক শ্লোকানুসারেই ব্রহ্মসম্ভূতই সমস্ত। সুতরাং সেইজন্য স্বয়ং ব্রহ্মই সমস্ত। ঐ বিষয়ে শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে 'সর্ব্বই খল্বিদং ব্রহ্ম'। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,

'ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব তবস্ত্বীত্যবধারয়েৎ॥ ৪৯

অসীমন্তিনী

[একাঙ্কিকা]

॥ নাট্যকার মন্মথ রায় ॥

[বর্ষীয়সী ধনী ব্রাহ্মণ—বিধবা চিন্ময়ী দেবীর বালীগঞ্জস্থিত সুরম্য বাসভবন "নারায়ণী"। রাত্রি প্রায় দশটা, চিন্ময়ী দেবী এবং তাঁহার সুহৃত্ত্বাবধায়ক রসলাল মুখার্জী আলোচনারত।]

রসলাল। এইবার তবে, কর্ত্তার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্রের খসড়াটা আপনি শুরুন মা। কালই এটা প্রেসে ছাপতে দিতে হবে, আর সময় নেই।

চিন্ময়ী। শোনাও বাবা।

রসলাল। (পাঠ) "বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন মেতৎ—আগামী ১০ই আশ্বিন রবিবার আমার স্বর্গীয় দেবতা ৺নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ আমাদের বালিগঞ্জস্থিত বাসভবন 'নারায়ণী' তে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে সায়াহ্নে গীতাপাঠ এবং সংকীর্ত্তন হইবে। অপরাহ্ণ হইতে দরিদ্রনারায়ণ সেবার আয়োজন থাকিবে, আপনি সবান্ধবে শ্রাদ্ধবাসরে যোগদান করিলে বাধিত হইব। নিবেদন ইতি,

বিনীতা

শ্রীমতী চিন্ময়ী দেবী

চিন্ময়ী। ঠিক আছে বাবা রসলাল। তবে ঐ 'বাধিত হইব' না লিখে 'ধন্য হইব' লেখ। কর্ত্তা তাই লিখতেন।

রসলাল। যে আজ্ঞে মা। (অবাকদন) আর সব ঠিকই আছে কেমন মা?

চিন্ময়ী। হ্যাঁ বাবা, মোটামুটি ঠিকই আছে। খাওয়া-দাওয়ার ফর্দ্দ ও গুলো আমি সাবিত্রীকে ডেকে করিয়ে নিচ্ছি।

রসলাল। তাহলে আমিও যা বসি?

চিন্ময়ী। না, বাবা, তোমার আর বসতে হবে না। সাবিত্রী ও সব একাই পারবে। দেখছি তো, খুব কাজের মেয়ে আমার সাবিত্রী।

রসলাল। 'তা যা' বলেছেন, মেয়ের মধ্যে একটু 'বাড়াল'।

চিন্ময়ী। তা' হোক, এই ক' মাসেই কথায় বাড়াল টানটা গেছে। কাজকর্মে আমাদের সবাইকে খুব খুশী করেছে। আমার আনন্দ যে একজন দুঃখী বিধবা ভাইঝিকে আশ্রয় দিতে পেরেছি। তুমি বলেছিলে বাবা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ভালো লোক পাওয়া যায় না। গেছে তো?

রসলাল। 'একটি বৃহৎ সংসারের রন্ধনাগারের তত্ত্বাবধানের জন্যে একজন বিধবা ব্রাহ্মণ মহিলা চাই'—শুধু এইটুকু বিজ্ঞাপন দিলে সাবিত্রীকে আপনি পেতেন না মা। ঐ বিজ্ঞাপনে 'কর্মঠা সুরুচিসম্পন্না যুবতী হওয়া চাই' এই কথাগুলো আমি জুড়ে দিয়েছিলাম বলে আপনি অমন কর্মিষ্ঠকর্মা মেয়েটি পেয়েছেন, আর তা ছাড়া মোটা বেতন আর নিখরচায় খাওয়া পরার ব্যবস্থা যেখানে রয়েছে সেখানে ভালো লোক কেন পাবেন না মা!

চিন্ময়ী। এই যে আছিস—সাবিত্রীকে ডেকে দে, আচ্ছা তুমি তবে এস বাবা।

রসলাল। আর তো আমার কোনো কাজ টাজ নেই মা? মনে করে দেখুন।

চিন্ময়ী। কিছু তো মনে পড়ছে না এখন, তা' তুমি থাকিস যদে আছো তো কিছুক্ষণ থাকছ—যদি দরকার হয় ডাকব।

রূপলাল। (হাত ঘড়ি দেখিয়া) রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেল। রাত দশটা পর্যন্ত তো আছিই, তারপরেও হয়ত আমাকে থাকতে হবে আজ,

(সুদর্শনা সাবিত্রীর প্রবেশ, রূপলাল প্রস্থান কালে তাহাকে একবার আড়চোখে দেখিয়া গেল)

সাবিত্রী। আমাকে ডেকেছেন মা ?

চিন্ময়ী। হ্যাঁ মা সাবিত্রী, ডেকেছি। আসছে রবিবার এ বাড়ির সবচেয়ে পবিত্র অনুষ্ঠানটি হবে।

সাবিত্রী। জানি মা, বার্ষিক শ্রাদ্ধ।

চিন্ময়ী। না মা, এতে সব কথা বলা হল না। লোকে বলে শ্রাদ্ধ, কিন্তু আমি বলি পূজা। মেয়েদের সবচেয়ে বড় দেবতা স্বামী। তার উপর, আমার স্বামীর নামও ছিল নারায়ণ।

সাবিত্রী। জানি মা।

চিন্ময়ী। আমার কাছে তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণই ছিলেন মা, যেমন ছিল রূপ, তেমনি ছিল গুণ। আমি আমার সেই নারায়ণ হারিয়ে কি করে যে বেঁচে আছি, ভেবে পাই না মা। ছেলেপুলে নেই, সে দুঃখ করি না সাবিত্রী—

সাবিত্রী। কিন্তু আমাদের দুঃখ হয়, এত বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করবে কে মা !

চিন্ময়ী। কারা ভোগ করবে তার নির্দেশ অন্তিম কালে তিনিই দিয়ে গেছেন সাবিত্রী। তাঁর সেই কথাগুলো এখনও কানে বাজছে।

(চোখ বুজিয়া কথাগুলি যেন শুনিতে লাগিলেন)

সাবিত্রী। কি বলেছিলেন মা ?

চিন্ময়ী। (যেন তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিল। বলিলেন) সবই নারায়ণের ইচ্ছা চিন্ময়ী, তুমি যে আজ বিধবা হ'লে এও তাঁরই ইচ্ছা। বিধবাই বিধবার দুঃখ বুঝবে, অনাথ বিধবাদের দুঃখ তুমি দূর করো চিন্ময়ী। আর ছেলে-মেয়ে নেই—এ কোন দুঃখ নয়। দেশে অনাথ আতুরের অভাব নেই—তারাই তোমার ছেলে মেয়ে।

সাবিত্রী। আপনার জীবনে কথাটা খুবই সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে মা।

চিন্ময়ী। তা' হয়েছে কিনা জানিনা, তবে এটা ঠিক আমার এত বড় সংসারের ভার নেবার জন্যে আমি কোন সধবা মেয়ে চাইনি—চেয়েছিলাম একটি বিধবা। তুমি বিধবা বলেই মা, বিধবার দুঃখ এত বোঝ। বোঝ আমারও দুঃখ, জীবনে দুঃখ না পেলে দুঃখীর ব্যথা কেউ বোঝে না—এ আমি দেখেছি।

সাবিত্রী। আমাকে আপনি কেন ডেকেছেন মা ?

চিন্ময়ী। ও, হ্যাঁ, রবিবারের খাওয়া দাওয়ার ভারটা তুমি নেবে কেন মা।

সাবিত্রী। কিন্তু তার আগে আপনার কাছে আমার কিছু আবেদন করবার আছে। আপনি না ডাকলেও আমাকে এই জন্যেই আসতে হ'ত আজ।

চিন্ময়ী। কি কথা ! বল মা বল।

সাবিত্রী। আমি আপনার কাছে বিদায় চাইছি মা।

চিন্ময়ী। সে কি ! সে কি সাবিত্রী !

সাবিত্রী। হ্যাঁ মা, এখান থেকে বিদায় নিলে বড় বেশী দুঃখে পড়তে হবে আমি জানি, তবু আমি বিদায় না চেয়ে পারছি না।

চিন্ময়ী। আশ্চর্য ! কি হয়েছে সাবিত্রী ! আমাকে খুলে বল মা !

সাবিত্রী। সে কথা বলতে মুখে বাধে।

চিন্ময়ী। কেউ কি তোমাকে অপমান করেছে সাবিত্রী ? না—না চুপ করে থেকো না, উত্তর দাও মা।

সাবিত্রী। উত্তর দিলে আপনি মনে বড় আঘাত পাবেন মা।

চিন্ময়ী। কিন্তু তুমি চলে গেলে যে আঘাত আমি পাব, কোন আঘাতই তার চেয়ে বেশী হতে পারে না।

সাবিত্রী। বল, কে তোমায় অপমান করেছে—কি অপমান ?

সাবিত্রী। ঐ রূপলাল বাবু—

চিন্ময়ী। ও, মোক্ষদা আমাকে একটা আভাস দিয়েছিল বটে একদিন। কথাটা বিশ্বাস করিনি, উল্টে মোক্ষদাকেই দিয়েছিলাম ধমক। এখন বুঝেছি,

যোক্ষদা তবে মিথ্যা বলেনি! কে আছিস? রূপলালকে ডেকে দে, স্বামীর সম্পত্তি নিয়ে বেঁচে থাকে বিধবা, তার সেই স্থান, সেই পুজোয় বাধা দেয় যে দুশ্চরিত্র লোক, তাকে আমি কখনও ক্ষমা করতে পারি না—কখন না। সে হয়ত এসে বলবে তোমার কথা মিথ্যা, কিন্তু আমি জানি, মেয়েদের অসম্মানের কথা মেয়েরা যখন নিজ মুখে বলে তখন তাদের মাথা কাটা যায়—তাই সত্য না হ'লে মেয়েরা কখনো অসম্মানের কথা নিজ মুখে বলে না।

(সাবিত্রী চোখে আঁচল দিয়া নীরবে কাঁদিতেছিল। রূপলাল আসিয়া দাঁড়াইল)

রূপলাল। আমাকে স্মরণ করেছেন মা!

চিন্ময়ী। তোমাকে আমি বিদায় দিচ্ছি রূপলাল—আজই, এখনই তুমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, তোমার যা পাওনা, আমি হিসেব করে কালই তোমাকে পাঠিয়ে দেব তোমার বাড়ি।

রূপলাল। আপনি আমার উপর এত নির্দয় হয়েছেন কেন, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না মা!

চিন্ময়ী। ঐ সাবিত্রীর চোখের জল দেখেও কি বুঝতে পারছ না রূপলাল?

রূপলাল। বুঝলাম। সাবিত্রী তবে আমার নামে আপনার কাছে নালিশ করেছে, হয় ত বলেছে আমি তাকে অপমান করেছি।

চিন্ময়ী। তুমি সাবিত্রীর আঁচল ধরে টেনেছ—গায়ে হাত দিতে গেছ—যোক্ষদা নিজে দেখে আমাকে বলেছে, সেদিন আমি বিশ্বাস করিনি। বলেছিলাম এ কথা কখনই সত্য নয়, এ সব সইবার মেয়ে সাবিত্রী নয়—এ যদি এতটুকু সত্য হত, ঐ সাবিত্রী এসে নিজের মুখে আমাকে তা বলতো, আজ সে তা বলছে।

রূপলাল। হাঁ, আজ বলবারই কথা, আপনি যাকে মনে করছেন সতী সাধ্বী সাবিত্রী, আমি তাকে বলি কুলটা।

চিন্ময়ী। (রাগে চিৎকার করিয়া) রূপলাল, মুখ সামলে কথা বলবে আমার সামনে।

রূপলাল। ভুলটা বলেই আমি তাকে মাঝে মাঝে শাসন করতাম। ফল হ'ল তার আজ এই! কিন্তু সত্য চাপা থাকে না মা। সত্যকে ঢাকবার সাধ্য নেই ঐ কুলটার।

চিন্ময়ী। (ভীষণ উত্তেজনায়) বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও এখনি এখান থেকে—

রূপলাল। যাচ্ছি মা, যাচ্ছি। (পকেট হইতে একখানি খোলা খাম বাহির করিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি চিঠি বাহির করিয়া) আমাকে দেখতেই তার পেয়ে আঁচলে বাঁধতে দেখি নামধামহীন এই পত্রটা, আর সে পত্রটা হচ্ছে এই:

'আসছে বৃহস্পতিবার ঠিক রাত সাড়ে দশটায় আমি তোমাদের বাগানে খিড়কির দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকব। তুমি এস।' আজ সেই বৃহস্পতিবার, সাড়ে দশটাও বেজেছে, এই মুহূর্তটির অপেক্ষাতেই আমি বসেছিলাম আফিসে। আপনার এখানে ইনি আটক বলে যেতে পারেননি অভিসারে। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই, (সাবিত্রীকে) আপনার লোকটিকে এখানে ধরে আনবার জন্য দারোয়ানকে হুকুম দিয়ে তবেই আমি এখানে এসেছি, সাবিত্রী দেবী, (বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া) হাঁ ঐ বোধ হয় তিনি এসেও গেলেন!

নেপথ্যে দারোয়ান। হুজুর, ও আদমি আয়া।

রূপলাল। ভেজ দেও।

(একটি রুগ্ন লোক, তাহোধিক একটি রুগ্ন শিশু সন্তানসহ কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল। ভীত, সন্ত্রস্ত তাহাদের দৃষ্টি)

চিন্ময়ী। এটা তোমাদের সাজানো ব্যাপার রূপলাল, এ চক্রান্তে আমি ভুলব না। (সাবিত্রীকে) এ লোকটিকে তুমি চেনো সাবিত্রী? (কঠোর কণ্ঠে) না না, চুপ করে থেকো না—উত্তর দাও।

(এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। সাবিত্রী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে রুগ্ন শিশুটি 'মা মা' বলিয়া সাবিত্রীকে আসিয়া জড়াইয়া ধরিল, সাবিত্রী তাহাকে বুকে

চাপিয়া ধরিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল)

চিন্ময়ী। বুঝলাম, ও তোমার ছেলে! কিন্তু ও লোকটি?

(সাবিত্রী নীরবে কাঁদিতে লাগিল—কোন উত্তর দিতে পারিল না।)

শিশু। (লোকটিকে) বাবা, মা কাঁদছে কেন?

চিন্ময়ী। (বিস্ময়ে) সাবিত্রী! তবে তুমি কি—

সাবিত্রী। না মা। আমি বিধবা নই, যাতে বিধবা না হই, রুগ্ন বেকার স্বামীকে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি, কোলের এই শিশুটিকে চিকিৎসা করে আরও কিছুদিন যাতে ধরে রাখতে পারি, তাই—তাই আমার এই সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলে বিধবা সাজে আপনার পায়ে এসে পড়েছিলাম মা!

(ক্ষণিক নিঃস্তব্ধতা)

চিন্ময়ী। যত মিথ্যাই তুমি বলো, তোমার সাবিত্রী নাম মিথ্যা হয় নি মা! আজ থেকে তোমরা সবাই আমার কাছে থাকবে। (রূপলালকে) কিন্তু তোমাকে যেতে হবে রূপলাল। (রূপলাল মাথা হেঁট করিল)

রূপলাল। এরপর আমার আর থাকা চলে না জানি। যাচ্ছি। (সাবিত্রীকে) বড়ই অপরাধী মনে হচ্ছে তোমার কাছে, আমাকে পার তো ক্ষমা কর সাবিত্রী।

চিন্ময়ী। ক্ষমা যখন নিজ থেকেই চেয়েছ, পাপমুক্ত হয়েছ তুমি। যাও, ঘরে যাও—কাজগুলো সেরে ফেল।

(কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চিন্ময়ী ও সাবিত্রীকে তাকাইয়া দেখিয়া চলিয়া গেল।)

চিন্ময়ী। কিন্তু সাবিত্রী, তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারছি না—যতক্ষণ না সিঁথিতে সিঁদুর পরছ তুমি—

(সাবিত্রী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, চিন্ময়ীকে প্রণাম করিয়া ছেলেটিকে বুকে নিয়া চলিয়া গেল।)

চিন্ময়ী। (লোকটিকে) তুমি বলো বাবা।

লোকটি। আমি সবটা বুঝতে না পারলেও এটা বুঝেছি আপনার দয়ার শরীর। আপনি মা—জননী।

(চিন্ময়ীকে প্রণাম করিতে গেল)

চিন্ময়ী। আহা—থাক বাবা থাক।

চলমান জগৎ

(ওইলকক্সের 'The World' কবিতার অনুবাদ)

॥ শ্রীজগদানন্দ বাজপায়ী ॥

পুণ্য চলে লঘু পদে নিঃশব্দ চরণে,
পাপ পদভরে ঘন কাঁপে বসুন্ধরা,
উদ্যত সে চরণের রুদ্র আস্ফালনে
ভাবি মোরা, পৃথ্বি বুঝি শুধু পাপে ভরা।

ধ্রুব পদে ধরা যথা সূর্য্য পরিক্রমে,
তপনের উদয়াস্ত সুনিশ্চিত যথা,
পাপে আর পুণ্যে তথা ন্যায়ে আর ভ্রমে
চলেছে প্রগতি পথে বিশ্বমানবতা।

ভ্রান্ত এ ধারণা, পুণ্য শান্ত পদক্ষেপে
নীরবে কর্ত্তব্য নিজ সাধে সযোপনে,
জাগাইয়া প্রতিধ্বনি সারা বিশ্ব ব্যেপে
আপনার কীর্ত্তি কথা পাপ উচ্চে ভণে।

তুচ্ছ করি অসত্যের উচ্চ কোলাহল
সত্যের অভয় শঙ্খে উঠিছে নির্ঘোষি,
দীপান্বিত বর্ত্তমান আনন্দ উজ্জ্বল
আলোকিয়া অতীতের অন্ধ তমো মসী।

—একবার ঘুরে আসি—

॥ শ্রীদ্বারিকানাথ শেঠ ॥

টম্ (Tom) একজন পুরাতন আমেরিকাবাসী। কয়েকশত বছর আগে টমের পূর্ব্বপুরুষেরা ইংলণ্ড ছেড়ে এদেশে বসবাস করার বাসনা নিয়ে এসেছিল। এই টম লোকটির সহিত আমার আলাপ হয়েছিল একটা shopping centre এর সহযোগিতায়। আমার ইংরাজী বলার ভঙ্গিতে হঠাৎ দৃষ্টি ফেরাল এবং জিজ্ঞেস করলো কোন্ দেশ থেকে আমি এখানে এসেছি। তারপর সে নিজের পরিচয় দিতে সুরু করলো। সে একজন বিচক্ষণ ইঞ্জিনিয়ার—Massachusetts Institute of Technology বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং উপস্থিত NASA-তে চাকুরী করে আসছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হিরিকে তাকেও পৃথিবীর বহুস্থানে ঘুরতে হয়েছিল, তারই ফলে ভারতবর্ষে কয়েকদিনের জন্য থাকবার ও দেখবার সুযোগ তার হয়েছিল। তাছাড়া Korea যুদ্ধেতে সে Air Force Division এর একজন কর্ণধার পদে ছিল।

যেহেতু আমি একজন ভারতবাসী ও এদেশে কয়েকমাসের বাসিন্দা সেই জন্য সে আমার সহিত বন্ধুত্ব বজায় রাখার জন্য তার বাড়ীর ঠিকানা জানিয়ে রাখলো। এই সুযোগে আমি আমার বাড়ীর ঠিকানা জানিয়ে চায়ের নিমন্ত্রণে আসতে অনুরোধ করলাম। এই রকমভাবে আমাদের যাতায়াত সুরু হতে চললো এবং আমাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠতে লাগলো। একদিন সে আমাকে NASA পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানাল—আমি সুখী মনে তা গ্রহণ করলাম। New Orleans শহরের এক প্রান্তে Michoud নামক একটী স্থানে space flight center গড়ে উঠেছে—National Aeronautical and Space Administration নামে পরিচিত—সংক্ষেপে নামকরণ হয়েছে NASA। একটী বিরাট বাড়ী ৩৩ একর জমির উপর স্থাপিত এবং সমস্ত বাড়ীটাই air-conditioned করা আছে। বলা বাহুল্য যে এইস্থানে Chryster and Boeing Co মিলিতভাবে উত্তরে চন্দ্রলোকে অবতীর্ণ হবার ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদের পরামর্শ অনুসারে space craft তৈরিতে মনোনিবেশ করেছে। ভরসা রাখে যে তারা শীঘ্রই চন্দ্রলোকে পৌঁছাতে পারবে এবং সেখানকার যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান অর্জ্জনে গবেষণায় আসতে হতাশ হবে না। Space craft কারখানার পরিদর্শনে আমার মানসিক ক্ষুধা আরো বেড়ে উঠলো। একটী আন্তরিক শ্রদ্ধা জেগে উঠলো এই আমেরিকার কৃতিত্ব পূর্ণ বৈজ্ঞানিকদের উপর। সেদিনকার মতন টমকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে এলাম।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে টম্ একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী কেবল নয় তার কারিগরী বিদ্যা ও জ্ঞান, বিশেষত space-craft বিষয়ে, অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রেখেছে। আমরা একদিন রাত্রির ভোজনের আয়োজন করেছি এবং সেইখানেই নানাপ্রকার আলোচনা টমের সাথে সুরু হলো—space craft তৈরির পদ্ধতি থেকে ভূমণ্ডলের চারিধারের আবহাওয়ার সম্বন্ধে গল্পগুজব বেশ জমাট হয়ে উঠলো। আমার আলোচনার আগ্রহে ও কৌতূহলে ভূমণ্ডলের চারিধার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করলো টম।

তারপরই space-flight এর ব্যবস্থা হলো। নির্দ্দেশমত আমি টমের অফিসেতে গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং উভয়েই launching pad এর দিকে এগুতে লাগলাম। গন্তব্য স্থানে আসামাত্রই আমাদের পোষাক ছেড়ে space suit পরিধান করতে হলো। এই space-suit astronaut মাত্রই ব্যবহার করে থাকে। টম জানিয়ে রাখলো যে space suit এমন ভাবে তৈরি যে শরীরের শিরা

উপশিরাগুলি স্বাভাবিকভাবে ও নিজস্ব শক্তিতে আয়তে থাকবে আর blood pressure-এর কোন প্রকার অসুবিধা হতে দেবে না; আবার যদি capsule-এর pressure কমের দিকে বা হালকা হয়ে পড়ে এই space suit তা সামলাতে পারবে এবং শরীরের কোন প্রকার গোলমালের পথে আসতে দেবে না। বুঝলে ত? আচ্ছা, তাহলে Ground Engineer-কে স্মরণে রাখতে বলি যে এটা আমাদের প্রথম যাত্রা—আমরা ১০০ মাইলের মধ্যে orbit এর চারিধারে থাকতে চাই। Ground Engineer capsule-এর ভেতরে ঢুকে পড়বার আদেশ দিয়েছে এবং মেজর সাহেব এখুনি এসে পড়বে ও capsule-এর ভেতরের কলকব্জার নিশানা-গুলি ও বিবরণী সে নিজেই তোমাকে পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেবে, যেমন, pressure ও oxygen যন্ত্রপাতি কিভাবে চালু থাকবে ও অন্য যাবতীয় কলকব্জার কার্য্য কৌশলের ব্যাপারগুলি কিভাবে আয়ত্তে রাখা যাবে। আর একটা কথা বলে রাখি—আমাদের space-craftটা দুভাগে বিভক্ত করা আছে। আকাশের পথে উঠার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছুটা শব্দ সৃষ্টি হতে থাকবে ও কাঁপুনি সুরু হতে থাকবে—ভয় পেয়ো না যেন। এই কার্য্য কলাপের অবস্থা কয়েক মিনিটির জন্য ফুটে উঠবে যতক্ষণ প্রথম স্তরে rocketটা দ্বিতীয় স্তরের rocket থেকে ছাড়াছাড়ি হতে সময় লাগবে। ছাড়াছাড়ি হওয়ামাত্রই আমরা সোজাসুজিভাবে orbit-এর পথে এগুতে থাকবো, গোলমাল আর পাওয়া যাবে না; কিন্তু জেনে রেখো space craftটা তখন তীব্র গতিতে ছুটতে থাকবে, যথা ১৭,৫০০ মাইল প্রতি ঘণ্টার হিসাবে।

এখন বেশ পরিষ্কার বুঝে নিয়েছ সব, নয় কি? আপাতত air conditioning যন্ত্রটা ঠিকই চলছে। এবার তাহলে যন্ত্রপাতির ও কলকব্জার বিভিন্ন ব্যবস্থার আয়ত্তের মধ্যে রাখবার চেষ্টায় থাক। আচ্ছা, দেখতে পেয়েছ, তোমার ডান কব্জইএর কাছে একটা হাতল (handle) আছে, সেটা হচ্ছে three axis hand controller; এই যন্ত্রটার সাহায্যে rocket টি নানাদিকে চালান যাবে, যথা, controllerটিকে বাঁদিকে বা ডানদিকে চললে rocketটা ঘুরতে থাকবে। আবার যদি সামনের দিকে এগিয়ে রাখ তাহলে সোজাসুজি চলতে থাকবে। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ কি? Head controller-এর উপরে একটা ছোট বোতাম আছে, তার তাৎপর্য্য কি জান? বলি শোন: তুমি যদি বোতামটিকে নীচের দিকে ঠেলে নিয়ে চেপে রাখ, তাহলে Ground Engineer-এর সহিত কথা বলতে পারবে, আবার যদি আলগা করে রাখ তাঁর কথাবার্ত্তা শুনতে পাবে যাহোক, আর একটা কথা বলে রাখি—এই board-এ অনেক রকমের যন্ত্রের নিশানা দেওয়া আছে। এর জন্য চিন্তিত হবার কারণ নেই যেহেতু এই যন্ত্রগুলির কার্য্যকলাপ ও আয়ত্তে আনার প্রয়োজনীয়তা তোমার নিজের উপর নির্ভর করছে না; যখন যা করবার প্রয়োজন হবে সমস্ত নির্দ্দেশ তুমি Ground Engineer-এর কাছ থেকে পেতে থাকবে। জান ত সমস্ত ব্যাপারগুলি আপনা-আপনি সহজভাবে কাজ করে থাকে অর্থাৎ যাকে বলে automation। তুমি একেবারে সহজ ভাবে বসে থাকবে আর যুদ্ধ যা আসতে থাকবে তা মনের সুখে উপভোগ করবে।

আশা করি তোমার এখন সব বিবরণীর নিশানাগুলি আর অজানা নেই। তাহলে বেশ সরল মনে বসে থাকতে পার কিন্তু তোমার কান চোখ প্রভৃতিকে বেশ সজাগ করে রেখো। তবে একটা কথা মনে রেখো যে ছোট বোতামটাকে চেপে থাকলে কথা বলা যাবে আর আলগা করলে কথা শোনা যাবে। আমরা যে এখন প্রস্তুত হয়েছি তা জানবার সঙ্গে সঙ্গে space craft টী ছাড়বার হুকুম গেল। হাঁ, শুনতে আরম্ভ কর—পাঁচ সেকেণ্ড…চার সেকেণ্ড…তিন সেকেণ্ড…দুই সেকেণ্ড এক সেকেণ্ড—শূন্য বলামাত্রই যাত্রা হলো সুরু, আমরা আকাশের পথে চলেছি, বুঝলে ত?

এখন তুমি কি অনুমান করতে পারছো বেশ একটা ঘূর্ণি শব্দের সৃষ্টি হয়েছে আর তার গুরুত্ব ক্রমশঃ বেড়েই

চলেছে। তুমি শীগ্‌গীর অনুভব করতে থাকবে যে শব্দটা তোমারই পিছনের দিক থেকে উঠছে এবং আস্তে আস্তে মনে জাগতে থাকবে যেন তোমার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি পেঁখে যেতে চলেছে। এর জন্য ভাবনা করো না, শরীরের অবস্থা এরূপ থাকবে না, সহজ হয়ে আসবেই শীগ্‌গীর যখনই অসমভাবের অবস্থা আর শরীরে থাকবে না। আর যে কাঁপুনির কথা গোড়ায় উল্লেখ করেছিলাম বুঝতে কি পেরেছিলে তা যেন তীব্র বেগে সবাসরি মাথার উপর হাতুরী চালিয়ে দিল, নয় কি? দেখ, দেখ, এখন Ground Engineer ঘড়ির speedometer-এর দিকে তাকাতে বলছে—অনুমান কর space-craft-এর গতি কি রকম ভাবে উত্তর উত্তর বেড়েই চলেছে—২৪০০ ফিট্, ৪,০০০ ফিট্, ৬,০০০ ফিট্, ৮,০০০ ফিট্ ১০,০০০ ফিট্, ১২,০০০ ফিট্ প্রতি সেকেণ্ডে। এই পরিস্থিতির আওতায় চোখ, আঙুল ও হাতের বন্ধী পর্যন্ত সহজভাবে কাজে লাগাতে পারবে, কারণ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি একেবারে পেঁখে রয়েছে মনে হ'তে থাকবে এবং তুলতেও বেশ ভারী ওজন লাগবে। এটা আর কিছুই নয়, শরীরের যে একটা ওজন আছে তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকবে যতই আমরা বাস্তব পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির বাহিরের সীমানার দিকে এগুতে থাকবো অর্থাৎ পৃথিবীর যে আকর্ষণ-শক্তি আছে তা আমাদের সর্ব্ব শরীরে কিভাবে বিস্তার করে থাকে তা জানিয়ে দিচ্ছে মাত্র। যাহোক্ কোন প্রকার চিন্তা না করে এখন বেশ আরাম করে বসে থাকবার চেষ্টায় থাক। শুনছ, Ground Engineer বলছে যে space-craftটা সর্ব্বতোভাবে সুন্দর পথে চলেছে। ভূমণ্ডলের চারিধারে অসীম আকাশের পথে তাকিয়ে থাক তীব্র দৃষ্টিতে।

এখন দেখতে পারছো যে দিঁকে নীল আলো তার উজ্জ্বলতা হারাতে চলেছে, বরং দেখতে রং নিতে চলেছে, তারপর গোলাপী, তারপর আরো ঘন রংএ পরিণত হচ্ছে। কি সুন্দর দেখাচ্ছে বল ত? এখন আবার চিকণ নীল রংএ পরিণত হলো। যতই আমরা ভূমণ্ডলের বায়ুমণ্ডলের চারিধার থেকে ঘুরে যেতে চলেছি, চিকণ নীল রং ক্রমশঃ গাঢ়তর থেকে গাঢ়তম হ'তে চলেছে। কি সুন্দর দেখাচ্ছে! আমরা এখন জ্যোতিহীন রক্ততারকা-গুলির কাছে এসে পৌঁছেছি। এখন বুঝতে পারছো, আপাকেটি, যে আর কোন সাড়াশব্দ এসে পৌঁছাচ্ছে না, তাহলে প্রথম পর্যায়ের কার্য্য কৌশলতা space-craftটি শেষ করে ফেলেছে। এখনই তুমি অনুভব করতে পারবে যে space craft সোজাসুজি উপর দিকে চলতে সুরু করেছে, তাছাড়া আরো মনে হবে যে তারকাগুলি এলোমেলোভাবে এই অসীম আকাশের পথে ঘোরাঘুরি করছে। এবার শরীরের চাপ বা ভারী ওজনের ভাবটা কিছুটা হাল্‌কা হ'তে চলেছে; প্রথমে বেশ আস্তে আস্তে মনে জাগবে তারপর সহজভাবেই অনুমান করতে পারবে। যাহোক শুনতে পারছো—নীচ থেকে জানাচ্ছে যে আমরা বেশ কৃতকার্য্যতার সহিত উপরের দিকে চলে এসেছি এবং এই স্তরের সূচীভেদ্য অন্ধকার পথে এগিয়ে চলেছি। এখন space craftটি তীব্রগতিতে ছুটে চলেছে, দেখ, দেখ, ১০,০০০ ফিট সেকেণ্ড থেকে ১৮,০০০ ফিট, তারপরই ২২,০০০ ফিট সেকেণ্ডে পৌঁছেছে। এখনিই বুঝতে পারবে যে শরীরটা কোন প্রকার বাঁধনে বা তারের চাপে আর আটকে নেই কেবল নয়, এত হাল্‌কা বোধ করতে থাকবে মনে হবে যেন বুকের উপর থেকে একটি হাতীর পায়ের চাপ সরান হলো। এখন আর কাঁপুনি নেই, কোন সাড়াশব্দও নেই। আমরা দ্বিতীয় স্তর অতিক্রম করে সোজাসুজি অতি তীব্রগতিতে একেবারে orbit-এর সীমানায় এসে পৌঁছেছি।

এই স্তরে রাত্রির বা দিন সবই সমান। কেবলমাত্র শব্দহীন নিস্তব্ধতাই বিরাজমান; মনে হবে যেন বুকের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে! জান ত—তুমি উপস্থিত ১০০ মাইল উপরেই রয়েছ এবং ঘণ্টায় ১৭,৫০০ মাইল গতিতে ভূমণ্ডলের চারিধারে গন্তব্যবিহীন পথে ভেসে চলেছ। আচ্ছা, এখন তাহলে এগিয়ে একটু windscreen-এর দিকে তাকিয়ে দেখো; মনে হবে যেন গভীর ও গম্ভীর অন্ধকার রাত আগমনী দিনের অপেক্ষায় রয়েছে। আরও দেখতে পেয়েছ কি—

অতলান্তিক মহাসাগর রক্তাভায় মতন জ্বল জ্বল করে উঠছে থেকে থেকে ও এঁকেবেঁকে পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে চলেছে। আরো একটু নীচের দিকে তাকাও যে সীমানাতে হালকা নীলরংএর বাষ্পমণ্ডলী একটি পর্দার আকারে পৃথিবীকে ছুঁয়ে রয়েছে; দেখতে পাচ্ছ ত, পার্থিব পৃথিবীটা সোনার রংএর মতন উজ্জ্বল ভাব নিয়ে ভূমণ্ডলের বাষ্পমণ্ডলের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে আচ্ছা, শোন, এখন তোমার Land controllerটী ডানদিকে ফিরিয়ে দাও, দিয়েছ? দেখ সামনে Gibraltar, তারই উপর দিকে আফ্রিকা মহাদেশ। এখন আবার নিজনের বাঁ দিকে চলো যাক, দেখ Mediterranean সাগর পড়ে রয়েছে এবং তারই উত্তরে খণ্ড খণ্ড তুষারাবৃত Alps পর্বত বিরাজ করছে।

এই ভূমণ্ডলের নীচের স্তরে পার্থিব পৃথিবী বরাবর ঘুরতেই থাকবে। পৃথিবীর উজ্জ্বলতা ক্রমশঃ হালকা রং থেকে গোলাপী, তারপর হলদে ও লালে, বেগুনে এবং শেষ পর্যন্ত গভীর লাল রং এ পরিণত হলো। আমরা যে স্তরে রয়েছি তা সূর্য্যাস্তের সীমানার বাহিরে, বুঝলে ত! দেখ, সামনের পুঞ্জীভূত মেঘগুলি অন্ধকারে ঢাকা রয়েছে, এশিয়া এবং তারই উত্তরের সীমানায় বৃহৎ আকারে তুষারাবৃত পর্বতমালা দেখা যায় তা হচ্ছে হিমালয় পর্বত। এক ঘণ্টায় কয়েক হাজার মাইল অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যোদয়ের প্রতীক জেগে উঠছে, দেখছ ত! প্রথমে গোলাপী রং দেখা দিল, তারপর মুহূর্ত্তে পরে পরে লাল রং থেকে অনন্ত আগুনের ফোয়ারার আকৃতিতে পরিণত হলো। সামনে প্রশান্ত মহাসাগর চল্ চল্ করে চলেছে। তাহলে আমরা একটি পুরাপুরি প্রদক্ষিণ ভূমণ্ডলের চারিধারে করে ফেলেছি। এখন পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে যাবার ব্যবস্থাতে আসা যাক্।

আকস্মিক ভাবে একটা শব্দ আমার কানে এলো, শুনছ, ওঠো; রাত ৯টা বেজে গেছে, খাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

তোমরা ও আমরা

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

তোমরা যারা এসেছিলে সবাই,
বললে শুধু, 'ভালবাসো, ভালবাসার চেয়ে বড়ো
আর কিছু নাই নাই।
ভালবাসো আপনাকে আর স্বজন পরিজনে,
ভালবাসো মানুষকে, প্রেম বিলাও জনে জনে।

সে-প্রেম প্রদীপ শিখার মত জ্বলুক,
জ্বালুক নিবানো দীপ সব:
চারিদিকে জাগুক কলরব,
আনন্দ-গান জীবন ভোগের,
সে-ভোগ প্রেমের মন্ত্রে সঞ্জীবিত,
স্বার্থবোধে নয়কো সঙ্কুচিত।

বললে সবাই। কান পেতে সব শুনে গেলাম, আর
উচ্চস্বরে দিলাম জয়ধ্বনি।
কিন্তু ফেলে সে-সব মুক্তা মণি
আঁচলেতে বেঁধে নিলাম পাথরকুচি যতো:
চার দেওয়ালে বেঁধে জীবন পাপক্ষয় করি দিন গত।
পাই না আলো, শুনি না গান, কেঁদে কেঁদে মরি,
আর অভিযোগ করি:
পেলাম নাকো, পেলাম না হায়, কিছুই পেলাম না যে;
নিলাম নাকো, ফেলে দিলাম—
এই কথাটি কণ্ঠে আমি বাজে!
কান্না হল সার:
কান্না ভরা জীবন ঘিরে শুধুই হাহাকার।

উজ্জ্বল ভারত কি দেখিব না

॥ শ্রীনলিনী কিশোর গুহ ॥

আমাদের এই ভারতবর্ষে এমন অনেক মানুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে যাঁহারা আমরা যাঁহাদের দেবলোকবাসী দেবতা বলিয়া জানি, তাঁহাদের চাইতেও বড়। বেশ কিছুদিন পূর্বে একখানা পুস্তক, উহার নাম, মনে হয়, "মানুষ হইলেও দেবতার চাইতে বড়", পড়িয়াছিলাম। আমাদের ভারতবর্ষের জন. কয় মানুষের পরিচয় পুস্তকে ছিল। নরত্রূপী নারায়ণ বলিয়া যাঁহাদের আমরা মানুষ হইতে স্বতন্ত্র ও আলাদা করিয়া 'অবতার' আখ্যা দিয়া পূজা-অর্চনা করি বা করিয়াছি আমি তাঁহাদের কথাও বলিতেছি না। আমাদের দেশের প্রাচীন যুগে এমন সকল সাধক তাপস সত্যানুসন্ধানী ব্রহ্মবিদ্ মহর্ষী রাজর্ষী জ্ঞান-ভক্ত-কর্ম যোগী, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সমন্বয়ী মানুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, যাঁহাদের কথা আমরা স্মরণ করি, যাহাদের লইয়া আমরা গর্ব অনুভব করি। ভারতের সেই প্রাচীন যুগের মহিমার গৌরব কীর্তন রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন—বলিতে পারি আমাদের সকলের হইয়া কবি কৃতজ্ঞ চিত্তে ভারতের সেই মহিমা কীর্তন করিয়াছেন—

"প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সাম রব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে,
জ্ঞান ধর্ম কত কাব্য কাহিনী।"

শুধু সেই উপনিষদের অথবা বৈদিক যুগ কেন—পৌরাণিক বৌদ্ধ রামায়ণ মহাভারত ও ঐতিহাসিক যুগেও মানুষের মহান আবির্ভাব ঘটিয়াছে—মানুষের মতো মানুষ; আচরণ-ধর্মী আদর্শ চরিত্রের মানুষ আমাদের শ্রেয়ের পথ দেখাইয়াছেন। সেদিন ছিল একটা অভ্যুদয়ের যুগ। তার পরে দেখি এই ভারতেই একটা তামস যুগ—ধর্মান্ধতে—জ্ঞান ভক্তি কর্মান্ধতে ব্যভিচার।

অষ্টাঃ মন্ত্রের সাধক ভারত কালপ্রাণীতে প্রমাদ গণিল। কুসংস্কার কূপমণ্ডূকতা জ্ঞান বিজ্ঞান বুদ্ধির সাধনাকে স্তব্ধ করিয়া দিল। আমাদের দেশে যখন এই তামস যুগের প্রাধান্য প্রভাব, পাশ্চাত্যে তখন জ্ঞান বিজ্ঞান অভ্যুদয়ের যুগ। ভারতের এই দৈন্য দুর্বলতার অপরিহার্য পরিণাম ফল ভারতে ইংরেজ রাজশক্তির ভাগ্য বিস্তৃতি। সে কথা থাকুক।

এই পরাধীন ভারতেই আবার দেখিলাম ঊনবিংশ শতাব্দীর অভ্যুদয়ের যুগ। কত মহাপ্রাণ মনীষীর আবির্ভাব। ভারতের অধ্যাত্ম সাধনালব্ধ সম্পদের উত্তরাধিকারী তাহারা জাতির নব জন্মের সূচনা করিলেন, ধর্মে সমাজে সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কত মহারথী, কত নূতন চিন্তা, নূতন প্রেরণা; কত আদর্শনিষ্ঠ ত্যাগী, আচরণধর্মী সব মানুষ, খাঁটী মানুষের যেন মিছিল। ধর্মে সমাজে রাষ্ট্রীয় চেতনায় কি অপূর্ব অভ্যুদয়ের যুগ। নব জাগ্রত জাতি লইল স্বদেশের দীক্ষা। স্বদেশ সেবা, স্বদেশ প্রীতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম। জাতির মরা গাংগে বান ডাকিল। আত্মসম্বিতে জাগ্রত জাতি স্বাধীনতা অর্জনের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিল।

তবে জাতির ত্যাগ-তপস্যার বীর্যতত্ত্বে আমাদের বাঞ্ছিত স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে বলিতে পারিনা। কারণ শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় India is one, indissoluble, indivisible অর্থাৎ এক অখণ্ড অবিভাজ্য যে ভারত শেষ পর্যন্ত সেই ভারত খণ্ডনের ভিত্তিতে, খণ্ডিত ভারতের (পাকিস্থান ও ভারত) স্বাধীনতা হইল। ইহাই বর্তমানে স্বাধীন ভারত।

• • •

স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি। বিদেশী শাসনের

অবসান হইয়াছে—রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি, —ইহা যেমন সত্য, তেমনি স্বাধীনোত্তর ভারতে জাতি সংগঠনের দায় দায়িত্ব পালনের বিচারে আমাদের কর্মৈষণার অভাব, আমাদের সেই অনৈক্য, কলহপ্রিয়তা-পরশ্রী-কাতরতা ভ্রম-বিমুখতা চারিত্রিক দুর্বলতা যে ভাবে ধরা পড়িতেছে তাহাতে কিন্তু আমাদের সেই অতীত তামসিক যুগের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। যেন একটা তমিস্রা নামিয়া আসিয়াছে। চতুর্দিকে লক্ষ্যভ্রষ্টতা, স্থির সাধনার স্থান অস্থির প্রয়াসে পর্যবসিত হইতেছে, কর্মোদ্যমের অভাব বিতর্ক বিতণ্ডায় পূরণ করার উৎসাহ, মন-মুখ আলাদা, কথা যত বেশী, কাজ তত কম—একটা জাতির জীবনে ইহা তামস-যুগের লক্ষণ—অভ্যুদয়ের নয়।

অধ্যাপক টি এন ভাদোয়ারীর খেদোক্তিটি মর্মে আঘাত করে; "Even in our fallen days we say, we are proud of our 'rishis' and then go to sleep again. O, let us rather ask, are 'rishis' proud of us."

বুঝিবার কথা এই যে আমাদের দেশের মুনি ঋষি মনীষী মহাপুরুষদের লইয়া গর্ব করা মোটেই বড় কথা নয়, আজ ভাবিবার কথা ও বুঝিবার কথা—আত্ম জিজ্ঞাসার কথা: আমাদের ঐ পূর্ববর্তী মুনি ঋষি মহাপ্রাণ মনীষীরা আমাদের দেখিয়া খুশী হইতেছেন কিনা, গর্ব বোধ করেন কিনা। আমাদের বর্তমান আচরণ দেখিয়া তাঁহারা যদি প্রসন্ন না হন, মর্মাহত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের লইয়া গর্ব করিব কোন্ মুখে? সেই জন্যই প্রয়োজন আজ আত্ম-বিচার। আচরণের কষ্টিপাথরেই শুধু সেই বিচার হইতে পারে।

বড় আদর্শ, বড় কথা, এদেশে যথেষ্ট রহিয়াছে—তাহার অভাব নাই। কিন্তু শুধু কথার জলে টিঁড়া ভিজিবে না। বহু শোনা বড় কথা কতটুকু ব্যষ্টি ও সমাজ-জীবনে, আচরণে রূপায়িত করিয়াছি সেই কর্মের খতিয়ান —এই আত্ম বিচার আজ চাই। অতি স্বল্প পরিমাণ আচরণও বহু বড় কথা অপেক্ষাও বড় ও শ্রেয়।

জাতির জীবনে, জীবন-ধর্মে আজ পুঞ্জীভূত গ্লানি, অন্ধকার। ইহা লইয়া তর্ক করা যায়, ক্ষোভ প্রকাশ করা যায়, পরস্পর কলহ করাও যায়। কিন্তু দেশ ও জাতির সেবক গঠন কর্মীর পথ ভিন্ন। কথা আছে: "It is better to light a candle, than to curse the darkness"। ইহাই তো ভারতের এবং হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির আদর্শসম্মত কথা—আচরণ করা, হওয়া।

গঠন কর্মে বিশ্বাসীকে অন্ধকারে নিষ্ঠার প্রদীপ জ্বালাইতে হইবে তাঁর জমক সমারোহের ঢাক ঢোল না পিটাইয়া। জানি এতে নিষ্ঠা ধৈর্য বিশ্বাসের প্রয়োজন। আজ চারিদিকে বৈদ্যুতিক আলোর চোখ ঝলসানো সমারোহ—এই পরিবেশে গৃহের তুলসী মূলে যে গৃহ-লক্ষ্মী নীরবে মাটির প্রদীপটি নিত্য জ্বালাইয়া রাখিতেছেন, এই ক্ষুদ্র দীপশিখা কতখানি মনের অন্ধকার দূর করিয়া দেয়, সে তো তর্কের বিষয় নয়, গঠন কর্মী তাহা নিত্য প্রত্যক্ষ করে নিষ্ঠাবান কর্মে, কর্ম-নিষ্ঠায় কর্ম করিতে পারার আত্ম প্রসাদে।

বড় কথাও নয় বৃহৎ আয়োজনের কথাও নয়। আজ গঠন কর্মীদের ক্ষুদ্র ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে যাহা সাধ্যায়ত্ত মনে হইবে, হউক ক্ষুদ্র তাহাই শুদ্ধ অন্তঃকরণে আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে। এই কর্মের অধিকারকেই স্বধর্ম জানিয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে কোন প্রত্যাশা না রাখিয়া। প্রথমে ক্ষুদ্র বা ছোট কাজে অভ্যস্ত হইতে হইবে। আমি, তুমি আমরা এই পাঁচজন লইয়াই সূত্রপাত। যে পাঁচ (পুরুষ বা নারী) মিলিতে পারা যাইবে শুদ্ধ মনে তাহাদের প্রার্থনা হইবে জাতির কল্যাণ। পরে প্রতিশ্রুতি লইব: মিথ্যা বলিব না, মিথ্যাচরণ করিব না, চরিত্র নির্মল ও পবিত্র রাখিব অধর্ম অন্যায় পথে উপার্জন করিব না; সম্ভবমত কিছু না কিছু উৎপাদন করিব; পরচর্চা করিব না। এই কাজগুলি ক্ষুদ্র হইলেও প্রচার ও বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজন নাই, অর্থেরও প্রয়োজন নাই। গঠনকর্মীকে এই বিশ্বাস রাখিতে হইবে পাঁচ আছি, দশ হইব, বিশ পঞ্চাশ শত সহস্র হইব। সহস্র এই ভাবেই অযুতে লক্ষে পৌঁছাইবে, এই লক্ষ কোটি

লইয়াই তো জাতি।

আমাদের জাতির নৈতিক চরিত্রের অধোগতি ঘটিয়াছে —ইহা অহরহ যার তার মুখেই শোনা যায়। যাহারা শুধু অপরের নিন্দা করিতে উৎসাহ বোধ করে অপর সকলের নীতিভ্রষ্টতার প্রসঙ্গে রোমাঞ্চিত হইয়াই থাকে— তেমন সব শুধু নিন্দুকের প্রচার নয়, জাতির মর্যাদা সম্মানের অপহ্নব ঘটিলে যিনি বেদনা বোধ করেন, জাতির দরদী বান্ধব তেমন বিশুদ্ধাত্মার বেদনাহত অন্তরের ক্ষোভও এই মর্মেই প্রকাশ পায় যে নৈতিক অধোগতিই আজ জাতির বড় সমস্যা, বড় বিপদ।—সুতরাং আজ এই সত্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই যে জাতির নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটিয়াছে। আর জাতির বিপদ কিন্তু শুধু এই খানেই নহে; বিপদ এইখানে যে, এই সম্পর্কে অনেকেই আমরা অভিযোগ করিয়া রোমাঞ্চিত করিয়া অক্লেশে সব দায়িত্ব শেষ করিয়া অক্লেশে নিদ্রাভোগ করিতে পারি, জাতির জন্য মমতা আমাদের সক্রিয় করে না, জাতির নৈতিক অধোগতির সর্বনাশা দুঃসংবাদেও আমাদের মুখে অন্ন রুচে! জাতির নীতি-বোধের অভাব ঘটিলে জাতির থাকে কি?

তবে গঠন কর্মে বিশ্বাসীদের ইহা উপলব্ধি করিবার যে জাতির নৈতিক চরিত্রের অধোগতির কথা সত্য হইলেও, আবার ইহাও সত্য যে, আমাদেরই সমাজে এমন সব মানুষ আছেন যাঁহাদের চারিত্রিক নিষ্ঠা সতেজ, সক্রিয় ও অম্লান। এমন মানুষ, আমাদের সমাজে আছেন— যাঁহারা মিথ্যাচরণ করেন না, স্বার্থ ও অর্থলোভে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন না, যাহারা ঘুষের বিনিময়ে কাজ করেন না, ঘুষ দিয়া স্বার্থ সিদ্ধি করেন না, চুরি জুচ্চুরী, ঠকানো ফাঁকি দেওয়া আত্মাবমাননা মনে করেন।

আসলে এই বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে ধর্মের গ্লানি দেখা দিলে যুগে যুগে যে ধর্ম তথা সত্য শক্তির আবির্ভাব সম্ভব হয়, তাহার হেতু এই সম্ভাবনার তথা সত্য ও ধর্মপ্রতিষ্ঠার বীজ রহিয়াছে সমাজেই। অর্থাৎ আদর্শ চরিত্রের মানুষেরও অভাব নাই। এবং নাই বলিয়াই এই অন্ধকারেও আশো জ্বলিবেই জ্বলিবে। উজ্জয়ন্তভারত দেখা দিবেই দিবে।

"আগমনী"

(গান)

॥ শ্রীতারাপ্রসাদ গুহ ॥

জাগো মা জগদ্ধাত্রী বঙ্গে।
এসো মা সুখদে এসো মা বরদে
লহ লো প্রণামে—রঙ্গে ॥

এসো ক্রিয়ারূপিনী মহালক্ষ্মী,
জাগো শক্তিরূপা মহাশক্তি,
এসো মা পার্বতী কার্ত্তিক, ভারতী
সুত গণপতি সঙ্গে ॥

আজি— মুখর করিয়া ধরা জাগো,
ওগো দুর্গে দুঃখহরা, মাগো,
লহ এ প্রণতি দান তব শক্তি
ভারত-সন্ততি অঙ্গে ॥

রবীন্দ্রনাথের নাটকে একটি বৌদ্ধ কাহিনী

॥ ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য ॥

সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্গত 'মহা-বস্তু অবদান' গ্রন্থের 'মালিন্যাবস্তু' হইতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মালিনী' নাটকের কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন। মূল কাহিনীটি এই প্রকার :

প্রত্যেকবুদ্ধ গ্রামে ভিক্ষার্থ বাহির হইলেন, কিন্তু কোন ভিক্ষা না পাইয়া গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া যখন ভিক্ষার্থ অন্যত্র যাইবার উদ্যোগ করিয়াছেন তখন একজন ভক্তিপরায়ণ সমৃদ্ধ গ্রামবাসী তাহার সেবার ভার গ্রহণ করিলেন, তিনি গ্রামান্তরে যাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। এই গ্রামবাসীর কন্যা পবিত্র চিত্ত ও শুচি বস্ত্র পরিহিতা হইয়া তাহার সেবা কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই সৎকর্মের পুরস্কার স্বরূপ সেই গ্রামিকের কন্যা স্বর্গ লোকে অপ্সরা রূপে জন্মগ্রহণ করেন, তারপর সেখান হইতে পুনরায় কাশীতে কৃকি রাজার কন্যারূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। রাজকন্যার নাম মালিনী। রূপে এবং গুণে তিনি সকল রাজকন্যাদিগের মধ্যে অতুলনীয়া হইলেন।

কাশীরাজ পরম ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কৃকি ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তি করিতেন। তিনি কন্যাকে ব্রাহ্মণ-দিগের সেবা কার্যে নিযুক্ত করিলেন, মালিনী ব্রাহ্মণ-দিগকে পরম যত্নে সেবা করিয়া পরিতুষ্ট করিলেন। ব্রাহ্মণগণ রাজকন্যার রূপ লাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাহাকে লাভ করিবার সঙ্কল্প করিলেন, ইহারা কেহই ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই। রাজকন্যা ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বিরক্ত হইলেন এবং সিদ্ধান্ত করিলেন ইহারা সেবার অযোগ্য।

এমন সময় একদিন মালিনী পিতার প্রাসাদ শিখর হইতে পথি মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা বিগততাপ এবং শেষ বারের মত শরীর ধারণ করিয়া নির্বাণ লাভের যোগ্য হইয়াছিলেন। রাজকন্যা তাহাদিগকে প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানাইলেন, শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি তাহাদিগকে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিলেন। ভিক্ষু সঙ্ঘ তাহার আমন্ত্রণে রাজপ্রাসাদে আগমন করিয়া তাঁহার প্রদত্ত ভোজ গ্রহণ করিলেন। রাজকন্যা লোক-নাথ কাশ্যপকে আমন্ত্রণ জানাইলেন, তিনিও আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া রাজকন্যার নিকট হইতে সেবা ও পরিচর্যা গ্রহণ করিলেন। ভগবান কাশ্যপ তাহাকে ধর্মোপদেশ দিয়া বিদায় হইলেন।

বিশ হাজার ব্রাহ্মণ প্রতিদিন কৃকিরাজের প্রাসাদে আহার্য্য ও সেবা লাভ করিতেন। তাহাদের পরিবর্তে ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি মালিনীর আকর্ষণ দেখিতে পাইয়া তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া রাজকন্যার প্রতি ইহার প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্প করিলেন। রাজাকে তাহারা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রতি রাজকন্যা মালিনীর পক্ষপাতিত্বের কথা জানাইলেন এবং রাজকন্যাকে দণ্ড দিবার জন্য তাহাদের হাতে সমর্পণ করিবার জন্য দাবী করিলেন। রাজা ব্রাহ্মণদিগের বিদ্রোহের ভয়ে রাজকন্যাকে পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং তাহাকে ব্রাহ্মণদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া স্থির করিলেন।

মালিনী মৃত্যুর জন্য ব্রাহ্মণদিগের নিকট এক সপ্তাহ সময় প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল, সপ্তাহান্তে তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই স্থির হইল। এই এক সপ্তাহ কালকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য মালিনী নানা আয়োজন করিতে লাগিলেন। প্রথম দিবসে তিনি ভগবান কাশ্যপ সহ ভিক্ষুসঙ্ঘকে আহার করাইলেন।

আহারান্তে তাহারা রাজপরিবারের সকলকে ধর্মকথা শুনাইলেন। দ্বিতীয় দিবসে ভগবান কাশ্যপ পাঁচশত রাজপুত্রকে দীক্ষা দিলেন, তৃতীয় দিন রাজার পরিজনগণ ধর্মকথা শুনিল, চতুর্থ দিন রাজার মন্ত্রিগণ, পঞ্চম দিনে রাজ্যের সেনাপতিগণ, ষষ্ঠ দিনে রাজার আচার্য গুরু স্বয়ং এবং সপ্তম দিবসে নগরের অধিবাসীগণ সকলেই ভগবান কাশ্যপের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিল। সাতদিনের মধ্যে কাশীর রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রজা পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিল। তাহারা সকলেই জানিলেন মালিনী আমাদিগের চক্ষু খুলিয়া দিলেন, আমাদিগকে কল্যাণমার্গে অগ্রসর হইবার সাহায্য করিলেন। তখন সকলে সমবেত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের হাত হইতে মালিনীর প্রাণ রক্ষায় ব্রতী হইল। ব্রাহ্মণগণ ভয় পাইয়া গেলেন, তাহারা মালিনীর উপর হইতে মৃত্যু দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। এইবার তাহারা ভগবান কাশ্যপকে বধ করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভগবান কাশ্যপ যে তাঁহাকে বধ করিবার জন্য তাঁহার নিকটে গেল তাহাকেই মৈত্রী দ্বারা বশ করিয়া নিজ ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। ব্রাহ্মণগণ নিবৃত্ত হইলেন না, অবশেষে ভগবান কাশ্যপ পৃথিবী দেবতাকে আহ্বান জানাইলেন, পৃথিবী দেবতা একটি বৃহৎ তালগাছ কাঁধে লইয়া ব্রাহ্মণদিগকে তাড়া করিয়া গেলেন, ব্রাহ্মণেরা বিনাশ প্রাপ্ত হইল।

এই মূল কাহিনীটিকে কিভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মালিনী' নাটকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। বৌদ্ধ কাহিনী মাত্রেই একটি সম্প্রদায়গত (sectarian) মনোভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে, এখানেও তাহা পাইয়াছে। দেবাপরায়ণা রাজকন্যার প্রতি ব্রাহ্মণদিগের কামাসক্তি বৌদ্ধ সাহিত্যের সাম্প্রদায়িক (sectarian) মনোভাব প্রকাশের নিদর্শন। তারপর রাজকন্যার শিক্ষার ফলে রাজপরিবারের সকলেরই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ, কাশ্যপকে বধ করিবার নিমিত্ত যে সকল ব্রাহ্মণ প্রেরিত হইত, তাহাদের সকলেরই ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ, শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধদিগের দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের বিনাশ ইত্যাদি পরিকল্পনার মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারমূলক মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মালিনী' নাটকে বৌদ্ধ কাহিনীটিকে প্রথমেই এই সাম্প্রদায়িক এবং প্রচারমূলক মনোভাব হইতে মুক্ত করিয়াছেন। 'মালিনী' নাটকের ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাঁহারা সংস্কার ধর্ম রক্ষায় বদ্ধপরিকর মাত্র। ইহার জন্য তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়াছে, রাজকন্যার নির্বাসন প্রার্থনা করিয়াছে। কিন্তু মালিনী আসিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার দেহে পুণ্যের জ্যোতি দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে দেবী ও জননী বলিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ একটি প্রচারধর্মী কাহিনীকে এখানে সাহিত্যিক মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংঘাতের কথা উভয় কাহিনীতে আছে এ কথা সত্য, তথাপি বৌদ্ধ ধর্মের করুণা এবং মৈত্রীর আদর্শের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর নবপ্রবুদ্ধ মানবিকতাবোধের সন্ধান করিয়া কাহিনীকে যুগোপযোগিতা দান করিয়াছেন। বৌদ্ধ কাহিনীর মধ্যে যে সকল অলৌকিকতার কথা ছিল, তাহাও রবীন্দ্রনাথ সতর্কতার সংগে পরিহার করিয়া 'মালিনী' কাহিনীকে একটি শাশ্বত সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়াছেন।

মালিনী এবং কাশ্যপ এই দুইটি নামই রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ কাহিনী হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ক্ষেমঙ্কর এবং সুপ্রিয় চরিত্র এবং ইহাদের নাম দুইটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই উদ্ভাবন করিয়া তাহার কাহিনীর মধ্যে আনিয়া সংযুক্ত করিয়াছেন। তাহার ফলে বৌদ্ধ কাহিনীর মধ্যে যাহা নির্বিশেষ রূপে অবস্থান করিয়াছিল, তাহাই 'মালিনী'তে বিশেষ এক একটি চরিত্রের রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল।

বৌদ্ধ কাহিনীর মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের বিনাশের কথা আছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'মালিনী'র কাহিনী সেই পথে অগ্রসর হইয়া যায় নাই; ইহাতে কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের পরাজয় বিজয়ের কথার পরিবর্তে ব্যক্তি চরিত্রের শাশ্বত

গুণের বিকাশ দেখা যায়। 'মালিনী' নাটকে প্রেমের যে একটি সংযত সুন্দর রূপ প্রকাশ পাইয়াছে, কিংবা প্রেমের আকর্ষণবশতঃ বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যে বিশ্বাস-স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে বৌদ্ধ কাহিনীতে তাহার ইঙ্গিত পর্যন্ত নাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ কাহিনীটির মধ্যে একদিক দিয়া যেমন বহিরঙ্গগত রূপকর্ম সার্থক করিয়াছেন, আর একদিক দিয়া তেমনই ইহার অন্তর্মুখী প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন; একটি পুরাণ কাহিনীকে কাব্যের কাহিনীতে পুনর্গঠন করিয়াছেন।

বৌদ্ধকাহিনীতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের কথা আছে, 'মালিনী' নাটকেও ধর্মের কথা আছে সত্য, তবে রবীন্দ্রনাথ এই ধর্মকে বলিয়াছেন নবধর্ম। এই নবধর্ম বলিতে রবীন্দ্রনাথ কি মনে করিয়াছেন, বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে ইহার পার্থক্যই বা কোথায় তাহাও এখানে আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। পূর্বেই বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য মাত্রেরই বিষয় হৃদয় ধর্মের সঙ্গে আচার ধর্মের সংঘাত এবং পরিণামে হৃদয় ধর্মেরই প্রতিষ্ঠা। এই হৃদয়-ধর্মই মালিনীর নবধর্ম। এই ধর্ম শাস্ত্রের শাসন মানে না, কেবলমাত্র হৃদয়ের শাসন মানে। সুপ্রিয়র মধ্যেও এই নব ধর্মের চেতনা দেখা দিয়াছিল। সে ব্রাহ্মণদিগকে বলিতেছে—

আমি নহি একজন
তোমাদের ছায়া। প্রতিধ্বনি নহি আমি
শাস্ত্র বচনের। ২য় দৃশ্য

তারপর ক্ষেমঙ্করকে বলিতেছে,

যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম ব্রত উপবাস
এই শুধু ধর্ম বলে করিবে বিশ্বাস
নিঃসংশয়ে? বালিকারে দিয়া নির্বাসনে
সেই ধর্ম রক্ষা হবে? ভেবে দেখো মনে
মিথ্যারে সে সত্য বলি করে নি প্রচার
সেও বলে সত্য ধর্ম দয়া ধর্ম তার
সর্ব জীবে—প্রেম সর্ব ধর্মে সেই সার,
তার বেশী যাহা আছে প্রমাণ কি তার? ২য় দৃশ্য

এই নবধর্মের কথা সুপ্রিয় আরও সুস্পষ্ট ভাষায় এখানে প্রকাশ করিয়াছে,

স্বর্গ আছে কোন দূরে,
কোথায় দেবতা—কেবা সে সংবাদ জানে।
শুধু জানি, বলি দিয়া আজ অভিমানে
বাঁচিতে হইবে ভালো, বিশ্বের বেদনা
আপন করিতে হবে—যে কিছু বাসনা
শুধু আপনার তরে তাই দুঃখময়।
যজ্ঞে যাগে তপস্যায় কভু মুক্তি নয়,
মুক্তি শুধু বিশ্বকাজে। চতুর্থ দৃশ্য

ইহার মধ্যে বৌদ্ধধর্ম নহে, শাশ্বত মানব ধর্মের কথা আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর ধর্মচেতনায় যে যুক্তিবাদী মনোভাবের বিকাশ দেখা গিয়াছিল, ইহার মধ্যে তাহারই প্রেরণা দেখা যায়। ইহাই মালিনীর নবধর্ম। বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে এই ভাবের প্রেরণা থাকিলেও ইহাই বৌদ্ধ ধর্মের সর্বস্ব নহে, ইহার অতিরিক্ত আরও অনেক কিছু লইয়া বৌদ্ধধর্ম। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্ম হইতে কেবল মাত্র ইহার করুণা ও মৈত্রীর আদর্শ টুকুই গ্রহণ করিয়াছিলেন, যুক্তি-বহির্ভূত আচার কিংবা তাহার বৈরাগ্যের ভাবকে তিনি গ্রহণ করেন নাই। এখানেও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং বৌদ্ধ কাহিনীতে যেমন মালিনী বৌদ্ধ ধর্মাচারের মধ্যে নিজের আধ্যাত্মিক সাধনার সিদ্ধি সন্ধান করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের মালিনী তাহা করে নাই, উনবিংশ শতাব্দীর নব প্রবুদ্ধ মানবিকতার চেতনায় তাহার নবধর্ম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মানবিকতাবাদের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক আছে।

মালিনীর নবধর্মের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবি-ধর্মেরও অনেকখানি যোগ আছে। রবীন্দ্রনাথ 'মালিনী' নাটকের সূচনায় সে উল্লেখও করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশংকরের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষার পুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গল রূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকার তত্ত্ব নয় সে,

মূর্তিশালার মাটিতে পাথরে নানা আকার নিয়ে মানুষকে সে হতবুদ্ধি করতে আসে নি। কোনো দৈবধারীকে সে আশ্রয় করেনি। সত্য যার স্বভাব, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানব-দেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক সকল পৌরাণিক ধর্ম-জটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে। আমার ঐ মতের সত্যাসত্য আলোচ্য নয়; বক্তব্য এই যে, এই ভাবের উপরে মালিনী স্বতঃই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এরই যা দুঃখ, এরই যা মহিমা, সেইটেতেই এর কাব্যরস। এই ভাবের অঙ্কুর আপনা আপনি দেখা দিয়াছিল "প্রকৃতির প্রতিশোধ"—এ, সে কথা ভেবে দেখবার যোগ্য। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' হয়তো তারও আগে এর আভাস পাওয়া যায়।

'প্রভাত-উৎসব' কাব্যগ্রন্থ রচনার সময় হইতে রবীন্দ্র কবি-মানসে বিশ্বের সঙ্গে যোগ অনুভব করিবার যে প্রেরণা দেখা দিয়াছিল, মালিনীর নবধর্ম বোধের মধ্যেও সেই ভাবের বিকাশ দেখা যায়। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' যেমন নির্ঝর পাষাণ প্রাচীর ভেদ করিয়া উদ্দাম আবেগে বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া বিশ্বের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়াছিল, মালিনীও অন্তঃপুরের শাসন ও বন্ধন অস্বীকার করিয়া বহির্বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ছুটিয়া আসিয়াছে। 'চিত্রা' কাব্য গ্রন্থের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার ভিতর দিয়াও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সঙ্গে যে যোগ অনুভব করিতে চাহিয়াছেন, মালিনীর নবধর্ম চেতনার মধ্য দিয়াও তাহার বিকাশ দেখা যায়।

মালিনী। জন্ম লভিয়াছি রাজকুলে,
রাজকন্যা আমি—কখনো গবাক্ষ খুলে
চাহিনি বাহিরে, দেখি নাই এ সংসার
বৃহৎ বিপুল—কোথায় কি ব্যথা তার
জানি না তো কিছু। শুনিয়াছি দুঃখময়
বসুন্ধরা, সে দুঃখের লব পরিচয়
তোমাদের সাথে। ২য় দৃশ্য

নবপর্যায়ের 'চিত্রা' কাব্য রচনার যুগ পর্যন্ত রবীন্দ্র কবি-মানসে নানা ভাবে এই ভাবেরই বিকাশ দেখা গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের বিশ্বানুভূতির মত মালিনীও অনুভব করিয়াছে, 'আজ আমি হয়েছি সবার' (তৃতীয় দৃশ্য)। 'আমি যেন এ বিশ্বের প্রাণ' (ঐ)। এখানে রবীন্দ্রনাথের কবি-ধর্মের সঙ্গে মালিনীর নবধর্ম একাকার হইয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধ কাহিনীতে যেমন বৌদ্ধ ধর্মের মহিমা প্রচার করিয়া পরিণামে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপর বৌদ্ধধর্মকে প্রতিষ্ঠা করিবার কথা বলা হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী'তে পরিণামে নবধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার কোন কথা নাই। নবধর্মের প্রচারক সুপ্রিয় এবং আচার ধর্মের প্রতিনিধি ক্ষেমঙ্কর উভয়ের মৃত্যুর ভিতর দিয়াই কাহিনী সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। সুতরাং বৌদ্ধ কাহিনীর মত 'মালিনী' নাটকের কাহিনীর ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা লক্ষ্য ছিল না। ধর্ম উপলক্ষ্য মাত্র হইয়া ইহার মধ্যে মানব-চরিত্রের কয়েকটি শাশ্বত গুণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। প্রেম, বিশ্বাস-ঘাতকতা, প্রতিহিংসা, বাৎসল্য, ভক্তি ইত্যাদি মানবিক গুণই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া 'মালিনী'র কাহিনীকে উচ্চ কাব্য মূল্য দিয়াছে। সুপ্রিয়ের দিক দিয়াই হোক, কিংবা মালিনীর দিক দিয়াই হোক, নবধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়াস কাহারও দ্বারা কাহিনীর মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই।

সুপ্রিয়ের মনের মধ্যে নবধর্মের চেতনা তাহার মালিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্বেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল, সুতরাং ইহা মালিনীর প্রতি সুপ্রিয়ের প্রেমের পথ ধরিয়া বিকাশ লাভ করে নাই। মালিনী এবং সুপ্রিয় উভয়েই পরস্পর স্বাধীন ভাবেই আজন্ম নবধর্মের প্রেরণা অনুভব করিয়া আসিয়াছে। ইহার সঙ্গে সুপ্রিয়ের কোন স্বার্থের সম্পর্ক জড়িত হইয়া ছিল না। ইহা তাহার আন্তরিক প্রেরণার ফল; তারপর সে যখন মালিনীর মধ্যে ইহার সমর্থন লাভ করিয়াছে, তখন তাহার মনে ইহার শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র, ইহার ভিতর দিয়া মালিনীর প্রতি তাহার আকর্ষণ প্রবলতর হইয়াছে। মালিনীর রূপ-যৌবনের আকর্ষণই সুপ্রিয়ের একমাত্র অবলম্বন ছিল না,

এমন কি তাহা হয়ত কিছুই ছিল না, কেবল মাত্র সুপ্রিয় আজীবন যে মন্ত্রে দীক্ষিত, মালিনীর মন্ত্রে তাহারই সমর্থন লাভ করিয়া তাহার প্রতি তাহার প্রথম আকর্ষণ, তারপর তাহা প্রেমে পরিণতি লাভ করিয়াছিল। নবধর্ম শেষ পর্যন্ত কাহারও দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না হইলেও সুপ্রিয় দ্বারাই ইহার অধিক প্রচার হইয়াছে, কাহিনীর শেষভাগে মালিনী সুপ্রিয়র কর্মের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে মাত্র। বৌদ্ধ কাহিনীতে মালিনী বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে, 'মালিনী' নাটকে মালিনী দ্বারা তাহা সম্ভব হয় নাই। ইহার তাহা লক্ষ্যও ছিল না।

মালিনীর আচরণ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন এখানে মনে হইতে পারে, মালিনীর চরিত্রের মধ্যে যে ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সুপ্রিয়কে বিবাহ করিবার ইচ্ছা তাহার সঙ্গে কতদূর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার একটি উত্তর হইতে পারে যে, ক্ষেমঙ্করের প্রতি সুপ্রিয় যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাহা জানিবার পূর্বেই মালিনী সুপ্রিয়র প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু যদি তাহাই হয়, তথাপি দেখা যায়, যে-মুহূর্তে সে সুপ্রিয়র ক্ষেমঙ্করের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবার কথা সুপ্রিয়র নিজের মুখ হইতেই শুনিতে পাইল, সেই মুহূর্তেও সুপ্রিয়র প্রতি তাহার কোন বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পাইল না। সুপ্রিয়র প্রতি প্রেম কি তাহাকে সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিল? কিন্তু কদাচ তাহা নহে, কারণ, শেষ মুহূর্তেও সে যে সুপ্রিয়কে হত্যা করিবার পরও ক্ষেমঙ্করকে ক্ষমা করিবার জন্য পিতার নিকট অনুরোধ জানাইয়াছিল, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে মালিনী সুপ্রিয়র প্রেমে অন্ধ হইয়া গিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া যায় নাই। যদি তাহাই হয় তবে সুপ্রিয়কে বন্ধুর প্রতি নির্মম বিশ্বাসঘাতক জানিয়াও তাহাকে ভালবাসিল কি করিয়া?

মালিনী সুপ্রিয়কে যে প্রকৃতই ভালবাসিয়াছিল, তাহার খুব সুনিশ্চিত প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় কি না তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। সুপ্রিয় ভক্তের মত মালিনীর নিকট আত্মনিবেদন করিয়াছে, মালিনীর স্বার্থ রক্ষার জন্য বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, কিন্তু মালিনীর নিকট হইতে তাহার কি প্রত্যক্ষ প্রতিদান পাইয়াছে? একদিন মাত্র রাজার মুখে যখন সুপ্রিয়র বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার হাতে রাজকন্যাকে সমর্পণ করিবার কথা শুনিতে পাইল, তখন মুহূর্তের জন্য তাহার কুমারী হৃদয়ে লজ্জার স্পর্শ দেখা গিয়াছিল,

> কোথা হতে এল আজ
> অশ্রুবাষ্পে ছল ছল কম্পমান লাজ—
> যেন দীপ্ত হোমহুতাশন শিখা ছাড়ি
> সদ্য বাহিরিয়া এল স্নিগ্ধ সুকুমারী
> রুদ্রের-দুহিতা। —৪র্থ দৃশ্য

রাজা অনুভব করিলেন,

> বুঝিলাম মনে
> আমাদের কন্যাটুকু বুঝি এতক্ষণে
> বিকশি উঠিল—দেবী না রে, দয়া না রে,
> নরের সে মেয়ে। —ঐ

এতদ্ব্যতীত সুপ্রিয়র প্রতি মালিনীর প্রেমানুভূতি অভিব্যক্তির আর কোন নিদর্শন দেখা যায় না। বরং সুপ্রিয়র নিকট হইতে ক্ষেমঙ্করের কথা সে যত খুঁটিনাটি করিয়া জানিতে চাহিয়াছে, তাহার নিজের কথা তত জানিতে চাহে নাই। সুপ্রিয়র সঙ্গে মালিনীর নিভৃত আলাপনের যে একটি দৃশ্য আছে (চতুর্থ দৃশ্য), তাহাতে ক্ষেমঙ্করের প্রসঙ্গই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। নিজে হইতেই সুপ্রিয়র প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষেমঙ্করের কথা মালিনী জিজ্ঞাসা করিয়াছে, 'ক্ষেমঙ্কর বান্ধব তোমার?' ক্ষেমঙ্করের সঙ্গে তাহার আবাল্য বন্ধুত্বের কথা যতই আবেগপূর্ণ ভাষায় সুপ্রিয় মালিনীকে বলিয়াছে, মালিনী তাহা ততই অনুগতচিত্ত হইয়া শুনিয়াছে এবং যেন আরও শুনিতে চাহিয়াছে। তাহার কুমারী হৃদয়ে সুপ্রিয় অপেক্ষা ক্ষেমঙ্করের প্রতি যে অধিকতর কৌতূহল প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং পিতার মুখে সুপ্রিয়র সঙ্গে তাহার বিবাহের

সম্ভাবনার কথা শুনিতে পাইয়া তাহার কুমারী হৃদয়ে সর্ব প্রথম যে লজ্জার স্পর্শ দেখা দিল তাহার যে একান্তভাবে সুপ্রিয়ই লক্ষ্য ছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। ক্ষেমঙ্করকে প্রথম দর্শনের দিন হইতেই মালিনীর মনে তাহার প্রতি এক দুর্গভীর আকর্ষণ সৃষ্টি হইয়াছিল, সুপ্রিয়র সান্নিধ্যে ক্ষেমঙ্করের কথাই সে জন্য সে বারবার শুনিতে চাহিয়াছে। সুতরাং সুপ্রিয়র প্রতি তাহার কুমারী হৃদয়ের আন্তরিক ভালবাসা কোনদিন সৃষ্টিই হইতে পারে নাই। এই মর্মেই নাটকের শেষ দৃশ্যে ক্ষেমঙ্করকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার প্রার্থনার ব্যাখ্যা করা যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, মালিনী মুখ্যতঃ প্রেম বিষয়ক নাটক নহে, কিন্তু তথাপি প্রেম ইহার মধ্যে নিজের অধিকার স্থাপন করিতেও ব্যর্থকাম হয় নাই। মালিনীর চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ ইহার মধ্যে কেবল মাত্র একটি করুণা পুত্তলি রূপে পরিকল্পনা করিয়া তাহাকে সকল দিক হইতে আদর্শায়িত করিয়া তুলেন নাই, তাহার মধ্যে স্বাভাবিক রক্তমাংসের অনুভূতিরও সন্ধান করিয়াছেন। নাট্যিক চরিত্র রূপে এখানেই মালিনী চরিত্রের সার্থকতা। সুপ্রিয়কেও এখানে নবধর্ম প্রচারের বাহ্যিক বাহন রূপে নাট্যকার উপস্থিত করেন নাই, তাহারও মানবিক অনুভূতির ক্ষেত্রটিকে সন্ধান করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তবে এ কথা সত্য, এই কথাই ইহার মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিতে পারে নাই। নাট্য কাব্য রচনার যুগে রবীন্দ্রনাথের কোন রচনাতেই এই কথা প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই।

সুপ্রিয় মালিনীকে ভালো বাসিয়াছিল এ'কথা সত্য, এই ভালবাসার জন্যই সে আজীবন বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া তাহার মতও শেষ পর্যন্ত মাথা পাতিয়া লইয়াছিল, কিন্তু তথাপি এমন সন্দেহ করিবার কারণ আছে যে মালিনীও কি সুপ্রিয়কে সত্যই ভালো বাসিয়াছিল? একমাত্র আদর্শগত ঐক্য ব্যতীত পুরুষের যে গুণ নারীকে তাহার দিকে আকৃষ্ট করে সুপ্রিয়র মধ্যে তাহার কি কিছু পরিচয় পাওয়া যায়? সুপ্রিয়র সঙ্গে নিভৃত আলাপনের সুযোগ লাভ করিয়াও মালিনী যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—'ক্ষেমঙ্কর বান্ধব তোমার?' তারপর পরম ধৈর্যভরে সুপ্রিয়র মুখ হইতে ক্ষেমঙ্করের যে প্রশস্তিবাচন মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছে, তাহার মধ্যে কি তাহার কুমারী হৃদয়ের গোপন অভিলাষ তাহার দিকেই ধাবিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতে পারে না? তাহার প্রতি সুপ্রিয় চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে ঐ কথা শুনিয়া মালিনী যে পরম সংযত ভাষায়ও বলিয়াছে,

হায়, কেন তুমি তারে
আসিতে দিলে না দেখা মোর গৃহদ্বারে
সৌম্যমুখে? এ' ঘরে সে প্রবেশিত আসি
পূজ্য অতিথির মতো, শুচির প্রবাসী
ফিরিত স্বদেশে তার। —৪র্থ দৃশ্য

ইহার কি কোন নিগূঢ় অর্থ নাই?

তারপর উৎকণ্ঠিত হইয়া ক্ষেমঙ্করের কি দণ্ডবিধান করিয়াছেন, তাহা পিতাকে জিজ্ঞাসা করিবার কালে যে বলিয়াছে—

ওরে রমণীর মন,
কোথা রক্ষা মানে বলে করিস ক্রন্দন
মধ্যাহ্নে নির্জন নীড়ে প্রিয়-বিরহিতা
কপোতীর প্রায়?—কী করেছো বলো পিতা
বন্দীর বিচার?

তারপর পিতা যখন বলিলেন,—'প্রাণদণ্ড হবে তার' তখন সে যে পিতার নিকট তাহার হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল,

ক্ষমা করো একান্ত এ প্রার্থনা আমার
তব পদে।

তাহা কি কেবল মাত্র সুপ্রিয়র বন্ধু বলিয়া? এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। ক্ষেমঙ্করকে প্রথম দর্শনের মুহূর্ত হইতেই তাহার কুমারী হৃদয় তাহার দিকে আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল, সুপ্রিয় তাহারই বন্ধু বলিয়া তাহার সান্নিধ্যের মধ্য দিয়া তাহার স্মৃতিকে জাগ্রত রাখিবার সে প্রয়াস পাইয়াছে, সেজন্য সুপ্রিয়কে চোখের সম্মুখে হত্যা করিতে দেখিয়াও মালিনী ক্ষেমঙ্করকে ক্ষমা করিবার জন্য সে প্রার্থনা জানাইল। মালিনীর

চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য তাহা হইতে যে বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতক সুপ্রিয়কে সে জীবনে গ্রহণ করিতে পারে, তাহা কল্পনা করা যায় না। ক্ষেমঙ্করের প্রতিই তাহার প্রেম সঞ্চার হইয়াছিল তবে অটুট সংযমের মধ্য দিয়া তাহার প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া বাহিরের দিক হইতে তাহা সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না।

তবে এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, রাজার নিকট হইতে মালিনীর সঙ্গে সুপ্রিয়র বিবাহের সম্ভাবনার কথা শুনিতে পাওয়ায় তাহার মধ্যে যে কুমারী অনোচিত লজ্জার বিকাশ হইয়াছে, তাহা বিবাহের কথা বলিয়াই বিশেষ করিয়া সুপ্রিয়র সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক ছিল এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই।

কঠোপনিষৎ

॥ শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ ॥

ঝরঝর বৃষ্টিধারা দুর্গম পর্বতশিখরে
যথা ঝরে পড়ে'
উদ্দাম প্রবাহে ঝরে চলে
নিম্নতর পার্বত্য প্রদেশে
বিকীর্ণ উপত্যকা তলে।
অজস্র তরঙ্গ-রঙ্গে
গর্জনে
প্লাবনে অবশেষে
বিচ্ছুরিত বিস্তীর্ণ শতধা,
তেমনি যে, আত্মা থেকে প্রাণ-প্রবাহকে,
প্রাণীদের, নামরূপাশ্রিত এ বিশ্বকে,
ধর্মকে, পৃথক ভাবে বিভিন্ন বহুতা
জলধারা,—জল ভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির চিত্তকে :
মানুষ দেবতা পশু কীট পরমাণু
আকাশ বাতাস মাটি মেঘ নদী
চন্দ্র-সূর্য-নীহারিকা নক্ষত্র কুয়াশা—
সবলের মধ্যে একই 'অস্তি'র আলোর নির্যাস
পরম সাম্যের স্থিতি—না জেনে যে
বিভেদ রচনা
করে, তার সমস্ত আলোর উত্থান
নির্বাপিত, ক্ষিপ্রতার বিভেদের স্রোতে কলস্বনা
ভেসে চলে। বহুধা বিক্ষিপ্ত ছিন্ন
খণ্ড সাধনায়
সমস্ত বিনষ্ট তার। নিম্নগা জল কল্লোলের
মত সেও সহস্রধারায়
সংসারের কুহরে—গুহায়
পতিত বিলুপ্ত হয়, বড় জীবনের
কোনো অঙ্গীকার তার জীবনকে সমৃদ্ধ করে না।
কখন তাকিয়ে আখে পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আছে
মৃত্যুর বিভেদের সেনা। ২।১।১৪

(ভাবানুবাদ)

যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্মান পৃথক পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি॥
—২।১।১৪॥

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৩—

(৫৬)

১০টায় রেণু মঠে যায়, ঠাকুরের একটি ব্লক তৈয়ার করিবার জন্য ঘটো আনিতে। সন্তোনের পুঞ্জীভূত অভিযোগ—designation দেওয়া হয় নাই, আমাকে ছুতুরের মত দেখে, ছেঁড়া পাতায় খাইতে দেয়...। আমি গোড়ায়ই তাহার (সন্তোনের) এখানে থাকিতে আপত্তি করি প্রথম দিনের সভায়।...তাহার সে বক্তব্য করিয়াছিল। সে যখন থাকিবেই, তখন বলা হইল তোমার অর্থ উপায়ের কাজ কর, যতটুকু পার এখানের কাজ কর। তারিণীবাবুও তাহাই বলেন। কিন্তু অর্থ-উপায়ের কোন চেষ্টা সে করিতেছে না। এখানের সকলেই তাহার আচরণে বিরক্ত। শেষে সন্তোন রেণুকে বলিয়াছে, আমি নিত্যগোপালের doctrine বুঝি, নিত্যগোপাল বুঝি না। ইহা সে খুব জোর দিয়া বলে। অথচ সে নিত্যগোপালের কাজ করিবে। এও কি হয়? নিত্যগোপালের জীবনের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কি? তবুও তো আমি তার আর্থিক অবস্থার দিকে চাহিয়া এখানে চুপচাপ পড়িয়া থাকিয়া নিজের কাজ গুছাইবার পরামর্শ দিয়াছিলাম। কাজ নাই, টাকা নাই, কিসের designation? Designation পাইলে সে হাতে মাথা কাটিবে। তারিণী বাবু আসেন রাত্রি প্রায় ৯টায়। কথা হয়। ১০ টাকা আমি নিজে কাপড়-জুতা কিনিবার জন্য দিয়া রেখেছি। শতবার্ষিকী হইতে টাকা দিতে আমি অপারগ, আমি ওখানে কোনও কিছু নিয়া ভিক্ততা সৃষ্টি করিতে পারিব না...। ৯॥টায় পাঠ হয়...'প্রাণধারা ও কার্যকারণ সম্বন্ধ'। Like cause like effect—ইহা আজ অচল।...রেণু মন্তুর ওখানে যায়।...

১১ই অক্টোবর

ঠাকুর, 'শ্রান্ত হলে নদীতীর তরুতল পাই, তোর বুকে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমাই'। আমি যে এখনও বজ্রাঘাতের মধ্যেও মাথা ঠিক করিয়া ঘুমাইতে পারি, সে তোমার ঐ পাদপদ্মের মহিমাই। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত আমার দেহ-প্রাণ তোমার চরণতলে নিজকে ফেলিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত। আমাকে পথের মাঝে ফেলিয়া যে যাহার মত সরিয়া পড়িয়াছে...। তুমিই আমার সকল জটিল কুটিল সমস্যার সমাধান। চতুর্দিকে সমস্যার পর সমস্যা জমিয়া উঠিতেছে।...প্রতিভা বৈকালে বর্ষসূচী বিতরণ করিতে বাহির হয়। এ পর্যন্ত ৩ দিনে সে ৭৩খানা বিতরণ করিল। সন্তোনের সঙ্গে মঠে কথা হয়। তারিণীবাবু পূজার পর যাওয়ার কথা বলিয়াছে। এখন তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এমন নির্বোধ আর হয় না। 'সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা'। সে এই সম্প্রদায়ের কেহ নয়। কি তাহার দাবী? সে যাহা করিতে পারিত, তাহা এখানের কেহ পারে না। তাহাই যদি দৌড়াদৌড়ি করিয়া করিত, তবে তো ইহারা মাথায় করিয়া রাখিত। তাহার ব্যবহার ও কাজলপনা দিয়া সে সকলকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। 'অধিকার' পাইলে সে বজ্রাঘাত করিবে, এই ভয়ে কেহ designation দিতে সাহসী নয়। যাহারা 'কাজ' করিবার পূর্বেই 'প্রতিষ্ঠা' চায়, তাহাদের প্রতিষ্ঠা আসে না। তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া শুধু অপরের উপর ছড়ি ঘুরায়, কাজে ফাঁকি দেয়। সারা জীবন কর্মই করিয়াছি, পদমর্যাদা চাই নাই। প্রতিষ্ঠা তাই পিছনে ঘুরিয়াছে।...

১২ই অক্টোবর

ঠাকুর, তুমিই আমার আশ্রয়; তোমার অভিপ্রায়ই

আমার আত্মা। আমার জীবনে তোমার কি অভিপ্রায় তাহাকে জানাই আমার আত্মজ্ঞান, তোমার অভিপ্রায়কে ভালবাসাই আত্মপ্রেম। ইহার ভিতরে কোনও অভি-সন্ধির স্থান নাই—ধর্মাভিসন্ধি অর্থাভিসন্ধি কামাভিসন্ধি মোক্ষাভিসন্ধির গন্ধও নাই। তুমি-আমি সহজ বন্ধনে বদ্ধ।...আমার সামনে পিছনে, দক্ষিণে বামে, উর্দ্ধে অধে। তোমার জীবনে আমি সর্বসমন্বয় আস্বাদন করিয়াছি। আমি সর্বসমন্বয়মূর্তি হইব, তুমি হইব। ১টার পর কমলানন্দ আসে। তাহার সঙ্গে 'নিরাকার' পদের অর্থ ঠাকুর কেমন করিয়াছেন তাহাতে কেমন করিয়া আকার-নিরাকার সাকারের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে, এপারের ওপারের সমন্বয় হইয়াছে, মায়াবাদ খণ্ডিত ও সমধিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করি।...এখানে— সর্বত্র লেখাপড়া শিখিয়া যোগ্য হইবার জন্য, প্রচার করিবার জন্য একটা ব্যর্থ খেয়াল পোষণ করিয়া চলিয়াছে। এখানে 'আসা' নাকি তাহার ব্যর্থ হইয়াছে। রাজা অন্ত লোকদারা হইতে পারে—কাজেই উহা ছোট কাজ। আমার সাক্ষাৎ সেবা যেহেতু সেবা মনে ধরে না। অর্থাৎ 'কর্ম' কেহ চায় না। এই রোগ এখানেও প্রবেশ করিল। কীর্তন করা বড় কাজ আর মহোৎসবে রান্না করা ছোট কাজ—কি মন্দ বুদ্ধির পরিচয়। কত বড় বিপদের মধ্য হইতে ঠাকুর তাহাকে রক্ষা করিয়া এখানে আনিয়াছেন, সে জন্য কোনও কৃতজ্ঞতা নাই, তৃপ্তি নাই। কেবল সুযোগের খোঁজ করিলে কি মানুষ সুযোগ পায়? আত্মতৃপ্তি যাহার নাই, ভগবানও তাহাকে তৃপ্ত করিতে পারেন না। স্বধর্ম ও স্বকর্মকে অবলম্বন করিয়া কেহ অগ্রসর হইতে চায় না। পর ধর্মের জন্য, পর কর্মের জন্য মানুষ পাগল। অথচ এই পাগলামি তো খেয়াল মাত্র, কল্পনা মাত্র। উহা কখনও বাস্তব নয়।...

১০ই অক্টোবর

মা, আমার সকল দেহ প্রাণ মন অধিকার করিয়া তুমি বস। আমার জীবনে তোমার অধিবাস হউক।... শিবের সংসার করিতে চাহিয়াছিলাম যেখানে লক্ষ্মী-সরস্বতীর সমন্বয় হইবে, কার্তিকেয়-গণেশের মহামিলন সংঘটিত হইবে। সে আশা আমার সফল হয় নাই। আজ আছে শুধু চোখের জল আর বুকভরা বেদনা।... বিশ্বের মাঝে প্রাণ খুলিয়া বিচরণ করিব।...বুদ্ধিরূপে তুমি আমার জীবনে প্রকাশিত হও। আমার বুদ্ধিকে পুরুষো-ত্তমময়ী কর।...শ্রীকৃষ্ণ তিন বাঞ্ছা পূরণের জন্য শ্রীগৌর হইলেন। শ্রীগৌর হইলেন শ্রীনিত্যগোপাল নিজ আরব্ধ কর্ম সম্পাদনের জন্য, 'মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী'—'অতএব মুক্তি করিব সন্ন্যাস'—বর্ণাশ্রম ও সহজিয়া সমন্বয়, 'নারদী প্রকৃতি হয়ে মুনেরপি মন'—নারীর মর্যাদা স্থাপন, গার্হস্থ্য-সন্ন্যাস ভেদ দূরীকরণ। শ্রীনিত্যগোপাল ব্যতীত আর কাহাকেও কি বাহির করা যাইবে যাহার জীবনে মহাপ্রভুর আরব্ধ কার্যের ক্রম বিবর্তন এত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে? প্রতিভা আজ কণ্ঠসূচী বিস্তার করিয়া আসে।...

১৪ই অক্টোবর

মহাকালী মুক্তকেশী মা আমার, তোমার ঐ বিপ্লবময়ী মূর্তি বুকে লইয়া জীবনপথে চলিয়াছি। অতীত সংস্কার—মধু কৈটভ—সামাজিক, নবনারী সম্বন্ধীয়, ভক্ত-ভগবান সম্বন্ধীয় সব সংস্কার ভাঙিয়া চলিয়াছি। তোমার কোলে থাকিয়া মধু-কৈটভ ভয়ে আমি ভীত নই। নবীন সৃষ্টির উন্মাদনা আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। আমি আজ রণ ক্ষেত্রের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সব প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে যুঝিয়া চলিয়াছি। তিল তিল করিয়া সারাজীবন বুকের তাজা রক্ত তোমাকে বলি দিয়াছি। কখনও যখন যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পড়ি, আবার তোমার অমৃত পান করিয়া নবীন বল পাই। মা, কেহ তো আমার সঙ্গে যুদ্ধ না করিয়া ছাড়ে নাই। রণ-রঙ্গিণী মা, তোমার কৃপায় এই ভাঙিয়া-পড়া সমাজকে আবার তোমার জ্ঞানানন্দে গড়িয়া তুলিব। মা, বল দেও। রেণু গোপালসহ ১টার পর মঠ হইতে ফুল নিয়া আসে ও মালা গাঁথে।...বেহালার বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় আসেন। তাহার সঙ্গে 'পাওয়ার পর সাধনার' কথা বিশেষ উল্লাসের সঙ্গে আলোচনা হয়। ...কাল (সন্তোষ শাস্ত্রীকে) বলিয়াছিলাম—যে নিত্য-গোপালকে আমি এত ভালবাসি, তুমি যদি তাহাকে না ভালবাস, অথচ বল আমাকে ভালবাস, আমার সে

ভালবাসা কি ভাল লাগে?···কুসুম আজও আসিল না। কি দুঃখ যে ইহারা আমাকে দিতেছে।···

১৫ই অক্টোবর

মহালক্ষ্মী ঘাবাবাবী আমার, তুমি একা, সর্বদেবশক্তীময়,। মহিষাসুর মর্দিনী, সকল স্বয়ংসুলাধার কেবল জীবসমূহের মধ্যে সংগঠনকারিনী। তোমাকে ঘিরিয়া বিশ্বের সর্বজাতি সর্বধর্ম, সর্ব আশ্রম, সর্ব সমাজ এক হউক, অদ্বৈত হউক। সারা জীবন সঙ্ঘ সঙ্ঘ করিয়া কাঁদিলাম। শিবের সংসার, কুবেরের সংসার করিব বলিয়া বাহির হইয়াছিলাম। পারিলাম না তো। কেবল পিতা, কেবলা মাতা, কেবল স্বামী, কেবলা স্ত্রী সংহত হউক, সঙ্ঘ গড়িয়া তুলুক। তবে না আনন্দময়ী তোমার বুক আনন্দে উছলিয়া উঠিবে, সন্তান যখন হাত ধরাধরি করিয়া মায়ের চারিদিকে দাঁড়াইবে, তখন মায়ের কি শান্তি! তোমাকে আনন্দ দেওয়াই হউক আমাদের আনন্দ। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি মুছিয়া ফেলিব। রেণু গোপালকে মঠে গিয়া স্কুল আনে। প্রতিভা ১২টার পর মঠে প্রসাদ পাইতে যায়। প্রসাদ পায় ৪টায়।...আমি ৪টার একটু পূর্বে মঠে যাই।···শিশির এখান হইতে মঠে যায়, তাহার সঙ্গে বিকাশ চলিয়া আসি।···না আসার কারণ কত ছোট। এই তো অনুরাগ আমার প্রতি,—র প্রতি!···

১৬ই অক্টোবর

বিজয়া দশমী (প্রাচীন মত)

মা, মহাসরস্বতি, আমি কালী-কুমার, আমি মুক্তকেশী-দুলাল। আমার কেশ হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের সবটুকু মুক্ত হউক। মুক্ত ছাড়া কেহ ভোগ করিতে পারে না। আমার জীবনের বন্ধ ভোক্তা তত্ত্ব নিস্তব্ধ মুক্ত হউক তোমার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া, শরণাগত হইয়া। তোমার মত করিয়া আমাকে গড়িয়া তোল—'সাজারে যে মা তোর সন্তানে'। আমি কালীকুমার হইব—আমির ভাল দিয়া সব কিছু ঢাকিয়া রাখিয়াছি, আমার সেই বিকল্প বসন দূর কর। সহজ জীবন দাও···আমি ও বিশ্বসত্ত্ব গলিয়া এক হইয়া অদ্বৈতানন্দ লাভ করিব।...কেহই তো কিছু করিতে পারিল না। সকলেই স্থিতিভূমি হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিছু গড়িয়া তোলার মত মনোবল, বুদ্ধি ও কর্মকুশলতা ইহাদের নাই। আমি 'একা' শুধু দাঁড়াইয়া আছি। ইহাদের পাইলে কলিকাতাকে 'আক্রমণ' করিতাম। এ অভিযান কেহ সামলাইতে পারিত না। ঠাকুরের জীবনদর্শন অদ্ভুত। উপরোক্ত কথাগুলি প্রণাম পাইবার সময় শিশির-সন্তোষের কাছে বলি। মাখনবাবু আসে। বর্তমানে আধুনিক সব প্রতিষ্ঠানেই নাকি চক্ষু নীচের দিকে ঝুঁকিয়া আছে। দৃষ্টি সার্বজনীন নয়, শুধু অসুরের দিকে দৃষ্টি। মিসুর মানসিক অবস্থা এলোমেলো। যাহার কাজের মধ্যে সে কোনও বড়ত্ব দেখে না। ইহা তো সকলেই পারে। শাস্ত্র পড়া, প্রচার করাই ঠাকুরের বড় কাজ। বলার জন্য সে ভিতরে ভিতরে অস্থির। কী যে করিব বুঝিতেছি না। চলিয়া গেলে তো ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কথামত চলিলেও কিছু করিতে পারিতাম। তাহার তো অনেক কথা থাকে। সন্ধ্যায় বিমলা আসে মোটরে, তাহার মেয়েরাও আসে।···

১৭ই অক্টোবর

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তমতে বিজয়া

মা দুর্গা, বিজয়া, ঘরে বাইরে সর্বক্ষেত্রে পরাজিত বিশ্ব বিজয় লাভ করুক। ইন্দ্রিয়ের কাছে আমরা পরাজিত, রূপরসগন্ধের ক্ষেত্রে পরাজিত। মুক্তি দিব, মুক্তি পাইব—ইহাই বিজয়। পুরুষোত্তম ছাঁচে বিশ্ব গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প লইয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম—বিশ্ববিজয় সঙ্কল্প সার্থক হউক, বিশ্বময় কোলাকুলি প্রতিষ্ঠিত হউক। ভাইয়ে ভাইয়ে, পরিবারে পরিবারে, সমাজে সমাজে, জাতিতে জাতিতে প্রতিষ্ঠিত হউক কোলাকুলি। বিশ্বের ধূলি হউক ব্রহ্ম-রজঃ, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম মানুষ। আজ সকালে রেণু রান্না করে।···ঠাকুরের সামনে বসি ও আলোচনা করি, প্রার্থনা করি, ভাইয়ে ভাইয়ে একপ্রাণ থাকিবার কথা বলি। কুন্টু আসে। কলিকাতার পূজায় প্রাণ কই? মনে পড়ে, ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায় যখন ঢাক বাজিয়া উঠিত তখন প্রাণটা কেমন করিত, মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া কেমন করিয়া কাঁদিতাম, বিসর্জনের সময় কেমন করিয়া আকুলভাবে কাঁদিতাম। এখন বিসর্জনে

বেদনা কই? উৎসবও নাই, ধর্মও নাই, সামাজিকতাও নাই। আছে শুধু হৈ হৈ। মা আসিয়াছেন, সব সন্তান এক হও, মায়ের মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিবে।...

১৮ই অক্টোবর

ঠাকুর, 'রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে'? কাহার কাছে দাঁড়াইব, কেহ তো আর তেমন করিয়া শুধায় না, 'পরং কেমন আছ'? কাঁকর-মিশ্রিত চাউল খাওয়াইতে তোমার যে-বেদনা সেদিন তোমাকে পাইতে দেখিয়াছিলাম, কেহ তো আজ আর নাই তেমন বেদনা অনুভব করিবে। আজ যে কত অনাদর, কত অযত্ন পাই, তাহার জন্য কেহ তো ব্যথা পায় না। কত দিন হয় গিয়াছ! কেহ আর তেমন ডাকে না, খোঁজে না, খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে না। ঠাকুর, তুমিই আমার জীবনে সব।...৩টার সময় আমি বেণু ও গোপা মঠে যাই...। ঠাকুরের ওখানে যাই, রান্নাঘরের সামনে একটু বসি। বলি—দেহে প্রাণে মনে তাঁহার ভাবিত করিয়া লও। মঠের সব ভাল লাগিল, চোখে জল আসিল।...জ্ঞানানন্দ তাহার লিখিত গ্রন্থ দেখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। পরে একদিন আসিব বলিলাম।...

১৯শে অক্টোবর

ঠাকুর, ১৩১২ সনের ১৩ই অগ্রহায়ণ পথের মাঝ হইতে আমাকে তুলিয়া লইয়াছিলে। আমাকে অঙ্গীকার কর, তোমার অঙ্গ করিয়া লও, আমাকে স্বীকার কর, 'স্ব' করিয়া লও। আমি তোমার সঙ্গে এক দেহ এক প্রাণ, এক মন একাত্মা হইয়া আমার সকল সমস্যার সমাধান করিয়া লইব। যখন তুমি আর আমি দুই, তখন সেই ব্যবধানের মাঝে সকল সমস্যা ভিড় করিয়া দাঁড়ায়। অদ্বৈতানুভূতিতেই সর্ব সমাধি বা, সর্ব সমস্যার সমাধান নিহিত।... তুমিই আমার মাথা গুঁজিবার স্থান। সকালে বিরজা আসে...। বেণু রান্না করে। ১১টায় শিয়ালদহ যাই, গাড়ী আসে ১২-৭-এ; কুসুমকে নিয়ে আসে।...মণি বাগচীর কাছে ঠাকুরের দর্শন আলোচনা করি।...

২০শে অক্টোবর

ঠাকুর, তোমার চাওয়া পাওয়ার মাঝে আমার চাওয়া-পাওয়ার মহানির্বাণ লাভ হউক। তুমি আমাকে পাও—ইহাই আমার আজিকার প্রার্থনা। আমি তো তোমাকে চাই নাই, তুমিই চাহিয়াছ। তোমাকে পাইয়া আমার যে আনন্দ, তাহার কোটিগুণ আনন্দ তোমায় আমাকে পাইয়া। তোমার পাওয়ার মাঝে আমি ডুবিয়া যাইব, তোমার পাওয়ার আনন্দের মাঝে আমি আমার সকল সত্তা-চৈতন্য-আনন্দ সমর্পণ করিব। তোমা হইতে আমার স্বতন্ত্রতা মুছিয়া যাউক। তুমি আমি এক হই।..গীতার কোন্ কোন্ শ্লোক অবলম্বন করিয়া আমি প্রচলিত সমস্ত ভাষ্য টীকা হইতে সরিয়া গিয়া ঠাকুরের দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় ভাষ্য লিখিতেছি, তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত

২১শে অক্টোবর

ঠাকুর, আমার মূলা প্রকৃতির মধ্যে এমন বিপ্লব আনিয়া দেও যাহাতে আমার প্রকৃতি পরা প্রকৃতিতে গড়িয়া উঠে। শ্রীরাধাই পরা প্রকৃতি। আজ রাধা প্রকৃতি লাভ করিতে হইবে এই বিশ্ব প্রকৃতিকে। বিদ্যা-তপ-প্রাণ নিরোধ-ব্রত-দান-অসময়ে অত্যন্তশুদ্ধি লাভ হয় না; কেননা মূলাপ্রকৃতির বদল না হইলেও বিদ্যা সাধন প্রভৃতি সম্ভব হয়। বর্তমান যুগ প্রকৃতি-বিপ্লবের যুগ, স্বভাব পরিবর্তনের যুগ। শ্রীরাধা বিনীতা বিরহা, পরস্পর বিরুদ্ধধর্মাশ্রয়ী—কন্দর্পী বৈষ্ণবী আমি রাধা হইব, রাধাভাব লাভ করিব। জোরে উষাঙ্গিনী মহুর বাসায় যায়। গীতা ৫৲ টাকা ম.ও. করিয়া পাঠাইয়াছে। যতীন মজুমদার এক পত্র দিয়া বিজয়ার প্রণাম জানাইয়াছে। সচ্চিৎবাবু হাঠাৎ আসেন, তাহাকে মিষ্টি দেওয়া হয়। অনেক সেবা ইহারা নবনারায়ণ আশ্রমের করিয়াছেন।...কথামত ধার্মোমিটার দেয় না এবং বলে যে জ্বর নাই, তাই দেয় নাই—তাই খুব রাগ করিয়াছি। দুঃখও হয়, রাগও হয়। আমি যে কতখানি অপেক্ষা ইহাদের জন্য করি, তাহা কি ইহারা বোঝে? কে কতখানি এই সংসারে কাহার জন্য অপেক্ষা করে তাহা আমি জানি। ...২টায় আমি বেণু ও গোপা রিক্সায় প্রকাশ সরকারের বাসায় যাই। সেখানে

মঠের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন···।...গোপার উপর 'চাপ' ছিল, এবার তাহা নাই দেখিয়া সে (কুসুম) খুশি —ইত্যাদি উক্তি আমাকে বেদনা দেয়, তাহা সে বোঝে নাই। গোপার কল্যাণ অকল্যাণ সম্বন্ধে আমাকে ভিন্নাইয়া তাহার দুশ্চিন্তা অশোভন, অন্যায়।

২২ অক্টোবর

ঠাকুর, তুমি অযাচিত করুণায় আমাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলে, তোমায় আদর করি নাই। তুমি সারা জীবন আমাদের অপেক্ষায় ছিলে, আমরা করিয়াছি উপেক্ষা। আমরা ছিলাম তোমার ইষ্ট।...তবুও তো আজিও আগলাইয়া রাখিয়াছ। 'তোমার খুশি চেয়ে আছে আমার খুশির পানে'। আমি তোমার খুশি হওয়ার দিকে চাহি নাই, আমি আমার খুশি নিয়াই ছিলাম বিভোর। তোমার খুশি হওয়ার মাঝে আমি খুশি—ইহাই আমার সারাদিনের প্রার্থনা। তোমার স্নেহমাখা নয়নের চাহনির মাঝে আমি ঝাঁপ দিব, ডুবিব, তোমার সঙ্গে এক হইব। বিচ্ছিন্ন থাকিয়া আর কষ্ট দিব না।...'প্রাণ-সাধনা' প্রবন্ধের মধ্যে 'নৈবাত্মনঃ···' শ্লোকটী চুকাইয়া দেই। নারায়ণকে সঞ্চিত করিলে নরের সঞ্চিত হওয়া আপনিই হয়। কবে তোমার মননের মাঝে আমার মনন সহজ হইবে? আমি আর আমাকে মনে করিব না, মনে করিব তোমাকে। মনের বিষয় হইবে তুমি, আমি নই। আমার মন লীন হউক, বুদ্ধি লয় হউক, তোমার মন হউক আমার মন, তোমার বুদ্ধি হউক আমার বুদ্ধি, তোমার আমি হউক আমার আমি। আমি তোমার counter part হইব। জীবনে সকলের সঙ্গে এক হইতেই চাহিয়াছিলাম মনের লেঠা চুকাইয়া। 'বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্ট'। কুসুমের স্বভাব আমার। সকালে — আসিয়াছিল। তাহার সঙ্গে সরল প্রাণে অকপটে কথা বলিয়াছি। একদিন সে কত কাছে আসিয়াছিল। সে দিন তো আমার বর্তমান। কোনও অতীতকেই অতীত হইতে দিতে ইচ্ছা হয় না। আমি বর্তমানের মাঝে অতীতকে পরিণাক করিতে চাই। আমি নিত্যের উপাসক। অতীতেরও না, বর্তমানেরও না, ভবিষ্যতেরও না।

২৩শে অক্টোবর

ঠাকুর, তুমি আমার সামনে অনন্ত কর্ম-জ্ঞান-প্রেমের ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছ। আমার তো মরিবার অবসর নাই। আবার আমায় পিছনে ফিরিয়া যৌবনে যাইতে সাধ হয়। নইলে ছুটির কেমন করিয়া? আমার মনের লেঠা চুকাইয়া যাও, মনের জঞ্জাল পুড়িয়া ফেল। তুমি আমি এক হই। তুমি বারবার ভিখারীর মত 'মন' চাহিয়াছ—'মন্মনা ভব', 'মযোব মন আধৎস্ব', 'মযর্পিত মনোবুদ্ধিঃ' ইত্যাদি। অনন্ত কর্মের পথে তুমি আমার সখা সাথী বন্ধু। সকলে ছাড়িলেও তুমি ছাড়িবে না। 'যোঽবসিস্যতে সোঽহমস্মি'।...কুসুমের উদ্যাপ ১০০ মিষ্ট রান্না করিতে চাহিয়াছিল, সেই নাই (শরীর সুস্থ নাই বলিয়া)। রেণু রান্না করিয়াছে দুপুরে। সব অসুস্থদের হাতের রান্না খাইতে অরুচি বোধ হয়। আমি এমনই নিরুপায়। অথচ একটী মেয়ে থাকিতে রান্নার লোক রাখিতে হইবে? টাকাই বা কোথায়? রেণু দুপুরের পর কার্তিক মাসের পাণ্ডুলিপি দিয়া আসে।···

২৪শে অক্টোবর

রাধারাণী···বিশ্বের সকলের সব গোপন চোখের জলের ঘন বিগ্রহ তুমি। যেদিন কৈশোরে যেচ্ছায় কাঁদিতে চাহিতাম, কাঁদিতাম, সেইদিন হইতে তুমি আমার সঙ্গিনী রূপে আছ। বিশ্বের সব হাহাকার, সব কান্না, সব লাঞ্ছনার বিগ্রহময় সার্থক রূপ তুমি। তুমি সকল না এর positive রূপ, তাই তুমি নৈর্ব্যক্তী। কান্না দিয়া তোমায় তবু গড়া, তুমি মূর্তিমতী কান্না।... অনন্ত রূপরসের জন্য সাধের যে বেদনা, তোমাতেই সে রূপ যাচন করিয়াছে। বিশ্বের কান্নাই আজ আরাধনা রূপে তোমাতে সার্থক। কান্না আজ আরাধনা, শ্রীরাধা। ৪।৪টায় 'প্রাণ ধারা—কার্য্যকারণ সম্বন্ধ' পাঠ করা হয়। আমি ব্যাখ্যা করি। কারণ ও কার্যের মধ্যে একটী

সহজ পরকীয়া শক্তি আছে বলিয়াই কারণের রূপগুণের অনুরূপ কার্যের রূপ-গুণ হয় না। নিয়তিবাদ আজ বিজ্ঞানেও অচল। Exception ও rule-কে একই বৃহত্তর rule-এর মধ্যে ফেলিয়া উভয়কে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অমর ব্রহ্ম হইতে ক্ষয়ধর্মশীল জগৎ সহজভাবেই উৎপন্ন হয়। বাহির হইতে কোনও অচিন্ত্য শক্তি আমদানী করিয়া ব্রহ্মের সঙ্গে জুড়িয়া দিবার প্রয়োজন নাই। কর্ম ও কর্মফলের মধ্যে ঐ পরকীয়া শক্তি রহিয়াছে। তাই প্রারব্ধও কাটে। যে আগুনে কাঠ পোড়ে, তাহা হইতে তীব্রতর আগুনে লোহাও গলে। জ্ঞান-সাধনায় প্রারব্ধ কাটে না, কিন্তু ভক্তির আগুনে প্রারব্ধও গলিয়া যায়—'দুঃসহ প্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধূতাশুভাঃ' —ভাগবত বলিয়াছেন। তীব্র বিরহে ব্রজগোপীদের প্রারব্ধ ক্ষয় হইয়াছিল। সুধাংশু আসে বৈকালে—সে লক্ষ্মীপূজার যে ১৸০ দক্ষিণা পাইয়াছিল, তাহা আমাকে দিয়া যায়।...

২৫শে অক্টোবর

রাধারাণী আমার, বিশ্বের পরাশক্তি, পরকীয়া শক্তি আমার, তুমি মূলাশক্তি বলিয়াই এই বিশ্বের দুইটী অণু ও ধ মর্যাদা রক্ষা করিয়া, ব্যবধান রক্ষা করিয়া পরস্পরের সঙ্গে অন্যোন্যমিথুন ভাবে যুক্ত থাকিতে পারিতেছে। তুমি তাই যোগমায়া। তোমার এই তত্ত্ব বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার লালসায় রাধাভাব দ্যুতি-সুবলিত গৌরসুন্দর নিত্যগোপালরূপে প্রকট হইলেন। আমি শ্রীনিত্যগোপালকে রামগোপালরূপে ব্রজগোপাল-রূপে ও গৌরগোপালরূপে দেখিয়াছি। 'আমি বড়ভুজ হই' বলিয়া একদিন শ্রীনিত্যগোপাল রাম-কৃষ্ণ-গৌর হইয়াছিলেন। তিনিই আমার মূল; তাঁহার রস আহরণ করিয়াই আমি বাঁচিয়া আছি। তাঁহার আদেশের মানে আমি মহানির্বাণ লাভ করিব।...প্রতিভা রান্না করে।...জ্ঞানবাবু পত্রবাহিকীর একজন সভ্য হইয়াছেন... প্রতিভা বৈকালে কর্মসূচী বিলি করিতে যায়।...

২৬শে অক্টোবর

...যেখানে প্রতি দুইটী পরমাণু ও ধ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া নিজ নিজ রক্ত দিয়া একে অন্যকে পোষণ করে, সেই দেশই তো ব্রজ ধাম। তুমিই ব্রজ ধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিশ্বের সকল সম্বন্ধকে পরকীয় রাখিয়া, অন্যোন্য নিরপেক্ষ রাখিয়া অন্যোন্যসম্বন্ধবহ করিয়া রাসমণ্ডল রচনা করিয়াছেন। তুমি তাই রাসেশ্বরী, রাসবিলাসিনী। তুমি নিত্যগোপাল সাজিয়া আসিয়া বিশ্বের বুকে ব্রজপথ আঁকিয়া দিবে। আমি সেই পথে চলিব...। ৪টায় আমি মঠে যাই।...ঠাকুরের দর্শন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়। প্রায় ২৫০ জন সভ্যের নাম লেখা হইয়াছে। যে ২০০০ টাকা ট্রাস্ট বোর্ডের নিকট চাওয়া হইয়াছিল তাহা প্রয়োজনমত দেওয়া হইবে বলিয়া তাহারা স্থির করে।...সাময়িকী 'কলিকাতার দুর্গাপূজা কোন্ পথে?' লেখা শেষ হয়। বেণু ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। শিশুদের কতখানি আব্দার, কতটুকু দুষ্টামি সহ্য করিতে হইবে, তাহা জানা দরকার। মনে পড়ে শিশু বয়সে অবোধ মধ্যে বালি খাওয়া লইয়া মাকে কত উত্যক্ত করিয়াছি। শিশু তো কিছুটা করিবেই, নচেৎ শিশুত্বের অর্থ কি? শিশুর মত করিয়াই তো শিশুকে পালন করিতে হইবে। বৃদ্ধের মত শিশুকে দেখিলে চলিবে না। আমার আসিতে দেরী দেখিয়া বেণু মঠ পর্যন্ত যায়।...

২৭শে অক্টোবর

ঠাকুর, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল একটা সর্বজনীন ভাবের ক্ষেত্রে। সেই সম্বন্ধ যখন আমার পরিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে অবতরণ করিতেছে, যখন আমার সকল দেহপ্রাণমন তাহার সকল জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার লইয়া মুখোমুখী দাঁড়াইল এবং সেখানে বিরাট বিপ্লব আনয়ন না করিলে যখন তোমাকে কিছুতেই আপনার করা যাইতেছে না, তখনই লাগিল গণ্ডগোল। এই গণ্ডগোলের মাঝে পড়িয়া একদিন শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন, 'হাম সে অবলা সরল অবলা ভালমন্দ নাহি জানি'—যখন শ্যাম বঁধুয়ার সনে প্রেম করিয়াছিলাম, তখন কি জানিতাম এত জ্বালা। অর্থাৎ এমন করিয়া দেহপ্রাণমনকে ওলট পালট করিয়া দিয়া সে আমাকে তাহার মত করিয়া লইবে। সকল খুঁটিনাটির মাঝে ভগবান 'অবতরণ' করিলে

জীবন চড়চড় করিয়া উঠে। ইহাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধও এমনই এক পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে।···ঠাকুরের ব্রত করিবার জন্ত কটো দিয়া আসে বেণু। দুপুরে যখন প্রতিভা আসে, তখন অনেক কথা হয় আমার নিজের সম্বন্ধে—হাজার খানেক টাকা আমি ইহাদের দিয়াছি; আর আমার সেই দিয়াছি তোমাদের—যেমন কৃষ্ণ নারায়ণী সেনা দিয়াছিলেন দুর্যোধনদের আর নিজকে দিয়াছিলেন যুধিষ্ঠিরদের। আমি ইহাদের মধ্যে আছিও চটে, নাই-ও বটে—'সৎ ও অসৎ' দুই-ই। একদিন যে-আমি ভাবিতে পারি নাই যে, সত্যব্রতকে ছাড়িয়া যেদাত বাহির করিব, যে-আমি একদিন কল্পনাও করিতে পারি নাই যে কেমন করিয়া কলিকাতায় থাকিয়া ইহাদের সঙ্গে থাকিব না, সেই আমি একই বাড়ীতে পৃথগন্ন হইয়া আছি, অথচ ইহার মধ্যে কোনও ঝগড়া নাই। ইহারা মনে করিতে পারে না যে আমি ইহাদের নই, অথচ 'নই' যে তাহাও তো সত্য। এজন্ত আমার মনের উপর যে কত বড় বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে! আমার মন যে কতখানি flexible তাহা অনুধাবন করিতে বসি। সন্ধ্যার পর চালিশগ্রের সুধা ও তাহার মা মেয়েদের নিয়া আসে।···

২৮শে অক্টোবর

ঠাকুর, দেখা দাও। রাজরাজেশ্বর, আমায় দেখা দেও। ভুবনমোহন, বিশ্বের প্রতি কর্মে, জ্ঞানে ও ভালবাসায় আমায় দেখা দাও। কি আর আছে আমার, হৃদয়ের ধন, ভিখারিণীর সর্বস্ব ধন আমার। পথে পথে আমি তোমায় খুঁজিতেছি, আমায় দেখা দেও। তোমার ভুবন আলো করা রূপে আমায় দেখা দেও।···সুবোধ মিহুকে দেখে, মুখে কিছু নাই বলিল। আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। গোপার উত্তাপ···। ভূদেবের অব কমের দিকে।···বেণু ২টায় বাহির হয়, কবিরবাবুর ওখানে যায়—তিনি শতবার্ষিকীর সভা থাকিবেন···। প্রতিভা কর্মসূচী বিতরণ করিতে গিয়াছিল। সকালে সন্তোষ আসে। মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পক্ষে ছিলেন না, অথচ সন্ন্যাস নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইবার নিত্যগোপাল-রূপে তিনি 'না গৈরিক না সাদা কাপড় পরিয়া' আসিয়াছিলেন। প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্ম ও মায়াবাদে তফাৎ অতি সামান্ত। মায়াবাদের ব্রহ্ম জগতের ওপারে—সাধনা তাহার বৈরাগ্য, কাজেই জগৎ মিথ্যা। বৈষ্ণবের ঠাকুরও গোলোকে বা বৈকুণ্ঠে—তফাৎ এইটুকু যে মায়াবাদীর ব্রহ্ম নিরাকার, ভক্তের কল্পনার নাকার। নিত্যগোপাল 'আকাশ'কে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, বাস্তবিকই ব্রহ্ম বলিয়াছেন, জড় তাঁহার কাছে অজড়ের ঘন রূপ, যেমন তুষার জলের ঘন রূপ। জড়কে এইভাবে সত্য বলিলেই মায়াবাদের নিরসন হয়। সচ্চিদানন্দই বিগ্রহ।

২৯শে অক্টোবর

শ্রীনিত্যগোপাল, তুমি নর-নারায়ণ, নররূপে নারায়ণ, নরের দৃষ্টিকোণে তুমি নারায়ণ, ধরার ধাত্রী সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া তুমি নারায়ণ। মীন রূপ তুমি, হৃতধানসি বেদম্, রাখিয়া গেলে 'চরিত্রমবেদম্'। তুমিই কূর্মরূপে পৃষ্ঠে ধরণী ধারণ করিলে, শূকররূপে তাহাকে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিলে, বামনরূপে বলিকে ছলনা করিলে, ভৃগুপতি রূপে ক্ষমতাদৃপ্ত লোভের ক্ষত্রিয়ের হাত হইতে ধরাকে রক্ষা করিলে, শ্রীরামরূপে অপহৃতা লক্ষ্মীকে ঘরে ফিরাইয়া আনিলে, হলধর রূপে কৃষি সভ্যতার প্রবর্তন করিলে, গোষ্ঠবিহারী-রূপের সার্থকতা প্রদান করিলে, কল্কিরূপে তুমি ধরার ম্লেচ্ছভাব দূর করিলে।···মিহু বলে, শরীরের কষ্ট ভোগ করার চেয়ে মরা ভাল। শারীরিক ও মানসিক দুঃখ ভোগ যে তপস্তা, তাহাতে যে কর্মবিপাক কাটে, তাহা বুঝাইতে আমি গলদ্‌ঘর্ম। দুঃখকে ভগবানের আশীর্বাদ মনে করিতে পারিলে দুঃখ আর দুঃখ থাকে না। বেণু ২টার পর বাহির হইয়া ···।···

৩০শে অক্টোবর

রাধারাণী আমার, স্বরগঙ্গলখণ্ডন তোমার পায়পল্লব শিরোভূষণ করিয়া কৃষ্ণ মদনমোহন। দর্শনে রাষ্ট্রে সমাজে অনাদৃতা প্রকৃতির মহিমা-মণ্ডিত রূপ তুমি। ব্রজে তুমি 'রাই' রাজা; কৃষ্ণ সেখানে তোমার দারবান। তাই কৃষ্ণ পুরুষোত্তম। কাপুরুষ যাহারা তাহারাই প্রকৃতিকে ভোগ করিয়া থাকে। পুরুষোত্তম করেন প্রকৃতির ভজন। অথচ ঐ ভজনের মধ্যেই রহিয়াছে

দিয়া জোগ। যেখানে ভজনা নাই সেখানে জোগ দুর্ভোগ মাত্র। 'রাধাকে ভজিয়া রাধাপ্রেম নাম পেয়েছি অনেক আগে।' শ্রীরাধা, শ্রীরাধা, শ্রীরাধা, পরাণপুতলী আমার! বিশ্বপ্রকৃতিতে তোমার প্রকাশ তত্ত্বযুক্ত হউক। অতীনবাবু আসেন ৮টায়। আশ্বিন মাসের উদ্বোধনটায়ত তিনি পড়িয়াছেন। ভালও লাগিয়াছে। দার্শনিকভাবে বিশ্ব স্বীকৃত না হইলে যে বিশ্বরূপের পূজা করিবে ইহাই বলিলাম। নিত্যগোপাল আসিয়াছেন এই দার্শনিক বিষয় লইয়া। ঠাকুরের সিদ্ধান্তদর্শন হইতে কিছু পড়িয়া শুনাই। ৩টায় আমি মঠে যাই।...৪টায় শতবার্ষিকীর সাধারণ সভা আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত ৪০ জনের উপর সভা উপস্থিত হইয়াছিল। বঙ্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়াছিল। সাব কমিটি গঠিত হয়। আমার আলোচনা বেশ জমে। বেণু কর্মসূচী পাঠ করে। বেণু তাহার প্রবন্ধ পড়ে। ঠাকুরই যে বর্তমান বিশ্বের সর্ববিধ নৈতিক আন্দোলনের মূল উৎস, তাহা জোর দিয়া বলি। নির্মলাদিদি, সুশীল, চারু দত্ত প্রভৃতিও ছিলেন। প্রতিভা ছিল। যোগানন্দ গড়িয়া শিবতলা মঠে ৮ই নভেম্বর সভায় যোগদান করিবার জন্য আবেদন জানায়। আগামী শনিবার মঠে প্রথম সভা করিয়া পরে রবিবার গড়িয়া সভা করিবার কথা খগেনবাবু বলেন। তাহাই কথা হইবে। আগামী শনিবার মঠে প্রথম প্রচার সভা হইবে।...

৩১শে অক্টোবর

ঠাকুর, বন্ধু আমার, তুমি আমার জীবনের মহা বন্ধন, তুমি আমার মহা মুক্তি। আমি তোমার চরণে অনন্ত কাল বাঁধা রহিব। তুমিই আমার জীবনের সামঞ্জস্য, জীবনের সমাধান। তুমি আমার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎকে এক মহা সামঞ্জস্যের মাঝে গড়িয়া তুলিতেছ। তুমি আমার সর্ব, তোমাকে মাঝে বিশ্বকে পাইব, এক করিয়া লইব। তোমাকে ছাড়িয়া কোথায় আমি যাইব? বিশ্ব আমার, বিশ্বনাথ আমার, আমি বিশ্ব হইব, পরম প্রেমে বিশ্বনাথ হইব। তুমি লুকাইয়া আসিয়াছিলে, লুকাইয়া চলিয়া গেলে। হারিয়া গেলে সর্বসময় তত্ত্ব। তোমাকে বুকে লইয়া আমাকে ছুটিতে হবে বিশ্বের ঘরে ঘরে জাগো নিত্যগোপাল আমার জীবনে।...বেণু প্রুফ দেখে। -- ৪০টায় পাঠ হয়—'প্রাণধারা ও কার্য কারণ সম্বন্ধ'।... সন্ধ্যার সময় যতীন চট্টোপাধ্যায় অনেক দিন পর আসেন। ঘণ্টারও উপর কথা হয় নিত্যগোপাল জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে, বর্ণভেদ সম্বন্ধে, ব্রহ্মমায়ার পরকীয়ত্ব, প্রাণধারার মধ্যে hierarchy না-থাকার সম্বন্ধে। শিখসম্প্রদায় বিশেষভাবে গুরু গোবিন্দ ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপদেশের সমন্বয় বিধানদ্বারা ভারতবর্ষকে সেদিন মুসলমানদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, Brahmanism তাহা ভুলায় নাই। হিন্দুসমাজ জীবন্ত থাকিলে গুরু গোবিন্দ হিন্দুদেরও গুরু হইতেন। একদিন যে উদারতার বলে বুদ্ধ ভগবান বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন, ততটুকু উদারতা আর নাই। চিন্মানন্দ আসে। শনিবারের সভার সম্পাদক হিসাবে জনরঞ্জনবাবুর নাম আমি দিতে চাহিয়াছিলাম। চিন্মানন্দের তাহাতে আপত্তি। সে বলে—সন্ন্যাসীর নাম থাকিলে জনসাধারণের আস্থা বাড়ে। কোন্ জনসাধারণ নিত্যগোপালকে জানে যে তাহাদের শ্রদ্ধার হানি হইবে? আর নিত্যগোপাল নিজেই তো সন্ন্যাস কৌলীন্য স্বীকার করেন নাই—'সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ, গাইস্থ্য হেয়—এ বোধ বন্ধন'। আমি সকালে যাইয়া সকালেই শুইতে আসি।

১লা নভেম্বর

ক্রমশঃ

জননায়ক নেহরু

।। জনাব রেজাউল করীম ।।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনের সহিত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এমন নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন যে তাঁর কথা বাদ দিয়ে আমরা আজকের ভারতের কথা চিন্তা করতে পারি না। হ্যামলেটকে বাদ দিলে যেমন হ্যামলেট-নাটকের কথা ভাবা যায় না, ঠিক সেই রূপ নেহরুও ছিলেন ভারতের জীবন-নাটকের প্রধান নায়ক। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী নেহরু যত দিক দিয়ে এত ভাবে যে ভারতকে গড়ে তুলেছেন তা কি এক কথায় প্রকাশ করা যায়? আমাদের জাতীয় জীবনের প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রতিভার কর্মের ও চিন্তার ছাপ রেখে গেছেন। আজ সে সব কথা আমরা প্রতিনিয়তই অনুভব করছি। বস্তুতঃ নেহরু ছিলেন এ যুগের এক অনন্য স্পিরিট। জাতি যেমন যেমন মুহ্যমান হয়েছে নেহরুর কর্ম ও চিন্তা সেই ভাবে বিকশিত হয়েছে। এ দেশের প্রতিটি পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারতেন বলে তাঁর বিপ্লবী মন কোন দিন স্থবির হয়ে পড়ে নি। তিনি ছিলেন ভারতবাসীর নিকট প্রাণদায়িনী প্রেরণা, আশা ভরসার অবলম্বন। জাতির জীবন থেকে তাঁর স্মৃতি কোনদিন অবলুপ্ত হবে না।

ভারতের ইতিহাসে আরও বহু গণমান্য লোক ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের কিছু না কিছু গুণ নেহরু-জীবনে বিধৃত হয়েছিল। কিন্তু কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল যা তাঁর নিজস্ব। তাঁর ছিল অন্তরের মহত্ত্ব, হৃদয়ের উদারতা। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক। তিনি ছিলেন মানবতায় পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাঁর ইতিহাস-চেতনা ছিল প্রচণ্ড। এই ইতিহাস-চেতনা তাঁকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে প্রেরণা দিয়েছিল। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী উদার ও বৈপ্লবিক ছিল বলে তিনি দিগভ্রান্ত হন নি। তাই তিনি বহু দূরের জিনিষকে নিকটে দেখতে পেতেন। এবং নিজের দৃষ্টিকে বহুদূরে প্রসারিত করতে পারতেন। এই কারণে তিনি এই যুগের একজন বিরাট ব্যক্তি হয়ে পড়েছিলেন।

নেহরু ইতিহাসের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করেছিলেন বহু শিক্ষণীয় বিষয়। দেশ স্বাধীন হবার মুহূর্ত থেকেই তিনি উপলব্ধি করলেন কোথায় ভারতের ভাগ্য নিহিত আছে। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে মুহূর্তের সাময়িক সমস্যা থেকে জগৎ ধীরে ধীরে কোন পথে ছুটে চলেছে। তিনি বুঝলেন যে স্থায়ী শান্তি ব্যতীত ভারতের উন্নতি নাই। অগ্রগতিও সম্ভব হবেনা। এই জন্য নেহরু যে বৈদেশিক নীতি অবলম্বন করলেন তাতে আছে বুদ্ধির দীপ্তি ও প্রতিভার উজ্জ্বলতা। যাঁরা তাঁর এই দূরদর্শিতার পরিচয় পায় নি তাঁরা তাঁর নিন্দা করেছে। তাঁর পলিসির বিরোধিতা করেছে। কিন্তু নেহরু স্থির ও অবিচলিত পদে দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁর আদর্শের উপর। তিনি উপলব্ধি করলেন যে মহত্বকে চটকদার করে দেখাবার দরকার নাই। কোন প্রকার আপাত মধুর মোহ তাঁকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। তাঁর অন্তর্ধানের পর আজ তারা বুঝতে পেরেছে যে তাঁর নীতি ও পলিসি ছিল ঠিক। এ বিষয়ে নেহরুর মনে কোন সন্দেহ ছিলনা যে ভারতের স্বাধীনতা অতি অবশ্যম্ভাবীরূপে এসিয়া ও আফ্রিকার অবনত দেশগুলির স্বাধীনতা লাভের পথ সহজ ক'রে তুলবে। সত্যই তাই হ'ল। ভারতের স্বাধীনতা-লাভের অল্প দিনের মধ্যে এসিয়া-আফ্রিকার সর্বত্র স্বাধীনতার জয়ডঙ্কা বেজে উঠলো। তবে স্বাধীনতা বলতে তিনি কেবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথাই বুঝতেন না। তিনি মনে করতেন যে স্বাধীনতার সহিত অবিচ্ছেদে জড়িত আছে চিন্তার স্বাধীনতা, মত

প্রকাশের স্বাধীনতা, আত্মার স্বাধীনতা। তাঁর মন ছিল পরিপূর্ণভাবে সেকুলার আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ধর্মান্ধতার দ্বারা তিনি কোন দিন বিভ্রান্ত হননি। আন্তর্জাতিক শান্তি ও প্রীতির তিনি ছিলেন অগ্রদূত। তাই তিনি সহ-অস্তিত্বের আদর্শকে মনে প্রাণে সমর্থন করতেন। সেই জন্য এক দেশ অপর দেশ আক্রমণ করলে তিনি ক্রুদ্ধ সিংহের মত গর্জে উঠতেন। তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে বর্তমানকে গড়তে চেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মূলতঃ কবি ও ঐতিহাসিক। তাই তিনি যা স্পর্শ করতেন তাতেই কাব্যের অথবা ইতিহাসের ছোঁয়া লাগত।

স্বাধীন ভারতকে গড়ে তুলতে নেহরু যা করেছেন তার জন্য তাঁকে আমরা অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগঠক বলে মনে করি। একথা স্বীকার করতে হবে যে তিনিই 'সেকুলার' আদর্শের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন; ভারতকে সমাজতন্ত্রের আদর্শের পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। এবং সেজন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা এবং কর্তব্য সম্বন্ধে উচ্চ জ্ঞান এই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। প্রথম থেকেই তিনি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ঐতিহাসিক প্রচার দ্বারা উজ্জীবিত করে তুলেছেন। ভারতের জন্য একটি সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ আন্তর্জাতিক নীতি তিনি তৈয়ার করেন। তাঁর সেই নীতির সার্থকতা আজ আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। তাছাড়া তাঁর অনুপ্রেরণায় ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যে সব কাজ করা হয়েছে তাও নগণ্য নয়। প্রতিটি কাজে আমরা তাঁর প্রতিভা ও ধীশক্তির ছাপ লক্ষ্য করছি। তাঁর অবলম্বিত কার্যধারা ভারতকে বিপ্লবের পথে প্রতিনিয়তই দুর্বার বেগে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর বিবিধ পরিকল্পনা রচনা করেছেন। এ সবের সুফল আজ আমরা সর্বত্র লাভ করেছি। তিনি পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের আদর্শকে সর্বতোভাবে রূপায়িত করেছেন। ধর্মান্ধতা ও ঐতিহ্য পূজার মোহধারা তিনি কোনদিন বিভ্রান্ত হন নি। তিনি জাতির মনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী জাগ্রত করেছেন। এবং অক্লান্ত ভাবে দেশে নিম্ন বিপ্লবের জন্য সাধনা করেছেন। কোন বাধাই তাঁকে কর্তব্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তিনি যে পথ-নির্দেশ দিয়েছেন আজ কোন ক্রমেই তা থেকে পশ্চাৎ অপসরণ করা চলবে না। কোন দল ও ব্যক্তির মত যাই হোক না কেন ইহাই ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ। এই পথেই ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস রচিত হবে।

নেহরুর জীবন-দর্শন ও রচনাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তিনি একজন কবি। তিনি কবি-মন নিয়েই "ভারত আবিষ্কারে"র মত বিরাট গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় আমরা যে-নেহরুর পরিচয় পাই তিনি হচ্ছেন একজন উঁচুদরের কবি। এই কবি-নেহরুই আবার একজন শ্রেষ্ঠ পার্লামেন্টারী নেতা। পার্লামেন্টারী শাসন পদ্ধতির প্রতি তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। সেই জন্য সংসদে বিভিন্ন অপরাধের বিধান সভায় নির্বাচনের ব্যবস্থাকে অতি উচ্চে তুলে ধরে ছিলেন। তাঁর এই প্রকার গণতান্ত্রিক আদর্শ ভবিষ্যতের জন্য পথ নির্দেশক হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শাসন সৌকর্য্যের ব্যাপারে নেহরু এমন একটি উচ্চ নীতির মান প্রতিষ্ঠিত করেছেন যা চিরকাল অনুকরণীয় হয়ে রইবে।

চরম ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন রোমের জুলিয়াস সীজারের সহিত কয়েকটি বিষয়ে নেহরুর যেমন সাদৃশ্য আছে তেমনি অপর কয়েকটি বিষয়ে আছে বৈসাদৃশ্য। নেহরু হচ্ছেন সেই সীজার যাঁর মধ্যে বীর্যবান ছিল একটা রাজোচিত মহিমা। তাঁর রুচি ছিল অত্যন্ত মার্জিত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও হৃদয়বান। সীজারের সহিত তাঁর সাদৃশ্য এই খানেই শেষ। কিন্তু নেহরুর মধ্যে সীজারের দাম্ভিকতা ছিল না, আর ছিল না কোনও রূপ গণতন্ত্র বিরোধী উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও এক-নায়কত্বের মনোভাব। সব নিজে হব, সব নিজে করব, ক্ষমতার দায়িত্ব কাউকে ছেড়ে দেব না এরূপ নীতি নেহরুর ছিল না। তিনি গণতন্ত্রকে মন প্রাণ দিয়ে ভাল বাসতেন। বিরোধী দলকে শ্রদ্ধা করতেন। তাদের জন্য নানাপ্রকার সুবিধা করে দিতেন। রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা নিজের মধ্যে কুক্ষিগত

করে রাখেন নি। নিজের জন্যও বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করে গণতন্ত্রকে সঙ্কুচিত করেন নি। বরং গণতন্ত্রের আদর্শ ও কর্মধারাকে নানা দিকে প্রসারিত করেছেন। তিনি কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে বহুবার বহু দিক বিবেচনা করে দেখতেন। কিন্তু একবার কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সহজে তার থেকে সরে আসতেন না। সমস্ত বাধার সামনে তাকে কাজে পরিণত করবার জন্য অগ্রসর হতেন। বস্তুতঃ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও পদাধিকার তাঁর ক্ষমতার উৎস ছিল না বরং তাঁর ক্ষমতার উৎস ছিল তাঁর বিরাট হৃদয়, অকৃত্রিম দেশ-প্রেম ও অসাধারণ আদর্শ-নিষ্ঠা।

তিনি ছিলেন এক সুবিশাল দেশের প্রতিনিধি। কিন্তু তাঁর শক্তির পেছনে ছিল না কোন সৈন্যবাহিনীর আশ্রয়। তাঁর শক্তি এসেছিল পঞ্চাশ্লিশ কোটি নর-নারীর অন্তরের ভালবাসা থেকে। তিনি জনগণকে ভালবাসতেন। আর জনগণও তাঁকে অন্তর দিয়ে ভাল বাসত। তিনি গণ-মানসে যে আসন পেয়েছিলেন তা অন্য কোন দেশের ডিক্টেটারগণও পান নি। তিনি যে গণ-সংযোগের আদর্শ স্থাপন করে গেছেন ইতিহাসে তার তুলনা নাই। তিনি এত বেশী জন-সাধারণের সহিত মিশে ছিলেন যে তাঁর সম্বন্ধে অনায়াসে বলতে পারি যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ লোক-নেতা, লোক-শিক্ষক। জনগণিত জন সমুদ্রের মধ্যে তিনি অনুত্তোজনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। অন্য দেশের দর্শকগণ তা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যেত। কেমন করে একটি বিরাট দেশের প্রধান মন্ত্রী কোনও রূপ নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে এভাবে জন সাধারণের সহিত মিশতেন তা দেখে বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ অবাক হয়ে যেত।

নেহরু প্রায় সব সময় কাজ করতেন। বিশ্রামের অবসর তাঁর খুব কম ছিল। জনগণকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হননি। তিনি তাদের মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন, অর্ধমৃতের মধ্যে জীবন-প্রবাহ এনে দিয়েছেন। মাইনরিটি-গণ তাঁকে অকৃত্রিম বন্ধু বলে মনে করত। তাদের ভিতরের শক্তিকে তিনি জাগ্রত করেছেন। তাদের মনে একটা নিরাপত্তাবোধ এনে দিয়াছেন। নেহরুর ছিল একটা আভ্যন্তরীণ শক্তি—সে শক্তি উদ্ভূত হয়েছিল মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি থেকে। তাঁর নিজের উপর ছিল চরম আত্ম-বিশ্বাস। আত্ম-নিয়ন্ত্রণেরও তাঁর ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। এই সব তাঁকে দিয়েছিল চুম্বকের মত আকর্ষণ করার শক্তি। এই শক্তি-বলে তিনি সর্বলোকের হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। দেশ বিভাগের সময় যখন বহু লোক সাহস হারিয়ে ফেলেছিল, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়েও নেহরু সাহস ও আশাবাদ হারান নি। তাঁর দুর্জয় সাহস এতটুকু দমিত হয় নি। তাঁর সাহসী আত্মা তাঁকে কোন কঠিন কাজ থেকে কোনদিন পশ্চাৎ অপসরণ করতে দেয় নি। দেশের জন্য তাঁর ছিল উচ্চ আদর্শ। সব সময় তিনি দেখতেন দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন। তাঁর সামনে নীচতা, ভীরুতা ও হৈন্য সঙ্কুচিত হয়ে পড়ত। তাঁর ছিল একান্ত যুক্তিশীল মন। তাই তিনি সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে বর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী হবার পর প্রায় সতর বছর ধরে তিনি অবিরত কাজ করে গেছেন। দিনেকের তরে তাঁর বিশ্রামের অবসর ছিল না। তাঁর স্বপ্ন ও কল্পনা কোনদিন ক্লান্ত হয়ে পড়ে নি। তাঁর মনের তারুণ্য কখনও ক্লান্ত হয়নি। গণতন্ত্রের তিনি ছিলেন প্রকৃত ধ্বজা বাহক। তাঁর মত এমন একজন গণতান্ত্রিক লোক বর্তমান যুগে বিরল। তিনি যেন অহরহ ক্রমশঃ বিকাশশীল সত্তা। তাঁর চিন্তা কোনদিন স্তিমিত হয়ে পড়ে নি। পরিণত বয়সেও তাঁর মন ভেঙ্গে পড়ে নি। তাই দেখি নব নব পরিকল্পনার দ্বারা তিনি জাতিকে সর্বদাই উদ্বুদ্ধ করে ছিলেন।

মন্ত্রী নেহরু অপেক্ষা ব্যক্তি নেহরু আরও অনেক বড় ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁর প্রধানমন্ত্রী হবার যখন কোন কথাই ছিল না, যখন তিনি কেবল স্বদেশ কর্মী ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক ছিলেন সেই সময় সেই যে তিনি জনগণের হৃদয়ে আসন লাভ করলেন, সেই আসনেই বরাবর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এখনও

নেহরু জগতের যে কোন বিখ্যাত ব্যক্তির সহিত একাসনে প্রতিষ্ঠিত। আজ মৃত্যুর পর তিনি পার্টির উর্ধ্বে, তর্ক বিতর্কের উর্ধ্বে। তিনি এখন ভারতের বিরাট ঐতিহ্যের সঙ্গে একীভূত। তাঁর মত কেউ এত অকৃপণ হস্তে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে নি, কেউ এত বেশী সমস্যার সম্মুখীনও হয় নি। তিনি দেশের বিবিধ সমস্যার সমাধানকে হয়ত আলোর ঝলকানির মত দেখতে পেতেন। তিনি যখন অন্তিম শয্যায় শায়িত, তখনও তিনি সেই অবস্থাতেও মহান নেহরুই হয়ে রইলেন। ইনি সেই নেহরু যিনি মনে প্রাণে দেশকে ভালবাসতেন। যিনি দেশের অরণ্য নদ-নদী হ্রদ বনজঙ্গল কুসুমকে ভালবাসতেন। কাশ্মীর উপত্যকার বিবিধ তরুরাজি তাঁর মনে নানা ভাব জাগ্রত করত। তিনি লক্ষ লক্ষ চাষী কিষাণ ভাইকে অন্তর দিয়ে ভাল বাসতেন। তাদের ভিতর তিনি ভারতের আত্মাকে দেখে ছিলেন। তিনি শিশুদেরকে ভালবাসতেন, তারাও তাঁকে ভালবাসত। তাদের প্রফুল্ল হাসি দেখে তিনি নিজেও হাসতেন—এই নেহরুর বালক বয়সের দিনগুলি হাসি ও আনন্দে কেটেছিল। বিদেশে কেম্ব্রিজের দিনগুলিও তাঁর কেটেছে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে। আজ মনে পড়ছে কোন ভাবে গান্ধীজির পদতলে বসে দিনের পর দিন তাঁর কেটেছে· সেই খানে বসে তিনি আদর্শ শিখেছেন আর সেই খানে এমন প্রেরণা লাভ করলেন, এমন শক্তি লাভ করলেন যা তাঁকে দিল শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা। তাই গান্ধীজি বলেছেন নেহরুই তার উত্তরাধিকারী। অবশেষে সাধনার শেষে সিদ্ধির স্বর্ণ ঘাটে এসে জীবনের কর্ম সাঙ্গ করলেন। তাঁর নেতৃত্বে তাঁর প্রেরণায় এই জাতি মৃত্যুহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। আজ ভারত-বাসী জগৎ সভায় বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার শক্তি রাখে। নেহরুর প্রেরণা দীর্ঘ দিন ধরে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকবে। তাঁর আদর্শ একদিন সার্থকতায় মণ্ডিত হবে।

কীর্ত্তন

॥ পদকর্তা: শ্রীসন্তোষকুমার দে ॥

রাই, কি হল কদম্ব মূলে,
তোর মলিন বদন, বিরস কুন্তল,
শিথিল বাঁধন চুলে।
তোর অঙ্গের লাবণী কোন্ গুণমণি
হরণ করিতে চাহে,
তোর হেরি বেশবাস হই যে হতাশ,
পরাণ ধরিব না হে।
তুই বলে দে,—
শ্যাম কোন্ পথে গেছে বলে দে।

ওরে ললিতা বিশাখা ঘুরে একা একা
ফিরে এলো শেষে,—বলে দে।
আমি সেই খানে যাবো যেখানে নিঠুর
কালিয়া রয়েছে গোপনে,
শুনে রাখ্ রাই তারে যদি পাই
বাঁধিয়া আনিব এখানে।
আমার আঁচল দিয়ে বেঁধে আনিব,
নিঠুর কালিয়া সখীরে ছলিয়া
যেখানেই থাক্, বেঁধে আনিব ॥

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পো: অশ্বিনীনগর, ২৪পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

এবার পূজায়

বাঙলা তাঁতের কাপড় কিনুন

রঙের ঔজ্জ্বল্যে, পাড়ের বাহারে এবং বয়ন নৈপুণ্যে
অতুলনীয়

সুলভ টেকসই মনোরম

বাঙলার সকল অঞ্চলের বাছাই করা শাড়ী পাবেন এই সব সরকারী বিপণন কেন্দ্রে

কলকাতা ও হাওড়ায়

৭।১, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট,
১২৮।১, বিধান সরণি, কলিকাতা
১৫৯।১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা
১৮এ, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, (সাউথ) হাওড়া।

॥ এ ছাড়াও সব দোকানেই পাবেন ॥

বাংলা তাঁতের কাপড়ের জুড়ি নেই

W. B.(I & PR) Ad 20206/66

কবিরাজ এন. এন. সেনের

কেশরঞ্জন তৈল

কেশ ও মস্তিষ্কের পক্ষে মহাহিতকর
ভেষজগুণসমৃদ্ধ কেশ তৈল

সন ১২৯১ সাল (ইং ১৮৮৪) হইতে কেশরঞ্জনের অভিযান শুরু। এই দীর্ঘকালের মধ্যে এদেশে কত কেশতৈলের অভ্যুদয় ও বিলয় ঘটিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু কেশরঞ্জন আজও সমান গৌরবে দেদীপ্যমান।

কেশরঞ্জনের বিশাল ঐতিহ্যের মূলে রহিয়াছে ইহার অপর্যাপ্ত ভেষজ গুণ আর স্নিগ্ধ মধুর গন্ধ। গুণগ্রাহী ব্যক্তি মাত্রেই কেশরঞ্জনের বহুপরীক্ষিত ভেষজ গুণের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। চুলের গোড়া শক্ত করা, মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীকে স্নিগ্ধ রাখা, খুশকি মরামাস বা চুলের রুক্ষতা থাকিলে উহার অবসান ঘটানো, এবং সাধারণভাবে চুলের শ্রী ছাঁদ উজ্জ্বল, কমনীয় ও চিরস্থায়ী করা—এক কথায় চুলের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের সম্যক্ স্ফূর্তিবিধান —ইহাই হইল কেশরঞ্জনের লক্ষ্য।

কেশরঞ্জন সত্যই একটি
অসাধারণ কেশতৈল

অনন্ত নাটকার

মন্মথ রায়ের নাট্য গ্রন্থাবলী

একাঙ্কিকা ৫·০০ ॥ নব একাঙ্ক ৩·০০ ॥ ছোটদের একাঙ্কিকা ২·০০ ॥ ফকিরের পাথর ও নাট্যগুচ্ছ ২·০০ ॥ বিচিত্র একাঙ্ক ৩·০০ ॥ মরা হাতী লাখ টাকা ১·২৫ ॥ কারাগার—মুক্তির ডাক—মহুয়া ৩·৫০ ॥ মীর কাসিম—মমতাময়ী হাসপাতাল—রঘু ডাকাত ৩·০০ ॥ কোটিপতি নিরুদ্দেশ—বিদ্যুৎপর্ণা—রাজনটী—রূপকথা ৩·০০ ॥ ধর্মঘট—পথে বিপথে—চাষীর প্রেম—আজব দেশ ৪·০০ ॥ অমৃত অতীত ১·০০ ॥ সাঁওতাল বিদ্রোহ—বন্দিতা —দেবাসুর ৩·০০ ॥ জীবনটাই নাটক—আরো নাটক ২·৫০ ॥ উর্বশী নিরুদ্দেশ ·৫০ ॥ মহাভারতী ২·৫০ ॥ অশোক ২·০০ ॥ সাবিত্রী ২·০০ ॥ খনা ২·০০ ॥ চাঁদ সদাগর ২·০০ ॥ মহাপ্রেম ৩·০০ ॥ স্বর্ণকীট ও জওয়ান ২·০০ ॥ দুর্গেশ নন্দিনীর জন্ম ও একাঙ্ক গুচ্ছ ৩·০০ ॥

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স —কলিকাতা—৬

সকল শ্রেণীর সংগীত রসিকদের জন্য
চারদিন ব্যাপী

বরানগর সংগীত সম্মেলন

(আগামী ১লা ডিসেম্বর থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর)

স্থান : মহাজাতি সদন

১লা—রবীন্দ্র সংগীত দিবস
২রা—লোকগীতি দিবস
৩রা—শাস্ত্রীয় সংগীত দিবস
৪ঠা—আধুনিক সংগীত দিবস

উপদেষ্টা সভাপতি :
শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সেন
অভ্যর্থনা সভাপতি :
শ্রীরামপদ মাঝি
সভাপতি :
শ্রীপ্রবোধবন্ধু অধিকারী

IT'S QUALITY THAT COUNTS..

HIGH QUALITY PAPERS AND BOARDS TO MEET THE SPECIAL NEEDS ARE MANUFACTURED UNDER STRICT SUPERVISION OF EXPERT TECHNICIANS ADOPTING LATEST TECHNIQUES AND EQUIPMENTS

AT

ORIENT PAPER MILLS LIMITED

Brajranagar -- (Orissa)

and

Amlai – (M. P.)

MANUFACTURERS OF

WRITING & PRINTING PAPERS, PACKING & WRAPPING PAPERS INCLUDING WATERPROOF, CREPE AND POLYTHENE COATED PAPERS, POSTER PAPERS, DUPLEX, TRIPLEX AND GREY BOARDS

ORIENT PRODUCTS ARE SUPERIOR IN STRENGTH AND DEPENDABLE IN QUALITY

সংসার কাহাকেও বাধা দেয় নাই, সংসার সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা, মিথ্যা বিভীষিকাই আমাদের বাধা দিতেছে।...বিশ্বকে ভালবাসাই যে সংযম, ব্রহ্মচর্য; অথচ এ ব্রহ্মচর্যে শুষ্কতা নাই; যে অর্থে "নিরোধ" আমরা বুঝি, সে নিরোধও নাই। উপনিষদ্ বলিয়াছেন--অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিতে হয়, "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা" সংসার বিচরণই মরণ জয়। যারা অবিদ্যার ক্ষেত্র হইতে ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে সরাইয়া লইবার জন্য কাম ক্রোধের সঙ্গে কুস্তি করিল তাহারা লৌকিক চক্ষে বড় ব্রহ্মচারী হইলেও পুরুষোত্তম-রাজ্যে "মরা" সন্দেহ নাই। সংসারময় জীবন ছড়াইয়া না দিলে লক্ষ বৎসরেও ব্রহ্মচর্য্য বজায় থাকিবে না। চিত্তকে সংসার হইতে গুটাইয়া লইতে চাহিলেই সে বিদ্রোহ করে, তখন তাহাকে নিরোধ করার চেষ্টা ব্যর্থ। খাইতে পরিতে না দিয়া কাহাকেও পোষ মানানো যায় না: ইন্দ্রিয়ের খাদ্য স্বরূপ ও বিশ্বরূপ। তুমি যদি বিশ্বরূপের খাদ্য দিবে না, সে মরিবে বটে কিন্তু তাহার ভূত তোমায় ছাড়িবে না।

কামের ভূত আজ ব্রহ্মচারীদের ঘাড়ে চাপিয়াছে। তাহারা যে মরিয়া আছে তাহা বুঝা কি খুব কঠিন? নরনারায়ণের কাজ তাই গুরুতর, গুরুতম। এই মৃত ব্রহ্মচর্য্যকে জীবন্ত ব্রহ্মচর্য্যে গড়িয়া তোলার জন্যই তোমাদের ব্রহ্মচারিণীরূপে আমি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই। যিনি জীবনচারিণী, তিনিই ব্রহ্মচারিণী; জীবনই ব্রহ্ম। জীবনহীন ব্রহ্ম নরনারায়ণের উপাস্য নয়। ভারতবর্ষ তাইতো ব্রহ্মেরও পর পর-ব্রহ্মের স্তর স্থাপন করিয়াছেন। স্বরূপ ও বিশ্বরূপে প্রেম হইলে কাম নিয়া ঠেলাঠেলি করিতে হয় না। দুই ভাবে সংযম থাকিলে কামের সকল ফাঁক বন্ধ হইয়া যায়। বিশ্বরূপের দিক বন্ধ থাকিলে কাম স্বরূপের দিক দখল করিবে, বিশ্বরূপের দিক খোলা থাকিলে বিশ্বরূপের ক্ষেত্র দখল করিবে। দুই দিক খুলিয়া দিলে কামের দাঁড়াইবার স্থান পায় না। সব জীবন মধুময় হয়। সেই জন্যই বলি "অহং" ছাড়িয়া দাও। অহং দুইটির একটাকে নিয়া দাঁড়াইতে চায়। দুইটীর সমন্বয় "অহং" জানে না। আমির কাছে হয় বিশ্ব সত্য, নয় ঈশ্বর সত্য। আমি যদি হন্ পুরুষোত্তম তখনই বিশ্ব ও ঈশ্বর দুইই সত্য। তখন হয় বাস্তব ব্রহ্মচর্য্য। এ যে কলিযুগ। এখানে "বাস্তবম্ বস্তু বেদ্যম্"—কলি-যুগে যে বাস্তব বস্তু জানিবার যুগ। কোনো তত্ত্ব নিয়া ফাঁকি বা অভিনয় চলিবে না। সব আজ পুরুষোত্তমের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এই-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত) ৸

ঈশোপনিষৎ
কেনোপনিষৎ
কঠোপনিষৎ ৩৲
প্রশ্নোপনিষৎ
ঐতরেয়োপনিষৎ
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ

৮। শ্রীনিত্যগোপাল জীবনে ও দর্শনে
৯। স্বরাজের পূর্ণরূপ
১০। গীতাজয়ন্তী
১১। উজ্জ্বলবারিত (পুস্তিকা)
১২। মুণ্ডকোপনিষৎ
১৩। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা ৩৲ (গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

পাণ্ডুলিপি

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
ছান্দোগ্য উপনিষৎ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি

শ্রীমতী প্রতিভা রায়ের

নারী-প্রগতির ভূমিকথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ও শিশু নিত্যগোপাল
ও শিশু সুধার কথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল ৷৶০
রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ১৲২৲
শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন ৩৲
৪। রবীন্দ্র-স্মরণ ৫৲
৫। প্রাথমিক শিক্ষা ৪৲

নরনারায়ণ আশ্রম

ফোন নম্বর ৫৭-২৫৪০

গ্রাম : বাগুইআটি পো: অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

উদ্ভাস ভারত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয় আত্ম-অনাত্ম সমন্বয়
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয় সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

শ্রীনিত্যগোপাল

কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৮৮৭, ১৩৭৩, সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র ১৯শ বর্ষ, ১০-১১শ সংখ্যা

সংসার কাহাকেও বাধা দেয় নাই, সংসার সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা, মিথ্যা বিভীষিকাই আমাদের বাধা দিতেছে।···বিশ্বকে ভালবাসাই যে সংযম, ব্রহ্মচর্য; অথচ এ ব্রহ্মচর্যে শুষ্কতা নাই; যে অর্থে "নিরোধ" আমরা বুঝি, সে নিরোধও নাই। উপনিষদ্ বলিয়াছেন--অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিতে হয়, "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা" সংসার বিচরণই মরণ জয়। যারা অবিদ্যার ক্ষেত্র হইতে ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে সরাইয়া লইবার জন্য কাম ক্রোধের সঙ্গে কুস্তি করিল তাহারা লৌকিক চক্ষে বড় ব্রহ্মচারী হইলেও পুরুষোত্তম-রাজ্যে "মরা" সন্দেহ নাই। সংসারময় জীবন ছড়াইয়া না দিলে লক্ষ বৎসরেও ব্রহ্মচর্য্য বজায় থাকিবে না। চিত্তকে সংসার হইতে গুটাইয়া লইতে চাহিলেই সে বিদ্রোহ করে, তখন তাহাকে নিরোধ করার চেষ্টা ব্যর্থ। খাইতে পরিতে না দিয়া কাহাকেও পোষ মানানো যায় না: ইন্দ্রিয়ের খাদ্য স্বরূপ ও বিশ্বরূপ। তুমি যদি বিশ্বরূপের খাদ্য দিবে না, সে মরিবে বটে কিন্তু তাহার ভূত তোমায় ছাড়িবে না।

কামের ভূত আজ ব্রহ্মচারীদের ঘাড়ে চাপিয়াছে। তাহারা যে মরিয়া আছে তাহা বুঝা কি খুব কঠিন? নরনারায়ণের কাজ তাই গুরুতর, গুরুতম। এই মৃত ব্রহ্মচর্য্যকে জীবন্ত ব্রহ্মচর্য্যে গড়িয়া তোলার জন্যই তোমাদের ব্রহ্মচারিণীরূপে আমি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই। যিনি জীবনচারিণী, তিনিই ব্রহ্মচারিণী; জীবনই ব্রহ্ম। জীবনহীন ব্রহ্ম নরনারায়ণের উপাস্য নয়। ভারতবর্ষ তাইতো ব্রহ্মেরও পর পর-ব্রহ্মের স্তর স্থাপন করিয়াছেন। স্বরূপ ও বিশ্বরূপে প্রেম হইলে কাম নিয়া ঠেলাঠেলি করিতে হয় না। দুই ভাবে সংযম থাকিলে কামের সকল ফাঁক বন্ধ হইয়া যায়। বিশ্বরূপের দিক বন্ধ থাকিলে কাম স্বরূপের দিক দখল করিবে, বিশ্বরূপের দিক খোলা থাকিলে বিশ্বরূপের ক্ষেত্র দখল করিবে। দুই দিক খুলিয়া দিলে কাম দাঁড়াইবার স্থান পায় না। সব জীবন মধুময় হয়। সেই জন্যই বলি "অহং" ছাড়িয়া দাও। অহং দুইটির একটীকে নিয়া দাঁড়াইতে চায়। দুইটীর সমন্বয় "অহং" জানে না। আমির কাছে হয় বিশ্ব সত্য, নয় ঈশ্বর সত্য। আমি যদি হন্ পুরুষোত্তম তখনই বিশ্ব ও ঈশ্বর দুইই সত্য। তখন হয় বাস্তব ব্রহ্মচর্য্য। এ যে কলিযুগ। এখানে "বাস্তবম্ বস্তু বেদ্যম্"—কলি-যুগে যে বাস্তব বস্তু জানিবার যুগ। কোনো তত্ত্ব নিয়া ফাঁকি বা অভিনয় চলিবে না। সব আজ পুরুষোত্তমের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

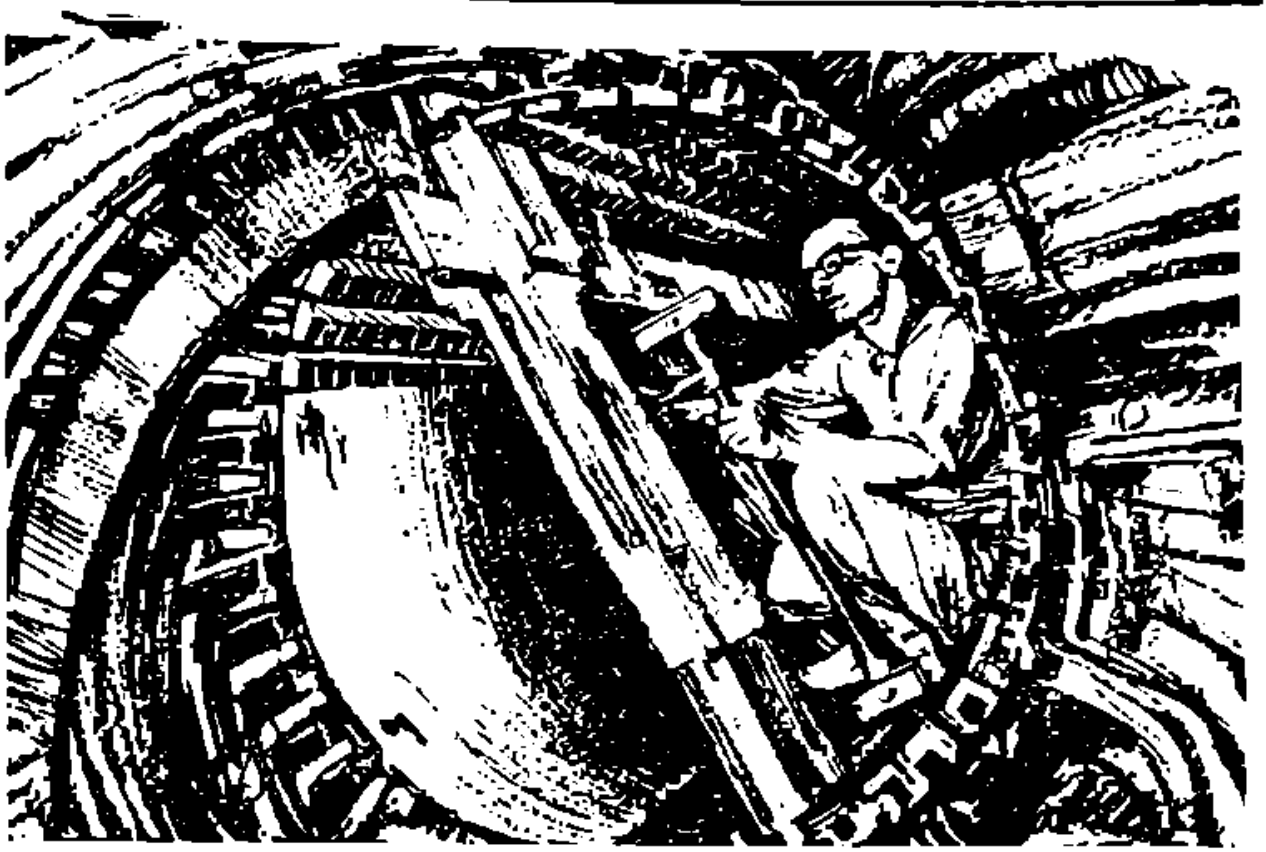

উৎসাহ আর চেষ্টায় সব হয় ...

জামশেদপুরের প্রধান পাওয়ার হাউসে ২৭,৫০০ কিলোওয়াটের তিনটি বিরাট টার্বো-অলটারনেটর আছে। এর মধ্যে একসঙ্গে দুটি চালিয়ে টাটা স্টীল ওয়ার্কস ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কলকারখানা এবং সারা জামশেদপুর শহরকে চব্বিশ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি টার্বো অলটারনেটরের কয়েল-সিস্টেমে গণ্ডগোল হওয়ায় সেটা অকেজো হয়ে পড়ে। কতকগুলো কারণে টার্বো-অলটারনেটর মেরামতে তাড়াতাড়ি চালু করবার রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। মেরামতের জন্য যতগুলো বাড়তি কয়েল দরকার ততগুলো জামশেদপুরে ছিল না। বিদেশ থেকে আমদানী করতে গেলেও প্রায় একবছরের ধাক্কা। তাছাড়া, এতকাল এই বিরাট ও জটিল যন্ত্রগুলোর মেরামতি কাজ বিদেশী বিশেষজ্ঞ কারিগররাই করে এসেছেন।

এ সবকিছু সত্ত্বেও টাটা স্টীলের ইলেকট্রিসিয়ানরা মেরামত করার নতুন যন্ত্রপাতি তৈরী করে ফেললেন এবং সাফল্যের সঙ্গে এগুলোর মেরামতে যত কয়েল লাগে তার মাত্র অর্ধেক কপার কয়েল নতুন কায়দায় যন্ত্রটিকে খাড়া করলেন। ১৯৬৬ সালের মে মাসে অচল টার্বো-অলটারনেটর আবার চালু হল। টাটা স্টীলের এই প্রচেষ্টায় দেশের ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচলো। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ভারতে এই প্রথম এরকম জটিল বৈদ্যুতিক যন্ত্র মেরামতের কাজ সম্পন্ন করে জামশেদপুর আবার প্রমাণ করল : উৎসাহ আর চেষ্টায় সব হয়।

টাটা স্টীল

The Tata Iron and Steel Company Limited

JWTNL1694

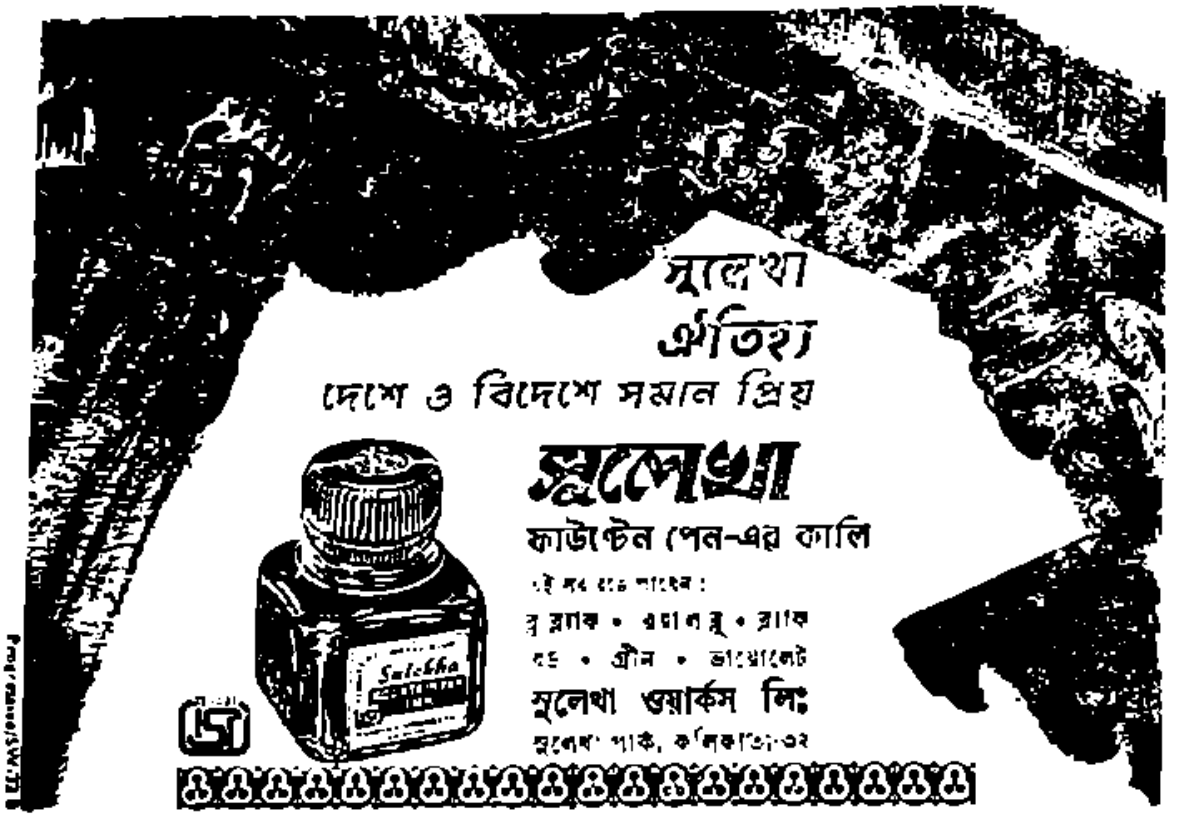

মাড়ী সুস্থ ও সবল রাখতে এবং মুখের গন্ধ দূর করতে

নিম অদ্বিতীয়

নিমের উপকারিতা হাজার হাজার বছরের পরীক্ষিত সত্য

আপনাদের প্রিয় ও স্বজনকে দাঁত বিশেষজ্ঞের বিশ্বয় ও প্রশংসার বিষয়। এই প্রশংসনীয় দাঁতের মূলে ছিল নিমের দাঁতনের নিয়মিত ব্যবহার। অবশ্য নিম দাঁতনের স্থান এখন বহুলাংশে গ্রহণ করেছে নিম টুথ পেস্ট। কারণ, নিম টুথ পেস্টে নিমের সক্রিয় উপাদান ছাড়াও আছে ফ্লুরাইড এবং দাঁতের পক্ষে উপকারী অন্যান্য-অবিচ্ছিত অন্যান্য উপকরণাদি যা দাঁত ও মাড়ী সুস্থ করে, পায়োরিয়া ও দন্তক্ষয় নিবারণে সাহায্য করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে শ্বাসপ্রশ্বাস সুরভিত এবং দাঁত ঝকঝকে করে তোলে।

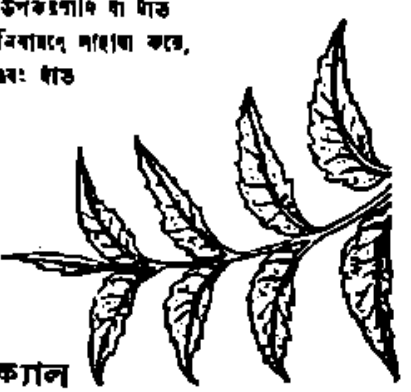

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

CNP-18-66

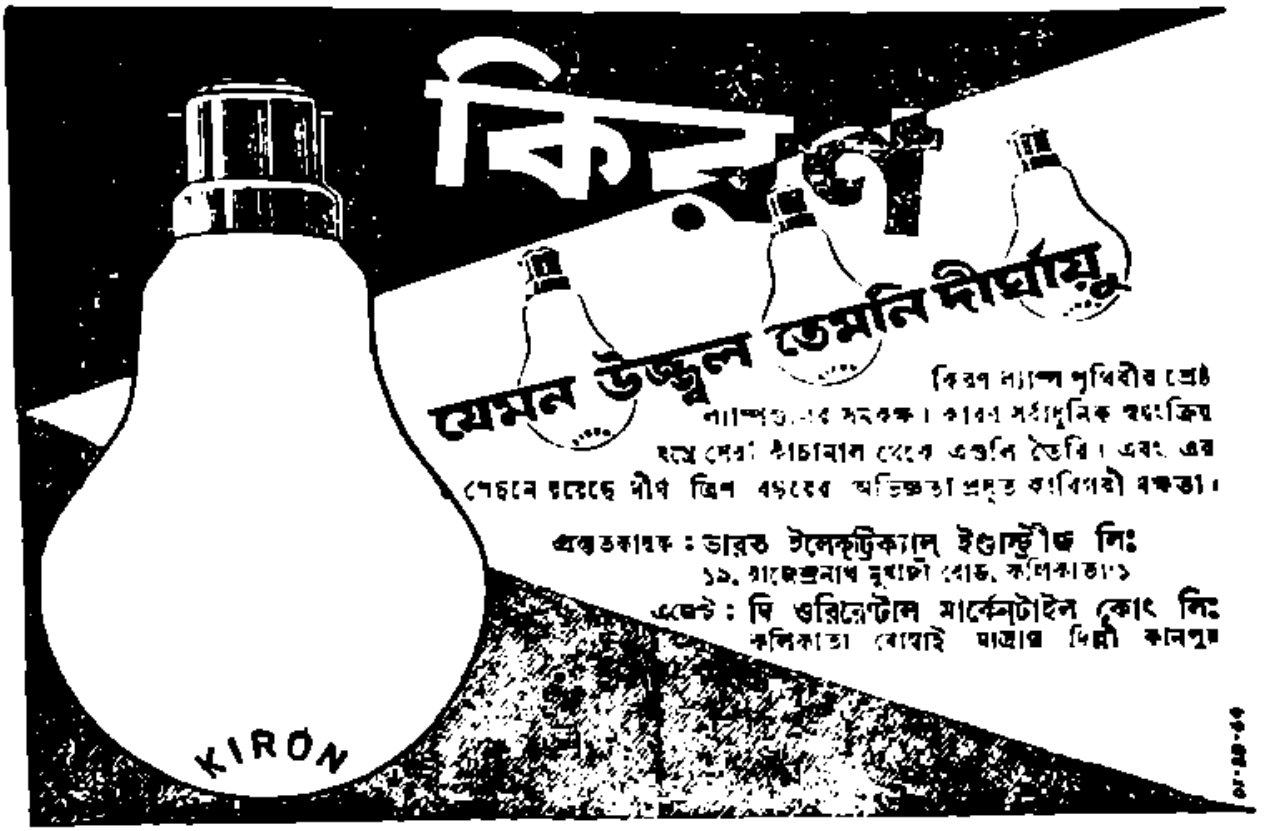

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৭·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০
কর্মবাণী	১·২৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	১·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
Soul of India Speaks	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	২·২৫

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
জীবন গড়া	০·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি

সাহিত্যের গল্প	
বিদ্যাসাগর	

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী :: ১৫, কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

॥ গান্ধী স্মারক নিধির বই ॥
বাহির হইয়াছে

গান্ধী-রচনা-সংকলন

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু সংকলিত
'Selections from Gandhi'
গ্রন্থের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ
অনুবাদ : শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাত্মাজীর নানাবিষয়ক রচনার নির্বাচিত অংশের
একখানি প্রামাণ্য সংকলন
মূল্য : ৫·০০

*

একখানি উচ্চাঙ্গের বই
স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রণীত

মহাত্মাজীর গঠনকর্ম-পদ্ধতি

গান্ধীজীর গঠনকর্মের আদর্শের অনবদ্য বিশ্লেষণ
মূল্য ৩·০০

*

পত্র লিখিলে প্রকাশিত বহির সম্পূর্ণ তালিকা
পাঠান হইবে।

প্রকাশন বিভাগ,
গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা),
১২ডি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল বিরচিত

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্

ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার কাশিমবাজার সংগৃহীত ষোড়শ শতাব্দীর গোপালভট্ট, চৈতন্যদাস ও কৃষ্ণ দাস কবিরাজের সারঙ্গরঙ্গদা টীকার ভাবার্থ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর বহুনন্দন দাস কৃত পদ্যানুবাদ সম্বলিত। সচিত্র শোভন সংস্করণ মূল্য বার টাকা।

গৌরপ্রীতিতে নয়নের দৃষ্টি খুলিয়াছে এমন ভক্তিমতী সুধা সেন কর্তৃক রচিত মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর সরস ও প্রাণ স্পর্শী ভাষায় এবং এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বপূর্ণতার প্রতিমূর্তি নদীয়া বিনোদিয়ার রূপ-গুণ-লীলা-মাধুর্যের সংবাদ এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্যবান চিত্র সম্বলিত। মূল্য আট টাকা।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক রচিত বাংলার চিরায়ত সাহিত্যের সম্ভার

পৌরাণিকী

ভারত আত্মার মর্মকথা পৌরাণিকী। ভোগবাসনা বিরহিত ত্যাগ-মহিমার সমুজ্জ্বল এ পুরাণ কথাগুচ্ছ অনাঘ্রাত কুসুমের মত নির্মল, গঙ্গাবারির মত পবিত্র। শোভন সংস্করণ। মূল্য ছয় টাকা।

পৌরাণিকীর আখ্যায়িকাগুলি স্বতন্ত্রভাবেও প্রকাশিত হইয়াছে।

বেহুলা	১·৬০
জড়ভরত	১·৫০
ফুল্লরা	১·৪০
সতী	১·৩০
ধরাক্রোণ ও কুশধ্বজ	১·২০
রামায়ণী কথা	২·৫০

জিজ্ঞাসা

১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-২৯
১, কলেজ রো, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

উদ্ধবভারত

কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৮৮৭ শকাব্দ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রশস্তি

জয় জয় জয় নিত্যগোপাল হে যুগ-সূর্য জয়।
জয় পুরুষোত্তমানন্দ ভারতু হে জয় জয়॥
মহামিলনের বাণী সুমহান,
ধরার মাঝারে করে গেলে দান,
চির শাশ্বত সে অমৃতবাণী সর্ব সমন্বয়
জয় জয় জয় হে মহাজীবন ভারতু হে জয় জয়।

কর্ম জ্ঞানের ভেদের দ্বন্দ্ব করে গেলে সমাধান,
সর্ব জাতির মিলনে বিশ্ব হল মহা গরীয়ান।
মহাযোগী মহা সমন্বয়ে তব
লভিল বিশ্ব জ্ঞান অভিনব;
তব জড়াজড় মিলন বীণায় ধ্বনি জাগে মধুময়
জয় জয় জয় হে মহাজীবন ভারতু হে জয় জয়॥

বিশ্ব তোমার মহামঠ, তুমি বিশ্ব-নাগরিক,
গৃহী সন্ন্যাসী তোমাতে অভেদ তুমি যে সামগ্রিক;
সব বিপরীতে মিলে গেছে আজ,
জাগিছে বিশ্বে প্রাণের সমাজ,
ব্রহ্ম আমি জগৎ আমি আমি যে সর্বময়
জয় জয় জয় হে মহাজীবন ভারতু হে জয় জয়॥

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ॥

(মৌখিক ভাষণের সারাংশ)

যাঁর জন্মতিথি উৎসবে আজ আমরা সমবেত হয়েছি, মাত্র কয়েক বছর আগেও যাঁর সান্নিধ্য লাভ করে আমরা ধন্য হয়েছিলাম, যাঁর স্মৃতি এই আশ্রমের ধূলিকণার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে সেই মহাপুরুষ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দকে তাঁর ৮৪ তম জন্মদিনে আমরা স্মরণ করি। আমার পরম সৌভাগ্য যে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। দিনের পর দিন তাঁর মুখনিসৃত বাণী আমি শুনেছি এবং শুধু তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্যের পরিচয় নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মধুর ও প্রাণবান সত্তার পরিচয় পেয়েছি।

যাঁরা তাঁকে সন্ন্যাসী বলে জানেন তাঁরা যেমন স্বামিজীর বহিরঙ্গটুকুই শুধু দেখেছেন, তেমনি যাঁরা তাঁকে রাজনৈতিক নেতা বলে জানেন, তাঁরাও তাঁর বহুমুখী প্রকাশের একটি মাত্র ঘটনাকেই মনে রেখেছেন। জীবন যাঁর যেখানে, শুধু সেখানে নয়, জীবন যাঁর পরিপূর্ণ, তাঁর পরিচয় দান করা আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ আমরা আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে জানবো ও প্রকাশ করবো। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ যে শুধু কৃষ্ণপ্রেমী পরম ভক্ত ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন জীবনবাদীও। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ জীবন-দর্শনকে তিনি আত্মসাৎ করেছিলেন। তাঁর দেশ-প্রেম, তাঁর রাজনীতি, তাঁর সন্ন্যাস-গ্রহণ এ'সবই ছিল সেই মহত্তর জীবনবাদের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। বেদান্তবাদী এই সন্ন্যাসীর সামনে ধর্ম এক মানবতার ধর্ম। হিন্দু মুসলমান অথবা উচ্চবর্ণ শূদ্রবর্ণ—এই ভেদ তাঁর মনে কোন-দিন আঁচড় কাটতে পারে নি। সৎ অসৎ, গুণ ও নির্গুণ এই দ্বন্দ্বের মধ্যে যিনি সৎ নন এবং অসৎও নন, যিনি গুণযুক্ত নন এবং নির্গুণও নন তিনি তাঁরই অনুসন্ধান করেছেন। তাই বারাঙ্গনালয়ের মধ্যেও তাঁর অনায়াস গতি। তিনি ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন সকলের কাছে সমান ভাবে। সন্ন্যাসী হয়েও তিনি গৃহী, গৃহী হয়েও তিনি নির্লিপ্ত, এবং নির্লিপ্ত হয়েও তিনি মহাসমুদ্ধ। জীবনের এই উদার প্রসন্ন এবং প্রাণবান দর্শন তিনি কোথায় পেলেন?

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের এই মহৎ জীবন-দর্শনের উপলব্ধি পেতে হ'লে আমাদের ফিরে যেতে হবে তাঁর জীবন আলোচনায়, যে জীবনের শুরু আজ থেকে ৮৩ বছর আগে বরিশালের কোন এক গ্রামে। শোনা যায় শিশু শরৎকুমার অনেকদিন পর্যন্ত কথা বলতে পারেনি। ভবিষ্যৎ জীবনে যিনি বাগ্মীতার দেশ ও মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন, তাঁর শৈশবের এই অক্ষমতা কৌতূহলপ্রদ বই কি। কিন্তু মহৎ পুরুষদের জীবনেই এমন বিচিত্রতা লক্ষ্য করা যায়। ইংলণ্ডের ডিজ্‌রেইলি ও গ্রীসের ডিমস্থিনিসও শৈশবে তোতলা ছিলেন। শরৎকুমার প্রকৃতিতে লাজুক ছিলেন; অথচ ভবিষ্যৎ জীবনে বেদান্তের নব ভাষ্যকার হিসাবে তিনি পূজিত হ'লেন। কিন্তু সেই শৈশবেও আর একটি লক্ষণীয় জিনিষ ছিল। শরৎকুমার পূজোর মণ্ডপে গিয়ে বসে থাকতে ভালবাসতেন। দুর্গাপূজা সমাপ্ত হ'লে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়ার সময় তাঁর আকুল কান্না—মাতৃহারা শিশু মায়ের বিয়োগে যেমন ভাবে কাঁদে। প্রতিবেশীর দুঃখেও তিনি কাঁদতেন। মানুষের দুঃখ ও দুর্গতি তাঁর মনের মধ্যে শুধু কান্নার মেঘ সৃষ্টি করে যেত। সেই বাল্যকালে বালক শরৎকুমার কীর্তন শুনে মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাকত। তার মধ্যে কোথায় যেন একটা উদাস নিরাসক্ত মন লুকানো ছিল। সে বাউলের সেই একটি গানই ঘুরিয়ে

ফিরিয়ে আপন মনে গেয়ে যেত—"অসার সংসারের মায়া ছাড়রে একবার..."

ষোল বছর বয়সে এনট্রান্স পাশ করে' কলেজে ভর্তি হ'লেন শরৎকুমার কিন্তু আর পাঁচজন ছেলের মত তিনি তাকণ্যের বশীভূত হলেন না। কিশোর শরৎকুমার সংসারের প্রতি যেন নিরাসক্ত, বেশভূষার দিকে তাঁর লক্ষ্য নেই, মন কি যেন খুঁজে বেড়ায়। কোথায় সেই সৎ চিৎ আনন্দ রূপ যাঁর প্রভাবে এই জগৎ আজ জগৎ। এই পৃথিবী কি মায়া মরীচিকা শুধু? অথবা এ জগতেরই এক অর্থ আছে? শরৎকুমার আপন মনেই গুনগুন করেন—"অসার সংসারের মায়া ছাড়রে একবার..."

১৯০৪ সালে যখন বাইশ বছর বয়েস তখন তাঁর বন্ধু নিতাই পাল তাঁকে পরমপুরুষ শ্রীনিত্যগোপালের কাছে নিয়ে গেলেন। শরৎকুমার দীক্ষা নিলেন দ্বিজ হলেন তিনি। তাঁর নিয়ত অনুসন্ধানের ছটফটানি এতদিনে শান্ত হ'লো। তাঁর অসহায় কুলহারা মন যেন কাছাকাছি বাঁধা পড়লো।

এর পরেই তাঁর কর্মজীবনের আরম্ভ। বরিশালের ব্রজমোহন স্কুলেই শিক্ষকতায় ব্রতী গ্রহণ করলেন শরৎকুমার। কিন্তু মন যাঁর ঋজু ও বন্ধনহীন, চিত্ত যাঁর শ্রীনিত্যগোপালের চরণে সমর্পিত, চাকুরীর মালিন্য তাঁর সইবে কেন? বি, এম স্কুলের আদর্শচ্যুতি তাঁকে বিচলিত করলো। চাকরি ত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন শরৎকুমার।

এই চাকরিত্যাগ করার প্রয়োজন ছিল। কারণ তা নাহ'লে হয়ত বেদান্তভাষ্য রচনার প্রেরণা তিনি পেতেন না। এই নতুন ভাষ্য যে চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করবে সে বিশ্বাস শরৎকুমারের ছিল। কলকাতার বিভিন্ন সভাসমিতিতেও তিনি বেদান্ত বিষয়ে বক্তৃতা দিতে সুরু করলেন। তাঁর বেদান্ত ব্যাখ্যার মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল যা বহু লোককে আকর্ষণ করলো। শরৎকুমারের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে গেল।

এমন সময়ে বাংলাদেশে এল অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ। ১৯২০ সালের সেই আন্দোলনে ঝাঁপ দিলেন শরৎকুমারও। বরিশালের গ্রামে গ্রামে এক নতুন নেতার আবির্ভাব লক্ষ্য করা গেল যার ত্যাগ, অসাধারণ বাগ্মীতা এবং রাজনৈতিক চেতনা বরিশালবাসীকে অভিভূত করলো। শরৎকুমার ইংরাজ সরকারের অন্যায় ও অসম্মানের প্রতিবাদে অনশন করলেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটক রাখলো ইংরাজসরকার। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে এসে আবার নতুন করে' জেগে উঠ্‌লেন শরৎকুমার। গ্রামে গ্রামে ঘূর্ণিঝড়ের মত ছুটে বেড়াতে লাগলেন বক্তৃতা দিয়ে। সত্য ও অহিংসা যাঁর ধর্ম সেই মহাত্মা গান্ধীকে আদর্শরূপে সামনে দাঁড় করিয়ে শরৎকুমার অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্যে আহ্বান দিলেন সকলকে। কি উদাত্ত সেই ডাক! কি গভীর তার আকর্ষণ! রাজনীতি সম্বল মাত্র নয় তাঁর মন। তাঁর অসহযোগিতা শুধু বিদেশী শাসনের সঙ্গে নয়; তাঁর এই অসহযোগ অন্যায়ের সঙ্গে, অসত্যের সঙ্গে, তাঁর বিরোধ নির্যাতন ও নিপীড়িতদের জন্য। শুধু দেশপ্রেম নয় মানবপ্রেম তাঁর অস্ত্র; বেদান্তবাদ তাঁর ধর্ম।

মনোবাঞ্ছা এবং বিবেকানন্দ যখন বিশ্ববিজয়ে বের হ'য়েছিলেন তখন তাঁর প্রেরণা ছিলো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্দেশ। অনুরূপভাবে শরৎকুমারের এই জীবনব্যাপীবোধক অভিযানে শ্রীনিত্যগোপালের বাণীই প্রেরণা। তিনি নিজেই বলেছেন শুধুমাত্র তাঁর নাম স্মরণ করেই আমি পার হ'য়ে গেছি দুস্তর বিপদের সাগর।

১৯২৩ সালে কংগ্রেসে যখন আভ্যন্তরীণ বিরোধ দেখা দিল তখন শরৎকুমার কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এলেন। আদর্শ তাঁর গান্ধীবাদ, প্রেরণা শ্রীনিত্যগোপাল। শরৎকুমার ঘোষ সেদিন নতুন এক সঙ্ঘের সৃষ্টি করলেন। সেই সঙ্ঘের নাম "স্বরাজসেবক সঙ্ঘ"। উদ্দেশ্য বিশ্বকল্যাণব্রত। পন্থা: সেবা ও অহিংসার সাথে অসহযোগ ও প্রতিরোধ।

আগেই বলেছি বি, এম স্কুল ত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন শরৎকুমার। কিন্তু যখন দেখলেন বি, এম স্কুল তাঁকে আদর্শ ত্যাগ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তখন তিনি অত্যন্ত আঘাত পেলেন মনে। তাঁর মনে তখন একান্ত

বাসনা—জাতীয় বিদ্যালয় চাই। স্বরাজসেবক সঙ্ঘের মাধ্যমে সেই জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। এবং এই স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ থেকেই ১৩০২ সালে অর্থাৎ আজ থেকে একচল্লিশ বছর আগে প্রথম বার করলেন 'উদ্বোধন ভারত' পত্রিকা। বেদান্তের সাধনা যে জগৎকে উপেক্ষা করে নয়, কর্মকে বর্জন করে নয়, একথা সকলকে শুনিয়ে দেবারে ঘোষণা করবার জন্যেই উদ্বোধন ভারত পত্রিকা। সে পত্রিকাকে সারাজীবনের সাধনায় বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তিনি। এবং আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁরই সুযোগ্য শিষ্যা শ্রীযুক্তা রেণু মিত্র। এই উদ্বোধন ভারত পত্রিকাই ক্ষেত্র যার মাধ্যমে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দকে আমরা জানতে পেরেছি, তাঁর জীবন-দর্শনের পরিচয় পেয়েছি, তাঁর বাণী শুনেছি—যা' তিনি দিনের পর দিন আমাদের মনে প্রাণে নিষক্ত করে দিতে চেয়েছেন। আমরা আত্মস্থ হ'তে চেয়েছি।

সদ্গুরুমার ঘোষের কর্মবহুল জীবনের পরিচয় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমার উদ্দেশ্যও তা নয়। আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে এই যে, তিনি কোন অবস্থাতেই পুরুষোত্তম-দর্শনের পথ থেকে সরে' যান নি। কারণ শ্রীনিত্যগোপালকে আশ্রয় করে তিনি থেকেছেন। আর কোন সময়েই তিনি দেশ জাতি ও সমাজের কল্যাণ-সাধন ব্রত থেকেও বিরত হন নি। কারণ দেশ ও সমাজও তাঁর কাছে কর্মাচরণেরই অঙ্গ ছিল। এক সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গগোষ্ঠী গঠন করে মহাপ্রভুর প্রেম ও আদর্শ তিনি প্রচার করে বেড়ান। এর জন্যে তিনি নবদ্বীপ গিয়েছেন এবং সেখানে বৈষ্ণবসমাজের মাঝে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গৌরাঙ্গদেবের জীবন আলোচনা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ডাক এল বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে। তিনি অন্তরের মধ্যে অনুভব করলেন শ্রীনিত্যগোপালের ডাক। কলকাতার মহানির্বাণ মঠে শ্রীনিত্যগোপালের পুণ্য সমাধি তলে বসেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। তাঁর পূর্ব নাম পরিত্যাগ করে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ এই নামে খ্যাত হলেন।

আমি স্বামিজীকে প্রথম দেখি ১৯৪৯ সালে শ্রীরাম গোপাল মহম্মদ ঘোষের উদ্বোধন ভারতের অফিসে। উদ্বোধন ভারতের লেখক হিসেবে শ্রীযুক্তা রেণু মিত্রের আহ্বানে আমি যাই স্বামীজির কাছে। মনে ভয় ছিল। মহা-ধার্শনিক স্বামিজী আমাকে কি ভাবে গ্রহণ করবেন জানতাম না। কিন্তু প্রথম আলাপেই আমি অভিভূত হ'য়ে গেলাম। যাঁকে দেখলাম তিনি ত নিস্পৃহ জীবনবিরাগী সন্ন্যাসী নন। তিনি প্রেমিক, তিনি স্নিগ্ধ, তিনি জীবনরাগী। জীবনে একটা অদ্ভুতপূর্ব সাড়া পেলাম। জীবন অবহেলার নয়, জানলাম পৃথিবী মায়াময় নয়। এ জীবনের সার্থক পরিণতি তার কর্ম-ময়তার মধ্য দিয়ে। কর্মই জ্ঞান, কর্মই ধ্যানবস্তু যায়। কর্মই মানুষকে সেই সৎ ও অসৎ, মৃত্যু ও অমৃতের অতীতে যিনি বিরাজমান তাঁর অভিমুখে নিয়ে চলেছে। একদিকে কর্মের এই আদর্শ, পৌরুষের এই প্রকাশ, অন্যদিকে চরম নিরাসক্তি ও বৈরাগ্য—এ'দুয়ের সমন্বয়মূর্তি রূপে পুরুষোত্ত-মানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকেই সামনে রেখেছিলেন।

স্বামিজী একদিন বললেন—ভারতবর্ষ তার চিন্তায় স্থাণু হয়ে যেতে বসেছিল। যতদিন সে ব্রহ্মচিন্তায় ও তৎ সৎ এর উপাসক ছিল ততদিন সে ছিল নিষ্ক্রিয় static, তাই জীবনযুদ্ধে বারবার আমাদের পরাজয় ঘটেছে। কিন্তু উপনিষদের মধ্যেই আছে উদার মন্ত্র—চরৈবেতি—এগিয়ে চল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই আহ্বান গতিমান হবার আহ্বান, dynamic হবার জন্য আহ্বান। ভারতবর্ষের এক মহা বিপ্লবী বুদ্ধ মানুষের মনের মধ্যে এসে ডাক দিয়েছিলেন। সে ডাক সফল হবার জন্য স্বামিজী বললেন সত্য static যেমন নয়, শুধু dynamicও তেমনি নয়। সত্য হচ্ছে দুয়ের সমন্বয়। বুদ্ধকে আমরা বাদ দিয়েছিলাম বলেই মুসলমান এসেছিল। আমরা তাও শুনিনি। কিন্তু ইংরেজ নিয়ে এল বিজ্ঞানের আলো।

স্বামিজী এই সমন্বয়রূপের সাধক। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে কর্ম ও বৈরাগ্য, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, শক্তি ও সেবা আত্মশক্তির বীর্য ও আত্মনিবেদনের নীরবতা এক হ'য়ে গিয়েছিল বলেই তিনি পুরুষোত্তম। এই পুরুষোত্তম

শ্রীকৃষ্ণকে জানবার সাধনাই জীবনের সাধনা। সেই সাধনার কথাই আমাদের তিনি শুনিয়েছেন।

তাঁরই কাছে শুনেছি জীবন এক অবিচ্ছেদ প্রবাহ। কিন্তু কর্মফলের বন্ধনে জীবন আবদ্ধ নয়। জীবন-সন্ধানী সেই পথিক আজ কত যুগে জানিনা, কিন্তু আমরা প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করছি তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। এই জন্য পৃথিবীর মধ্যে নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর। নর ও নারায়ণের সমন্বয়ে, জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ে, অনন্ত কাল ও অস্তিত্ব লোকের সমন্বয়ে সেই পুরুষোত্তম রূপের আবির্ভাব ঘটুক আবার এই ভারতভূমি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক তাঁর আবির্ভাবে। আমাদের সাধনা দিয়ে আমরা যেন প্রস্তুত করতে পারি তাঁর পথকে॥

স্মরণ

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের ৮৪তম অন্তর্ধানে

কোলাহল চারিদিকে ; অসহিষ্ণু মানবের মন,
পায় নি সে-পথ খুঁজে, যে-পথে জীবন সমুজ্জ্বল
সমৃদ্ধ সার্থক হয় ; তাই শুধু গড়ে নাকো', ভাঙে—
ভেঙে চুরে খান খান করে যেন যা পায় সম্মুখে।

এই যে বিভ্রান্ত মন, এই সব বিকৃত জীবন,
এরাও গড়তে পারে ; মাঝে মাঝে দেখেছি তাদের
কি অপরিসীম নিষ্ঠা। শিল্পী মন কত কিছু গড়ে
দেখেছি বিস্মিত চিত্তে মুগ্ধ হয়ে সৃষ্টির গরিমা।

অথচ এদের সামনে নেই কোন বলিষ্ঠ জীবন,
যে-জীবন নিয়ে যাবে তাদের অভীষ্ট পথ পানে,
যে চলবে দৃঢ় পদে, আর তার জীবন-আলোকে
বাড়াবে সে-চলাপথ, পথ হবে আলোকে ভাস্বর।

তোমাকে দেখেছি সেই সহৃদয় জীবন-পথিক,
শুনে মন্ত্র কর্ণে নিয়ে,—সে-মন্ত্র কী উন্নত উদার !
জনে জনে দিয়ে গেলে যে এল তোমার আঙিনায়,
বিভ্রান্ত মানুষ পেল সেই মন্ত্রে পথের সন্ধান।

তুমি নেই, তবু আছ : এ আশ্রম তোমার সে-বাণী
বুকে নিয়ে বসে আছে, যে আসে সে
শোনে কানে আজো
সেই মন্ত্র প্রাণপ্রদ ; আর পায় তোমার আশিস্—
সে-আশিস্ বিভ্রান্ত এ-জীবনের মহৎ সম্বল।

এখানে তোমাকে পাই, দেখি সেই প্রণয় ললাট,
আজো যেন কানে শুনি সেই বাণী কী যে প্রাণময়।
স্পর্শ পেয়ে ধন্য হই, সেই স্পর্শ ধূলিতে ধূলিতে,
প্রণাম অঞ্জলি রাখি শ্রদ্ধানত এ ধূলির 'পরে।

আর এই তীর্থে এসে মনে মনে করি এ প্রার্থনা ;
মানুষ সমৃদ্ধ হোক, বিভ্রান্তির হোক অবসান ;
ধন্য হোক এ ধরণী, জীবনের দীপ্ত পথে পথে
গতি হোক মানুষের, যে-পথের অভিযাত্রী তুমি।

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীসুনীতি চক্রবর্ত্তী ॥

ওঁ আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষম্।
বিশ্বপ্রেমদেন নরনারায়ণ-সেবীম্
বন্দে সদ্গুরু-শ্রীযুতং পুরুষোত্তমানন্দম্ ॥

কার্ত্তিকের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে বাংলামায়ের গৌরবের সন্তান শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ আমাদের কাছে প্রকটিত হয়েছিলেন। পিতামাতা নাম রেখেছিলেন শরৎকুমার। বাংলায় শরৎ ঋতু যেমন ঘরে ঘরে নবান্ন এনে দেয় শরৎকুমারও তেমনি যেন মানুষের কাছে নবান্ন নিয়েই এসেছিলেন। তিনি যে অন্ন পরিবেশন করেছেন তাতে দেহ মন প্রাণ সমস্তই এক অভিনব তৃপ্তিতে ভরে যায়। তাই তাঁর শরৎকুমার নাম সার্থক। এই শরৎকুমার তাঁর রূপ লাবণ্য নিয়ে ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন, কিন্তু মুখে কথা ফুটল না। মাতা মুক্তকেশী দেবীর সাধনায় প্রায় সাত বৎসর বয়সে কথা বলতে পারলেন। মায়ের সাধনার পাওয়া বাক্‌শক্তি শরৎকুমার আজীবন বিশ্বজননীর সেবাতেই ব্যয় করেছেন।

কিশোর বয়স থেকেই ব্রিটিশ শৃঙ্খলিত ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচনের জন্য শরৎকুমারের প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ভারতবর্ষের বুকে ভীষণ গর্জনে। ব্রিটিশ সরকারকে কম্পিত করেছিলেন। তখন তাঁকে ভারতবাসী দেখেছিল বিপ্লবী নেতা রূপে। আপনার বলতে যা কিছু ছিল সবকিছু বৃহত্তরে দান করে স্ত্রীপুত্র নিয়ে পথে দাঁড়িয়েছিলেন—মায়ের একান্ত উপাসক শরৎকুমার অনেকবার কারাবরণও করেছিলেন।

বিপ্লবী শরৎকুমার সম্বল-মূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপালের চরণ তলে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে পুরুষোত্তমানন্দ বিপ্লবী দার্শনিকরূপে এই ভারত তথা সমগ্র বিশ্বকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্ররূপে গড়ে তোলবার জন্য জীবন ভর সাধনা ও কর্ম করে গেছেন। ব্রিটিশ কারাগারে বসেও তাঁর বিশ্রাম ছিল না। তিনি পুরুষোত্তম দর্শনের ভিত্তিতে গীতার ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, উপনিষদের ভাষ্য লিখলেন। তিনি তাঁর ঐ ভাষ্যগুলির মধ্যে ও অন্যান্য ভাষণের মধ্যে রেখে গেছেন বর্ত্তমান সমস্যাসঙ্কুল যুগ-জীবনের সমাধানের পথের সন্ধান। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আশ্রম তা বহন করে মানুষের কাছে পৌঁছাবার জন্য ব্যাকুল।

শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ যে কথা বলতে এসেছেন তা আজকের মানুষের জীবনে অপরিহার্য্য প্রয়োজন। কেননা আজকের মানুষ সর্ব্বহারা, প্রচলিত ধর্ম, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা আজ সব ভেঙ্গে চুরমার। কোন্ ছন্দে জীবন গড়ে উঠলে এই ছন্ন ছাড়া মন সমাজ পুরুষোত্তম-সমাজে গড়ে উঠবে সেই কথাই সারা জীবন মানব দরদী পুরুষোত্তমানন্দ চোখের জলে বলে গেছেন, লিখিয়ে গেছেন সেই ছন্দে জীবন। আমাদের ধর্ম-জীবনে শুধু কতকগুলি সংস্কারই খানা বেঁধে আছে। জীবন-বাদ আজ বিলুপ্ত। জীবনের সকল কর্ম চলবে এক ঢংএ, আর ধর্ম-সাধনা চলবে আরেক ঢংএ পুরুষোত্তমানন্দ তেমন ধর্ম-সাধনার কথা বলেন নাই। তাঁর কথায় জীবনের প্রত্যেকটী কর্মই হবে জগৎ সেবা। ভাগবত বলেছেন—"ন তু পৃথক্ ব্যাপারঃ এব করণীয়ঃ" সকল কর্মই সেবা বুদ্ধিতে কৃত হলেই হয় জগৎ আরাধনা। কোন রকম কৌলীন্য তিনি স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ঊর্দ্ধোত্তরী, অধোত্তরী, সত্যত্তরী প্রত্যেকের সঙ্গে পুরুষোত্তমের direct and equal relation। সত্যত্তরীর কর্মও যদি বিশ্ব-সেবামূলক না হয়ে আত্ম স্বার্থমূলক হয় তাহাও ব্যর্থ। কোন ফাঁকী দিয়া ব্যাখ্যা পুরুষোত্তম দর্শনে নেই। জীবনের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সব কিছুরই ব্যাখ্যা বদলায়। তিনি বলতেন যে যে কর্মে আছ সব কর্মই যেন 'জগৎ হিতায়' হয়—

তাহাই ধর্ম। আজ কালের গতি এমন ভাবে চলেছে যে মানুষ আজ সর্ব্বহারা, তার সুস্থ দেহ নাই, অর্থ নাই, আবেষ্টনের অনুকূলতা নাই, তার ধৃতি, মেধা সবই যেন তিমিত। গীতা-জীবনচারী পুরুষোত্তমানন্দ এই দিশে-হারা মানুষের কাছে রেখে গেছেন তাঁর জীবন এবং রেখে গেছেন অমর বাণী কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এই ত্রি ধারার এক অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখেছি পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে। নৈষ্কর্ম্যবাদী ভারতবর্ষের বুকে পুরুষোত্তমানন্দ নৈষ্কর্ম্যের নতুন রূপ দিলেন ··তাই তিনি রাজনীতি করেও বলেছেন "আমি রাধানীতি করি"। বেদান্তের দৃশান্তবাদী ভাষ্যকার পুরুষোত্তমানন্দ জ্ঞানীসমাজে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত। দর্শনশাস্ত্রের নূতন রূপ দিয়ে তিনি আজ ঋষি শ্রেষ্ঠ। আবার কৃষ্ণ বলে, গৌর বলে, নিত্যগোপাল বলে কেঁদে বুক ভাসিয়ে তিনি ভক্ত শ্রেষ্ঠ। তাই একই জীবনে দেখতে পেয়েছি তিনি কেমন করে কর্মী হয়েও জ্ঞানী, ভক্ত।

আমরা নারী-সমাজ তাঁর কাছে পেয়েছি আমাদের স্বরূপের খবর। প্রচলিত শাস্ত্র ব্যবস্থায় "নারী নরকের দ্বার"; পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর এক পত্রে লিখেছেন "সমাজ ব্যবস্থায় তোমাদের কোন মূল্য নাই, "নারী নরকের দ্বার", আমি শাস্ত্র-ব্যাখ্যা বদলাইয়া নারী যে স্বর্গের দ্বার, ব্রজের পথের পথিক মহা সিদ্ধির সম ভাগিনী ইহাই তোমাদের জীবনে দেখিতে চাই। তোমরা যোগ্য হও। তোমরা মূর্তিমতী শাস্ত্র হও। পুরুষোত্তম-তত্ত্ব প্রচার কর। তোমরা দাঁড়াও নরসিংহীর মত। সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নতুন করিয়া গড়িতে হইবে।

আজ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জন্ম-বাসরে আমরা সমবেত হয়েছি, তিনি আনন্দিত হয়েছেন। আমাদের সমবেত স্তুতি তিনি গ্রহণ করুন। বিশ্ব-আসনে তিনি প্রতিষ্ঠিত হোন। বিশ্ব আত্মস্থ হোক। জয় গুরু।

এস আর বার পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ ॥

সমন্বয়-গুরু পুরুষোত্তমানন্দ ওগো ধীর সন্ন্যাসী
নিবেদি অর্ঘ্য লক্ষ প্রণাম শ্রীপাদপদ্ম' পরে;
আপন জ্যোতিতে এই ধরাধাম তুলেছিলে উদ্ভাসি
তব কণ্ঠের বাণী নির্ঝর আজিও নিত্য ঝরে।
দেশনেতা, গৃহী, সমাজকর্ম্মী, তুমি তপস্বী জ্ঞানী
জীবন ব্যাপিয়া নিত্য নতুন মূর্ত্তিতে দিলে দেখা;
ছিন্ন আসনে রহিতে সতত দীন বুকে বুক হানি
করুণাঘন, তাইতো জাতির প্রাণপটে আছ লেখা।
যাদুমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া মুক্তি যজ্ঞে হোম-শিখা জ্বালাইলে
ধরাটের তরে সিন্ধুর সম ক্ষুব্ধ তনু ও মন;
বৃটিশ-শোষণ মুক্ত করিতে জাতির বর্ম্মে অগ্নি মন্ত্র দিলে
বজ্রকণ্ঠে ঈশান-বিষাণ বাজালে অনুক্ষণ।
দশের কর্ম্ম ব্রহ্ম কর্ম্ম, কাঞ্চন কামিনী ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী
শাস্ত্র সোমা শিবরূপে পুনঃ শুনালে কথামৃত;
বিশ্ব-প্রেমিক নর-নারায়ণ তুমায় পতাকা বহি
স্বার্থের মোহ নাশিয়া সবারে করেছ উজ্জীবিত।
সঙ্কীর্ণতার অষ্টোপাশেতে আহরহ বাঁধা মানবের মন
ব্যষ্টির সাথে সমষ্টি আমি পরে নি যিনন বাঁধি;
এস আর বার পুরুষোত্তমানন্দ বিমোহিয়া এ' ভুবন
তোমার চরণ রেণু হাতে লয়ে সর্ব্ব-অঙ্গে মাখি।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

(মৌখিক ভাষণের সারাংশ)

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৮৪-তম জন্ম স্মরণে আপনারা এসেছেন—সাদর সম্ভাষণ জানাই আশ্রমের পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে। আপনারা এসেছেন শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের কাছে—এসেছেন শ্রীনিত্যগোপালের কাছে। কিন্তু তাঁরা আপনাদের কাছে ঠিক পরিচিত নন। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দকে তবু আপনারা অনেকে কিছুটা জানেন—তাঁর রাজনৈতিক দিক, তাঁর বক্তৃতা এক সময়ে বাঙলা দেশকে মুগ্ধ করেছিল—কিন্তু সেটা তাঁর সমগ্র জীবনের কতটুকু! তাই তিনিও অপরিচিতই—আর শ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধে তো আপনাদের কিছুই প্রায় জানা নাই। এই অপরিচিত দুইজন মানুষের পূজা এইখানে হয়ে থাকে—পূজা এই জন্য হয় যে মানুষ হয়েও এঁরা আরও কিছু এবং সব মানুষের মধ্যেই এই আরও কিছুর একটা আহ্বান আছে—যে জন্যেই মানুষ অনন্তের পূজারী ভারতবর্ষ চিরদিনই সত্য শিব সুন্দরকে পেতে চায়—কিন্তু পরিবার সমাজ রাষ্ট্রকে সত্য শিব ও সুন্দর করে তোলার পথে নয়—সমাধির পথে। কিন্তু বাস্তব জীবনকে তার যথামূল্যে স্বীকার করেই শ্রীনিত্যগোপাল-শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ অনন্তের সন্ধান রেখে গেছেন। শ্রীনিত্যগোপাল শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ এইখানে ভারতবর্ষীয় হয়েও তথাকথিত ভারতবর্ষীয় ধার্মিকতার বাইরে, আর সেইজন্যেই তাঁরা এত অপরিচিত। ভাল মানুষেরা যদি মনে যায়—তবে সংসারের চেহারাটা কোনদিনই সুন্দর হতে পারে না। আমাদের আজ প্রয়োজন কি করে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে ব্রহ্মভাবে উদ্ভাসিত করে সত্য সুন্দর ও কল্যাণময় করা যায়—অতি অপরিচিত এই দুইজন এই কথার কথাই বলে গেছেন। জীবনটাকে এঁরা জাগাজাগি করে ভাবেন নি—একই মানুষকে ব্রহ্মজ্ঞানীও হতে হবে, আবার রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবার কথাও ভাবতে হবে, সমাজ জীবনের শোষণ দুর্নীতির বিরুদ্ধেও তাকে লড়তে হবে, সুস্থ সুন্দর কল্যাণময় পরিবার জীবনও যাপন করতে হবে—এই কথাগুলিই এঁরা বলে গেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে কতখানি ফুটে ওঠে তা অবশ্য পরের কথা, কিন্তু চিন্তাধারার মধ্যে এই সামগ্রিকতা থাকবে তো।

শ্রীনিত্যগোপাল ১১৯ বৎসর আগে জন্মেছিলেন, ৫৬ বৎসর হয় দেহরক্ষা করেছেন—শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ ৮৩ বৎসর আগে জন্মেছিলেন—৮ বৎসর ৮ মাস হয় চলে গেছেন। শ্রীনিত্যগোপালের জন্ম ২৪ পরগণা জিলার পানিহাটি গ্রামে—পিতা কলকাতার আহিরীটোলায় বহু বৎসর ধনী মানুষ ছিলেন।...মাতুলালয়ে বিশ্বেশ্বরের সাধনায় নিত্যগোপালজন্মগ্রহণ করেন। ২।৩ বৎসর বয়সে তাঁর নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল···সারা জীবনটাই প্রায় তাঁর সমাধি অবস্থায় কেটেছে—যে সমাধি ভারতীয় সাধক জীবনের এক অতীত। অথচ এই শ্রীনিত্যগোপালই বলছেন, এই বিশ্বই আমার মহামঠ, এই শ্রীনিত্যগোপালই প্রাকৃত জীবনের প্রতিটী কাজ অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে করেছেন। একজন সমাধিস্থ পুরুষের জগৎকে সত্য বলা ও সেই জগতের সকল ক্ষেত্র সম্বন্ধে ওয়াকীবহাল থেকে তার সুখদুঃখ তালমন্দ নিয়ে উত্তরোত্তর পথে লড়তে লড়তে চলা—এইটাই অনুধাবনযোগ্য।...শ্রীনিত্যগোপাল পড়েছেন অনেক, লিখেছেনও অনেক—সেখানে বর্তমান যুগ-ধর্মের কথাই আছে—সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের নূতন সম্বন্ধের কথা—ধর্মকে বিশ্বজীবন যাপনকারী মানুষকে কিভাবে গ্রহণ করতে হবে ইত্যাদি অনেক কথা। অল্প কয়েকটী উদ্ধৃতি এইখানে

উল্লেখ করি।

পূর্ণজ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান। পূর্ণজ্ঞানের এক শাখা আত্মজ্ঞান। সর্ব্বজড় ও অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণ জ্ঞান।

সকল প্রকার অবস্থাই মায়িক। প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় আমি আছি এ বোধও থাকে না, কিন্তু সে অবস্থাও মায়িক। সকল প্রকার সমাধি অবস্থাও মায়িক, নির্ব্বাণ প্রাপ্তিও মায়িক। যা কিছু হয়, যা কিছু ঘটে, তাহাই মায়িক। নির্ব্বাণও একটা ঘটনা, সুতরাং তাহাও অমায়িক বলা যায় না।

আধুনিক চতুর্ব্বর্ণ শাস্ত্রীয় চতুর্ব্বর্ণ নহেন। শাস্ত্রীয় চতুর্ব্বর্ণ অভাপি নাই। শাস্ত্রীয় চতুর্ব্বর্ণের বিরুদ্ধে আমার কোন কথাই বলিবার নাই।

ব্রহ্মা হইতে চারিবর্ণের উৎপত্তি সেইজন্য ব্রহ্মাই চারি বর্ণ।

একই বস্তু চারি প্রকার হইলেও কি সেই চারি প্রকার একই বস্তু নহে? অবশ্য সেই চারি প্রকারই একই বস্তু। একই ব্রহ্মার কায়াই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র। সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রও সেই একই ব্রহ্মার কায়া। একেই চার, চারেই এক। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র একই ব্রহ্মার কায়াই চারি প্রকার হইয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র অভেদ। সেইজন্য ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়তা বৈশ্যতা এবং শূদ্রতা আছে, সেইজন্য ক্ষত্রিয়েতেও ব্রাহ্মণতা বৈশ্যতা এবং শূদ্রতা আছে, সেইজন্যই বৈশ্যেতেও ব্রাহ্মণতা ক্ষত্রিয়তা এবং শূদ্রতা আছে, সেইজন্যই শূদ্রেতেও ব্রাহ্মণতা ক্ষত্রিয়তা এবং বৈশ্যতা আছে। সেইজন্যই বলি ব্রাহ্মণও সর্ব্ববর্ণ, সেইজন্যই বলি ক্ষত্রিয়ও সর্ব্ববর্ণ, সেইজন্যই বলি বৈশ্যও সর্ব্ববর্ণ, সেইজন্যই বলি শূদ্রও সর্ব্ববর্ণ। ৩২

অবধূত যোগীর ন্যায় যোগনিয়মের বশীভূত নহেন, বিষয়ীর ন্যায় ভোগপরায়ণও নহেন, জ্ঞানীর ন্যায় মোক্ষ-কাঙ্ক্ষী নহেন, বীরের ন্যায় বলপ্রকাশক নহেন, ধীরের ন্যায় সংযমাত্মাশালী নহেন, ভক্তপাদি মতসাধকও নহেন। তিনি শৈব নহেন, শাক্ত নহেন, বৈষ্ণবও নহেন, তিনি কোন উপাসক সম্প্রদায়ের নিয়ম নিষেধের অনুবর্ত্তী বা বিধেয়ী নহেন। তিনি পরমানন্দস্বরূপ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিবতুল্য বিরাজ করিয়া থাকেন।

—এই উক্তিগুলি প্রত্যেকটিতে একটি নূতন কথা আছে যা আজকের দিনে বুঝে নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

এই জগতের শ্রীনিত্যগোপালকে বুঝতে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ভাষ্য প্রয়োজন। এ কেমন সন্ন্যাসী যিনি বলেন আত্মজ্ঞান পূর্ণজ্ঞানের এক শাখা? জড় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভকে ভারতবর্ষ নীচের তলে স্থান দিয়েছে—কিন্তু নিত্যগোপাল জড় ও অজড়কে এক লাইনে বসিয়ে বললেন এই দুইয়ে মিলিয়ে পূর্ণতা হয়। এ কেমন সন্ন্যাসী যিনি বলেন সকল প্রকার সমাধি অবস্থাও মায়িক? ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থায় বড় ছোটর ভেদ লক্ষ্য অনেক—সেইখানে নূতন যুগের মানুষ নিত্যগোপাল বললেন ব্রহ্মা থেকে চারিবর্ণের উৎপত্তি, সেইজন্য ব্রহ্মাই চারি বর্ণ ইত্যাদি। সন্ন্যাসী শ্রীনিত্যগোপাল তাঁর মঠে মেয়েদের স্থান দিয়েছিলেন যা ভারতবর্ষের সন্ন্যাস কল্পনা করতে পারবে না—কেননা সেখানে নারী বর্জনেই সন্ন্যাস।

এই শ্রীনিত্যগোপালের মধ্যে এত বিরুদ্ধ ধর্ম—যাদের আমরা বিরুদ্ধ বলে জানতে অভ্যস্ত—সন্নিবেশিত হয়েছে যে শ্রীনিত্যগোপালকে বোঝা খুব শক্ত। তিনি নিজে এ সব কিছু বলে যান নি, এই নূতন জীবন-চেতনার কথা কেবল লিখে গেছেন আর আচরণ করে গেছেন। তাঁর মধ্যে সব কিছুই পাওয়া যেত বলে একদল তাঁর মানুষী রূপতত্ত্ব পূজা অর্চনায় দিনটাই নিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন নিত্যগোপালদের সম্বন্ধে বললেন যে টাঁ্যাকে টাকা আর সমাধি একমাত্র নিত্যগোপালেই সম্ভব—তখনই বোঝা যায় শ্রীনিত্যগোপাল অটিল বস্তু—টাঁ্যাকে টাকা থাকলে সমাধি হতেই পারে না—এই ছিল আমাদের ধারণা কিন্তু নিত্যগোপালে তা হতো। টাঁ্যাকে টাকা মানেই বাস্তব জগৎ—অর্থাৎ বাস্তব জগতে বিচরণ করেও সন্ন্যাস বা সমাধি সম্ভব এবং শ্রীনিত্যগোপাল-পুরুষোত্তমানন্দের কথাই হচ্ছে সম্ভবই নয় শুধু প্রয়োজন। আজকের দিনে ব্রহ্মজ্ঞানীই বাস্তব জীবনে যথার্থ বিচরণ করতে পারবে।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের কাছে আসার আগের শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ এবং আসার পরের শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দে অনেক তফাৎ। পুরুষোত্তমানন্দ ছিলেন কুণ্ঠো, তিনিও তখন বিশ্বাস করতেন ভগবানকে ভালবাসতে হলে জগৎকে ঘৃণা দিতে হয়, এবং এই কারণেই নামকীর্তনাদি পরীক্ষাগারের চেয়ে বড় এ মনোভাবের ফলেই উপযুক্ত পড়াশুনার অভাবে বি, এ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। যাই হোক শ্রীনিত্যগোপালের কাছে এসে তিনি মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হলেন—যাতে তিনি ছোটবেলা থেকেই ভালবাসতেন দীক্ষিত হওয়ার পর এক বৎসরের মধ্যে আগে আগে কৃষ্ণ ও ক্রমে ক্রমে রাধা ও তারপর শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব তাঁর জীবনে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। গৌরাঙ্গ জীবন ও তত্ত্ব থেকে প্রকৃতি পুরুষ একাধারে এই তত্ত্ব তাঁর মধ্যে প্রবেশ করল। তখন থেকে জগৎকে ভাল লাগতে লাগল—কিছুদিন তিনি চাকুরী করেছিলেন—শিক্ষকতা বৃত্তি। ৮ বৎসর পরে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে চাকুরী ছেড়ে দিলেন একটা অজানার ডাকে—শ্রীনিত্যগোপাল-তত্ত্বের আহ্বান তাঁকে পথে বের করে আনল। গুরুভাইদের আর্থিক সাহায্যে এক বৎসর ধরে শ্রীনিত্যগোপাল জীবন ও তত্ত্বের আলোকে জড় ও অজড়ের তুলা মূল্যের মানদণ্ডে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখলেন জগৎ সত্য হয় কেমন করে তার দার্শনিক কাঠামো এই প্রথম লেখা হল। শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের কয়েকটী বাণী এইখানে লিখছি—

এতদিন পৃথিবী তনিয়াছে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহারই সত্য, আজ প্রথম শুনিল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়-বিচরণ, বিষয়-ভোগও তুল্য সত্য, তবে তাহাকে প্রত্যাহার-আসনে আসীন হইতে হইবে। যাহার আসন স্থির হয় নাই, তাহার বিচরণ নিবৃত্তিতা মাত্র। যিনি আসীন নন, তিনি ব্রহ্মে অনন্ধ, তিনিও ক্লীব। আসীনের তরে মন আধীন, ইন্দ্রিয়গুলি তাহার বন্ধু, নিত্য, ইন্দ্রিয়-গুলির সেবাদানে কোন আগ্রহ নাই। কিন্তু ব্রহ্মনের ক্ষেত্রে মন ও ইন্দ্রিয় দুই-ই আগ্রহী। আগ্রহে মন ইন্দ্রিয়ের অনুসরণ করে অথচ মন 'আবৃণোৎপরিবাত্তনি' ভাবে বোধেই ডুবিয়া যায় না। ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে ঘুরিয়াও মন অচ্যুতই থাকে। আসন-সিদ্ধ সাধনাই ইহা আনিবে। এই তত্ত্বই গীতার 'নির্যোগক্ষেম'-র তত্ত্ব।

শ্রীকৃষ্ণ একাধারে পূর্ণ ঈশ্বর, পূর্ণ যোগাধার, পূর্ণ যশস্বী, পূর্ণ শ্রীমান্, পূর্ণ জ্ঞানবান্, পূর্ণ বৈরাগী।

গীতার দৃষ্টি বুদ্ধির দিকে। কোনও এক 'রহস্যের' বুদ্ধিতে অহিংসাও হিংসা, আবার কোনও এক 'রহস্যের' বুদ্ধিতে হিংসাও অহিংসা। হিংসা ও অহিংসা বুদ্ধির বস্তুতে, কর্মে নয়।

গীতার কৌশল বুদ্ধি-কৌশল ও ভক্তি-কৌশল। মানুষ যে কোনও কর্মের সাধনায় বর্তমান থাকুক না কেন, সব সাধনায়ই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, যদি সে তাহার কৌশলটি জানিতে পারে। পথের কাড়াকাড়ি, সাধনার বাড়াবাড়ি গীতায় নাই! হিংসা কিংবা অহিংসা হইতে হইবে এমন কোন কথাই গীতায় নাই। গীতায় আছে 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'।

হিংসাপথ যদি দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী, হয়, যদি উহা কর্মের তাৎপর্যলক্ষণ-যুক্ত হয়, ভগবান তাহাকেও ভজনা করিয়া সার্থক করিবেন। হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন গীতার প্রয়োজন নয়। কোন্ পথ তোমার—ইহা স্থির কর অন্তরঙ্গ দেখিয়া, শক্তি কত মাপিয়া, কতখানি ঝোঁক তোমার ও সমাজের উপর আসিবে তাহার হিসাব করিয়া, এবং নিজের যৌক্তিকতাই বা কতখানি তাহা ওজন করিয়া।

গীতা মুক্তিশাস্ত্র; কিন্তু যে মুক্তি অনন্তকাল, অনন্ত সংসার-বন্ধনকে মানিয়া লইয়াও নিজের গৌরবে নিজে অচ্যুত থাকিতে পারে, সেই মুক্তিই গীতার মুক্তি, পুরুষোত্তমের মুক্তি। মুক্তি ও বন্ধনের অতীত যে অবস্থা যাহা মুক্তির হিসাবে পূর্ণ মুক্তি, বন্ধনের হিসাবে পূর্ণ বন্ধন তাহাই গীতার মুক্তি। ব্রহ্মে মুক্তি বা বন্ধনের কোন প্রশ্নই নাই, সবই পুরুষোত্তম দেহে যত বা মুক্ত। ব্রহ্মে যে যাহা, সে তাহাই। কি, কেন—এ সব প্রশ্নের নির্যাস-স্থান ব্রহ্ম, ব্রহ্মে মুক্তি বা বন্ধন দুইই মিথ্যা বা দুইই সত্য। ব্রহ্মে মুক্তির ভাষা বা বন্ধনের ভাষা কোন ভাষাই নাই, আছে পুরুষোত্তম-ভাষা।

কেবল ঐশ্বর্য্য, কেবল বৈরাগ্য কিম্বা পরস্পরকে ফাঁকি দিয়া নিজ প্রয়োজনমত কার্য্য হাসিল করার অভিসন্ধি বাস্তব সৃষ্টিকৌশল লক্ষ বছরেও দিখাইতে পারিবে না। ঐশ্বর্য্যে ক্লীবত্ব আসে, যেখানে আত্মসম্প্রসারণ সেখানেই সৃষ্টিলোপ। আবার বৈরাগ্যেও ক্লীবত্ব রহিয়াছে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি পুনঃপুনঃ আহত লাঞ্ছিত হইয়া নিজ সৃজনশক্তি হারাইয়া ফেলে। যেখানে ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য সমন্বিত, সেখানেই বীর্য্য, যশঃ, শ্রী ও জ্ঞান। জগতে এক প্রান্ত ঐশ্বর্য্য, অপর প্রান্ত বৈরাগ্য।

—এই সামঞ্জস্য সমন্বয় তত্ত্ব, এই পরস্পর বিপরীতের সমন্বয় কি করে সম্ভব? তার পথ হচ্ছে আমিত্বের বিলোপ —শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ-কথিত এই নরনারায়ণ তত্ত্ব অধিগত করার পথ সম্বন্ধে তিনি লিখছেন—'আমি'-কে কেন্দ্র করিয়া যাহা কিছু, সবই কাম। আমির কেন্দ্রে মোক্ষ পর্য্যন্ত স্বর্গসুখ, তখন মোক্ষও 'আমি'-র ভোগ।

আমার করা না-করা অন্যথা-করা সবই কর্ম্মপদবাচ্য, পুরুষ-ব্যাপারতন্ত্র নৈষ্কর্ম্যও কর্ম্মপদবাচ্য। আমি যাহা না করিয়াও পারি, তাহাও ক্রিয়াবিশেষ মাত্র। প্রচলিত অহম্-প্রধান যোগ, সাংখ্য, আধ্যাত্ম, তপ বা অন্য কিছুই পুরুষোত্তম-'আমি'-কে পাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

—নয় বহির্মুখী গতি—এ হচ্ছে আত্মশক্তি ও পুরুষকার, আর নারায়ণ হচ্ছেন অন্তর্মুখী গতি—এ হচ্ছে আত্ম-নিবেদন শরণাগতি ও নির্ভরতার কথা। এই দুটোকে একসঙ্গে চালাতে হবে পুরুষোত্তমকে লাভ করতে হলে—পুরুষোত্তম-পথে চলতে হলে। আত্মশক্তি ও আত্মনিবেদন এই দুটোকে একসঙ্গে জীবনের পাথেয় করতে হবে—একদিকে অহম্ ব্রহ্মাস্মি আর একদিকে আমি বিশ্বনায়কের —এই দুটো উপলব্ধি একসঙ্গে রাখতে হবে। পুরুষকারই একমাত্র বল নয়, একটা বড়ত্বের মধ্যে আত্মনিবেদন ছাড়া জীবনের কল্যাণ শান্তি আনন্দ ও অমৃতের আস্বাদন কোনটাই লাভ করা যায় না।

শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের লেখাগুলি থেকে বোঝা যাবে ব্যাপারটা সহজ নয়—আমি আত্মশক্তিতেও শক্তিমান হব, আবার শরণাগতির সাধনাও রক্ষা করে চলব—এ কি সহজ? আমি ধ্যানও করব, আবার কর্ম্মও করব, আবার জ্ঞানের পথেও অগ্রসর হব—সর্ব্বোপরি আমি ভক্তিমানও হব—এ কি সহজ? সহজ নয়—কঠিন খুবই —তবু মানুষের স্বভাবের মধ্যেই এই সবই রয়েছে—তাই এ আবার খুবই সহজ, এ স্বভাবসঙ্গ—সর্ব্বোপরি এ সার্ব-জনীন—কেননা সকল দেশের মানুষের স্বভাবেই এই সবগুলি কম বেশী রয়েছে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের মধ্যে যেমন আছে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, তেমনি আছে প্রচণ্ড প্রেম। তাঁর জীবন থেকে শিখতে পারি আবেগ-জীবন কি করে পরিশুদ্ধ হয়; আবেগময় জীবন কি করে বুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যীকৃত হয়ে বেগবান অথচ কল্যাণময় হতে পারে তাও জানতে পারি। এই জানাটা আজকের দিনে খুব প্রয়োজন

এই রকম তত্ত্ব আর ঐ রকম দুইজন মানুষকে বুকে ধরে নরনারায়ণ আশ্রমে বসে আছে—তার প্রদীপ বাইরের দিক থেকে ক্ষীণ—কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রতিষ্ঠান হিসাবে বড় হওয়াই তার উদ্দেশ্য নয়—তত্ত্বটাকে জীবন দিয়ে ধরে রেখে তাকে পৌঁছে দেওয়াই তার কাজ।

পুরুষোত্তমানন্দ-জীবনের তত্ত্ব যাঁরা দিলে আর অবশ্য আলাদা করে কিছু থাকে না—শুধু বলা যায় মানুষ পুরুষোত্তমানন্দও অতি মনোজ্ঞ ছিলেন—তাঁর অপরিসীম মানুষী তাঁর পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধির দীপ্তিকে উজ্জ্বল করেছে। তিনি যেমন সুদর্শন পুরুষ ছিলেন, তেমনি তাঁর আচার-আচরণ যেমন ছিল অত্যন্ত রুচিসম্মত তেমনি ছিল মিষ্টি। কী স্নেহই যে সমস্ত মানুষকে করতেন তা কোন্ ভাষায় বোঝাব? আর মানুষকে মর্য্যাদা দিতে বুঝি তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। ছোটকে বুকে তুলে নিয়েই—ছোট কাজ বা ছোট মানুষ—তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর ঘণ্টার পর ঘণ্টার আলোচনার একদিকে সজীব পাণ্ডিত্য আর একদিকে চোখের জল আর শ্রীভগবানের জন্য আকুল কান্না এই সব মিলে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করত যে কিছুই কেউ না বুঝলেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ হয়ে শুনত।

তাঁর কথা এই অল্প সময়ে শেষ হয় না—এই একটুখানি আপনাদের সকলের সঙ্গে বসে আস্বাদন করে তাঁকে আমাদের সম্মিলিত প্রণাম নিবেদন করি।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৬৫)

…যে নক্ষত্র থেকে আলো আসতে ২৫দিন লাগে, আমি যখন তাকে দেখি তখন তো ২৫দিন আগের নক্ষত্রকে দেখি…সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা সেখানে ২৫ বৎসর পরে পৌঁছিবে।…আমার গতিতে গতি মিলাও…। রাসের চক্র হুহু করে চলছে।…স্থিতিধর্মী সংসার মিথ্যা…পুরুষোত্তমের plane-এ ব্রহ্ম সত্য জগৎ সত্য।…মানুষ গতিধর্মী—গীতায় গতির কথাও বলেছেন, স্থিতির কথাও বলেছেন …নাচতে নাচতে স্থির থাকার নাম মাত্রাজ্ঞান,…ছন্দ…! নাচ ও ছন্দ এক করতে অহংকার থাকলে পারে না—আমার ব্যক্তিগত ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য মিথ্যা…। কবিরাজ ডাক্তার যেমন নাড়ী দেখে জ্ঞান মানুষকে বিশ্লেষণ করে দিতেন।—রাসলীলা শুনলে কামক্রোধলোভমোহ মোহিত হয়ে যায়।… ব্রহ্ম সত্য জগৎ সত্য 'আমি' রেখে হবে না…। Peaceful coexistence অদ্বৈতবাদী পাশ্চাত্ত্য কল্পনাই করতে পারে না।…মহারাস হচ্ছে স্বজাতীয় বিজাতীয়ের মিলন—এই রাসে শঙ্কর-বুদ্ধ-খ্রীষ্ট-হেগেল-মার্কস্…হাত ধরাধরি করে দাঁড়াবেন…বিশ্বরূপ স্বামী বিশ্বরূপ স্ত্রী না হলে কেউ কাউকে পাবে না…তখন শঙ্করাচার্য সত্য…। ভোক্তা হয়ে নিজের আমি দিয়ে বিশ্বের বস্তুকে ভোগ করবে, ঘটনার মীমাংসা করবে—এ তো অসুরত্ব। লক্ষ্মী বিশ্বের, কোন একের নয়; রক্ত সমস্ত দেহে ছুটাছুটি করে বলেই পবিত্র—ভোক্তা রাবণের লক্ষ্মী অলক্ষ্মী—বিশ্বরূপ রামের লক্ষ্মী লক্ষ্মী…। Decentralisation-ই হচ্ছে ডক্টিবাদ…। একলার মুক্তির কথা এখানে নাই—শেষ মানুষের সঙ্গে শেষ ছিদামে আমি পার হব।…পঞ্চশীল রাজনীতির মত ধর্মের ক্ষেত্রেও রয়েছে।…শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীনিত্যগোপাল দুইজনে এসেছেন…। বৃন্দাবন থেকে ফিরে নিত্যগোপাল পরমহংসদেবের কাছে গেছেন—আনন্দে রামকৃষ্ণদেবের কোমরের কাপড় খসে গেছে…দুইজন দুইজনকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।…বিবেকানন্দ যা রেখে গেছেন তা creative…এই creative ধর্মন আমি সারা বেদান্তে রেখে গেলাম…। নূতন যুগের ভোরে…শ্রীরামকৃষ্ণের বাংলা শ্রীনিত্যগোপালের বাংলা পথ দেখাবে।…হরেকৃষ্ণবাবু ও শচীনবাবুকে আশ্রমের পক্ষ থেকে সাদর অভ্যর্থনা জানাই। আগামী রবিবার রাসপূর্ণিমা দিনে নবনারায়ণ আশ্রমের জন্মদিন ৩টায় আলোচনা…আমি সংসার-বিপ্লবী, আমি সন্ন্যাস-বিপ্লবী, আমি কর্ম-বিপ্লবী, আমি জ্ঞান-বিপ্লবী… আমি সব কিছুতে বিপ্লবী।…Love is static, service dynamic…যে ভালবাসার সেবা নাই, সে ভালবাসা ব্যর্থ…। নিত্যগোপাল, তুমি তারা আমি ছাড়া, তুমি আছ আমি নাই…। ধরার ধূলি হউক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম মানুষ।

১৪, ১১, ১৮ …। এই সংসারকে একটা সৃষ্টি-চক্র বলে—ব্রহ্মচক্র; চাকা যেমন ঘুরে ঘুরে চলে—তেমনি ব্রহ্ম থেকে সৃষ্টি, সৃষ্টি থেকে ব্রহ্ম; ব্রহ্ম থেকে আমি, আমি থেকে ব্রহ্ম। যে জানে আমি ব্রহ্ম থেকে এসেছি—ব্রহ্মেতে যাব তার কর্ম অনন্তায়িত হবে। বীজ থেকে গাছ ফল, আবার বীজ গাছ ফল… অনন্ত কাল বীজ এইভাবে বেঁচে থাকে। আমিও বেঁচে থাকব যদি আমি নিত্যগোপালে পৌঁছুতে পারি—তাঁহাতে পৌঁছিলে আমি অনন্তায়িত হইব।…ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের নাম ফলাধ্যায়—ফল ব্রহ্মবস্তু—প্রত্যেক মানুষকে ফলে পরিণত হতে হবে। উপনিষদ্ আমি ব্রহ্ম আমি ব্রহ্ম বলেছে—আমি নিত্যগোপালের মধ্য দিয়ে এসেছি…শিষ্যের সকল কর্মের ফল ভোগতে। যার

শুকনো প্রাণ নয় সে তো অনন্ত হবেনা ; হবে—পাঁচশ বৎসর পরে হয়তো, কেননা এক হিসেবে মৃত্যু তো তাদের নেই।...কিন্তু নিত্যগোপাল এসে ছিলেন এই জন্যেই ফল ফলিয়ে দিতে—ফল ফলাতেই মানুষের শেষ কথা...। যার জীবনে পুরুষোত্তম ফুটেছেন, নিশ্চয় সে অনন্ত হবে। —ছিঁচকে স্ত্রীপুত্রকন্যার আসক্তিতে লাভ নেই।...অনন্ত বীজের শেষ পরিণাম নিত্যগোপাল ফল...প্রত্যেক মানুষ অব্যয় বীজ।...সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল ভাবতে হবে আমি কতখানি নিত্যগোপাল ফল ফলাতে পেরেছি—মানুষ-বীজের শেষ ফল নিত্যগোপাল ব্রহ্ম-সূত্রে লিখেছি—যুগের আগে অবতার আসেন—নইলে যুগের গতি নেই। ভবিষ্যৎ যুগ কি ভাবে চলবে তার ছবি নিত্যগোপালে...' অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্য—অপ্রমত্ত হয়েই তাঁকে বুঝতে হবে।...বেহুঁশ হয়ে চলা হচ্ছে—আমাকে যে ফল ফলাতেই হবে সে তার খোঁজ রাখে...সবাই খাচ্ছে দাচ্ছে দিন যায়...। প্রার্থনা হয়—কিন্তু প্রার্থনার অর্থ ভাবনা করা হয় কি? কোন সাড়া নাই শব্দ নাই—এই যে ঘাতব্যাধি রোগ এ থেকে যেন তোমরা বেড়ে উঠতে পার—। নিত্য নূতন করে যদি জীবন চালাতে না পারলে তাহলে পুরুষোত্তমকে লাভ করবে কেমন করে? কত খানি নিত্যগোপাল-ফল জীবনে ফললেন বীজ তা রোজ কাবুক—বীজ ভাবুক তার অঙ্কুর উদ্গম হলো কি না, ফুল ফুটল কি না, ফল ধরল কিনা...আমার ভিতরের ব্রহ্ম কবে ফুলবে, কবে ফুল ফুটবে...আমি বয়সে বাড়ছি, আমি ব্রহ্ম হওয়াতে বাড়ছি কি না—আমি ব্রহ্মমুখো হয়েছি কি না...। আলো এসে ডাকছে বীজের ভিতরের চাড়া গাছকে, জল ডাকছে, মাটি ডাকছে—বেরিয়ে এস, ফুটে ওঠ...। প্রকৃতি তোমাকে ডাকছে, বলছে—ওঠ জাগ...। তোমাদের জীবনে কবে এ ডাক আসবে? কবে তোমাদের অন্তরের ঘুমন্ত সত্তা জাগবে?...নিত্যগোপাল, এদের যে কারো কোন বেদনা দেখি না, কি হবে? বুদ্ধদেবের মধ্যে এই জাগরণের, ভিতরের এই সত্তার ফুটে উঠবার জন্য কি বেদনা—যেদিন আলো আসবে সেদিন কি তীব্র বেদনা—সন্তান প্রসবের বেদনার মত বীজের সন্তান বুদ্ধ।...কি বেদনা...গোবিন্দ জীবন থেকে বেরোলেন—কি কষ্ট—তিনি বিশ্বসুত—সুত মানে পুত্র। উপনিষদ বললেন তিনি বিশ্বনাথ, তিনিই বিশ্বসুত—স্বামীই তো পুত্র...। খাওয়া সন্তার মধ্য দিয়ে, সব কিছুর মধ্য দিয়ে দেখতে হবে আমি নিত্যগোপালকে জন্ম দিতে পারার মত করে চলতে পারছি কি না...না নিজের বুদ্ধি-মত চলছি—আসক্তি বিদ্বেষের বশীভূত হয়ে...ভগবান সুন্দর করে প্রকাশিত হন—সেরকমভাবে কেটে তিনি বের হোন...। আমি নিত্যগোপাল-বীজ ফল হব, আবার বীজ হব...এই চক্র চলছে...। তোমাদের খাওয়া ঘুম সবই হচ্ছে—কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে কোন আকুলতা তো কিছু দেখি না...। আমরা সব সাধনা করবার জন্য জন্মেছি এ কথাটা মনে রেখো...

১৮, ১১, ৪৬ :...ভক্তকবি গান গেয়েছেন, আমি তো তোমারে চাহি নি জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছ... দেখা দিয়েছ। খুবই সত্যি কথা—যদি কেউ জীবনের দিকে তাকায় তাহলে সে দেখবে তিনিই ডেকে ডেকে যাচ্ছেন। তিনিই চান—আমরা চাইনি।...আমি অভাগা, তবু তুমি আমায় চেয়েছ—...গুরু শিষ্যকে চান...শিষ্য গুরুকে চায় না—সে তার যান্ত্রিকতা নিয়ে এড়িয়ে চলতে চায়...। নিত্যগোপাল এসেছেন—একটা যুগ ভেঙে যাচ্ছে—নূতন যুগের আদি শ্রীনিত্যগোপাল জীবনের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছেন...জীবনটা জগৎটা আজ নূতন করে গড়ে নিতেই হবে—বর এসে গেছেন—তুমি তাঁকে বরণ করে নেবে না? বলবে না আমার সব দেহ মন প্রাণ দিয়ে আমি তোমায় বরণ করব? নদী যদি সাগরে যুক্ত থাকে, সাগরের জলকে যদি নদী তার মধ্যে ঢুকতে দেয়—অকপটে সরল প্রাণে...তাহলে সাগর নদীর রূপ বদলে দেবে।...বদ্ধ জলে মশা ব্যাঙ হয়, সাগরে তো হয় না—বদ্ধ জীবের আবার সাধন কি?...গুরুর কাছে নিজেকে বলি দেওয়া ছাড়া জীবের আর সাধন নেই—তাঁকে গোপ্তা (রক্ষা কর্তা) বলে বরণ করে নিতে হবে। মানুষ নিজের আমিকে ছাড়ে না—বাইরে অনেক ত্যাগ করে—

শুধু আমিকে হাতছাড়া করে না। অথচ আমি না ছাড়লে হবে না কিন্তু।...

জীবনবেলা দুই তারিখ করে ব্রহ্মপ্রেম-সাগর জলে...আমি ছেড়ে তালান দেব...আহাজ ভোবে কেননা সে সাগরের বুক দলিত করিয়া চলে। তাই টাইটানিকও ভোবে—কিন্তু ভলার বেলা ভোবে কবে দে? ভলার বেলায় আমি তো অপিত—সে সাগরের তরঙ্গের সঙ্গে উঠছে নামছে...হয় দোলায় দোলে—দুলতে দুলতে পাটে পাটে খসে যায়—তখন সাগর-সঙ্গ সাগার গায়—এমনি তর ভগবান যখন জীবনে আসেন—তখন দেহাবসান—তখন দেহ মন প্রাণ স্নান করে ওঠে...[জীবন বেলা দুই তারিখ করে গান্ধীজী আবার গাইলেন]। এইই মানুষের চরম পরিসমাপ্তি, চরম সার্থকতা—তিনি হন, আমি বনে—আমার সকল দেহমনপ্রাণ তাঁকে দিয়ে আমি কৃষ্ণ-গতপ্রাণা, কৃষ্ণ-কামিনী হব। নিত্যগোপাল, স্বামী, প্রেম্ব কিশোরীর দুয়ারে অযাচিত করুণায়। তুমি কৃপণনি...তোমার ঐ রূপ আমার প্রাণ স্পর্শ করুক—তুমি আমার জীবনের অণুতে অণুতে প্রবেশ কর—আমার জীবন নিয়ে তুমি ইচ্ছামত খেলা কর...আমি তোমার খেলার পুতুল হব।...তুমি আমার আমি নাও—আমি নিত্যগোপাল, আমি নিত্যগোপাল। তোমার সেই জীবনের প্লাবন, ওগো সাগর, তোমার সহজ জীবন, তোমার energy...আমি ঘরে ঘরে ঘরে বেড়াব—কেউ তোমায় নেবে না—সেই বেদনা নিয়ে চলবার হবতো—এই বেদনাই···আমার জীবনের ব্যথা...। যা ফুরিয়ে এনেছি—অনাহার অনশন অনিদ্রা সব তোমায় চরণে নিবেদন করে যাচ্ছি। দিন গেল ...আজকের সারা দিনে আমার কতটুকুতে আমি ছিল, কতটুকুতে তুমি ছিলে?...আমি নিষ্পাপ হবো, তুমি জলে ওঠো—স্বামী, স্বামী...।

১৯, ১১, ৪৬—ওঁ...ওঁ। সংসারে পথ-চলা খুব কঠিন—'সংসার অতি ভীষণ স্থান'—এজন্য সংসারের দোষ নয়—মানুষের অহম্ ও মম—এই দুটোতে আটকে পড়েই এ সংসার ভীষণ স্থান হল। প্রত্যেকে সামগ্রিক দৃষ্টি হারিয়ে বিচ্ছিন্ন করে রেখে বলেই সংসার ভীষণ—যদি নিজের মন বা অহমকে আর কারো কাছে ন্যস্ত করা যায় তাহলে ভীষণ নয়। জ্ঞানী বা ভক্ত দুই-ই নিজের বাইরে যাবার জন্যে চেষ্টা করে—জ্ঞানী আমার নয়, আমার নয় বলে যান করে, ভক্ত বলে তোমার তোমার ··· ঘরের বৌরা নিজেদের সন্তানদের আমার সন্তান বলে দেখে—যদি মনে করত এরা আমাদের শ্বশুরের গোত্র, তাহলেই দৃষ্টি বদলে গিয়ে সব ঘটনাটাই আলাদা হয়ে যেত...ব্যাপকতার মধ্যে এলেই ঘটনার মীমাংসা হয়...বড় ছোটর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, তাতেই সমস্যা।···একটা বড় আমির মধ্যে যেতে হবে—বৌদের কাছে স্বামীরা আলাদা—কিন্তু শ্বশুরের মধ্যে তো তারা এক—তাই শ্বশুর-রূপ মূলকে ধরলে স্বার্থ এক—শ্বশুরের কাছে পুত্রবধূরা সমান, নাতিরা সমান—ব্যাসাদ হয় পুত্রদের সংঘাতে।...একটা বড় গোত্রের মধ্যে আমরা এক—তাই বলে কি গোত্র তোমার? শাণ্ডিল্য গোত্র—আমারও তাই—এস দুজনে এক গোত্রের হয়ে আপন হয়ে গেল।...নিজের আমিকে ভগবানে দিলে এমনই করে সকলে আপন হয়। ভগবানে আমি দিতেই হবে—তোমায় আমিও তাঁকে দেব, আমায় আমিও তাঁকে দেব—সেইখানে মিলনাম। শুধু বিজ্ঞানে সমস্ত ব্যাপ্তি তাঁর···এখানে যে কেউ আসবে সব আমাকে দিয়ে আসতে হবে—কারো মেয়েও থাকতে পারবে না, কারো ছেলেও নয়—আশ্রমে ঢুকতে হলেই আমির নিবাস করে দিয়ে আসতে হবে—কিন্তু হয় স্বার্থ নিয়ে—আমিতে আমিতেই ঝগড়া...সাধনভজনশীল জীবন যাপন করতে ডাকা হয়েছে...। হয়তো করতে কিছুই পারলাম না—শুধু বলে যাব এই জীবনের কথা...। অনুই বলে কিছু নাই—পূর্ব জন্মের অর্জিত কর্মই অনুই...সমগ্রগতির ভিতর দিয়ে অনন্ত বন্ধন কেটে যায়—সাগরে সমগ্রগত হলেই মহান মুক্তি—অনুই কাটাতে চাও, তাঁকে আমি দাও—

কমলা

সেই মায়েরা

।। শ্রীভারতী ।।

আজকের এই বৃষ্টিভেজা বিষণ্ণ অন্ধকারে শুধু
মনে পড়ছিল তাদেরই কথা যে মায়েরা
ছড়িয়ে আছেন দেশে দেশান্তরে।
আছেন পৃথিবীর পর্ণ কুটিরে কিম্বা মহার্ঘ প্রাসাদে;
শুধু পরিচয়ে যারা এক।
ভেজা চোখের ঘোলা ছাউনি নিয়ে
যারা বেঁচে আছেন জীবন্মৃত হয়ে।
এদের ছেলেদের কেউ হয়তো ঘুমে বলি,
কারো বা বুকের ধনদের অসংখ্য সম্ভাবনা ভরা
প্রাণের প্রদীপটি
নিভে গেছে কোনো এক অতর্কিত মুহূর্তের
নিদারুণ বিপত্তিতে।
এরা সবাই মায়ের পায়ে প্রণাম রেখে বেরিয়েছিল;
বলেছিল যাবো ঘুরে আসি।
কিন্তু ফিরে আর কেউ আসেনি, আসতে পারেনি।
আজকের এই বৃষ্টিভেজা বিষণ্ণ অন্ধকারে
শুধু মনে পড়ছিল সেই মায়েদেরই কথা
একটি নামেই যাদের পরিচয়
অবিরল চোখের ধারায় যাদের চেনা যায়।

দেখেছি পর পর দুই প্রৌঢ় ছেলেকে হারিয়ে বৃদ্ধা মায়ের
ফেটে যাওয়া হৃৎপিণ্ডটাকে। দেখেছি
যুবক ছেলের মৃত্যুতে মায়ের শুকিয়ে যাওয়া জীবন
ঝরে পড়েছে বহুর না ঘুরতেই। এও দেখেছি
মা চিকিৎসা, মা সান্ত্বনা, অসহায় মায়ের কোলে শিশুপুত্র
ঢলে পড়েছে মরণ সাপের বিষাক্ত ছোবলে।
আর দেখলাম, অবাক বিস্ময়ে পাথর হয়ে গিয়ে দেখলাম
যারো, ছুড়ির শিশু ও যুবকেরা স্বাধীন দেশের পথে পথে
গুলি খেয়ে মিটিয়ে গেল সংঘের পিপাসা।
তারা ভাঙা ভাঙা ভাষার মত মরণান্তিক যন্ত্রণায় এদের মায়েরা
লুটিয়ে পড়ল ধুলোয়; অভিশাপ উঠল গগন ছাপিয়ে।
আজকের এই বৃষ্টি ভেজা অন্ধকারে কেবলই
মনে পড়ছিল সেই সব মাতৃমূর্তিকেই; মনে হচ্ছিল
সমস্ত আকাশ জুড়ে, সমস্ত বাতাস ভরে
ছড়িয়ে গেছে যেন তাদেরই কান্না।
অন্ধকারের ভেজা কালির বিষণ্ণ রূপ-লেখায় আজ
ফুটে উঠছে শুধু একটিই বেদনার লিপিকা।
আজকের এই মুহূর্তটি তাই শুধু মায়েদের
শুধুই মায়েদের।

অনেক রামদুলারী, অনেক অতীজিৎ আর তারা'র মা
পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। সুরুল ইসলাম, নিমাই,
আনন্দ অলোক এবং
আরো অনেকের কত শত মায়েরা এসে হাত ধরল ওদের,
নদী হল সমুদ্র।
ব্যথাদীর্ণ বুকের নিরুপায় দীর্ঘনিঃশ্বাসে
আজকের বাতাসটা বড় ভারী
আজ সমস্ত মন জুড়ে আসন পেতেছে তাদেরই
একটি নামেই যাদের সম্পূর্ণ পরিচয়
অবিরল চোখের ধারায় যাদের চেনা যায়।

বিজ্ঞান ও দর্শন

॥ শ্রীউমাশঙ্কর চট্টরাজ বি, এস, সি, ডিস্ ইন দেসিস এডুকেশন, মি, এস্,।

জীবনের রহস্যকে জানবার জন্যে মানুষের কত প্রচেষ্টা। মানুষ পৃথিবীকে বোঝবার মানুষের কত ইচ্ছা। এই রহস্যগুলিকে জানবার জন্যে মানুষ তিন-টি পথ বেছে নিয়েছে—ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান। অজানাকে জানবার ইচ্ছা, না পাওয়াকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আদিম মানুষের ছিল। বাঁচবার অনিবার্য তাগিদেই ত মানুষ রহস্যঘন বিশ্বের রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করতে চায়। মানুষের মনে চিরন্তন এক আকুল জিজ্ঞাসা—এই আপাত দৃশ্য আপার কাম্যের পিছনে কি সত্য লুকিয়ে আছে? এটা অবশ্য স্বাভাবিক কৌতূহল কারণ জীবন-ধর্মের সঙ্গে জ্ঞান ও রূপের পিপাসাকে মেলাতে হ'বে।

মানুষের একটি বিশেষ গুণ হোল আত্মরক্ষা। আর আত্মরক্ষার মত আর একটি স্বভাবগুণ হোল বিশ্বপ্রেম। এর থেকেই জন্ম নিল "বিজ্ঞান ও দর্শন"। বিজ্ঞান মানুষকে জ্ঞান দেয় বিশুদ্ধ জ্ঞান পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষা এই দুই হাতিয়ারের সাহায্য নিয়ে বৈজ্ঞানিক এই বিশুদ্ধ জ্ঞানের সন্ধান করেন। এই হাতিয়ার নিয়েই মানুষ জড় বিশ্বকে বিশ্লেষণ করে আবার কোথাও চলে তার সংশ্লেষণী কাজ। কাজের মধ্য দিয়েই সত্যকে জানা যায়। আমার কোন কিছু জানতে হ'লে দেখা ও শোনার প্রয়োজন; তর্কের মাধ্যমে তাকে জানা যায় না।

জীবনকে সুখী করার তাগিদে অতি প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ বিজ্ঞানের সাধনা করে এসেছে। প্রস্তর যুগের মানুষের সাধনায় সত্যই হ'য়ে হঠাৎ একদিন দু'টি কাঠের ঘর্ষণ হ'তে অগ্নিদেব আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। সেদিনের মানুষগুলো সেই প্রথম যেন একটু আরামের মুখ দেখতে পেল। হিংস্র পশুর হাত হ'তে তারা মুক্তি পেল। এরাই ত প্রকৃত বিজ্ঞানী। এদেরই চলার পথে চলে আজ কত বিজ্ঞানী বিশ্বকে কত উন্নততর করে তুলেছে। এদেরই প্রচেষ্টায় জগৎ আজ কতো সভ্য। বর্তমান জগতের সভ্যতার ভিত্তিতে যদি খুঁজে দেখা যায় দেখবো "বিজ্ঞান"। ত্রিভুবনে বিজ্ঞানের কি অপ্রতিহত অভিযান। এই অভিযানের এখনও শেষ নাই। নিত্য নূতন কত্তই চিন্তা তার। আজ সবের মধ্যে তার চিন্তার শেষ খুঁজে পাওয়া যায় বিজ্ঞানের এই সুস্থ চিন্তা স্বীকার করে, জীবনের পরম সত্য ও পরম স্বার্থ পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। জীবনের বাস্তব প্রয়োজন না মিটলে সত্য শিব ও সুন্দরের (Truth, beauty and love) উপাসনা করা ব্যর্থ। দেহটাকেই যদি সে বাঁচিয়ে রাখতে না পারল তবে তার কিসের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য? এই উত্তর ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের কি অপূর্ব কর্ম ধারা বয়ে চলেছে! জীবনের সত্য সন্ধানের প্রতিটি পথে আজ বিজ্ঞান আলোক বর্তিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দ্রষ্টা এবার দৃষ্টি নেবে, দ্রষ্টা হ'য়ে বিজ্ঞান বিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণার গতি বিধিতে চলবে তারই অনুশাসন। বিশ্বের সকল রহস্যজাল বিজ্ঞানী এবার ছিন্ন করে চলেছে। স্রষ্টাকে ছেড়ে এবার সৃষ্টিকে জানার কঠোর সাধনা হ'চ্ছে। সাধনায় সিদ্ধিলাভ হ'য়েছে, তবে সিদ্ধির পশ্চাতে লক্ষ্য আছে। পশ্চাৎ হ'তে সে বলছে, বিজ্ঞান, সমস্ত মঙ্গল কর্ম তোমার জন্য নয়; সংহারও তোমার কাজ। লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যাকরার সুন্দর কৌশল সে জানে কিন্তু যদি একটু চিন্তা করে কথাটা বলা হয়, সত্যই কি এটা বিজ্ঞানের কাজ? না। বিজ্ঞান স্বয়ংক্রিয় নয়। তাকে পরিচালনার ভার মানুষের. মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্বের রহস্যকে ভেদ করতে পারে। কিন্তু মানুষের মনের রহস্য জানার অধিকার দার্শনিকের। দার্শনিকের হাতিয়ার হোল দর্শন।

দর্শনের অর্থ কি? দর্শনের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হোল 'দেখা' (দৃশ্+অনট্)। কি দেখা? না কোন বিষয়ের

সমগ্রকে দেখা—তার উদ্দেশ্য ও সমাপ্তিকে দেখা। আবার দেখার অর্থ জানা। তাই আরও পরিষ্কার করে বলা যায়, কোন বিশ্ব বিষয়কে অতৃপ্ত তৃষা নিয়ে সে বিষয়ে জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষাকেই দর্শন বলা যাবে। সে বিষয় কিন্তু কোন টুকরো জিনিষ হবে না—তার যেমন আরম্ভ থাকবে তেমনি একটি পরিসমাপ্তিও থাকবে। অর্থাৎ সমগ্রকে জানা চাই—সে বিজ্ঞান বা সাহিত্য যে বিষয়ই হোক্ না কেন! তা'হলে দার্শনিক তাকেই বলবো "who has a taste for every sort of knowledge and who is curious to learn and is never satisfied" এবং যে "a lover not of a part of wisdom only but of the whole"- John Dewey দর্শনের আধুনিক ব্যাখ্যা করে বলেন "whenever philosophy has been taken seriously, it has always been assumed that it signified achieving a wisdom that would influence the conduct of life" কোন মানুষের জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে এবং সে ধারণা যদি গভীর ভাবে চিন্তা প্রসূত হয় তবেই তাকে দর্শন বলা যাবে। জীবন বিভিন্ন, তাই সে সম্পর্কে ধারণাও বিভিন্নতর হ'তে বাধ্য। তাই জীবনের চলাকেই (way of life) দর্শন আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। জীবন যাত্রার পদ্ধতি থেকে দর্শন পৃথক নয়। শুধু কথা নয়, কাজই মানুষের আচরণের প্রধান সাক্ষী। তাই জীবনের আচরণই কোন মানুষের দর্শনের প্রকৃষ্ট পরিচয়।

বিজ্ঞানের বহুমুখী সাধনা যখন নিজ নিজ আওতায় এসে গতিহীন হয় তখন শুরু হয় দর্শনের জয়যাত্রা। দার্শনিকরা বিজ্ঞানের বহুমুখী সাধনার সমন্বয় সাধন করে। বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্তের সঙ্গে মানুষের ধর্ম ও নীতিকে একসূত্রে বেঁধে ফেলাই দর্শনের কাজ। [ধর্ম হোল ধৃ+মন্ (duty) অর্থাৎ যাকে অবলম্বন করে মানুষ জীবন ধারণ করে, নিজ নিজ শৃঙ্খলা, নিয়ম, রক্ষা, অরক্ষা প্রভৃতিকে মেনে চলে সেটাই ধর্ম।] পরে এই বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয়ী সিদ্ধান্ত জগতের বুকে তুলে ধরে দর্শন। বিজ্ঞানের দেওয়া জ্ঞান পরিমাণ সংক্রান্ত, আর দর্শনের দেওয়া জ্ঞান গুণ সংক্রান্ত। বিজ্ঞানের মত দর্শনকেও যুক্তিতর্কের মধ্যে দিয়েই চলতে হয়। পদ্ধতিতে দুটোই প্রায় এক। তবে গণিতের নিয়ম সব ক্ষেত্রে জীবনের নিয়মের সঙ্গে একতালে পা ফেলতে পারে না। যেমন, দুটো সমান শক্তিশালী চুম্বকের ঠিক মধ্যস্থলে একটা কাঁচা লোহার দণ্ড রাখলে লোহাটা কোনদিকেই আকৃষ্ট হ'বে না। তেমনি যদি একজন নৈয়ায়িক বলেন যে সমান গুণসম্পন্ন সমপরিমাণ ঘাস একটা গাধার দু'পাশে দিলে সে কোনটাই খাবে না, তাহলে ঐ নৈয়ায়িক গাধা অপেক্ষা মূর্খ। কারণ লোহার নিয়ম গাধায় খাটে না।

আজকে মানুষ শুধু দার্শনিক হলেও চলবে না আর বৈজ্ঞানিক হ'লেও চলবে না। আজকের মানুষের এক হাতে থাকবে দর্শন আর এক হাতে থাকবে বিজ্ঞান। মানুষের বাস্তব জীবনের ক্ষুধা মেটাবার জন্য বিজ্ঞান সদা প্রস্তুত। আর তার মানসিক চিন্তার রসদ যোগাবে দর্শন। জ্ঞানার্জনে অপরিহার্য বিজ্ঞান আর সেই জ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগে অপরিহার্য দর্শন। দর্শন না থাকলে বিজ্ঞানের শুভবুদ্ধির উন্মেষ হবে কেমন করে? বিজ্ঞানের নিত্য নূতন অভিযানে কে তার ললাটে জয়টীকা দিয়ে মঙ্গলঘট নিয়ে মঙ্গল কামনা করবে? জীবনকে সচল রাখতে বিজ্ঞান দরকার। আজকের দিনের বড় বড় কল কারখানা মারণাস্ত্র তৈরীর জন্য নয়; রহস্যময়ী প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য, জীবনের সত্যকে বিশ্বের বুকে জাহির করার জন্য। তাই বিজ্ঞান যাবে আগে দর্শন থাকবে সাথে। দর্শন বিজ্ঞানকে কড়া পাহারা দেবে; বিজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ পথে নিয়ে যাবে। সমাজ-কল্যাণের কাজই হ'বে বিজ্ঞানের কাজ। সমাজকে সম্পূর্ণরূপে পেতে হ'লে তাই চাই দর্শন ও বিজ্ঞান। এরা একই বৃন্তে ফোটা দু'টি ফুল। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির সাধনা ব্যর্থ। বিজ্ঞানীর পথ হোক সুগম, নূতন সম্ভাবনায় সে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলুক। পিছনে থাকবে তার দার্শনিক। মাঝে মাঝে সে বলবে "তুমি বীর যোদ্ধা; কিন্তু প্রাণহন্তা নও, তুমি শ্রেষ্ঠিক"।

আমাদের জাতীয়তা-বোধ

॥ শ্রীরুহিদাস সাহা ॥

দু'শ বছরের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি তাও প্রায় আঠার বছর হয়ে গেল। এই দু'শ বছরে ইংরেজ শাসনে আমাদের চরিত্রে যে বিজাতীয় বোধ, পরানুকরণ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, ভয়ভীতি, ধীর ধর্ম ও সংস্কৃতিতে অবহেলা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য যে ভাবে নিয়ত উপনিবেশে সঞ্চারিত হয়েছিল তা যদিও এই আঠার বছরে বিদূরিত হবার নয় তবুও যতটুকু হওয়া উচিত ছিল তার শতাংশ হয়নি। স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয়তা বোধ-অগ্নি যে ভাবে জ্বলে উঠেছিল, স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তা দপ করে নিভে গেল। স্বাধীনতা অর্জন অপেক্ষা স্বাধীনতা রক্ষার যে আরও বেশী স্বদেশপ্রীতির প্রয়োজন তা আমাদের ভাবনায় এলো না। দেশমাতৃকার মুক্তি সাধনে সর্বস্ব পণ করে জীবন দিতেও যারা কুণ্ঠিত হন নি তাঁদের বংশধর হয়ে দেশ-জননীর কথা খুব কমই আমরা ভাবি। নিজের পরিবারের বাইরেও যে একটা সুন্দর জগৎ রয়েছে, সে জগতে প্রবেশ করলে যে চিত্ত আনন্দে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে-তা আমরা ক্রমশঃই ভুলতে বসেছি।

আত্মকেন্দ্রিকতা আমাদের যে ক্রমশঃই গ্রাস করছে তার প্রমাণ জনহিতকর কার্যে আমরা আর পূর্বের মত উৎসাহিত হই না। তাই সভা সমিতিতে যোগদান করতে আমাদের সময়ের অভাব হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ সভা সমিতি কোরামের অভাবে বানচাল হবার উপক্রম হয়। নির্ধারিত সময়ের পরে শুরু হয় অধিকাংশ সভা-সমিতি। অভাবের প্রতিবাদ করতে আমরা শিখেছি ভুলে। কোথাও অন্যায় দেখলে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে যেতে হয় আমাদের। ওর মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে রাখতে চাই না কোথাও ইতস্ততঃ করি। তাই দেখি প্রকৃত অপরাধীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে চায় না অনেকে। ফলে পুলিশ কর্তৃপক্ষও তদন্ত করতে পারে না অনেক ক্ষেত্রে।

আমরা নিজের পরিবারের জন্যে যতটা ভাবি সমাজের জন্যে তার শতাংশও নয়। নিজের পরিবার পরিজন, নিজের সন্তান সন্ততিদের কি ভাবে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখতে পারব, তাদের মুখে কি ভাবে হাসি ফুটাতে পারব সকাল সন্ধ্যা আমাদের সেই ভাবনা। পরিবারের প্রতি এরূপ-কর্তব্য যদি পারিবারিক গণ্ডী-মুক্ত হয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্যে রূপায়িত হয় তবেই তাকে আর স্বার্থপরতা বলা চলে না। দেশের প্রতিটি মানুষ যদি এরূপ কর্তব্য পালনে তৎপর হয়ে ওঠে তবে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এক নব যুগের সূত্রপাত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আজও আমাদের সমাজে সে-যুগচেতনার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয় নি। সন্তানের কান্নায় আমাদের যে-হৃদয় এত বিগলিত হয় সে-হৃদয় পাষাণ হয়ে যায় বুভুক্ষু শিশুর কান্নায়। যে সমাজে স্বার্থপরতার প্রাদুর্ভাব, জাতীয়তা-বোধের সেখানে ঘটে তিরোভাব।

ট্রামে বাসে বৃদ্ধদের বসার সুযোগ না দিয়ে নিঃসংকোচে সীট অধিকার করে বসতে আমরা একটুও ইতস্ততঃ করি না। সম্মুখস্থ লোককে উপেক্ষা করে সীট অধিকার করতে ছুটে যাই আমরা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে ট্রামে বাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্ধ হয়ে যায়। এ সকল মূলে স্বার্থপরতা থেকেই উদ্ভূত।

আমাদের জাতীয়তা-বোধ বলে যে কিছু নাই তার আর একটি বড় দৃষ্টান্ত কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটি অঞ্চলে পানীয় জলের অপচয়। জলের কলের মুখ স্বাধীনভাবে খোলে রেখে দেওয়া হয়েছে—যতক্ষণ কলে জল থাকে, ততক্ষণ সমানে জল পড়ে যেতে থাকে—কারও একবার মনেও পড়ে না যে ঐ ভাবে জল পড়ে যাওয়া মানেই জলের অপচয়। এই অপচয়ের রোধ না করা যে কত বড় দৈন্য সে বোধই যে-জাতির নেই সে জাতির জাতীয়তা কতটুকু তা সহজেই বোধগম্য।

আমাদের সমাজে স্বার্থত্যাগী যে একেবারে নেই তা নয়। তবে তাদের সংখ্যা নগণ্য। আর্তের আর্তিতে, ব্যথাতুরের বেদনায়, নিরন্নের হাহাকারে তাঁদের প্রাণ কাঁদে, সহানুভূতিতে হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু এঁদের সহানুভূতিতেও আমরা স্বার্থের গন্ধ পাই, অপকারীর অপকারকে বিকৃত করে নানা বিদ্রূপাত্মক বাক্য বাণে নিজেরা আনন্দ উপভোগ করি।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সরকারের উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে আমরা ভাবলাম আমাদের সব কাজই শেষ। বাকী শুধু ব্যালট বাক্সে ভোটটি দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করা। তারপরও যা বাকী থাকে তা হ'ল সরকারের উগ্র সমালোচনা করা। সমালোচনা ভাল। গণতান্ত্রিক দেশে সরকারী সমালোচনার অভাবে গণতন্ত্রই হয় মূল্যহীন। বিশেষ করে কল্যাণ-ধর্মী রাষ্ট্রে, যেখানে সরকারের কল্যাণ-হস্ত সর্ব-দিকে প্রসারিত হয় সেখানে সমালোচনা তো থাকবেই। তবে সরকারী সমালোচনার আমরাই বা কতটুকু উপযুক্ত তারও বিচার প্রয়োজন আছে।

জাতীয়তাবোধ বলতে যা বুঝায় তার কতটা আমরা দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পদক্ষেপে রূপায়িত করতে পেরেছি? আজও আমাদের দেশের নেমতন্ন বাড়ীতে অপরিমেয় খাদ্যের অপচয় ঘটে। আমরা একবারও ভাবি না, আমাদের দেশ খাদ্যে ঘাটতির দেশ। প্রতি বছর প্রচুর খাদ্য আমদানী করতে হয় বিদেশ থেকে। তার ফলে আমাদের সার্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ হবার উপক্রম। তাছাড়া, আমাদের দেশে অসংখ্য বুভুক্ষু নরনারী যারা ভাঙ্গাচীন থেকে খাবার কুড়িয়ে খায় তাদের কালিমালিপ্ত মুখগুলো কি আমাদের চোখের সামনে একবারও ভেসে আসে! বন্ধুর নেমতন্ন বাড়ীতে খেতে বসে অতিরিক্ত খেয়ে বা বিনিদের অপচয় করে বাহাদুরীর নজীর সৃষ্টি করে হৃৎসিৎ আনন্দে মেতে উঠতে আমাদের এতটুকু লজ্জাবোধ হয় না। অথচ আমরাই তো দরিদ্রতার কথা উল্লেখ করে সরকারী সমালোচনায় উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠি।

পূর্ববাংলার নিপীড়িত নির্যাতিত ছিন্নমূল যাঁরা পিতৃপুরুষের কিটামাটি ছেড়ে প্রায় রিক্ত হয়ে জীবন রক্ষার্থে ভারতে প্রবেশ করেছেন তাঁদের প্রতি সকলেরই সহানুভূতি থাকা উচিত, সহানুভূতি রয়েছেও। তাই দেশের চতুর্দিক থেকে সরকারী উদ্বাস্তুনীতির সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় দেশের উপর দিয়ে এবং সরকারও স্বেচ্ছায় হ'ক আর অনিচ্ছায় হ'ক উদ্বাস্তু খাতে যতটা অর্থব্যয় করেছেন তা একেবারে নগণ্য নয়। কিন্তু সে-অর্থে ক'জন উদ্বাস্তু উপকৃত হয়েছেন? অথচ সে-অর্থ বণ্টনের ভার পড়েছিল পূর্ববাংলার মানুষের উপর যাদের অনেকেই অকল্যাণ্ডের অধিপতি-সিংহাসনে বসে নিজেদের স্বর্গরাজ্যের দেবতাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন! এই অকল্যাণ্ডই তো অসংখ্য করুণ কাহিনীর সাক্ষ্য বহন করে চলেছে!

আমাদের জাতীয়তাবোধের কত নমুনা! ট্রামে বাসে জায়গা থাকা সত্ত্বেও পাদানী দখল করে অপরের বাধা সৃষ্টি করি, একবারও ভাবি না এ গাড়ীতে অপরের যেমন যাবার প্রয়োজন আছে, তেমনি আছে অধিকার। একবারও মনের কোণে স্থান দিই না, আমার জন্যে দুর্ঘটনা ঘটে কতগুলো জীবনের অকাল বিয়োগ ঘটা অসম্ভব নয়। আজও রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা দ্বিধাহীনচিত্তে থুথু-কফ ফেলে যায় পথে ঘাটের যেখানে সেখানে। মনে একবারও সংকোচ এসে এদের বাধা দিয়ে বলে না—এই থুথু-কফ থেকে কতকগুলো রোগ সংক্রামিত হয়ে সমাজের অনেক অনিষ্ট সাধন করতে পারে এবং সামাজিক ক্ষতি শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হতে পারে রাষ্ট্রীয় ক্ষতিতে। মনের আনন্দে বলা খেতে খেতে খোসাটি ফেলি রাস্তায় উপরে। এই খোসাতে একটি অমূল্য জীবনের যে অকাল বিয়োগ ঘটতে পারে তা যেন আমাদের চিন্তায় একবারও আঘাত হানে না। নিজের গৃহে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীর কথা বেমালুম চেপে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করি; সকলের অলক্ষ্যে যে-সব রোগী কাপড়চোপড় সার্বক্ষণিক পুড়ছে ঘুরে যাই নিঃসংকোচে—এরূপ কাজ যে প্রকারান্তরে নিজের সর্বনাশের বীজ বপন করে তা ভাববার মত সুস্থ বুদ্ধি আমাদের নেই যেদিন হয়নি কলকাতায় ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হয়েছে

এর মধ্যেই হাতলগুলোয় কি মাখা হয়েছে তা প্রত্যক্ষদর্শীর অজানা নয়। অথচ এগুলো আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। কলকাতার পথে চলতে চলতে হঠাৎ মাথার উপর বকের-গুলো আবর্জনা বা জল পড়ে মাথা বা জামাকাপড় ভিজিয়ে দেবার নজীর পথযাত্রীর অভিজ্ঞতা-তালিকাভুক্ত। ঐ জল বা আবর্জনা দূষিত পদার্থ হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। অথচ বিনা দ্বিধায় সে-সব ঘটছে আমাদের সমাজে, আর সে-সব করছে আমাদের প্রতিবেশীরাই।

দুর্নীতি দুর্নীতিতে সমাজটা একেবারে ছেয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবে যেন কোন কাজই হতে চায় না। সর্বক্ষেত্রে ঘুষ দেওয়া নেওয়ার ঝোঁকটা খুব প্রবল। আপনার বিরুদ্ধে সত্য অভিযোগটাও অসত্য প্রমাণিত হয়ে যাবে যদি আপনি কিছু টাকা খরচ করতে প্রস্তুত থাকেন! আমাদের দেশে টাকার কি মহত্ব! আমাদের আবার একটা দেশ! রোগীর ওষুধ আর শিশুর খাদ্যে যে দেশে এত ভেজাল সেটা আবার দেশ! দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় রোগীর ওষুধ ও শিশুর খাদ্যে নিঃসংকোচে ভেজাল মেশায়, খাদ্যশস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে, দেশের অগণিত দরিদ্র জন-সাধারণের হাহাকারের মধ্যে অজস্র মুনাফা লুটে পৈশাচিক আনন্দ পায়। সে আনন্দে তারা দিশাহারা হয়ে যায়। সংবাদে প্রকাশ, কলকাতার এক ব্যবসায়ী বিদেশে এমন একটি মেশিনের অর্ডার পাঠিয়েছিল যার সাহায্যে পাথর থেকে চাল সদৃশ পদার্থ তৈরী করা সম্ভব। চালের সঙ্গে ঐ পাথরগুড়ো মিশিয়ে মুনাফা লোটাই ছিল ঐ নর-পিশাচ ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্য। আমাদের ব্যবসায়ী সমাজের দেশদ্রোহিতার নজীর আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সাম্প্রতিক দু'টি যুদ্ধে। ভারত-চীন যুদ্ধের পূর্বে যে চাল ছিল সাতাশ টাকা মণ, যুদ্ধের সময়ে তা পৌঁছে গেল চল্লিশ টাকায়, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর তা দাঁড়াল আশী-নব্বই টাকায়। এই অস্বাভাবিক চড়ের একটি কারণ উৎপাদন হ্রাস হলেও কৃত্রিম অভাব সৃষ্টিই এর প্রধান কারণ, আর এই অভাব সৃষ্টি করেছে আমাদের দেশের বড় বড় ব্যবসায়ী মহল অর্থের লালসায়। দরিদ্র ভারতের দারিদ্র্য পীড়িত জনসাধারণের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় এমন নজীর বুঝি কারতেই সম্ভব!

দেশের নিরাপত্তার রক্ষার ভার যাদের উপর তাদেরই যদি হয় দুর্নীতিপরায়ণ, দেশের হবে ভরসা কোথায়! যানবাহন সংক্রান্ত আইন রক্ষার্থে ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে। সেখানে খানিকক্ষণ দাঁড়ালেই দেখা যাবে—পয়সার যেন চড়ির লুট চলছে! পুলিশ দেবতার দয়ায় তখন আইন লঙ্ঘনকারীও ত্রাণ পেয়ে যায়। এ সব ঘটছে সুস্পষ্ট দিবালোকে, আমাদের চোখের সম্মুখে। পুলিশ যেন যাদুকর, আমরা তার দর্শক। কোন প্রতিবাদ নেই, কোন বিরক্তিরও ভাব নেই।

পৃথিবীর বিভিন্নদেশে ভারতীয় দূতাবাসগুলিতেও জাতীয়তাবোধের একান্ত অভাব। বিভিন্ন দেশে ভারত মাতার পরিচয়ী মূর্তি তুলে ধরাই দূতাবাসগুলির কর্মচারি-দের পবিত্র কর্তব্য। দেশপ্রেমের অভাবেই সে-সকল কর্তব্য থেকে তারা বিচ্যুত। সে-কারণেই ভারতের নিন্দার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে না, ভারতের বক্তব্যে ততটা আন্তরিকতা দেখা যায় না। এভাবে বিদেশে ভারতের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়, ভারতের প্রতি বিদ্বেষ ঘনীভূত হয় বিদেশীর মনে মনে। এই দিকটি আরও স্পষ্টতর হয়ে ওঠেছে সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে। পাকিস্তান যেখানে মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার চালিয়ে সকল দেশের সমর্থন লাভের চেষ্টা করল, ভারত সত্যকে সত্য বলে প্রচারেও ততটা কৃতকার্য হতে পারল না। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা বিজয় গৌরবে উল্লসিত হ'লেও, দূতনীতিক্ষেত্রে আমাদের পরাজয় বরণ করতে হ'ল।

চিত্র প্রদর্শনী শেষে প্রেক্ষাগৃহে জাতীয় সঙ্গীত হয়ে আসছে কিছুদিন ধরে। সে-সময়ে যেখানে যে দৃশ্য দেখা যায় তা বড়ই মর্মান্তিক। কোথায় দর্শক-মণ্ডলী দাঁড়িয়ে জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করবে এবং জাতীয় সঙ্গীতে নিজের কণ্ঠ মিলিয়ে দেবে, সেখানে অধিকাংশ দর্শক ছুটাছুটি করে বেরিয়ে পড়ে প্রেক্ষাগৃহ থেকে। তিন ঘণ্টা বসে আমরা চিত্র দেখতে পারি, কিন্তু জাতীয় সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করতে দু'মিনিট সময় হয় না

আমাদের! এমন দিন ছিল যখন ভারতের এক প্রান্তে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উচ্চারিত হ'লে তা প্রতিধ্বনিত হতো দেশের অন্য প্রান্তে। এ মন্ত্র-বলে দেশের মানুষ হাসিমুখে এগিয়ে গেছে জীবন বলিদানে। কিন্তু আজ? আজ আমরা ভুলতে বসেছি সে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র। তাই আমাদের চরিত্রে আজ স্বদেশপ্রেমের অভাব।

পরপর তিনটি অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেছে। আশানুরূপ সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি এসব পরিকল্পনা থেকে একদিকে আমাদের আন্তরিকতার অভাব, অন্যদিকে দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা—এ দু'য়ে মিলে এক দুই ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে দেশে। ফলে, সেতু নির্মিত হয়েছে, সে-সেতু ধ্বসে পড়েছে কিছু দিন পরে। রাস্তাঘাট তৈরী হয়েছে, কিন্তু স্থায়িত্ব লাভ করেনি বেশী দিন। জমিতে জলসেচের জন্যে কত পরিকল্পনা, কত বাঁধ নির্মাণ—চাষীদের তাগো কিন্তু জল জোটেনি অনেক ক্ষেত্রে। মোট কথা, পরিকল্পনার অর্থ ব্যয় হয়েছে, কিন্তু দেশের মঙ্গল হয়নি তাতে। মুষ্টিমেয়ের মঙ্গলে তো দেশের মঙ্গল নয়! সরকারী অর্থে অনেক লোকের পকেট ভারী হয়েছে, কালোবাজারীদের উৎপাত বেড়েছে। দেশে দেখা দিয়েছে মূল্যস্ফীতি। অপর দিকে যে দুঃখ তা বড় করুণ। দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি যে তিমিরে ছিল আজও তারা সেই তিমিরে। গ্রাম-ভারতের দারিদ্র্য-পীড়িত জনমণ্ডলী আজও দু'মুঠ অন্নের জন্যে হাহাকার করে, সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তাগো যা জোটে তাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, রাতের আঁধারে তারা আলো জ্বালাতে পারে না; চিকিৎসার অভাবে জীবনগুলো অকালে ঝরে পড়ে। ইলেকট্রিকের আলো তাদের জীবনে আলো জ্বালাতে পারে নি, সুপ্রশস্ত রাস্তা তাদের মনে প্রশান্তি জাগাতে সমর্থ হয় নি।

দেশজোড়া আজ অবিশ্বাস, কাকে ঠকিয়ে কে বড় হবে শুধু সেই ফন্দি। রাজনৈতিক আবর্তে জনসাধারণ বিভ্রান্ত। রাজনীতির আজ চরম অবমাননা। স্বদেশ-প্রেমের কণ্ঠে এখন বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা।

সুস্থ ও সবল ভারত গঠনে আজ বিশেষ প্রয়োজন নৈতিক চরিত্রের শুভ উদ্বোধন, রাজনৈতিকতার নয় উদ্বোধন। কিন্তু তা কি ভাবে? শৈশবই শিক্ষার উপযুক্ত সময়। সেই সময়ে শুরু হয় ছাত্র জীবন। গীতা-উপনিষদের বাণী ও মহাপুরুষদের জীবন-কাহিনী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য তালিকায় যুগপৎ হওয়া উচিত স্বদেশপ্রেমের পীঠস্থান।

কিন্তু তা কি সম্ভব হবে ভারতে? ভারত যে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। আর, এখানে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হিন্দুধর্মের প্রতি উদাসীনতা হিন্দুধর্মের স্বপক্ষে বললেন যিনি তিনি সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি। আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ অন্য ধর্মের শুভদের স্বাগত জানান, কিন্তু বহির্ভারতের হিন্দুধর্মীয় নেতৃবৃন্দ অভ্যর্থনা পান না তাঁদের কাছ থেকে। সুদূর বিদেশ থেকেও আমাদের নেতৃবৃন্দ অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় উৎসবে বাণী পাঠিয়ে দেন, কিন্তু হিন্দুধর্মীয় উৎসবে সে-সবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না তাঁরা। অনেক নেতা শপথে বলেন—আমি হিন্দু নই, প্রধানমন্ত্রীত্ব তাতেই সহজলভ্য হয়।

এখন প্রশ্ন, এই নীতিতে আত্মসমর্পণ করব, না এ নীতি পরিবর্তনে সচেষ্ট হব? দেশের পচনশীল সমাজের পরিবর্তে সুন্দর ও বলিষ্ঠ সমাজ গড়ে তুলতে হ'লে বিদ্যালয় সমূহে ধর্মশিক্ষা বিশেষ প্রয়োজন। দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের সেই বিষয়টি নেতৃবৃন্দের সম্মুখে তুলে ধরবার সময় এসেছে এই গুরুত্বপূর্ণ আবেদন প্রত্যাখ্যাত হ'লে আন্দোলনের পথে পা না বাড়ানো উপায় থাকবে না। এ বিষয়ে আমাদের পথ প্রদর্শক গণবিপ্লবী শ্রীগৌরাঙ্গ।

দর্শন-চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্র

॥ অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত ॥

বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক; কিন্তু তাঁর অন্তরের গভীরে যে-একজন দার্শনিক মনীষী বাস করতেন এ-কথাও অবিসংবাদিত। তাঁর এই দার্শনিক সত্তার সন্ধান তাঁর শেষ জীবনের পূর্বে বড় একটা কেউ দেখতে পাননি। কিন্তু একটু অনুধাবন ক'রে দেখলে উপলব্ধি করা যায় যে, তাঁর উপন্যাস সৃষ্টি-কর্মেও একটি উজ্জ্বল দার্শনিক সত্তার ধারণা ছিল। উপন্যাসে যখন তিনি জড় প্রকৃতিকে সংযোজন ক'রে জীবন এবং জগতের অনুভাবনার গভীর তাত্ত্বিক দিকগুলিকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন, তখনও সেখানে আমরা দার্শনিক বঙ্কিমকেই প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু সে-দর্শন চিন্তা উপন্যাসকারের বর্ণনার সময় প্রাসঙ্গিক ভাবে এসেছে; যেমন করে আসে মালা গাঁথবার বেলায় একটি বিশেষ ফুলের সৌন্দর্যকে বিশিষ্ট সজ্জায় স্থান দেওয়ার জন্য মালাকারের অপূর্ব রূপচিন্তা।

যথার্থ দার্শনিক বঙ্কিমকে আমরা পাই তাঁর রচিত 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণ চরিত্র', এবং 'শ্রীমদ্ভগবত গীতা'র ব্যাখ্যায়। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র মধ্যেও দার্শনিক বঙ্কিমের একটি বিশিষ্ট জীবন-চিন্তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, এবং সে-দর্শনচিন্তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে সাংখ্যদর্শনের উপর ব্যাপক আলোচনা এবং 'জ্ঞান', 'ত্রিবেদ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে কি বলে' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে। দর্শন জীবনচিন্তার ঘনীভূত রূপ। এই জন্যই জীবনের গহনে গিয়ে দার্শনিকের ডুব দিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রও দিয়েছিলেন। জীবন দিয়ে কি করা যায় তার উত্তর লাভ করার জন্য সারাজীবন তিনি অধ্যয়ন করেছেন, বহু পরিশ্রম করেছেন। দীর্ঘদিন তিনি পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের বিভিন্ন দর্শন মূলক গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করেছেন, ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থগুলির মনন ও অনুধ্যান করেছেন; তার ফলে জীবনের একটি গভীর সত্যচিন্তায় এসে তিনি উপনীত হয়েছিলেন। জীবনের প্রশ্ন নিয়ে তিনি কি ভাবে জীবনের বহু পথ অতিক্রম করেছিলেন, সেই কথা তিনি 'ধর্মতত্ত্বে'র শুরুর মুখে এই ভাবে দিয়েছেন, "অতি শৈশব অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, 'এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়?' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক রোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী-বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্টভোগের ফলে এতটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। 'জীবন লইয়া কি করিব?' এ-প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল উত্তর অযথার্থ। লোকের সকল জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ ফল, এই একমাত্র সুফল। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, আমি এ-তত্ত্ব কোথায় পাইলাম। সমস্ত জীবন ধরিয়া, আমার প্রাণের উত্তর খুঁজিয়া এতদিনে পাইয়াছি।" [১] এই উত্তর নিয়েই তিনি জীবনের প্রতিটি কাজ করতে চেয়েছেন, এবং তাঁর উপলব্ধিজাত কথায় আমাদের জীবনকে পরিচালিত করার নির্দেশও দিয়ে গিয়েছেন। অন্য এক স্থানে বলেছেন; 'জগতের অন্তরাত্মা বা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের এবং জগতের কি সম্বন্ধ, তা' জানতে পারলেই জীবন দিয়ে কি করতে হ'বে তা, বুঝা যায়।[২] আসলে উত্তর একই; ভক্তিপূর্ণ ঈশ্বরানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে মানব-

১। ধর্মতত্ত্ব—একাদশ অধ্যায়—ঈশ্বরের ভক্তি।

২। ঐ

জীবনে মনুষ্যত্বলাভ। তা' আনা কঠিন, এবং এই আনাতেই তিনি ধর্ম বলেছেন। এইদিক দিয়ে তাঁর মতে জ্ঞানই ধর্ম।

এই জ্ঞান সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন 'বিবিধ প্রবন্ধ' ১মখণ্ডের অন্তর্গত 'জ্ঞান' প্রবন্ধটিতে। প্রথমেই তিনি দর্শন এবং ইংরেজী ফিলসফি শব্দটির ভারতীয় এবং ইউরোপীয় দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করেন, এবং ফিলসফি শব্দের সহিত দর্শনের পার্থক্য বোঝার তাগিদ দিক নির্দেশ করেন। শুধু তাই নয়, ইউরোপীয় দার্শনিক কাঁত' লক, হিউম, মিল, স্পেনসার প্রভৃতির মতবাদগুলি বিশ্লেষণ ক'রে ভারতীয় দার্শনিকদের মতবাদের সঙ্গে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের দিকগুলিকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রেরও তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; এবং আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন যে ঘুরে ফিরে সেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে তাও তিনি বলেছেন। এক কথায় ভারতীয় দর্শনের নির্দিষ্ট পথেই তিনি সমস্ত সত্যের সন্ধান লাভ করতে চেয়েছেন। ভারতের মর্মমূলে তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির আলোকপাত ক'রে সত্যকে উদ্ঘাটন করতে চেয়েছিলেন। সাংখ্যদর্শনের বিভিন্ন দিকগুলিকে নিয়েই তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন; প্রাসঙ্গিকভাবে বেদের আলোচনাও তিনি সেই সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। 'ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে' প্রবন্ধটিতে যুক্তিবাদী উনবিংশ শতকের বিজ্ঞানমূলক দৃষ্টি নিয়ে সৃজন পালন সংহারের তিনটি দিক আলোচনা ক'রে, অর্থাৎ হিন্দুপুরাণ অনুযায়ী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের উল্লেখ ক'রে তিনি এক অনন্ত, অচিন্ত্যনীয়, অজ্ঞেয় শক্তির উদ্দেশ্যে ভক্তিভাবে অজস্র প্রণাম নিবেদন করেছেন। এখানেও তাঁর ভারতীয় দৃষ্টিই জয়লাভ করেছে।

'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন মন্থন ক'রে সর্ব মানবের জন্য একটি নূতন ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, যার নাম দিয়েছেন অনুশীলন ধর্ম। ধর্মতত্ত্বই বঙ্কিমদর্শনের শ্রেষ্ঠ ফল। বঙ্কিমচন্দ্র এই অনুশীলন ধর্মটির যথার্থ ভিত্তি রচনা করতে গিয়ে মানবজীবনের চারিটি বৃত্তিকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন। বৃত্তিগুলির নাম হচ্ছে শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কর্মকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী। বৃত্তিগুলির নামকরণ থেকেই বুঝা যায় যে, মানবজীবনের চরিতার্থতার দিক শারীরিক ও মানসিক দুটি ভাগে ভাগ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্লেষণ ক'রে দেখাতে চেয়েছেন। ইউরোপীয় দার্শনিকদের ভাবধারা তাঁর এই দার্শনিক চিন্তার উপর বিশেষভাবে কাজ করে গিয়েছে। প্রত্যক্ষবাদ বা প্রত্যক্ষবাদের (positive philosophy) প্রবক্তা ফরাসী দার্শনিক কোঁতের মতবাদের উপর বঙ্কিমচন্দ্র আজীবন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর প্রভাবকে তিনি 'ধর্মতত্ত্ব' ব্যাখ্যায় অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানিয়েছেন। এই অনুশীলন ধর্মে তিনি মানবজীবনে মনুষ্যত্বলাভকেই চরম লাভ বলে মনে করেছেন। বঙ্কিম-কথিত এই বৃত্তিগুলি পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে মানুষের মনুষ্যত্বলাভে সহায়তা করে। এই অনুশীলনের মধ্যে মানবজীবনের সুখদুঃখ প্রভৃতির কথাও বাদ পড়ে নি। এই সুখের কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ইউরোপীয় দার্শনিকদের মতবাদকে বিশেষভাবে আলোচনা করতে চেয়েছেন। কিন্তু যখন ভক্তি, জ্ঞান, প্রীতি প্রভৃতির বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, তখনই ভারতীয় দর্শনের গভীরতাকে নিজের চিন্তালোকে টেনে নিয়েছেন। ইউরোপীয় দার্শনিক চিন্তাগুলি এই বৃত্তিগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যথাযথভাবেই এসেছে। এক কথায় বঙ্কিমচন্দ্র জীবনকে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ আনন্দময় ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে অনুশীলন ধর্মের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে জীবন এবং জগৎ বিভিন্ন দিক দিয়ে দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু সব কিছুর একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রহণীয় রূপকেই সকলের কাছে তুলে ধরেছে। পরস্পরের সঙ্গে এই বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যের ফলেই মানবের চিত্তশুদ্ধি ঘটে। এই চিত্তশুদ্ধির দ্বারাই মানুষ মানুষ-নামের উপযুক্ত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে দ্রৌপদীর চিত্তশুদ্ধি ঘটেছিল বলেই পঞ্চ স্বামীর পত্নী হয়ে ব্রহ্মচারিতার মহাপাপকেও ধর্মে পরিণত করেছিলেন। এই উক্তির দ্বারা দিয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-জিজ্ঞাসার যথার্থ উত্তর পাওয়া যায়। উনবিংশ

শতাব্দীর মানবতাবোধই তাঁর এই দার্শনিক চিন্তার মূলে জীবনবারি সিঞ্চন করেছে। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র (২য়) 'মনুষ্যত্ব কি?' প্রবন্ধের সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির অনুশীলনকেই তিনি মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বলেছেন।

'কৃষ্ণচরিত্র' তাঁর দর্শনচিন্তার একটি অবিস্মরণীয় ফল। এই গ্রন্থে একদিকে যেমন তাঁর গবেষণামূলক মনোভঙ্গীর চরম প্রকাশ দেখা যায়, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় দর্শন-চিন্তারও সুষ্ঠু সুন্দর রূপায়ন ঘটেছে। শ্রীকৃষ্ণের জীবন-বৃত্তকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি যেন মাঝে মাঝে নিজস্ব একটি দর্শনচিন্তার সাক্ষাৎলাভ করেছেন। জীবনের বহুমুখিতার ফলই এই জীবনদর্শনের উৎসভূমি। সমস্ত বৃত্তিগুলির বিকশিত রূপের আধার রূপে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আদর্শ মানবের সন্ধান লাভ করেছেন তিনি। জীবন-জিজ্ঞাসার সার্থক উত্তর শ্রীকৃষ্ণের জীবনের মধ্যেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ-কথিত ধর্মতত্ত্বে অহিংসার স্থান থাকলেও আত্মরক্ষার জন্য যে মাঝে মাঝে হিংসার আশ্রয় নিতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের বিশ্লেষণ দেখলে এই দুটি নিজেরই উপলব্ধির বলিষ্ঠ প্রকাশ বলে মনে হয়। ধর্মতত্ত্বেও তিনি এই কথাই বলেছেন। নিজেকে সর্বপ্রথম রক্ষা না করলে, পরের মঙ্গল করার সুযোগ তো পাওয়া যায় না! তাই আত্মরক্ষাই জীবনের প্রথম কাজ। তা ছাড়া, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির দিক দিয়েও তিনি শ্রীকৃষ্ণের জীবনকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন—"যে-সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্যাদির পর্যালোচনা করিয়া আমরা নির্মল এবং অতুলনীয় আনন্দ অনুভব করি, সেই সকলের নাম দিয়াছি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। তাহার সম্যক্ অনুশীলনে সচ্চিদানন্দময় জগৎ এবং জগদীশ্বর সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপানুভূতি হইতে পারে। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন অভাবে সুখের হানি হয়।" এই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির আলোকেই শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীগণের রাসলীলাকে এই বৃত্তির অনুশীলনের উদাহরণ রূপে তিনি গ্রহণ করেছেন। জীবন-জিজ্ঞাসায় দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রের এখানে সৌন্দর্যদৃষ্টি ধরা পড়েছে। এক কথায়, কৃষ্ণকথিত ধর্মতত্ত্বকে তিনি একটি নতুন আলোকে আমাদের চোখের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। এইখানেই বঙ্কিমপ্রতিভার মৌলিক স্বাক্ষর চিহ্নিত হ'য়ে আছে। তাঁর মতে 'ঈশ্বর লোকহিতার্থে মনুষ্যচরিত্র গ্রহণ' করেছিলেন [৩]

আর 'শ্রীমদ্ভগবত গীতা'য়[৪] এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই নিজস্ব মতবাদকে ব্যাখ্যা ক'রে গিয়েছেন, এবং এইজন্যই গীতোক্ত ধর্মকে তিনি সমস্ত মনুষ্যের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। তাঁর মতে চিত্তশুদ্ধিই গীতারও উদ্দেশ্য। গীতা-ব্যাখ্যাতেও তাঁর মনুষ্যত্বের কথা এসেছে, সেই সঙ্গে মানুষের জীবনধর্মের একটি পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা তিনি আমাদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে দিয়ে গিয়েছেন। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির কেন্দ্রে সর্বদাই আছেন, কিন্তু জীবনের কর্মকে জড়িয়ে। সেই কর্ম সৎকর্ম এবং তার মধ্যে নিষ্কামতা আছে। সেইখানেই আমাদের মনুষ্যত্ব এবং মনুষ্যজীবন নির্বাহের নিয়মগুলি ধরা আছে। জীবনের গভীরে ডুব দিয়ে তাঁর উপলব্ধ সত্যকে উনিশ শতকীয় বাংলাদেশের যুক্তিবাদী পটভূমিকায় উনিশ শতকের আধুনিক ভাষাতেই তিনি আমাদেরকে বুঝিয়ে গিয়েছেন। এইখানেই দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রের অশেষ কৃতিত্ব।

৩। কৃষ্ণচরিত্র: ২য়খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ। বসুমতী সংস্করণ, পৃ ৫৫

৪। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত পত্র।

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় জন্যই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দ্দেশিত "সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য,—পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতেই সর্ব্ব-ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে সেইজন্য সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম, এই প্রকার অবধারণ করিবে। শঙ্করাচার্য্য সমস্তই ব্রহ্মাবধারণ করিতে বলিয়াছেন। সেইজন্য নিরাকার, সাকার এবং আকারও পরস্পর অভেদ, ইহাও তাঁহার স্বীকার করা হইয়াছে। যেমন নানা আর্য্য শাস্ত্রানুসারে আকাশ বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী পরস্পর অভেদ, এই প্রকারেই নিরাকার, সাকার এবং আকার পরস্পর অভেদ। কোন কোন গ্রন্থমতে আকাশ ও বায়ু নিরাকার, কিন্তু কাহার কাহার মতে আকাশের বিকাশ বায়ু নিরাকার বলিয়া পরিগণিত হইলেও, বায়ুও সাকার বলা যাইতে পারে। বায়ু হইতে জলের প্রকাশ। সেই জন্য সেই জল বিশিষ্ট বায়ু নিরাকার ও সাকার বলিয়াও অবধারিত হইতে পারে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের মতেও ঐ সাকার নিরাকার বায়ুই জল হইয়াছে বলিয়া বায়ুকেও আকার বলা যায়। কারণ জল বায়ুরই এক প্রকার বিকাশ। সেইজন্য বায়ুও যাহা জলও তাহা। ঐ প্রকারে সাকার, নিরাকার ও আকার-ব্রহ্মও অভেদ বলা যাইতে পারে, ঐ প্রকারে নিরাকার ও আকার ব্রহ্মও অভেদ বলা যাইতে পারে। আকাশের কোন ক্রিয়া নাই। অথচ নানা আর্য্য শাস্ত্রমতে আকাশই সক্রিয় বায়ু। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকেও ঐ দৃষ্টান্তানুসারে সক্রিয় ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে। কাহার কাহার মতে সক্রিয় বায়ু নিরাকার বলিয়া পরিগণিত হইলেও, সেই সক্রিয় বায়ু হইতেই আকার-জল বলিয়া সেই সক্রিয় নিরাকার-বায়ুও ঐ আকার জল-বিশিষ্ট বলিতে হয়। সেইজন্য ঐ সক্রিয় নিরাকার-বায়ুকে সক্রিয় সাকারও বলিতে হয়। ঐ প্রকারে সক্রিয় নিরাকার ব্রহ্মকেও সক্রিয়-সাকার ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে।

নিরাকার বায়ুই সক্রিয় আকার-জল যে প্রকারে, সেই প্রকারে নিরাকার সক্রিয় ব্রহ্মই সক্রিয় আকার-ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে ব্রহ্ম ও পরমাত্মা অভেদ। শঙ্করাচার্য্যের ঐ অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের দ্বিপঞ্চাশৎ শ্লোকের মতে পরমাত্মা ব্রহ্ম ও জীবাত্মা অভেদ বলা যাইতে পারে। সেই শ্লোক এই প্রকার—

যদ্রূপমাত্মকং কৃত্বা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
ব্যতিষ্ঠতি স যুক্তাত্মা তদ্রূপং তত্ত্বাভিধাধিতম্॥

উক্ত শ্লোক ব্যতীত শঙ্করাচার্য্যের জীবাত্মা-পরমাত্মার অভেদ-বাচক আরও অনেক শ্লোক আছে। শঙ্করাচার্য্যের আত্মার সহিত জগতের অভেদত্ব বাচকও অনেক শ্লোক আছে। সে সকলের মধ্য হইতে আত্মবোধ নামক গ্রন্থের একটি শ্লোকই এই স্থলে উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতেছে। সেই শ্লোক এই প্রকার—

আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং আত্মনোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
মৃদো ঘটং ঘটাদীনি স্বাত্মানং সর্ব্বমীক্ষতে॥৬৭

উক্ত শ্লোকানুসারে অবগত হওয়া যায়, যেমন ঘটাদি মৃৎ-পাত্র সকল এবং মৃৎ বা মৃত্তিকা অভেদ, তদ্রূপ আত্মা এবং এই নিখিল জগৎ অভেদ। সেই জন্যই বলিতে হয়, আত্মাই জগৎ—জগৎই আত্মা। শঙ্করাচার্য্যের মতেই আত্মা এবং জগৎ অভেদ প্রমাণ করা হইয়াছে। অথচ শঙ্করাচার্য্যের অনেক গ্রন্থেই জগৎ প্রাকৃত বলা হইয়াছে। জগৎ প্রাকৃত বলিয়া, জগৎকে প্রকৃতির অংশ প্রকৃতিই বলিতে হয়। শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে আত্মাই জগৎ। সেই জন্য আত্মা এবং প্রকৃতির অংশ জগৎ অভেদ বলিতে হয়। প্রকৃতির অংশ জগৎ এবং আত্মা অভেদ স্বীকার করিলে, প্রকৃতি-অনাত্মা ও আত্মা অভেদ স্বীকার করিতে হয়। শ্রীমদ্ভগবৎ-গোবিন্দ পাদাচার্য্য পরিব্রাজক পরমহংস স্বামী বিরচিত অদ্বৈতানুভূতি নামক গ্রন্থানুসারে,—

'অলাদস্ত যথাকাশি জলাদ্ বুদ্বুদো যথা।
তথাত্মনঃ পৃথগ্বিশ্ব প্রপঞ্চোয়মনেকধা॥' ১৩

ঐ শ্লোকানুসারে জল এবং জল-বুদ্বুদ্ যেমন অভেদ, তদ্রূপ আত্মা এবং প্রপঞ্চ অভেদ। শঙ্করাচার্য্যের এবং অন্যান্য অনেক অদ্বৈত মতাবলম্বীদিগের গ্রন্থানুসারেই প্রকৃতি এবং প্রপঞ্চ অভেদ। প্রকৃতিই মায়া, প্রকৃতিই অবিদ্যা, প্রকৃতিই অনাত্মা, এবং কোন কোন ব্যক্তির মতে সেই প্রকৃতিই অজ্ঞান।

ষড়বিংশ সিদ্ধান্ত

একই সুবর্ণে নানা অলঙ্কার হয়। সেই অলঙ্কারগুলি এক সুবর্ণ ব্যতীত যেমন অন্য কিছু নহে, তদ্রূপ ব্রহ্মই সমস্তই হইয়াছেন বলিয়া, সমস্তই ব্রহ্ম-ব্যতীত অন্য কিছু নহে বলিতে হয়। তাহা হইলে এই জগৎ এবং জগতস্থ কোন কিছুকেই অবিদ্যা এবং অসত্য বলা উচিৎ নয়। তাহা হইলে যিনি জগৎ এবং জগতের কিছুকে অবিদ্যার নানা বিকাশ বলেন, তাঁহার সে সমস্তকেই ব্রহ্মের নানা বিকাশ বলা উচিত। শঙ্করাচার্য্যের একপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে সুবর্ণজাত কোন সামগ্রীর যেমন চির সুবর্ণত্ব, তদ্রূপ ব্রহ্ম-জাত কোন কিছুর ব্রহ্মত্বই হইয়া থাকে। ঐ বিষয়ে মূল শ্লোক এই প্রকার,—

সুবর্ণাজ্জায়মানস্য সুবর্ণত্বক শাশ্বতম্।
ব্রহ্মণো জায়মানস্য ব্রহ্মত্বক তথা ভবেৎ॥

সুবর্ণই ত নানাপ্রকার সুবর্ণালঙ্কার। সুবর্ণই ত নানাকার সুবর্ণ সামগ্রী। সুবর্ণের সঙ্গে নানাপ্রকার সুবর্ণালঙ্কারের, সুবর্ণের সঙ্গে নানাপ্রকার সুবর্ণ-সামগ্রীর কোন প্রভেদ নাই। সুবর্ণই নানাপ্রকার অলঙ্কার হইলে, সেই অলঙ্কারগুলিকে সেই সুবর্ণ ব্যতীত অন্য কিছুই বলা যায় না। সুবর্ণই নানাপ্রকার আকার বিশিষ্ট নানাপ্রকার সামগ্রী হইলেও, সেই নানাপ্রকার আকার-বিশিষ্ট নানাপ্রকার সামগ্রীগুলিকে সেই সুবর্ণ ব্যতীত কিছুই বলা যায় না। ব্রহ্ম যদি নানাপ্রকার সামগ্রী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই নানাপ্রকার সামগ্রীগুলিকে সেই ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই বলা যায় না।

ক্রমশঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৩—

(৫৭)

ঠাকুর, দেখা দেও, কথা কও,...। কতদিন তোমাকে দেখি নাই, তোমার কথা শুনি নাই, তোমার ডাক শুনি নাই! আর যে পারি না! দেখা দেও, কথা কও। অনাদরে অযতনে উপেক্ষায় দিনের পর দিন যায়। তোমার অপেক্ষায় বসিয়া থাকি, চোখের জলে দিন কাটাই। কোথায় লুকাইলে? দেখা দেও, কথা কও ...হৃদয়হীন এই সংসার আর যে ঠেলিয়া চলিতে পারিতেছি না। আমি যে কাঁদি, তাহা কি তুমি দেখ না?...চিদানন্দের 'সন্ন্যাসী সেক্রেটারী'-র উপর জোর দেওয়ার আলোচনা হয়। তাহার নামও বিজ্ঞাপনে যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে ছাপা হইল।...আজ সারাদিন কেবল মনে উঠিতেছিল —দেখা দেও, কথা কও, একবার আমাকে ডাক। তুমি কি শুধু পটেই থাকিবে? তুমি আমার জীবনে জীবন দান কর। আরও মনে হইতেছিল—কাহাকেও ত শক্তি দিতে পারি নাই। সকলেই আমার কাছ হইতে দূরে যাইতে চায়। অথচ সারা জীবন মানুষের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিয়াছি। নিজ প্রয়োজনের কথা ভাবি নাই। সুরেশ গুপ্তের এক পোষ্টকার্ড আসে বেণুর কাছে। বেণু বিজয়ার প্রণাম জানাইয়াছিল। সুরেশ লিখিয়াছে—স্বামীজীর স্নেহশীল জীবন আরও ভারী হউক। আমি ভাবি—ঠাকুরের স্নেহ-জলে আমার জীবন এমন ভারী হউক যেন আমার জীবন তাঁহার স্নেহের অতলে ডুবিয়া যায়।

৮ই নভেম্বর

ঠাকুর, সর্বাশ্রয়, সকলের আশ্রয় তুমি। তোমার জীবনের মাঝেই রহিয়াছে স্থিতি, তাহার প্রয়োজনের নিগূঢ় অর্থ, তাহার আনন্দ। তোমার চরণতলে সারা বিশ্ব ছোট শিশুর মত ঘুমাইয়া আছে। তুমি আমার জীবনের সব-টুকু। তোমাকে লইয়াই আমি অনন্ত পথ বহিয়া চলিব। আমার নিত্যসঙ্গী তুমি। তুমি-আমি এক-প্রাণ: তোমার শতবার্ষিকীতে তোমার আবির্ভাব স্পষ্টতর হইয়া উঠুক। তুমি বাঙ্ময়ম, তুমিময় ছড়াইয়া পড়। তুমি নিজে বিশ্বের রথরজ্জু না ধরিলে ইহা কি আর চলিবে? বিশ্বরথ যে আটকাইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যৎ ইহার অন্ধকার। কোথাও সোয়েটের জন্য তেমন আকুলতা নাই। সর্বত্র চলিয়াছে শোষণ। সকালে যতীনবাবু ও কামিনীকুমার গাঙ্গুলী (যিনি আমার বক্তৃতা শুনিয়া গভর্ণমেণ্টের বড় চাকুরী ছাড়িয়াছিলেন) আসেন।...৯।০ টার পর মিনু ও বেণু বাহির হয়। মিনু ১ মাসের জন্য দক্ষিণেশ্বর যায়। স্বপ্না সেখানে আছে। বেণু...ফেরে ৬টার পর। মাখনবাবু আসেন। যামিনী সরকারের বড় ভাই ২টার পর আসে। সন্ধ্যায় রাজেন্দ্র মিত্র আসেন।...ঠাকুরের দর্শন সম্বন্ধে অনেকটা আলোচনা করি। আবার ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করি। শতবার্ষিকীর সভা হইবেন বলিলেন। বর্তমান যুগের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান করিবার মত দর্শন তিনি দিয়া গিয়াছেন।...বৈকালে সুধাংশু আসে। কাল এখানে যাহা করিয়া খাওয়াইবে বলিয়া গেল।...

৯ই নভেম্বর

ঠাকুর, তোমাকে যাহারা আগলাইতেছেন, তাহারা সকলেই আজ অবসন্ন, ক্লান্ত। কাহারও মধ্যে উৎসাহের কোন গন্ধও নাই। কে তোমার শতবার্ষিকীর জন্য বসিয়া আছে? যে যাহার লইয়া মত্ত। তুমি আসিয়াছিলে, বিশ্বে তোমার কি প্রয়োজন ছিল, তাহা কাহার ভাবিবার অবসর আছে? আমাকে লইয়া তোমার টানাটানি কেন? আমি কি করিব? আমাকে শক্তি দেও, বল দেও। তোমার দর্শন, তোমার জীবন বিশ্বময় ছড়াইয়া দিব,

তোমাকে ও তোমার বিশ্বকে গড়িয়া তুলিব, ইহাই ছিল সারা জীবনের ধ্যান। আমাকে বল দেও -কে সব সময়ে কাছে কাছে রাখিয়া পাহারায় রাখা উচিত। বড় চঞ্চল, অসংলগ্ন কথা বলে।...এটায় আমি মঠে যাই বেলু ফিরিলে। চিদানন্দ নাই, তারিণীবাবুও নাই।... কাহারও সঙ্গে psychological line of development-এর ধারা ধরিয়া আলোচনা করিতে পারি না বলিয়া বড় কষ্ট হয়। কেহ নিজের মন হইতে মুক্তি চায় না। অথচ ভগবানকে তো এক নূতন arrangement-এর ভিতর দিয়া পাইতে হইবে। তিনি যে জীবন-মথন ধন। তিল হইতে যেমন তৈল, দুধ হইতে যেমন মাখন, জীবন মথন করিয়াও তেমন পাওয়া ভগবানকে মথিত করিয়া তুলিতে হইবে। ভগবান তো বাহির হইতে ছুপ করিয়া পড়েন না। পুত্র যেমন পিতামাতার দেহ চুয়াইয়া প্রকাশিত হয়, ভগবানও তেমনি ভক্তের দেহ চুয়াইয়া প্রকাশিত হন।...সে স্বপ্নে রূপকে দেখিয়াছে, ইষ্ট নামও পাইয়াছে।...

৪ঠা নভেম্বর

বাবা নীলকমলের তিরোভাব দিবস

'আর কিছু নাই এ সংসারে কেবল কালীনাম সার রে'।—আমি গলায় পরেছি হার রে। মা, আমাকে তোমার উপযুক্ত সন্তানরূপে সাজাইয়া দেও। আমায় দিব্য জ্ঞান দেও। মুক্তকেশী মা আমার, অবধূতী মা আমার, আমাকে সর্বসংস্কার মুক্ত কর, সহজ জীবন দেও। দিগম্বরী, উলঙ্গিনী মা আমার, আমার জীবন সকল কামনা বাসনার মহানির্বাণে শ্মশানে পরিণত কর, সেখানে তুমি নাচ। সেখানে তোমার পায়ের পরশে দিব্য বৃন্দাবন গড়িয়া উঠিবে। যিনি destruction-এ কালী, তিনিই যাদবের দেশে রক্তমাংসের দেহে শ্রীরাধা। তাই শ্রীনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন—বৃষভানুপুরে কালী কাত্যায়নী রাধারূপে জনম নিলেন। বাবা নীলকমল আজ কালীচরণতলে আমাপূজায় দক্ষিণার সঙ্গে মহানির্বাণ লাভ করেন।—৫ঠা তার শ্মশানে যাই—সৎকারতিথি করি। সুশীল ঘর দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন প্রথমে অশ্বিনীবাবু 'চক্রধর'—ইত্যাদি গান হয়, পরে 'মধু মধু'। প্রথমে দুর্গামোহন সেন অশ্বিনীকুমারের জীবনী বলেন, পরে কল্যাণকুমার চক্রবর্তী। তারপর আমি বর্তমান যুগের দুর্নীতির মধ্যে অশ্বিনীবাবুর প্রয়োজনীয়তার কথা বলি। মিথ্যা আজ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে—ইহা truth for us দর্শনের অবশ্যম্ভাবী ফল। ভারতের সত্য হইতেছে truth in itself—এই ক্ষেত্রে শক্ত মানুষের দরকার। দুর্গামোহনবাবু অপর এক ভদ্রলোক সহ আমাদের অফিসে আসেন।...শ্মশানের সভায় আগামী শনিবার মঠের সভায় নিমন্ত্রণ বিতরণ করা হয়। 'পূর্ণত্ব' পত্রিকায় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ধর্ম শক্তবাহিনীর' কর্মসূচী বাহির হইয়াছে। বেলু ও প্রতিভা রাঁধে।...

৫ই নভেম্বর

বৃষভানুপুরে কালী কাত্যায়নী জনম নিলেন শ্রীরাধারূপে। দুইয়েরই রূপ বিপ্লবের রূপ:—কালী উলঙ্গিনী, রাধা অপহৃতবসনা। দুই-ই জাতি-কুল-শীল রূপ লজ্জার বাঁধন কাটিয়া মুক্ত জীবনধারা রূপ বিশ্ব-প্রাণের ভিতর প্রবাহিত। যাহা কালীতে abstraction, তাহাই concrete-এ রাধা। কালী শিব-হৃদি বিলাসিনী, রাধা কৃষ্ণহৃদি বিলাসিনী। কালী-রাধা আমার, তোমাকে বুকে লইয়াই তো চলিয়াছি। আমাকেও বিপ্লবের পথে আগাইয়া নিয়া চল, আমি 'পরাশক্তি' বলিয়া যাই।... আমি ও প্রতিভা ৩।০টার পর মঠে যাই।...'প্রাণ সাধনা' উদ্বোধনকারত হইতে কিছুটা পাঠ করে, আমি ব্যাখ্যা করিয়া দেই। একটা new light বলিয়া সকলেই খুব খুশী। এই standpoint না বুঝিলে ঠাকুরের অবতরণের গূঢ়তম উদ্দেশ্য ও তাঁহার লেখা বোঝাই হইবে না।... পত্রিকাগুলি জনসাধারণের হিংসাপ্রবণতাকে এমনইভাবে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল যে ইহাদের শাসন করার দরকার ছিল।...

৬ই নভেম্বর

ঠাকুর, তুমি হুগলীতে বলিয়াছিলে, 'আমি আনি

তোমরা আমারই বিকাশ'। তাই তুমি আমাদিগকে কখন 'আপনি' বলিতে। হুগলীতে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর, আপনি কেন আমাদের 'আপনি' বলেন? তুমি বলিয়াছিলে, মানুষ নিজকে আপনি আমি বলে। আমি জানি তোমরা আমারই বিকাশ। আমরা তোমার বিকাশ, তোমারই রক্তমাংস, তুমি। কবে তোমার আমির ভিতর মহানির্ব্বাণে লাভ করিয়া তোমার আমি বনিয়া যাইব? তুমি আমায় চাও, আমি তোমাকে চাই না। তোমার করুণা ধারার ভিতর আমি অতলে ডুবিয়া যাই—এই কর ঠাকুর। তোমার চাওয়া পাওয়াই আমার চাওয়া-পাওয়া হউক। 'তোমার খুশি চেয়ে আছে আমার খুশির পানে'। তুমি আমাকে পাইয়া তৃপ্ত হও।...আমি মঠে যাই···৩টার পর কার্যকরী সমিতির অধিবেশন হয়।···৪টার সময় ঠাকুরের সামনে সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সমস্ত দিনই আজ মেঘাচ্ছন্ন, টিপটিপ বৃষ্টি পড়ে। বৈকালে সামান্য একটু বাড়ে। লোকজন তেমন হয় নাই। সব শুদ্ধ ৫০ জন হইতে পারে।···রাধার কলঙ্কভঞ্জনের কথা মনে হইল, সভায় তাহা দিয়াই বক্তৃতা আরম্ভ করি। ওঁ নমঃ সর্ব্বসমবহ-তত্ত্বমূর্ত্তয়ে ভক্ত-ভগবতে আগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিতুরীয়তুরীয়াতীতায় ব্রহ্মপরমাত্ম ভগবৎপুরুষোত্তমায় শ্রীনিত্যগোপালায় নমো নমঃ। তুমি আসিয়াছ, তোমাকে বুকে লইয়া অভিযান করিব, বিশ্বময় তোমার দর্শন ও জীবন ছড়াইয়া দিব। বল দেও, বুদ্ধি দেও। আজ প্রথম ঠাকুরকে লইয়া প্রচার অভিযানের প্রথম যাত্রা দিন। তোমাকে ফেরী করিব না। বুকে লইয়া হৃদয় দিয়া তোমাকে ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিব। প্রাণ নিয়া propaganda চলে না, উহা প্রাণের হত্যা মাত্র। তুমি সহজ, সহজ প্রাণের মধ্য দিয়াই তোমার প্রচার হইবে। তুমি মানুষ, আমরা মানুষ হইব। শিশির আসে...।

৭ই নভেম্বর

ঠাকুর, তোমাকে বুকে লইয়া ছুটিয়া চলিব, বিশ্বের ঘরে ঘরে তোমার আসন রচনা করিবার জন্য। তুমি সার্বভৌম, তুমি বিশ্ব নাগরিক। তিলের মধ্যে যেমন তৈল, দুগ্ধের মধ্যে যেমন মাখন, বিশ্বের মধ্যে তেমন তুমি আছ। তোমাকে একান্তভাবে নিজস্ব দিয়া বিশ্ব ও আমি এক হইয়া বিশ্বাত্মা হইয়া তোমাকে মন্থন করিয়া ধন করিব।...আজ সকালে পদ্মমণি পার্শ্ব ও পুটু আমার কাছে নীচে গিয়া বলে, 'দাদু' তুমি আজ আমাদের ওখানে খাবে। ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ'।...২৷৷০টার পর চিদানন্দ মোটর নিয়া আসে। আমি বেণু রওয়ানা হই। প্রথমে চিদানন্দের স্থান দেখি। পরে বীরানন্দের ওখানে পৌঁছি ৫টা বাজিতে তখন ৫ মিনিট বাকি। প্রায় ৫টার সভা আরম্ভ হয়। প্রথমে অমূল্য চৌধুরী মহেশ্বরানন্দের বাল্য জীবন এবং মনোমোহন মৈত্রও কিছু বলেন। পরে বেণু তাহার 'শ্রীনিত্যগোপাল' প্রবন্ধ পাঠ করে। তাহার পর আমি বলি। আগে পরে ও মধ্যে ৩টী সঙ্গীত হয়। 'তুই এসেছিস, আমিও এসেছি' দ্বারা আরম্ভ করি। শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়েছেন সমন্বয়ের পূর্ব পর্য্যায়, নিত্যগোপাল দিলেন পর পর্য্যায়,—তড়াতড় সমন্বয় Process and Reality-র 'It is as true to say' লেখাগুলি উদ্ধৃত করি। 'মহানামশনি' শ্লোক আবৃত্তি করি। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের philosophy শ্রীনিত্যগোপাল দিয়াছেন। দার্শনিক রাসচক্র বিশ্বের সামনে গড়িয়া উঠিতে চাহিতেছে। প্রতিটী মতবাদ জীবনেরই এক একটী দৃষ্টিকোণ। কেহই একান্তভাবে সত্য নহে। সিটি কলেজের বাঙ্গলার অধ্যাপক, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের হেডমাষ্টার (সম্ভবতঃ রিটায়ার্ড) ও অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট লোক ছিলেন।··· মহানির্বাণ মঠ হইতে সুশীলার ভাইফোঁটার প্রসাদ নিয়া ৮টার কিছু আগে পৌঁছি।··· ···মঠে —এর প্রতিমূর্ত্তি রাখা হইয়াছে prominent place-এ, আর ঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তি রাখা হইয়াছে অপর আর এক ঘরে কোণে। ইহা ভাল লাগিল না। 'যাদের চেয়ে কেউ বড়'—ইহাই মনে হইল। এরূপ গুরুগিরি আমি চাই না। নিত্যগোপাল সামনে থাকিলেই আমি সামনে থাকি।

৮ই নভেম্বর

নিত্যগোপাল, স্মরণ আমার, আমি তোমার মাঝে

'তুমি' বলিয়া যাইব, আমার জীবনের প্রতি স্পন্দনে তুমি প্রকাশিত হও—তুমি আমি এক অদ্বৈত, একতত্ত্ব, একপ্রাণ, একমন, একবিজ্ঞান ও একানন্দ: কবে আমি তুমি হইয়া এই বিশ্বময় বিচরণ করিব? মানুষ আমাকে দেখিয়া তোমাকে দেখিবে, আমাকে ছুঁইয়া তোমাকে ছুঁইবে, আমার ভালবাসিয়া তোমাকেই ভালবাসিবে। আমাকে ততখানি এক করিয়া লও। তোমার জয় হউক। ১১টায় মায়া ও তার আসে। কিছু মিষ্টি ও কমলা লেবু। ...সন্ধ্যার পর মিঃ রায় চৌধুরী আসেন। অনেকক্ষণ থাকেন। কথা বার্তা হয়। আমাদের দর্শনের কথা ও বিজ্ঞাপনের কথা।...সতীশ চন্দ্র মণ্ডল আসেন।...গ্রাহক হইবেন...। মৃদুমন্দ আজ ১৮ দিনে জ্বর যাইল। যতীশ-বাবুর কাছে রবিবারের আলোচনা খুব ভাল লাগিয়াছিল। এরূপ নাকি আর শোনেন নাই। যাহারা আমার বক্তৃতা শুনিয়াছে, তাহারা সকলেই তো নূতন শুনিয়াছে। কিন্তু আসিল না তো! আজ আমি একা। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কয়েকটী লোককেও আমার কথা বুঝাইতে পারিলাম না। কি দুঃখ! বুকের মধ্যে সাহস হয় যেন মানুষ পাইলে কলিকাতা চষিয়া ফেলিতে পারি। কলিকাতার হাল চাল তো চিনি। ঠাকুর দিবে পারিব। একটী শ্রাবণ আনার প্রয়োজন আছে। কালী পূজা অবলম্বনেই কি কম টাকার শ্রাদ্ধ হইল! কোনও পত্রিকা তো কিছু বলে না। যাহারা দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষ বলিয়া চেঁচায়, তাহারা নীরব কেন? কে উপবাস-ক্লিষ্টদের মুখে অন্ন দিবার জন্য বসিয়া আছে? সকলেই চায় সমীরবল। ইহা তো সহ্য হয় না; ইচ্ছা হয় একবার গর্জন করি। নরসিংহ আমার, জীবনে আসুক, একবার হুঙ্কার দেই।

৯ই নভেম্বর

তোমারেই প্রাণের আশা কহিব, কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে তুমি তা জান প্রভু গো। কোন্ প্রয়োজন তুমি আমার জীবনে সাধিতে চাও, তুমি আমাকে তাহা জানাইয়া দেও। আমার জীবনে তুমি কোন্ রস আস্বাদন করিতে চাও? 'একোঽহম্ বহু স্যাম্'—একা তোমার এই বহু হওয়ার পশ্চাতে কোন্ রসের খেলা রহিয়াছে এবং আমার জীবনে তোমার সেই রসের কোন্ দিক তুমি আস্বাদন করিতে চাও? আমি প্রয়োজনাতীত হইব—তোমার প্রয়োজনই আমার প্রয়োজন হউক। আমার জীবনে তোমার যাহা প্রয়োজন, তাহাই আমার আত্মা। আর আমার জীবনে আমার যাহা বাহ্য প্রয়োজন, তাহাই আমার 'অনাত্মা'। তুমি তোমার ভিতরে এই আত্মা-অনাত্মার সমন্বয় বিধান করিবে। তোমার প্রয়োজন-সিদ্ধির মধ্যে তোমার ও আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। তোমার জয় হউক।... ঠাকুর যাহাকে 'বড়মিঞি' ডাকিতেন, চিদানন্দ তাহার ভাই-পো রাধারমণ বসুর নিকট গিয়াছিল।...সন্ধ্যার একটু পূর্বে উপেন ধর আসে...। বিহুর পত্রের উত্তর দেওয়া হয়। ওখানে ডাক্তার দেখাইয়া ওষুধ খাইতে লেখা হয়। আলোচনা করিয়া ব্যায়াম করিতেও লেখা হয়।

১০ই নভেম্বর

ঠাকুর, নিত্যলক্ষ্মী আমার, তুমি আমি সেই কোন্ অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছি, আজও চলিতেছি, অনন্ত কাল চলিব। তোমার সঙ্গে আমার রহিয়াছে মুক্তি বন্ধন; মুক্তির বন্ধনে তুমি আমি বদ্ধ। ওগো আমার মহাবন্ধন, ওগো আমার মহামুক্তি, তুমি আমি ছায়াতপের মত একসঙ্গে আছি। তুমি আতপ, আমি তোমার ছায়া। আমি তোমার কান্তি হইব, সূর্যপ্রিয়ার মত স্নিগ্ধ-সুখে তোমার প্রিয়া হইব। আমাকে এমনটী করিয়া দেও। সকালে ধীরেন ডাক্তার আসে, মাখনবাবু আসেন।...সন্ধ্যার পর সত্যব্রত আসে। কালীর দুধ লইয়া আসে শমীনবাবুর নিকট হইতে। তাহাকে কালীর বাবদ ৩০৲ টাকা দেওয়া হয়। আর দিতে পারিব না বলিয়াছি। সব যে রিক্ত হইয়া গেল। খাওয়া খরচ চলাই তো ভার হইল।...ইহাদের যখন যাহা দরকার হইয়াছে, তাহা অকপটে দিয়াছি। আজ আর নাই, সব নিঃশেষ। মিহুর শাশুড়ী মিহুকে বলিয়াছে, 'এখানে আসিস না। ঠাকুরের পা ধরিয়া থাকিস। আমাকেই তার কেহ নেয় না, তারপর তোর'। গোপা যদি কথামত

চলিত, চকমকা কমাইতে পারিত, তবে তাহার জন্ত যতখানি শক্তি ব্যয়িত হইতেছে, তাহার সিকি আনিতে ইহার অনেকক্ষণ বেশী সে আগাইতে পারিত।...বৈকালে মিহুর যে তাপ উঠিত, সেটা কমিয়াছে। স্নায়ুকে পাওয়ার ফল হইতে পারে। নিত্যব্রতের কাছে শুনিলাম উষাঙ্গিনী নাকি রবিবার আসিবে। আর টানাটানি করিব না। আমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার সেবার জন্ত কয় জনে আছে? আজ বুঝিয়াছি নিজের প্রয়োজন থাকিলে অন্তের সেবা হয় না। আমার চক্ষু তো একরূপ গিয়াছে। কে আমাকে পড়িয়া শুনাইবে? একজন সে কাজ নিজেও তো পারিত। কে লইবে? কোথায় সে লোক?...

১১ই নভেম্বর

ঠাকুর, ৭০ বৎসর যাহাদের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছি, যাহাদের স্নেহরসে পুষ্ট হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছি, আজ তাহাদের মধ্যে বসিয়া, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, তাহাদের সঙ্গে একান্ত হইয়া তোমাকে চাহিতেছি। যাহাদের সঙ্গে ক্ষণেকেরও পরিচয়, আমার সেই স্নেহ নিত্য হউক। তুমি আমার নিত্য পিতা, নিত্য মাতা, নিত্য স্ত্রী, নিত্য পুত্র, নিত্য ধন, নিত্য দেহ, নিত্য প্রাণ, নিত্য মন। আমার সব নিত্য হউক তোমার নিত্য স্পর্শে।...৩টার পর অন্নদের বাসায় যাই।...মঠে আসি...। তারিণীবাবুর সঙ্গে মঠের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়। এক দল ঠাকুরকে অতিক্রম করিয়া নিজ নিজ গুরুকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছে। কেহ কেহ মেয়ে নিয়া বিভ্রাটের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে, সব একরূপ ছত্রভঙ্গ। একটী ঝড় না আসিলে এই আবহাওয়া পরিষ্কার হইবে না। শতবার্ষিকীর মধ্যে যে আলোচনার ও সৌহার্দ্যের সৃষ্টি হইবে, তাহাদ্বারা আবহাওয়া বিশুদ্ধ হইবে বিশ্বাস করি। ঠাকুর মেয়েদের স্থান দিয়াছেন ইহা স্বীকৃত সত্য। কোন্ চিন্তাপ্রণালী অনুসরণ করিয়া নরনারীর সম্পর্ক বিপজ্জনক না হইয়া সমাজের কল্যাণকারী হইতে পারে, নর-নারী মিলনের কুফল হইতে মানুষ রক্ষা পাইতে পারে, সেই আলোচনা জমিয়া উঠিলে এখানের বিষাক্ত আবহাওয়া বিশুদ্ধ হইবে। অবধূতানন্দের সঙ্গে কোলাকুলি করি—বলি তোমার বাগান-সেবা ঠাকুর গ্রহণ করিতেছেন। এক দল চাষী-ব্রহ্মচারীর প্রয়োজন আছে। তুমি আমাদের ফেলিয়া যাইও না। মন্ত (অমলানন্দ) আমাকে বিক্রয় করিয়া দেওয়ার কথা বলে। আমি বলি সে পয়সা মঠে দেও। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামে যাইব। এক পয়সার মূল্য আমি জানি। ঠাকুর ছোটর মূল্য শিখাইয়া গিয়াছেন। বীরানন্দ মোড় পর্য্যন্ত আসে। আমার গায়ের চাদরটা ফেলিয়া আসি। সেবানন্দ সেটা দিয়া যায়। আমার অবর্ত্তমানে সুবোধ মুখার্জী আসিয়াছিলেন।

১২ই নভেম্বর

রাধারাণী, স্বাধীনভর্তৃকা রূপে তুমি বিশ্বের সামনে পুরুষ-নিরপেক্ষ প্রকৃতির একটী স্বাধীন রূপ প্রকটিত করিয়াছ। তুমি পুরুষ-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। তাই তুমি পুরুষতন্ত্র সমাজ-ব্যবস্থার কলঙ্কিনী, অসতী। অথচ তুমিই ছিদ্রকুম্ভে জল আনিতে সক্ষম। শতছিদ্রময় এই সংসারে ব্রহ্মবারি বহন করিতে একমাত্র প্রাণবল্লভা তুমিই পার। তাই তোমাকে সকল দেহপ্রাণমন দিয়া ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। প্রাণবল্লভা আমার, হৃদয়পুত্তলী আমার, তুমিই নারীর মূর্ত্তিমতী মর্য্যাদা, বিনয়ের খনি, বিশ্বের ধনবিগ্রহ। তোমার মত কে আছে? তুমি আমি এক। তোমাকে বুকে লইয়া বিশ্বময় তোমার উন্মাদিনী রূপের গৌরব ও মাধুর্য ছড়াইয়া দিব। আমি তুমি ধনিয়া যাইব। আমি রাধা, আমি রাধা...যাহা আমি ধর্ম বলিয়া মনে করি, তাহা আমি সারা জীবন ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পালন করিবার জন্ত প্রাণপণ করিয়াছি, আখিক অনিশ্চয়ের মধ্যে ঝাঁপ দিয়াছি। কূল পাইয়া গিয়াছি। আমার সাধনা প্রাণের। প্রাণ আমাকে কূল দিয়াছে। অনিশ্চয়ের পথেই তো সারা জীবন চলিয়াছি। পথে কত কষ্ট পাইতে পারিতাম, ছেলেপুলে লইয়া উপবাস করিতে পারিতাম, পথের ভিখারী হইতে পারিতাম। প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। আজও ভরসা আমার সেই প্রাণ প্রাণবল্লভা রাধা। প্রাণঃ পিতা প্রাণঃ মাতা।—দেব কি ভবিষ্যৎ? দেবের খরচ চালায়। যদি না চালায়? আমি কাছে আছি যখন তখন তো আমার যায় আছে। তাহার

দিকে চাহিয়াও তাহাকে অর্থোপার্জনের যোগ্য করিয়া তোলা প্রয়োজন। অর্থের খুব টানাটানি। খরচ কমানো দরকার।

১৩ই নভেম্বর

পুরুষোত্তম বিশ্ব সংগঠনের শক্তি তুমি ওগো আমার বুকের ধন রাধারাণী। আমার পরাণপুতলী তুমি রাধারাণী। বাহির হইয়াছিলাম লক্ষ্য গড়িয়া তুলিব বলিয়া। বিশ্বরূপ পিতা হইব বিশ্বরূপা স্ত্রী গড়িয়া তুলিব, বিশ্বরূপ পিতা ও বিশ্বরূপা মাতার মহামিলনের ভিতর দিয়া বিশ্বরূপ পুত্রলক্ষ্য গড়িয়া তুলিব। তুমিও আসিয়াছিলে। তবে কেন আমি আজ একা, সঙ্গহীন? তোমার প্রাণপ্রিয়তম পুরুষোত্তমকে কি বিশ্ব মন্থন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিব না? তুমি এস আমার জীবনে, তুমি এস, তুমি এস। দিন যে যায়, আর কত দিন?...ধীরেন ব্যানার্জী আসে, তাহার কাছে দিল্লী যাবার কালীন সেখানকার কালী-বাড়ীতে মহাভারত আলোচনার কথা শুনি। বিজন মুখোপাধ্যায় (সেখানকার জজ) আলোচনার উদ্বোধন করেন। অর্জুন চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ইতিমধ্যে ধীরানন্দ আসে। তাহাদের সামনে রেণু 'নিতাগোপাল' প্রবন্ধ পাঠ করে।...শ্রীশ্রীমা, আনন্দময়ী, অনুকূল ঠাকুরকে লইয়া হৈ চৈ করিবার মত লোক ও টাকা আছে। নিতাগোপালের কি আছে? কিছু নাই। তাঁহার কথা আছে, দর্শন আছে, জীবন আছে—ইহাতে যদি প্রচার হয় হইবে, নয় তো হইবে না। রক্তের মত ছুটিতে ইচ্ছা। চারিদিক হইতে যেন পাষাণ-প্রাচীর চাপিয়া ধরিয়াছে। নিতাগোপাল-দর্শন প্রতিষ্ঠিত না হইলে যুগের মানুষ বাঁচিবে কি? 'Either-or'-এর দর্শন ও জীবন যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত চতুর্দিকে।...

১৪ই নভেম্বর

রাধারাণী, তুমি আমার তন্ত্র মন্ত্র, তুমি আমার ধ্যান জ্ঞান, তুমিই আমার সর্বশাস্ত্রসিদ্ধান্ত। আমার জীবন-মরণ ধন তুমি, সারা জীবন নিংড়ান ধন তুমি। তোমাকে জীবনে পাইয়াছি। এই সৌভাগ্য, এই গর্ব লইয়া আমি চলিয়াছি। তাই এত দুর্যোগের মাঝেও আমি তৃপ্ত আছি। কিন্তু তোমাকে, তোমার পরবর্তী জনকে তো বিশ্বের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে পারিলাম না। 'যত বাধা আছে মরমে'। বিশ্বময় সকলে 'Either-or-এর বন্ধনে বদ্ধ। কে আছে তুমি ছাড়া 'Either' ও 'or' এই দুই কূলের মধ্য পথ অবলম্বন করিবার মত বিপ্লবী? Either-এর বন্ধন, or-এর বন্ধন ছিঁড়িয়া কে উল্লাসের মত ছুটিবে? আমাকে বল দেও, আমি ছুটিব, দেশকে পাগল করিয়া তুলিব।...মাথা ও জ্বর আসে...। উপরে আসি—মন্ত্রটী আবার শুনাইয়া দেই। নিজের কথা কিছু বলি। ঠাকুরের 'জয় কি? টেনে তুলব' এই অভয় বাণী তাহাদেরও, ইহা বলি। উষাদিদি মন্থর বাসা হইতে আসে ৪টায়। ৪টার পর গীতার 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন' ও তাহার পরের শ্লোকের কিছুটা ব্যাখ্যা পড়া হয়। আমার জ্বর মত হয়। বেশ উত্তাপ। শুইয়াই পাঠ শুনি ও ব্যাখ্যা করি।...র দুষ্টামীর জন্য তাহাকে রাগ করি ও পিঠে ২টা চাপড় দেই। সারা দিন কষ্ট হয়। না শাসন করিতে পারিলেই তো ভাল হইত। তাহার জীবনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তো আমার উপর। সে যদি মানুষ না হয় কত কষ্ট সে পাইবে...। মনে পড়িতেছে ছোট বেলাকার একটী ঘটনা। তখন আমার বয়স ৩।৪ বৎসর হইবে। আমার জ্বর হইয়াছিল। ডাক্তার সেব রাত্রিতে ক্যাস্টর অয়েল খাইবার ব্যবস্থা দিলেন। আমি খাইতে না চাওয়ায় বাবা আমাকে একটা চড় দিয়াছিলেন। সেই দিন আমার জ্বর বাড়িয়াছিল! বাবা খুব দুঃখ করিয়াছিলেন।...

১৫ই নভেম্বর

ঠাকুর, যত দিনের কথা মনে আছে, ততদিন মানুষের ভাগ্যকে নিজের ভাগ্যের সঙ্গে মিশাইয়া এক করিয়া তাহাদের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছি—স্ত্রী পুত্র কন্যা এবং তাহাদের বাহিরের সকলের সঙ্গে অদ্বৈত হইয়া চাহিয়াছি তাহাদের ব্যথা বুঝিতে ও তাহার প্রতীকার করিতে। তাহারা তাহাদের ভাগ্য আমার ভাগ্য হইতে পৃথক করিয়া লইয়াছে। পৃথক হইয়া তাহারা নিজেদের সমস্যার সমাধান করিতে চাহিতেছে। আমি

চাহিয়াছিলাম অদ্বৈত হইয়া সমস্যার সমাধান। তাহারা যে যাহার সমাধান খুঁজিতে চলিয়া গেল। আমি আজ একা, একরূপ সব হারাইয়া অন্তরে নয়নে কাঁদিতেছি। তুমি আছ আমার, তাই চলিতে পারিতেছি। না হইলে চারিদিকের যে আবেষ্টন তাহাতে হাত পা অবশ হইয়া পড়িতাম। শরীর ভাল নয় বলিয়া আজ আর প্রার্থনায় যাই নাই। উহারাই সারিয়াছে।....র সম্বন্ধে যাবতীয় কথা হয়। তাহার বাড়ী 'ঘুল ঘড়ী', কোনও পরিবার নহে। সারাদিন বাহিরের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিবার ফলে -র ভিতর একটা বহির্মুখী ভাব আসিয়াছে। ঘরের শিক্ষা, একা থাকার শিক্ষা হয় নাই। এখানেও তাই। তবুও ইহার প্রতিকার করিতে হইবে। উজ্জ্বল-ভারত যেমন— -র আছে, শতধারিকী যেমন আছে,— -র জন্যও কিছু সময় রাখিতে হইবে।...

১৬ই নভেম্বর

রাধারাণী আমার, বিশ্বব্যাপী সর্ব সমাজ ও দর্শনে নিন্দিতা প্রকৃতি পরম গৌরবোজ্জ্বল মূরতি আমার, তোমার জীবন উত্তর দিয়াছে প্রকৃতির কি মহীয়ান রূপ সম্ভব হয়। সর্বশাস্ত্রে অভিমুক্তা প্রকৃতির মূর্তিমান উত্তর তুমি। তোমাকে বিশ্বময় খুঁজিলাম, মাটির জগতে মাটির মানুষে খুঁজিলাম। দেখা দেও চিন্ময়ী আমার মৃন্ময়ী রূপে।... বুকের ভিতর যে নরসিংহ একদিন বরিশালময়, বাকলায় গর্জন করিত, যে গর্জনে মানুষ স্তব্ধ হইত, সে গর্জন কি আর স্ফুরিত হইবে না, ঠাকুর, তোমাকে বুকে লইয়া? আর একবার গর্জন করিতে দেও। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত কত দিন আর পড়িয়া রহিব? এমন একটি গর্জন করিব যে সারা কলিকাতা কাঁপিয়া উঠিবে, পথ খুলিয়া দিবে, নির্দেশ মানিয়া চলিবে। সন্ধ্যার পর — আসে। ইহাদের যেরূপ মেজাজ, ইহাদের লইয়া কাজ করা শক্ত। —'প্রচার সচিব' designation না পাইলে কাজে সুবিধা পাইতেছে না—ইহা ২।১ দিন আগে বলিয়াছিল। আমি ইহা বুঝি না। কাজ যে করে, তাহার কোনও designation দরকার? বরিশালের একজন মানুষও তো জিজ্ঞাসা করে নাই আমি কংগ্রেসের সভাপতি না সম্পাদক? আমি আমি; কর্মই ছিল আমার পরিচায়ক। Designation আমার কাজের নির্ধারক নয়; আমি উহার অনেক উর্দ্ধে। সস্তা কর্মীকে designation নীচে নামাইয়া দেয়। Sreekrishna was never a king, but he was all in all.....।

১৭ই নভেম্বর

ঠাকুর, সারা জীবন খুব কাঁদিলাম। নারী-জীবনের তথা বিশ্ব-প্রকৃতির সর্ববিধ সমস্যার সমাধান বলিয়া শ্রীরাধা এবং পৌরুষময় পুরুষ-জীবনের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান-মূর্তি বলিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে একদিন অযাচিত করুণায় হৃদয়ের দুয়ারে পাইয়াছিলাম। পাইয়া তো সাধ মিটিল না। 'বাঁচি আর মরি দিতে হবে পারি'। তুফানের মাঝখান দিয়া চলিয়াছি ঐ নূতন সাগরতীর পানে, সামনে উদ্ভাসিত সমাধানের দিকে। অনুকূলকে গ্রহণ ও প্রতিকূলকে বর্জনরূপ 'পাল' শক্ত করিয়া টানিয়া রাখিব। বাঁচি আর মরি দিতে হবে পারি। বল দেও, বুদ্ধি দেও, শক্তি দেও।...সে এখন একটু প্রাণ খুলিয়া মেলামেশা করে। আমার সহজ জীবন, সহজ চিন্তাপ্রণালীর উপর অযাচিত আরোপ করিয়া দূরে সরিয়া যাইবার কোনও প্রয়োজন কাহারও ছিল না। আমি যতখানি মানুষকে তাহার দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করি, সে কি নিজের সম্বন্ধেই তাহা করিতে পারে? আমি তো দাস-দাসী করিয়া কাহাকেও রাখিতে চাই না। অথচ মানুষ আমার সঙ্গেই যত তর্ক বিচার করে। যেখানে তর্ক-বিচারকে ডরাইয়া রাখা হয়, মানুষ সেখানেই প্রাণ খুলিয়া থাকে, প্রাণের অবমাননা হইতে দেয়। আমি স্বাধীন সত্তা স্বীকার করি বলিয়াই যত উল্টা তর্ক আমারই সঙ্গে। ভারতবর্ষ ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে স্বীকার করে, সকলকে তার তার কথা বলিতে দেয় বলিয়াই তাহার যত দোষ কীর্তন করিতেছে। পাকিস্তানে ইহারা ঠিক আছে। সেখানে এত 'ইনক্লাব জিন্দা বাদ' চলে না। ঘাসের লক্ষণ ইহাই। রাত্রিতে লুচি খাই। বড় লোক হইয়াছি। কেননা দাঁতের বেদনায় কটী চিবাইতে পারি না। সতীশ দাস একবার ঘরে চাউল ছিল না বলিয়া দোকান হইতে রসগোল্লা

কিনিয়া খাইয়াছিল। আমার অবস্থাও তাই।

১৮ই নভেম্বর

গৌর আমার ধূলায় লুটায়, অমনি চৈতন্য আসি অঙ্গের স্পর্শ লাগি ধূলায় লুটায়, অঙ্গের গন্ধ বাড়াইতে অমনি আসি ধূলায় লুটায়, অঙ্গের প্রেমে বিহ্বল হইয়া অমনি আসি ধূলায় লুটায়॥ গৌরগোপাল নিতাগোপাল আমার, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ। আমি আজ তোমার জীবন ও দর্শন লইয়া নিঃসঙ্গ। তুমিও ছিলে নিঃসঙ্গ; তোমার দর্শন ও জীবনের মূল তাৎপর্য্য বুঝিবার মতন কোন যোগ্যতা ছিল না বলিয়াই তুমি কিছুই আমাদের কাছে বলিয়া যাও নাই। শুধু নিজের কথা লিখিয়া গিয়াছ। আজ তোমার আশীর্ব্বাদে তোমার কথা লইয়া যতটুকু পারি নাড়াচাড়া করি ও নাড়াচাড়া দেই। তুমি কিছুই বলিয়া যাও নাই; লিখিয়াই গিয়াছ। তুমি তাহাতেও ছিলে পাক্কা। আমি যে তোমার দর্শন লইয়া পার পাইতে পারিতেছি না। ঠেলাঠেলি করিয়াও তোমার দর্শন দিতে ইচ্ছা হয়। ঠাকুর, আমায় পথ দেও। রেণু সকালে বাহির হইয়া প্রথমে মহানির্বাণ মঠ, পরে জয়া মঠ ও বিমলার বাসায় আমার জন্মদিনের কথা জানাইয়া জেনারেল প্রিন্টার্স হইতে চেক লইয়া ১১ টায় ফেরে। তাহার পর যায়।·· অনেক কথা বিকার সঙ্গে তাহার লেখা একটী কবিতাকে উপলক্ষ্য করিয়া। রাত্রি ৮।৯টার পর উপরে আসি। কিছু পরেই তাপিসীবাবু আসে। তাহাকে উপরে আনা হয়। ১০টা পর্য্যন্ত অনেক কথা হয়—মঠের কথা, তাহার বাসানের কথা, শত বার্ষিকীর কথা, মঠের শৃঙ্খলা আনার কথা, সচ্চিদানন্দকে লইয়া বিব্রত হইবার কথা, হলদিপুরে হরিদাসবাবুর কথা।

১৯শে নভেম্বর

রাসযাত্রা—নরনারায়ণ আশ্রমের জন্মদিন

শ্রীশ্রীরাসপূর্ণিমার বুক নিংড়াইয়া অমন নিয়াছিলে তুমি নরনারায়ণ আশ্রম; আমি তাহা ধারণ করিয়াছিলাম সংসার-সন্ন্যাসি গলানো এক অযৌন জীবনে। এই নর-নারায়ণ আশ্রম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব জাতির মহা-মিলন ক্ষেত্র। যাহারা একদিন ইহাকে পুষ্ট করিয়া ছিল, আজ তাহারা অনেকেই নাই। আমি নরনারায়ণ নিতাগোপালের সাধপীঠ এই আশ্রম বুকে লইয়া চলিয়াছি। উজ্জ্বলভারত বাহন রূপে ইহার কথা ছড়াইয়া চলিয়াছে। বস্তুতঃ আশ্রমের সাধনা আজ সমতল ক্ষেত্রে, সমাজের বুকে। এই আশ্রম সংসারী-সন্ন্যাসীর মহামিলন ক্ষেত্র, জগন্নাথ ক্ষেত্র। তোমার জয় হউক। তোমার জয়ে বিশ্বের জয়। আজকার ডাইরী লিখিবার আগে রেণু গত বৎসরের ডাইরী হইতে লেখা অংশ পাঠ করে

৯।৯টার পর মঠে যাই আমি ও প্রতিভা। প্রতিভা মহানির্বাণ রোড, অশ্বিনীদত্ত রোড, পণ্ডিতিয়া রোডে শনিবারের সকার বিজ্ঞাপন বিলি করিয়া আসে।... চিদানন্দ প্রস্তাব করে—যৌবনের যে জানা-শুনা ময়ী কিংবা ম্যাজিস্ট্রেট আছে, তাহাকে দিয়া ২৫ টাকা দামের ওষুধের দাওয়া চিকিৎসালয় খোলা হউক। কলিকাতার মত স্থানে এত ক্ষুদ্র ব্যাপার লইয়া কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হইতে লজ্জা বোধ — নাই বড় লোক লইয়া টানাটানি করিতে ইহাদের আটকায় না তদুপরি আমরা শতবার্ষিকীর কিছুই করিতে এ যাবৎ পারি নাই, অথচ যে কয়েকটা টাকা পাইয়াছি তাহা খরচ হইয়া যাইতেছে, এখন শতবার্ষিকীর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট নয় এমন ব্যাপারে কি আমরা ২৫০ টাকা খরচ করিতে পারি? আমাদের না আছে লোকজন, না আছে টাকা, না আছে স্থান। এ অবস্থায় বাহিরের কোনও লোককে টানিয়া আনা ছেলে-মানুষী ছাড়া আর কিছুই নয়।...

২০শে নভেম্বর

ক্রমশঃ

সাময়িকী

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-জন্মোৎসব : বিগত ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৭৩ (ইং ২রা ডিসেম্বর ১৯৬৬) কার্ত্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৮৪-তম জন্ম তিথি ছিল। ঐদিন তাঁহার পুণ্যদেহ ধারণকারী নয়নারায়ণ আশ্রমে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জীবন দেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের পূজা ও ভোগ অন্তে ঐ দিন উপস্থিত ভক্ত-শিষ্যশিষ্যাগণ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জীবন কথা নিভৃতে সম্মিলিতভাবে স্মরণ করেন। অতঃপর এই উপলক্ষে ১৮ই অগ্রহায়ণ রবিবার সর্বসাধারণ সহযোগে সমারোহ অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন সকাল হইতেই শ্রীনিত্যগোপালের পূজা ও ভোগে আশ্রমস্থ বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করে। মন্দির সাজানো, আলপনা দেওয়া, অঞ্জলি দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিপ্রহরের ভোগের পর বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণসহ প্রায় তিনশত ছেলেমেয়ে খিচুড়ী তরকারী ও চাটনী প্রসাদ পাইয়াছে—ইহাছাড়া কিছু সংখ্যক শিক্ষকগণ যাহারা পূজা ও অঞ্জলিতে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও প্রসাদ পাইয়াছিলেন। অতঃপর বিকাল ৪টাতে সকলে সম্মিলিত হইয়া শ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও দর্শন আলোচনা করেন। আশ্রমের কয়েকজন শ্রীনিত্যগোপাল-প্রশস্তি দ্বারা উদ্বোধন করিলে অধ্যাপক শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতি করা হয়। শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায় বাস্তুঘাটিতে নয়নারায়ণ আশ্রমের প্রতিবেশী—শ্রীমৎ স্বামিজী তাঁহার বাড়ীতে বসিয়া বহু তত্ত্বাদি আলোচনা করিতেন—এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তি জ্ঞাপন করেন।

ইহার পর আশ্রম সম্পাদিকা সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীনিত্যগোপালদেবের জীবন ও দর্শনের অনন্যতা ও বর্তমান যুগে ইহার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করেন। অতঃপর শ্রীসন্তোষ-কুমার অধিকারী, শ্রীশান্তশীল দাশ ও শ্রীসুনীতি চক্রবর্তী বলেন। ইহাদের বক্তৃতা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। ইহারা ব্যতীত শ্রীজ্ঞানেরঞ্জন সেন, শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপার্থসারথি বিশ্বাস ও সভাপতি কিছু বলেন। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ যখন পূর্বাশ্রমে শিক্ষকতা করিতেন সেই সময়ে একদিন বহু ছাত্রসহ অনেক দূরের গ্রামে চড়ুইভাতি করিতে গিয়া কেমন করিয়া স্বপ্নাবেশে ও জগৎ প্রেমে বিভোর হইয়া সকলসহ খিচুড়ী মাখামাখি করিয়া নাচানাচি করিয়াছিলেন শ্রীগুরুদাসবাবু সেই কাহিনীটি বর্ণনা করেন। শ্রীমৎ স্বামিজীর পূর্ব আশ্রমের অগণিত না জানা ও ভুলিয়া যাওয়া ঘটনাগুলির মধ্য হইতে একটি জানিতে পারিয়া সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। শ্রীমৎ স্বামিজীর সামগ্রিক সমন্বয়বাদ সমাজ-জীবনে অনুপ্রবেশ দ্বারা সামাজিক স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিবার প্রচেষ্টা যে আজ বিশেষ প্রয়োজন—অন্যান্য সকলেই সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিয়া শ্রীমৎ স্বামিজীর প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্পণ করেন। ইহার পর কয়েকজন বিশিষ্ট গায়ক গায়িকা রবীন্দ্র সঙ্গীত শ্যামা সঙ্গীত প্রভৃতি গান করেন।

বন্ধুবর শ্রীঅনিলকুমার সমাজদার বিহারের পালামৌর অন্তর্গত খেলারীতে শ্রীমৎ স্বামিজীর জন্মোৎসব পালন করেন। সে সম্বন্ধে উক্ত স্থানীয় সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—

গত ১৬ই অগ্রহায়ণ (ইং ২রা ডিসেম্বর ১৯৬৬) শুক্রবার সাহিত্যিক শ্রীঅনিলকুমার সমাজদার-এর উদ্যোগে তাঁর : কবিতা-নিলয় : নামক মাঝারিগুছ বাস ভবনে মহা তপস্বী শ্রীশ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৮৪ তম জন্ম জয়ন্তী বহু গণ্য মান্য অভ্যাগম সমাগমে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানান্তে সমাগত অভ্যাগতগণকে প্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। রাতে যুবকগণ দ্বারা নাম সংকীর্তন হয়॥

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নয়নারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাওইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪পরগণা হইতে প্রকাশিত ও বি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

পুরুষের পদমর্যাদা
অটুট রাখে
বাটার জুতো
Bata

আমি বৈষ্ণব নহি কারণ তাহাতে তিলক কেটে ভেক নিতে হয়, আমি বৈষ্ণবের দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। দাড়ী আছে বটে কিন্তু কাজি মৌলভির নিকট কলমা পরে মুসলমান হই নাই, মুসলমান দলের মুসলমান কেবল মুখে বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। ব্যাপটাইজড না হইলে খৃষ্টান দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না, বাহ্যিক জলতর্পণ পূজার্চনাও নাই, কুলগুরুর কাছে কাণে কৌতা মন্ত্রও লইতে চাহি না— ইহাতে সাধারণ হিন্দুরা আমাকে নাস্তিক বলিবেন। বাহ্যিক পূজা অর্চনা তপই আস্তিকের কার্য তাঁহারা বলেন এখন কোন দলে ত আমাকে লইবে না, আমিও দল চাই না। দল গেড়ে জোরাতেই, পঙ্কিল পঙ্ক পরিপূর্ণ পুতিগন্ধযুক্ত পল্বলেই হইয়া থাকে; স্বচ্ছ সরোবরে প্রবাহিনী স্রোতস্বিনী নদীতে হয় না। তবে আমি কি? আমি সকল দলের ভিখারী। ভিখারীর জন্য সকল দ্বারই উন্মুক্ত। আমাকে প্রেম ভক্তি ভিক্ষা সকল দলের সাধুরাই দিয়া থাকেন। আমি সকল দলের ভিক্ষ পাই। সেইজন্য আমার সকল দল লয়ে এক অখণ্ড দল'

—শ্রীনিত্যগোপাল

সূচীপত্র কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৮৮৭, ১৩৭৩

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ১৬১
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-প্রশস্তি
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী
স্মরণ (কবিতা)
শ্রীশান্তশীল দাশ
শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ ১৬৬
শ্রীসুনীতি চক্রবর্ত্তী
এস আর যায় পুরুষোত্তমানন্দ (কবিতা)
শ্রীহরিপদ রঞ্জন কাব্যতীর্থ
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ১৬৮
শ্রীরেণু মিত্র
প্রার্থনাকালীন ভাবণ (৬৫)
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত
৮। সেই মায়েরা (কবিতা)
শ্রীগায়ত্রী
বিজ্ঞান ও দর্শন
শ্রীউমাশঙ্কর চট্টরাজ
আমাদের জাতীয়তা বোধ
শ্রীরুদ্রিদাস সাহা
দর্শন চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্র
অধ্যাপক গোপেশচন্দ্র দত্ত
সিদ্ধান্ত দর্শন (পূর্বানুবৃত্তি)
শ্রীনিত্যগোপাল
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (৬৬)
১৯৫৩
সাময়িকী
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-জন্মোৎসব

মানুষকে মানুষের মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অসম্ভব, মানুষহীন মানুষের উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। মানুষে মানুষে করিয়ে পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—মানুষ কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এই জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার নির্দেশ পাবেন নীচের বইগুলিতে

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের মুদ্রিত

ইন্দ্রস্বর (অনুবাদ ও ভাষ্য)

১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)

২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত) ৮৲

৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত) ৬৲

ঈশোপনিষৎ ২৲

কেনোপনিষৎ ২৲

কঠোপনিষৎ ৩৲

প্রশ্নোপনিষৎ

ঐতরেয়োপনিষৎ

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

মুণ্ডকোপনিষৎ

শ্রীনিতাগোপাল—জীবনে ও দর্শনে

স্বরাজের পূর্ণরূপ

১১। গীতাস্বরাজী

১২। উজ্জয়নকাব্যম্ (পুস্তিকা)

১৩। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা ৩৲

(গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)

পাণ্ডুলিপি

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ

ছান্দোগ্য উপনিষৎ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি

শ্রীযতী প্রতিভা রায়ের

নারী-প্রগতির ভূমিকথা

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ও শিশু নিতাগোপাল

ও শিক্ষা সুধার কথা

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীযতী রেণু মিত্রের

সমন্বয়ব্রতী শ্রীনিতাগোপাল ৷৷৵০

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲

শরৎচন্দ্রের দেশপ্রেম ৩৲

রবীন্দ্র-স্মরণ ৫৲

প্রাথমিক শিক্ষা ৬৲

নরনারায়ণ আশ্রম 21 JAN 1967

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয় আত্মা-অনাত্মা
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয় সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল

পৌষ ১৮৮৭, ১৩৭৩, সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র ১৯শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'উজ্জলভারত' পত্রিকার গ্রাহক অনুগ্রাহক বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট আজ এই নিবেদন করি যে, মাঘ ১৩৭৩ সংখ্যা হইতে ইহার যে ত্রিংশ বর্ষ আরম্ভ হইতেছে, সে সংখ্যা হইতে উজ্জলভারত দুই মাসে একটী সংখ্যা বাহির হইবে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵৮০ পয়সা, বার্ষিক মূল্য ৫·০০ টাকা। বিজ্ঞাপনের হার পরিবর্ত্তিত হইয়া নিম্নরূপ হইবে—

পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫·০০ টাকা
অর্ধ „	৪০·০০
এক চতুর্থাংশ	২৫·০০
দ্বিতীয় তৃতীয় কভার	৮৫·০০
চতুর্থ	১০০·০০ „

পত্রিকার আকার এবং মুদ্রণ স্থান পূর্ববৎ ৯½″×৭″ এবং ৮″×৬″ থাকিবে।

নানারকম দুর্যোগ ও বর্ত্তমান অর্থনৈতিক প্রয়োজনে আমরা এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি উজ্জলভারতের সুহৃৎগণের সহৃদয় সহযোগিতা ইহাকে আগের মতই ঘিরিয়া রাখিবে।

নরনারায়ণ আশ্রম
পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

রেণু মিত্র
সম্পাদিকা, উজ্জলভারত

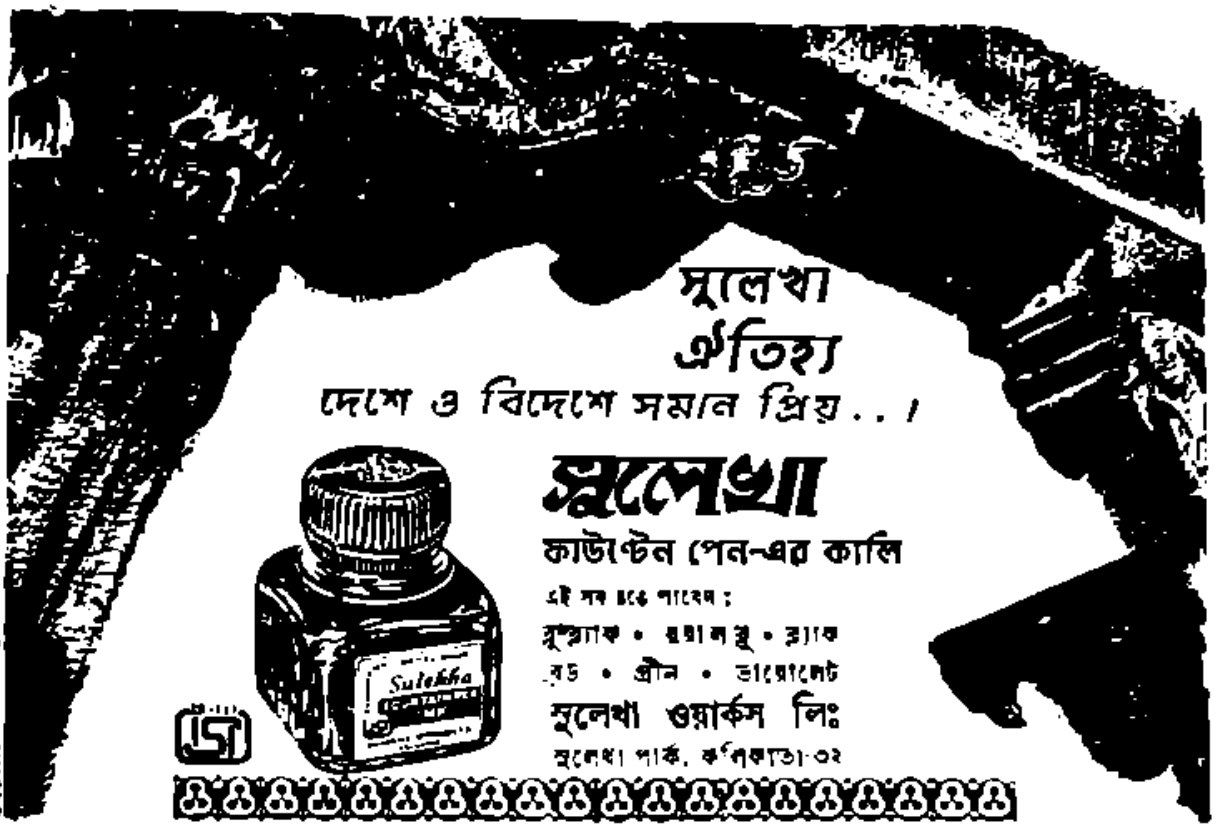
সুলেখা
ঐতিহ্য
দেশে ও বিদেশে সমান প্রিয়...!
সুলেখা
কাউণ্টেন পেন-এর কালি
এই সব রঙে পাবেন :
ব্লুব্ল্যাক • রয়্যাল ব্লু • ব্ল্যাক
রেড • গ্রীন • ভায়োলেট
সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

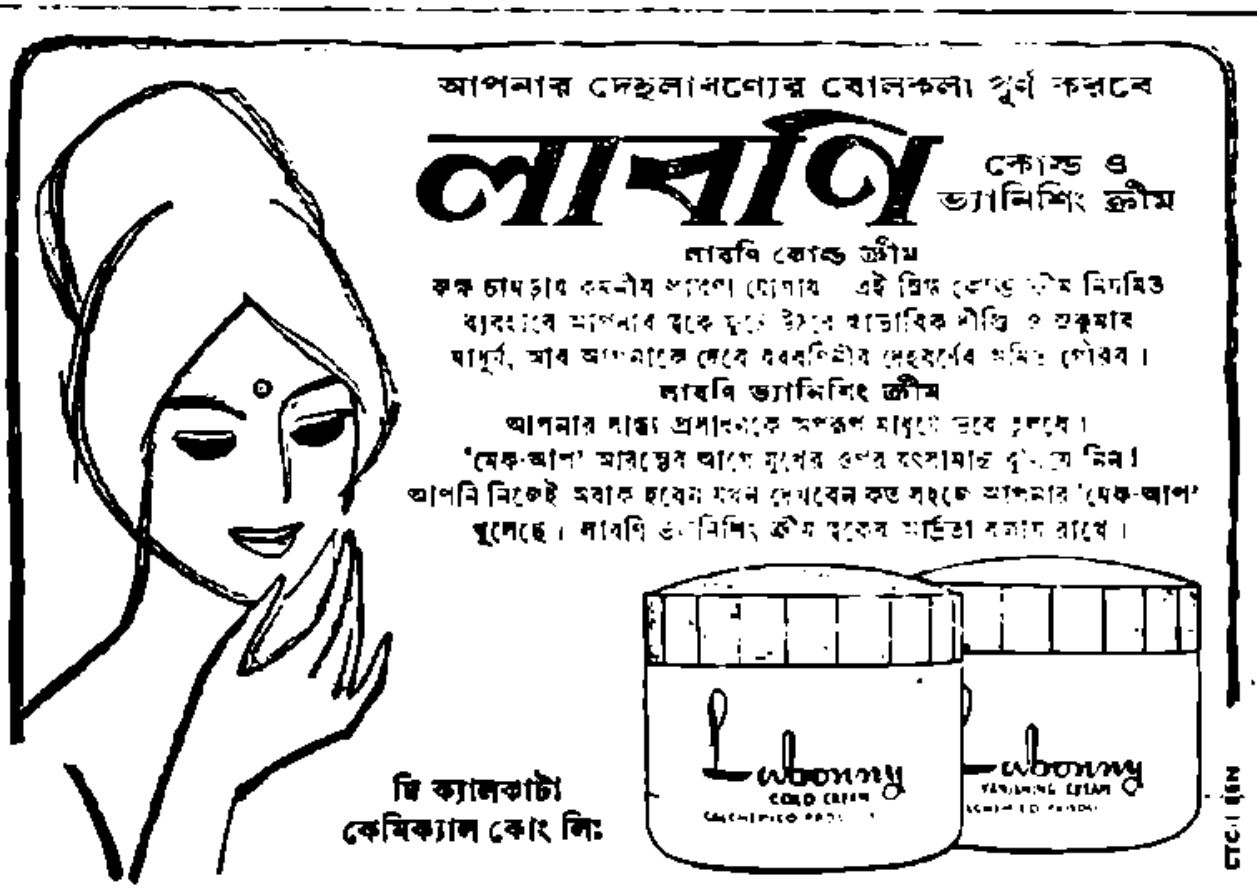
আপনার দেহলাবণ্যের ষোলকলা পূর্ণ করবে
লাবণি
কোল্ড ও
ভ্যানিশিং ক্রীম
লাবণি কোল্ড ক্রীম
রুক্ষ চামড়ায় কমনীয় লাবণ্য যোগায়। এই স্নিগ্ধ কোল্ড ক্রীম নিয়মিত
ব্যবহারে আপনার ত্বকে ফুটে উঠবে স্বাভাবিক দীপ্তি ও সুকুমার
মাধুর্য, আর আপনাকে দেবে কমনীয় দেহসৌষ্ঠবের অমিত গৌরব।
লাবণি ভ্যানিশিং ক্রীম
আপনার লাস্য প্রসাধনকে অপরূপ মাধুর্যে ভরে তুলবে।
'মেক-আপ' আরম্ভের আগে মুখের ওপর কয়েকবার ঘুরিয়ে নিন।
আপনি নিজেই অবাক হবেন যখন দেখবেন কত সহজে আপনার 'মেক-আপ'
খুলেছে। লাবণি ভ্যানিশিং ক্রীম ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখে।
Lavanny
COLD CREAM
Lavanny
VANISHING CREAM
দি ক্যালকাটা
কেমিক্যাল কোং লিঃ

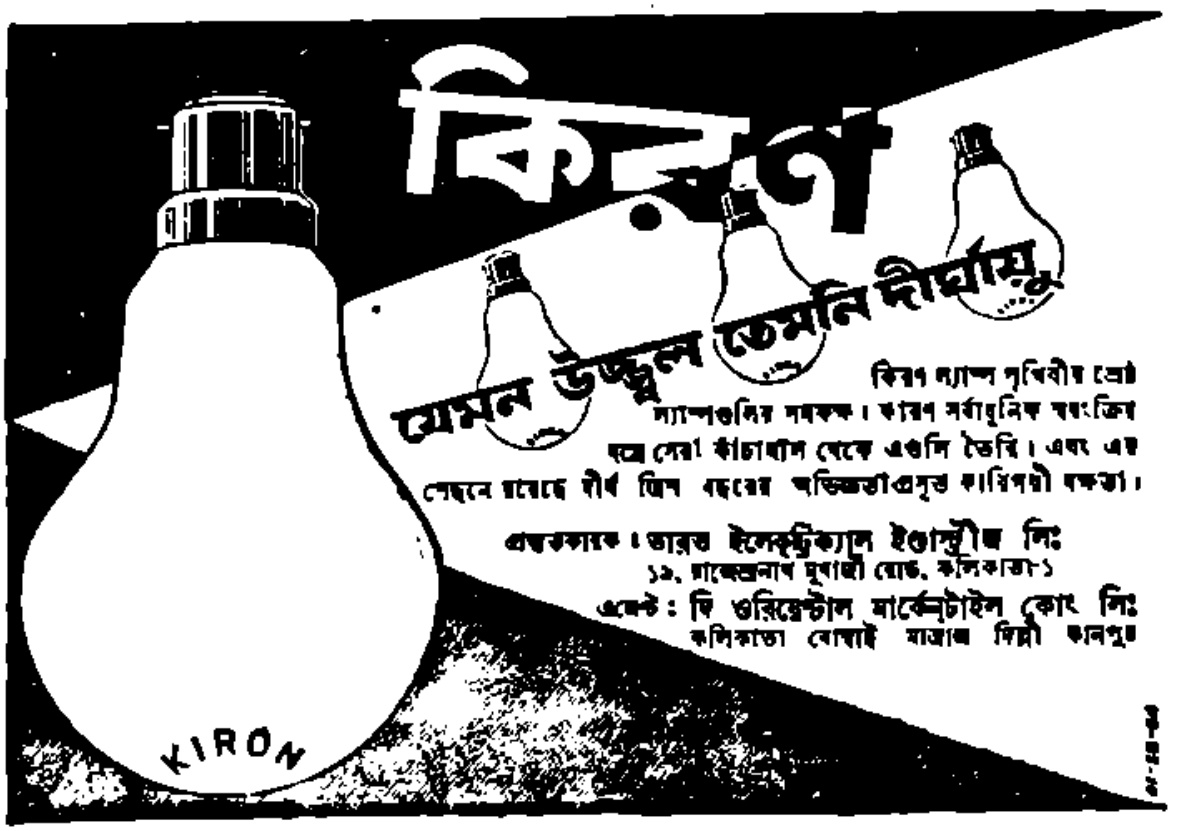

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৭·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০
কর্মবাণী	১·২৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
Soul of India Speaks	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	২·২৫

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
জীবন গড়া	·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি

সাহিত্যের গল্প	১·৫০
বিদ্যাসাগর	২·২৫

প্রয়োজনমত নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী :: ১৫, কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

পরিকল্পনার মাধ্যমে পশ্চিমবংগের অগ্রগতি

দেশ ভাগের পর নানাবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিমবংগের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। পনের বছরের পরিকল্পনার ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ এবং সর্বোপরি খাদ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবংগ অনেক এগিয়ে গেছে।

আমাদের চতুর্থ পরিকল্পনায় ব্যাপকতর কর্মপ্রচেষ্টা চলেছে।

॥ শিক্ষায়তনের সংখ্যা ॥

	১ম পরিকল্পনা কালে	৩য় পরিকল্পনা কালে (১৯৬৩-৬৪)
প্রাথমিক, নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদি	২৩,১০৬	৩২,৭৪১
উচ্চ, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	৩,২২৭	৪,৯৯২
কারিগরী বিদ্যালয় ও কলেজের সংখ্যা (পলিটেকনিকসহ)	২৯	২৩২
কলেজ (সাধারণ শিক্ষা)	৯৫	১৪৫
বিশ্ববিদ্যালয়	৩	৭

॥ কৃষি উৎপাদন ॥

	১ম পরিকল্পনার শুরুতে	৩য় পরিকল্পনা কালে
চাল	৩৬·২১ লক্ষ টন	৫৭·৬৫ লক্ষ টন
আলু	২·৭০ লক্ষ টন	৭·৭৯ লক্ষ টন
পাট	৬·৭৫ লক্ষ গাঁট	৩৬·১৭ লক্ষ গাঁট

॥ স্বাস্থ্য ॥

হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডিস্‌পেনসারি, ক্লিনিক প্রভৃতি চিকিৎসা ব্যবস্থা	২,০৫৬ (১৯৬৫)
রোগী শয্যার সংখ্যা	৩৩,১৬৭ (১৯৬৫)

॥ বিদ্যুৎশক্তি ॥

	১ম পরিকল্পনা কালে	৩য় পরিকল্পনা কালে (১৯৬৫-৬৬)
উৎপাদন হার	৩৬৪ মেগাওয়াট	৮৮৮ মেগাওয়াট

এই পরিকল্পনা প্রতিটী নাগরিকের জন্যই
এর সুফল পাচ্ছেন প্রতিটি নাগরিক

ডব্‌লিউ. বি. (আই. অ্যানড পি. আর) এ. ডি. ৩১৮৮/৬৭

বিদেশে আমাদের
বড়ো দশজন খরিদ্দার

ভারতীয় বাটার জুতো বিদেশে যে সব জায়গায়
রপ্তানি করা হয়, তাদের প্রথম দশটির নাম : যুক্তরাজ্য,
জাপান, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ,
বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া, সৌদি আরব, ফ্রিটাউন এবং
হল্যাণ্ড। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর
এই দশটি দেশে মোট ৫,৬৬০,০০০ জোড়া জুতো
রপ্তানি করা হয়েছে।

Bata

আমাদের বই-এর বৈশিষ্ট্য

লক্ষ্য করুন

বেলেঘাটা ভ্যারাইটী ষ্টোর্স

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

১৩৪, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড,

কলিকাতা-১০

লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল বিরচিত

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্

ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার কাব্যতীর্থ সম্পাদিত ষোড়শ শতাব্দীর গোপালভট্ট, চৈতন্যদাস ও কৃষ্ণ দাস কবিরাজের সারঙ্গরঙ্গদা টীকার ভাবার্থ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর বল্লভাচার্য দাস কৃত পদ্যানুবাদ সম্বলিত। সচিত্র শোভন সংস্করণ মূল্য বার টাকা।

গৌর-প্রীতিতে নয়নের দৃষ্টি খুলিয়াছে এমন ভক্তিমতী সুধা সেন কর্তৃক রচিত **"মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর"** সরল ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় এবং এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বপূর্ণতার প্রতিমূর্তি নদীয়া-বিনোদিয়ার রূপ-গুণ-লীলা-মাধুর্যের সংবাদ এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্যবান চিত্র সম্বলিত। মূল্য আট টাকা।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক রচিত বাংলার চিরায়ত সাহিত্যের সম্ভার

পৌরাণিকী

ভারত-আত্মার মর্মকথা পৌরাণিকী। ভোগবাসনা বিরহিত ত্যাগ-মহিমায় সমুজ্জ্বল এ পুরাণ-কথাগুচ্ছ অনাঘ্রাত কুসুমের মত নির্মল, গঙ্গাবারির মত পবিত্র। শোভন সংস্করণ মূল্য ছয় টাকা।

পৌরাণিকীর আখ্যায়িকাগুলি স্বতন্ত্রভাবেও প্রকাশিত হইয়াছে।

বেহুলা
জড়ভরত
খুল্লনা
সতী
ধরাস্রোণ ও কুশধ্বজ
রামায়ণী কথা

জিজ্ঞাসা

১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-২৯
১, কলেজ রো, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

খরচা কমানো উৎপাদন বাড়ানো

টাটা স্টীলের কারখানায় লোহা গলানোর ছ'টা ব্লাস্ট ফার্নেসকে কয়েক বছর অন্তর অন্তর ঢেলে মেরামত করতে হয়। কারখানার লোকেরা যাকে বলেন রিলাইনিং করা। এই রিলাইনিং একটা বিরাট কাজ এবং এতে হাজার হাজার টন রিফ্রাকটরি ইট, ইস্পাত, চালাই লোহা, বহু মাইল ইলেকট্রিক কেবল আর পাইপ লাগে। আর লাগে ইঞ্জিনিয়ার আর শ'য়ে শ'য়ে কর্মী এত বছর। এই কাজের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি, প্রত্যেকটি ধাপ আগে থেকে ছকে নেওয়া হয় এবং তারপর বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার আর কর্মীরা একসঙ্গে ঘড়ির কাঁটার মতন কাজ চালিয়ে যান যাতে যত কম সময়ে এবং কম খরচে এই মেরামতির কাজটি নিখুঁতভাবে হয়।

এই কাজে টাটা স্টীল গত কয়েক বছরে অভাবনীয় উন্নতি করেছেন। যেমন ধরুন, ১৯৪৭ সালে একটি ব্লাস্ট ফার্নেস রিলাইনিং করতে ৯৯ দিন সময় লাগে। ১৯৬০ সালে সেই কাজ যখন ৭৪ দিনে করা হয় তখন অনেকে ভাবলেন যে এ রেকর্ড বোধহয় ভাঙা যাবে না। কিন্তু ছ'মাস না যেতেই আর একটি ব্লাস্ট ফার্নেসকে মাত্র ৬৪ দিনে রিলাইনিং করা হয়।

কিন্তু এই শেষ নয়। যে ব্লাস্ট ফার্নেসকে ১৯৪৭ সালে রিলাইনিং করতে ৯৯ দিন লেগেছিল সেটাকে কিছুদিন আগে মাত্র ৪৭ দিনে রিলাইনিং করা হয়েছে। ফলে, মেরামতিতে যে সময়টা বাঁচলো তাতে প্রতিদিন দেশের অতি প্রয়োজনীয় আরও লোহা তৈরি হয়েছে।

ক্রমান্বয়ে কম সময়ে কাজ করা ও অঙ্কভাবে রেকর্ড করার এই অপ্রান্ত ও অবিরত চেষ্টার উদ্দেশ্য হ'ল টাটা স্টীলের ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র : খরচা কমানো,উৎপাদন বাড়ানো।

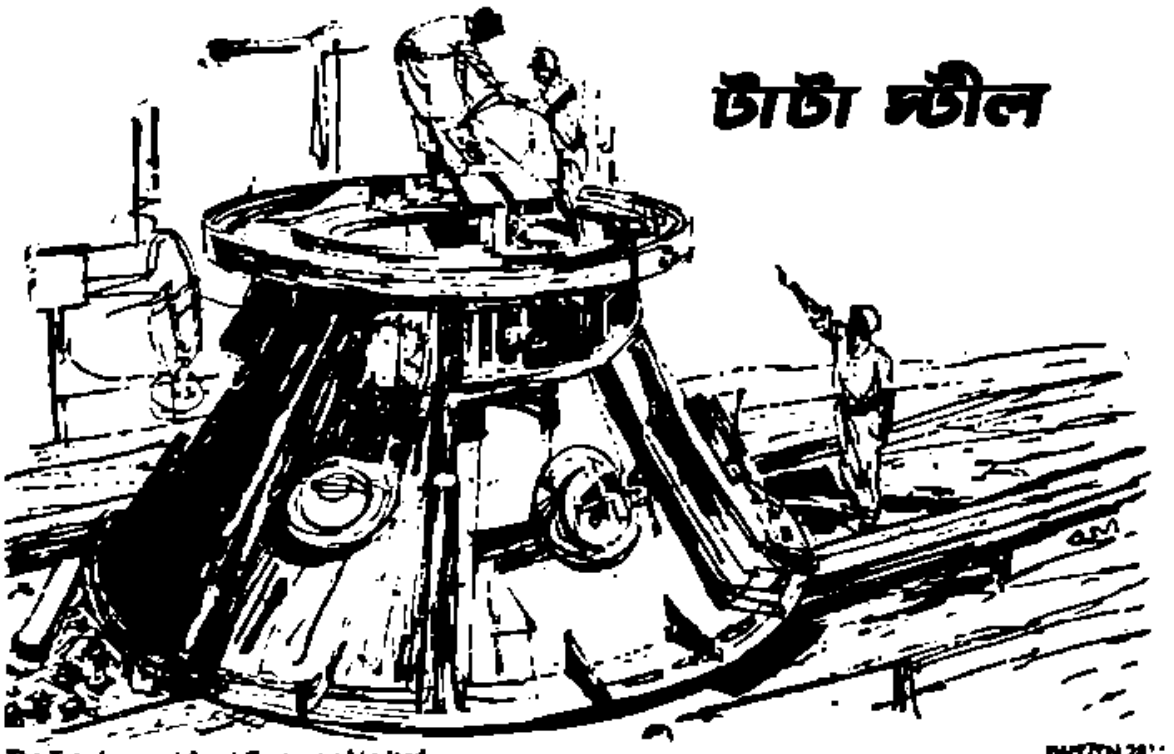

টাটা স্টীল

The Tata Iron and Steel Company Limited

JWT/TN 28

উজ্জ্বলভারত

১৯৮৬—১৩৭২ মাঘ হইতে ১৩৭৩ পৌষ

বার্ষিক সূচী

অসীমস্তিনী (একাঙ্কিকা)
শ্রীমন্মথ রায়

আগমনী (কবিতা) ১৩৮
শ্রীতারাপদ গুহ

আমাদের কথা
সম্পাদিকা

আমাদের কয়েকটী সমস্যা
শ্রীআশা শেঠ

আমাদের জাতীয়তা-বোধ
শ্রীহরিদাস সাহা

উজ্জ্বলভারত কি দেখিব না ? ১৫৬
শ্রীনলিনীকিশোর গুহ

একবার ঘুরে আসি
শ্রীবামিকানাথ শেঠ

এস আর বার পুরুষোত্তমানন্দ (কবিতা)
শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ

কঠোপনিষৎ (কবিতা)
শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

কীর্ত্তন (গান)
শ্রীসন্তোষকুমার দে

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২৫, ৬৯, ৯০, ১১৫
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

গভীর-বেদী হস্তী (পূর্ববঙ্গ হিন্দু সমাজ চিত্র)
শ্রীঋষিচন্দ্র কাব্যতীর্থ

গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মসূচীর দার্শনিক ব্যাখ্যা
শ্রীনাথাল চৌধুরী

গীতা-জয়ন্তী
শ্রীপ্রতিভা রায়

গ্রীক কবি মেনান্দার
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

চলমান জগৎ (কবিতা)
শ্রীজগদানন্দ বাজপায়ী

জননায়ক নেহরু
জনাব রেজাউল করীম

জাতীয় সঙ্কটে সাহিত্যের ভূমিকা
শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

তেলিংগাড়ী
শ্রীনরিংশেখর মজুমদার

তোমরা ও আমরা (কবিতা) ১৩৫
শ্রীশান্তশীল দাশ

দর্শন-চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্র
শ্রীগোপেশচন্দ্র গুপ্ত

দাক্ষিণ্য (কবিতা)
শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বসু

দেবী সূক্ত
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

পরলোকে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ কুশারী
শ্রীনীরোদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

পূজার কথা
শ্রীরেণু মিত্র

পৃথিবীটা বড্ড বেশী সচল (কবিতা)
শ্রীভারতী

প্রার্থনাকালীন ভাবনা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

ফরাসী সাহিত্যের রূপরেখা
শ্রীমীরা রায়

বিজ্ঞান ও দর্শন
শ্রীউমাশঙ্কর চট্টরাজ
মনস্তত্ত্বে অন্তর্বাদ ও ক্রিয়াবাদ ১০৬
শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়
মাতৃমাতৃকাস্তবম্
৺ প, চ, ঠাকুর
রবীন্দ্রনাথের নাটকে একটি বৌদ্ধ কাহিনী
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
রবীন্দ্র-স্মরণে
শ্রীসুনীতি চক্রবর্তী
আজন্ম লালিত নৈতিক পবিত্রতা
শ্রীশ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
শাকসব্জীর বাগান করিবার পূর্বে কতকগুলি
বিবেচ্য বিষয়
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীগৌরাঙ্গ
শ্রীপ্রতিভা রায়
শ্রীশ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৪০)
১৪৬, ১৮৭, ২১৯
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ১৬২
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী
শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ ১৬৬
শ্রীসুনীতি চক্রবর্তী
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ১৬৮
শ্রীযোগেন্দ্র মিত্র
শ্রীশ্রীদুর্গা (কবিতা)
শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল
শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল
শ্রীযোগেন্দ্র মিত্র
শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
প্রণতি
সত্য (কবিতা)
শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার রায়
সবই ভুল ?
শ্রীমান
সাময়িকী—প্রতিবাদ
—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ জন্মোৎসব
—নরনারায়ণ আশ্রম শোকসংবাদ
সিগমুণ্ড ফ্রয়েড্
শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়
সিদ্ধান্ত দর্শন ২৩, ৪৬, ৮৮, ১২৬, ১৮৪, ২১৭
শ্রীনিত্যগোপাল
সেই মায়েরা (কবিতা)
শ্রীআরতী
স্থল রাজা
একজন শিক্ষাবিদের অভিজ্ঞতা
স্মরণ (কবিতা)
শ্রীনাজমীল রায়

পৌষ, ১৮৮৭ শকাব্দ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৬৬)

যতই মম মম কর, আমি আমি কর—আমি কিন্তু ততই সরে যাচ্ছি...নিজের পুত্রকন্যা স্বামী সব নিবেদন করতে শেখ—নিজের হাতে রাখলেই বিপদ অনিবার্য।... —আসলে তাকে খাওয়াবার ভার আমার—না সেই নইতে হবে ...উদ্বাস্তিনীকে বলেছিলাম, ছেলেদের জন্য তুমি তো কিছু বল না? জবাব দিয়েছিল, তুমিই তো ভাবছ।... —যে ভাবে সাবধান করেছি।...সংযম ধৈর্য সাধনা দরকার ...। নিত্যগোপাল, আমার দেহকে তুমি নাও।...অর্জুনকে কৃষ্ণ বলছেন, নিত্যমপি বা গোপ্য...অর্থাৎ এ শরীর আমার নয়, এ দেহ গোবিন্দের এমন করে যারা ভাবতে পারল, যারা নিজেদের শরীরকে পর্যন্ত আমার (কৃষ্ণের) বলে সেবা করে, তাদের চেয়ে নিগূঢ় প্রেমভাজন আমার অপর কেহ নাই। যারা নিজের শরীরকে ভগবান শরীর বলে সেবা যত্ন করে, সুস্থ রাখে...তারা সার্থক শিল্প।...আজকের আশ্রমে তো সেদিনের তুলনায় রাজভোগ হচ্ছে—আমার ছেলেরা কী দারিদ্র্যের মধ্যেই কাটিয়েছে...ভগবান শ্রীনিত্যগোপাল রক্ষা করে এসেছেন। যারা এখানে আসবে তারা সবাই তাদের সব স্বামিজীর বলে মনে করবে—মেয়েকে পরকীয় করে রেখো...যে বস্তু যার যত প্রিয় তা ভগবানকে দিতে হয়...। ইসমাইলের বাপের উপর খোদাতালার আদেশ সবচেয়ে প্রিয় বস্তু আমাকে দিতে হবে—বাপ ইসমাইলকে বলি দিল...এ ত্যাগ দেখে, এ মমত্বহীনতা দেখে খোদাতালা ইসমাইলকে বাঁচিয়ে দিলেন। বাঁচবার পথ নিজেকে গোবিন্দে দেওয়া—যা কিছু তুমি তোমার হেফাজতে রাখবে, তাতেই শনির দৃষ্টি পড়বে—অদৃষ্ট এক দিনে যাবে...যদি রক্ত বলি দিতে পার, যদি নিজেকে তাঁকে দিতে পার। আমার সব বিশ্বনাথের, আমার দেহমনপ্রাণ সব বিশ্বনাথের, সকলের সাথে মিলে মিশে চলব—এ রকম করে ভাবতে পারলেই শুধু আশ্রমে শান্তি আসবে।...

২০, ১১, ৪৬—ওঁ নমঃ॥ নরনারায়ণ আশ্রম প্রচলিত সমস্ত চিন্তাপ্রণালীর সঙ্গে একটা যুদ্ধং দেহি ভাব নিয়ে এগিয়ে চলেছে...প্রচলিত সংসারকেও সে গ্রহণ করে নি, প্রচলিত সন্ন্যাসকেও সে একমাত্র সত্য বলে জানে না...। সমস্ত প্রচলিত সংস্কারকে পরিপাকে করে সে এগিয়ে যাবে। দৈব কপাল অদৃষ্ট সবই সত্য—এগুলি মানুষ নিজে সৃষ্টি করে। পূর্বজন্মের যে কর্ম সেটাই আজ দৈব—কাজ করার কালে বুঝি নি যে আমি আমার অদৃষ্ট সৃষ্টি করছি—যখন কাজ করেছিলাম তখন ভালই লেগেছিল—কিন্তু সে অদৃষ্ট যখন আমার থেকে বড় হয়ে উঠল তখন দেখি আর সে ভাল নয়। তখন মাথা চাপড়াই আর অদৃষ্টকে দোষ দেই।...কপালের থেকে গোপাল বড়। নরনারায়ণ আশ্রম মানুষকে এই পথ দেখাবে কি করে দৈবকে পরিপাক করা যায়, কি করে কপাল গোপাল হয়। ভগবান সৃষ্টির দিনই মানুষকে একটা স্বাধীন আত্মা দিয়ে দিয়েছেন...এই গৌরব নিয়ে মানুষ মূল আত্মার সঙ্গে যুক্ত থেকে

করল—সেইখানে মানুষের স্বার্থত্যাগ। যদি বুদ্ধ ঘোষণা না করে সেই ধর্ম আমিত্বকেই সর্বতোভাবে নিজের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলত তাহলেই তার এ গৌরব সত্যিকারের বিরাট গৌরব হত। কৃপা ও কর্ম এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করার চেষ্টার মধ্য দিয়েই শুধু তা সম্ভব হতে পারে ...গুরু মানবে না, ঈশ্বর মানবে না, কিন্তু এই সব না মানার চোট কি সামলাতে পারবে? শিষ্য নিজ পুরীর জন্য লোভী হয়—কিন্তু সেটা যখন মাত্রা ছাড়ায়?... গুরু নিশুম্ভ বাধা দিয়ে প্রকৃতিকে জয় করতে চেয়েছিল—এটা অসত্য যুগের কথা। সত্য যুগের কথা হচ্ছে প্রকৃতির সামনে কৃপার সামনে নত মস্তকে বিনীত হওয়া—যতটা মানতে পারলে ততটাই অদৃষ্টকে খণ্ডালে...। আসক্তি বিদ্বেষের স্তরের যে ব্যক্তি-মনের ½ ভাগই জানলা, জান মাত্র ½ ভাগ—তাকে নিয়ে বেশী বড়াই চলে না...। তোমার থেকে তোমার গুরু তোমার মন বেশী জানেন...কর্মকে সেবায় পরিণত করবার কৌশল গুরু দেবেন...বিশ্বের সঙ্গে কর্ম মেলালে অদৃষ্ট কাটে ...ভগবানে শরণাগতি কথাটা অস্পষ্ট—বিশ্বের, মধ্যে অহংটাকে বিলিয়ে দিতে হবে ...ধ্যান না করলে কৃপার সঙ্গে মিলবে এই ধ্যান না করলে অদৃষ্ট ছেড়ে না...। কৃপাকে নিতে হয় ...এখানে আসবার জন্য কোন্ ঘটনা খুঁজে দেখো—সে ঘটনা দুর্যোগ হলেও পরম সুযোগ। কল্পনা তোমার কোন পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে। তাই ত্রিকিউটী হয়েই নিত্যগোপালের আশ্রমে এসেছে...। মানুষ প্রত্যেক মুহূর্তে কৃপাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিচ্ছে। ...শেষে আঘাত পূর্ব জন্মের কর্ম এসে আবার কাণে ধরে চালাবে...। অদৃষ্ট সৃষ্ট হয় বিশ্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে...। সঙ্ঘের মধ্যে নিজের কর্মকে ছড়িয়ে মনে কর আমরা দশজনে মিলে একজন। ভগবানের স্থলে সঙ্ঘকে মানতে বলি আমি—কেননা ভগবান যা না অস্পষ্ট—সঙ্ঘ যা পরিষ্কার না মেনে কেবল নিজ মনে থাকলে কেউ ভেংচি কেটে, কেউ দাঁত খিচোবে...। যে স্ত্রী স্বামীকে পরিবার থেকে পৃথক করে নিল, বা যে স্বামী স্ত্রী নিয়ে পরিবার ত্যাগ করল তারা যদি এ কাজ বৃহত্তর ব্যাপকতর জীবনের জন্য না করে শুধু নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থকেই মেটায়, তাহলে সুখ তারা পাবে না। সঙ্ঘ প্রত্যক্ষ—ব্রহ্ম অপ্রত্যক্ষ...সঙ্ঘ বা পরিবারের সবলের সেবা করব এ মনোভাব যদি আসে অমনি অহংকার বাড়ে ...উল্টো মোড় দিয়ে অদৃষ্টের প্যাঁচ খুলতে হবে—উল্টো প্যাঁচ হচ্ছে সঙ্ঘের মধ্যে বিলীন হওয়া...। বরিশালে কংগ্রেসের কাজ করেছি—কংগ্রেস ছেড়ে আমি জন্ম নেই নাই—ভূটান সুরেশ গুপ্ত, দুর্গামোহন সেন, স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ—আবার ছাড়তে হল স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ—দাঁড়ালাম সত্যব্রত ও শ্রীপুজ্যবর্গ নিয়ে নরনারায়ণ আশ্রম করে—এর পর বেণু-প্রতিষ্ঠা এল, সত্যব্রত নাই—আমি কাজ করে চলেছি। আমার সঙ্গে থেকে এরা সার্থক হোক—কিন্তু এখন যদি এরা অভিমান করে আমরা না হলে পুরুষোত্তমানন্দ দাঁড়াবেন কি করে—তাহলেও ঠাকুর আমার জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছেন—কিন্তু এদের যেন সে অদৃষ্ট না হয়...। গোপালের চরণে শরণাগত হও কপাল কেটে যাবে।... পাকিস্তানের আত্মস্থিতি নাই, তাই বাইরে কোথাও তার সত্যিকারের স্থান নাই...। আত্মস্থিতি খোঁজ, যখন যেখানে প্রভু রাখিবে আমারে তার মধ্যে মঙ্গল খোঁজ... বিচ্ছিন্ন আমি তাল জিনিষ নয়—বিপদে পড়বে... নিত্য-গোপালের শরণাগত হও, আশ্রমের শরণাগত হও—মনের পিছনে যেয়ো না—মন তাল জিনিষ নয়—মন-নৌকাকে বাতাসে ঠেলে নিয়ে যাবে—বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি—গুরুকে কর্ণধার কর—নিজের মনের ভাবনা গুরুকে বলবার সরলতা রাখ—সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু—একত্রিত হতে পারলেই বাঁচবার পথ খুঁজে পাবে...বিচ্ছিন্ন হলে অদৃষ্টের হাতে মার খেতেই হবে—নিত্যগোপাল ও তাঁর চরণাশ্রিত দীন সেবক পুরুষোত্তমানন্দ প্রাণপণে তোমাদের অদৃষ্ট কাটাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু তোমাদেরও তো সাধনা করতে হবে...।

২৪, ১১, ৫৬। ও··ও। [উদ্বোধন হইতে একটা স্থান পাঠ হয়]...আমি বহুদিন এইভাবের কথা বলিয়াছি। নিত্যগোপাল জেগে থাকবার জন্যই এসেছিলেন—জগ-তারার মত জেগে থাকতেই তিনি এসেছেন...তোমার আমার জীবনে অবতার আসেন।...তিনি জেগে আছেন, কিন্তু তাঁর জেগে থাকা বুঝতে হলে আমার অহংকারকে

ঘুম পাকাতে হবে···তোমার 'আমি' থাকতে নিত্যগোপালের জন্ম হয় না।···প্রাণ প্রাণ করে আমি প্রাণ দিলাম—তোমরা প্রাণকে আগ্রহ করলে না।...নিজের কাণকে বিশ্বাস করো না, নিজের চোখকে বিশ্বাস করো না...। নিজের বুদ্ধির মত করে আমরা তুমি দেখি যে দেখা-শোনার ব্যাপকতা থাকে না।···প্রাণধর্ম সব সময় বোধ জেগে না···প্রাণধর্মের প্রথম কথা বিশ্বাস করা··· প্রাণধর্মের প্রথম কথা বিশ্বাস করা···নিজের শোনা কথাও বিশ্বাস করো না—ভুল শোনা ও ভুল দেখার এ বিশ্ব ভরা···। সত্যি নিত্যগোপাল আছেন...। এখানে যখন এসেছিলাম মরুভূমির মধ্যে এসেছিলাম— জল নাই···তপস্যা করে জল আনব এই ছিল কথা—কে জল দিয়ে গেল ? কোথায় ছিলেন খগেনবাবু সুধীনবাবু (শ্রীখগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীসুধীন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী)?···এ বিশ্বে প্রাণই মরে গেছে···নরনারায়ণ আশ্রম প্রাণ ছাড়া বাঁচবে কি করে ? ···টিউবওয়েল হয়েছে, সোমাতা এসেছেন···। মাতৃগর্ভে প্রাণ থাকে রূপরূপে···। পুরুষোত্তমানন্দ টাকা হাতে নিয়ে রওনা হয়নি—প্রাণ নিয়ে শরণাগতির দ্বারা ১৯১৯ থেকে এ পর্যন্ত এসেছি।·· তিনি জাগতে এসেছিলেন— আমরা আমাদের মনোবুদ্ধিদ্বারা আমাদের কর্মদ্বারা বলছি, তুমি এসো না, তুমি জেগোনো—আমিই করব···। বর্তমান যুগে নিজের মন ও বুদ্ধির উপর যারা আস্থা না হারাবে, যারা মনে করবে খুব বুদ্ধি, তাদের পথ কোথায় ? মনবুদ্ধিই তো মানুষকে ডুবিয়েছে··। নরনারায়ণ আশ্রম অনেক সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে—নিত্যগোপাল সোনার মানুষ···ঐ তাঁর আস্তানা স্মরণ রেখো··। তিনি সব পারেন—কিন্তু করবেন কার জন্যে ?···তুমি কি তোমার আমি তাঁকে দিয়েছ ? স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে পথে নেমেছি তিনি তো ভাসিয়ে দেননি···ঠাকুর, তোমাকে যেন আমি বিশ্বাস করি···গুরুভাইদের তোমার প্রতি অবিশ্বাস এসেছিল। ঠাকুর, আমার তো তোমার উপর অবিশ্বাস আসবে না ? একথা ঠাকুরকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম তিনি বলেছিলেন, না, তোমার আসবে না।···ব্রাহ্ম বন্ধুর সঙ্গে কৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল···আমি কৃষ্ণকে তখন পর্যন্ত বুঝতাম না—কিন্তু আমি তো তাঁর সম্বন্ধে রায় দিয়ে দেই নি—এই শ্রদ্ধা ও বিনয়টুকু না থাকলে জগতে কোন বস্তু কিনিষ সম্বন্ধেই জানতে পারা যায় না।...কিছুই যারা বোঝে না অথচ শুধু তাদের বিচার চালাতে চায়—তাদের নিয়ে আমি বিপন্ন···ঠাকুর আমার রক্ষা করেছেন। ঠাকুর, আমার বিশ্বাসটুকু রেখো···। এই পন্থা ধরলে মানুষ ঠকতে পারে কিন্তু কিন্তু বিশ্ব তো শুধু মানুষ নিয়ে নয়—বিশ্বনাথও তো আছেন।·· কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে পারবে না—নরনারায়ণ আশ্রমের দেবতা এখানে জেগে আছেন—তোমরা যদি শরণাগত হতে, তোমরা যদি বুদ্ধি গোবিন্দকে দিতে পারতে···তাহলে দেখতে নিত্যগোপাল কি বস্তু।···· তোমার বুদ্ধি নিয়ে চললে গোবিন্দ দূরে, অতি দূরে। প্রজ্ঞাবাদ সংসার থেকে পালিয়ে গেছে, চালাকী ধরা পড়ে গেছে। একমাত্র শরণাগতই আজ বাঁচবে—উদ্ধত তার্কিক দল, বিনীত হও বিশ্বেরাত্মা হও, বচনে স্থিত হও— গীতার শেষ কথা করিষ্যে বচনং তব বলবার মত বীর্য লাভ কর—বলতে শেখ তোমার বিচারে চলব, আমার বিচার চালাব না···। শয়তান মন বুদ্ধির কথা শুনো না··· পাঁচ বৎসর আগেও যে নোংরামির নক্সর ফেলে ছিল, আজও সেইখানেই নোঙ্গর ফেলে আছে—এক পাও এগোয়নি।···তিনি এসেছেন বাড়ীতে, আজ তো বাড়ী গোছাতে হবে···। আমার কুল-দেবতা, গৃহ-দেবতা নিত্যগোপালকে রাখতে গেলে শিখতে হবে—কেমন করে ঘর গুছালে, কেমন করে সম্পর্ক রাখলে নিত্যগোপালকে রাখতে পারি—এ কথা ভাবতে হবে, শিখতে হবে। সূত্রধার কথা শুরু করে বলছি···। কথা আমি এখানে বন্ধ করতে পারলাম না···। চারদিন সকালে সন্ধ্যায় কিছু বলিনি তোমরা কথা শোননা বলে। বাঁশুর না টানলে সুর বেরোয় না—তোমরা কথা না শুনলে কথা বলব না।

ক্রমশঃ

শাকসব্জীর বাগান করিবার পূর্বে কতকগুলি বিবেচ্য বিষয়

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মিত্র

(১) শাক-সব্জী চাষের উপযুক্ত বাড়ীর সংলগ্ন কত পরিমাণ জমি আছে এবং সেই জমির মাটি প্রধানতঃ কি কি শাক সব্জীর পক্ষে উপযুক্ত।

(২) প্রত্যেক পরিবার কি কি শাকসব্জী খাইতে পছন্দ করেন

(৩) পছন্দমত প্রত্যেক শাকসব্জী প্রত্যেক ঋতুতে মোটামুটি কত পরিমাণ জমিতে উৎপাদন করিলে উহা প্রয়োজন মত প্রায় প্রত্যেকদিনই পাওয়া যাইবে।

(৪) প্রত্যেক শাকসব্জীর প্রকৃতি অনুযায়ী কোন অংশে কখন কি শাকসব্জী উৎপাদন করিলে জমির কোন অংশ অযথা খালি পড়িয়া থাকিবে না।

(৫) কোন কোন সব্জী (আলু, রাঙ্গালু, পিঁয়াজ প্রভৃতি যাহাদের বহুদিন রাখা যায় এই সকল ছাড়া) এক সঙ্গে বেশী পরিমাণ জমিতে বুনিলে উহা একসঙ্গে ফল দিবে এবং পরিবারের প্রয়োজন অপেক্ষা অতিরিক্ত হইয়া পড়িবে এবং নষ্ট হইয়া যাইবে, সুতরাং উহা প্রয়োজন মত কিছুদিন পর পর বুনিতে হইবে

শাক-সব্জীর বাগানের জন্য উপযুক্ত স্থান বাছ ও তত্ত্বাবধান—

(ক) শাকসব্জীর চাষের জন্য বাতাস ও রৌদ্রের বিশেষ প্রয়োজন; সুতরাং শাক-সব্জীর বাগান বেশ খোলা জায়গায় হওয়া দরকার, উহার উপর কোন বড় গাছের বা অন্য কোন বস্তুর ছায়া না পড়ে, শাক-সব্জীর জমি খুব উঁচু হওয়া দরকার, যেন উহার উপর জল না দাঁড়ায়।

(খ) শাক-সব্জীর পক্ষে দোআঁশ মাটিই উপযুক্ত; মাটি খুব গভীর ভাবে কর্ষণ করিয়া বা কোদাল দ্বারা কোপাইয়া ওলা করিয়া লইতে হইবে। উহাতে ইট, পাটকেল, জঙ্গল, পোকা, মাকড় যেন না থাকে।

(গ) শাক-সব্জীর জন্য সারের খুবই প্রয়োজন; এই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে সব্জী ক্ষেতের কোন অংশই কোন সময়ে খালি পড়িয়া থাকিবে না একটি ফসলের পরই আর একটি ফসল লাগাইতে হইবে; কাজেই প্রচুর সার প্রয়োগ করিয়া সব্জী ক্ষেতের উর্বরতা শক্তি বজায় রাখিতে হইবে। সুতরাং শাক-সব্জীর চাষ করিতে হইলে সারের ব্যবস্থা করিতে হইবে, এই সম্পর্কে উত্তমরূপে সংরক্ষিত গোবর ও গোচনা সার, সবুজ সার ও কম্পোষ্ট সার বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিশিষ্টে এই সকল সার প্রস্তুতের কথা বলা হইয়াছে।

(ঘ) শাক-সব্জীর জন্য জল সেচনের বিশেষ দরকার। কাজেই কোন জলাশয়ের নিকটে শাক-সব্জীর বাগান হইলে জল সেচনের বিশেষ সুবিধা হইবে।

(ঙ) শাক-সব্জীর ক্ষেত সকল সময়েই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। মাঝে মাঝে নিড়ানীর দ্বারা জমি আলগা করিয়া দিতে হইবে, উহাতে জমির রসও রক্ষা পাইবে।

(চ) শাক-সব্জীর ক্ষেতে পোকা দেখিলেই উহা মারিয়া ফেলিতে হইবে। গাছের রোগাক্রান্ত পাতা বা ডাল কাটিয়া পোড়াইয়া বা অন্যভাবে নষ্ট করিয়া ফেলা দরকার। সব্জী ক্ষেতের আশে পাশে জঙ্গল, বাবিশ ইত্যাদি থাকিলে উহারা পোকার বা রোগের আশ্রয়স্থল হয়। সুতরাং যতটা সম্ভব সব্জীক্ষেতের আশে পাশের জমি পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

(ছ) জমির আকার অনুযায়ী সব্জীবাগান ছোট ছোট সমান খণ্ডে ভাগ করিয়া লইলে অনেক সুবিধা হইবে। প্রত্যেক খণ্ডে যাতায়াত করিবার জন্য মাঝে মাঝে রাস্তা থাকা দরকার।

(জ) প্রতি বৎসর একই সব্জী একই জমিতে যখন

করা উচিত নয়। উহাতে জমির উর্ব্বরতা শক্তি কমিয়া যায়।

(ক) জানাশোনা এবং বিশ্বস্ত বীজ-বিক্রেতার নিকট হইতেই বীজ ক্রয় করা উচিত। প্রায় প্রত্যেক সব্জীরই জমির, মাঝামাঝি বা নাবী জাতীয় বীজ ক্রয় করা আবশ্যক। এই বিষয়ে বীজ-বিক্রেতার পরামর্শ লওয়া ভাল।

(খ) সব্জীর চারা প্রস্তুত, চারা নাড়িয়া রোপণ, চারা রক্ষা প্রভৃতি অতি যত্ন সহকারে করিতে হইবে।

(ঘ) তরিতরকারির বাগানটি সুন্দররূপে রচনা করা উচিত। উহা যেন বাড়ীর শোভা বর্দ্ধন করে। বাগানের চারি ধারে বেড়া থাকা আবশ্যক।

(ঙ) সব্জীবাগানের অধিকাংশ কাজ নিজেরেরই করা উচিত। বাড়ীর মহিলারা ও ছেলেমেয়েরা ইহাতে অনায়াসে সাহায্য করিতে পারেন।

বীজ-সংগ্রহ

(১) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জানা-শোনা ও বিশ্বস্ত বীজ বিক্রেতার নিকট হইতেই বীজ ক্রয় করা উচিত।

(২) বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে বীজের প্যাকেট খোলা উচিত নহে, কেননা তিজা জলবায়ু লাগিলে বীজের জীবনীশক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

(৩) একসঙ্গে বীজ না কিনিয়া পরপর ফসলের জন্য যখন যে পরিমাণ বীজ বপনের প্রয়োজন হইবে, অবশ্যই সেই পরিমাণ বীজ কেনাই ভাল, কারণ বাড়ীতে বীজ ফেলিয়া রাখিলে উহা নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে।

বীজ-ক্ষেত্র বা হাপোর প্রস্তুত

(১) বীজ-ক্ষেত্র বা হাপোর উঁচু হওয়া উচিত, যেন উহার উপর জল দাঁড়াইতে না পারে। বীজ ক্ষেত্রের উপরি ভাগের মাটি ১ হইতে ১½ ফুট গভীর করিয়া খোঁড়া উচিত এবং উহার মাটি যেন খুব গুঁড়া করিয়া প্রস্তুত করা হয়—এই মাটির সহিত যেন ঘাস, জঙ্গল, গাছের শিকড়, কাঠকুটা, পোকা মাকড় বা তাহাদের ডিম মিশিয়া না থাকে।

বীজ-ক্ষেত্রের তিনটি স্তর হইলে ভাল হয়। প্রথম স্তর (২ ইঞ্চি গভীর) ভাঙ্গা ইট বা খোয়া; দ্বিতীয় স্তর (৩ ইঞ্চি গভীর) ২ ভাগ এঁটেল মাটি এবং ২ ভাগ বালি; তৃতীয় অর্থাৎ উপরের স্তর (৩ ইঞ্চি গভীর) ৩ ভাগ এঁটেল মাটি, তিনভাগ পচা পাতা সার এবং ৩ ভাগ পচা গোবর।

(২) বীজ ক্ষেত্রটি লম্বা ১০ ফিট এবং চওড়া ৩ ফিট হইলে ভাল হয়। কেন না তাহা হইলে বীজক্ষেত্রের একধারে বসিয়া নিড়ান প্রভৃতি কাজের সুবিধা হয়।

(৩) সাধারণতঃ ১০ ফিট × ৩ ফিট বীজক্ষেত্রের জন্য ২½ তোলা বীজই মোটামুটি যথেষ্ট, এবং এই পরিমাণ বীজ হইতে যে চারা উৎপন্ন হইবে তাহার দ্বারা এক বিঘা জমি রোপণ করা চলিবে।

বীজক্ষেত্রে বা হাপোরে বীজবপন

(১) একধারে সমস্ত বীজ না বুনিয়া প্রয়োজন মত দফায় দফায় বীজ বোনা ভাল।

(২) শক্ত আবরণ-বিশিষ্ট বীজ হইলে বুনিবার পূর্ব্বে কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখা উচিত।

(৩) খুব ছোট ছোট বীজ বুনিবার সময় বালি কিংবা ঝুরা মাটির সহিত উহা মিশাইয়া বুনিলে ভাল হয় কেন না তাহাতে ঠিকমত সমানভাবে সকল স্থানে মাটিতে বীজ ছড়াইয়া পড়িবে।

(৪) রৌদ্রের দিনে বীজ বুনিতে হইলে বীজ বোনার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে বীজ-ক্ষেত্রে জল ছিটাইয়া বীজ-ক্ষেত্রটি ভিজাইয়া দিতে হইবে; আবার যদি বীজক্ষেত্রের উপরের মাটি খুব ভিজা থাকে তাহার সহিত শুকনা গুঁড়ামাটি মিশাইয়া লইতে হইবে।

(৫) পাতলা করিয়া বীজ বপন করা উচিত, কেন না ঘন করিয়া বুনিলে চারাগাছ দুর্ব্বল হয়।

(৬) সন্ধ্যার কিছু আগে বীজ বোনাই উচিত।

(৭) বীজক্ষেত্রের উপর বীজ ছিটাইয়া উহার উপর পাতলা করিয়া মিহি মাটি ছিটাইয়া আস্তে আস্তে হাত দিয়া চাপিয়া দিতে হয়।

(৮) রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে বীজ ক্ষেত্র রক্ষা করিবার

অন্ত উহা চাটাই বা অন্ত কোন আবরণ দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়।

(৯) বীজ-ক্ষেত্র ভিজা রাখিবার জন্ত অল্প পরিমাণ জল ছিটাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

(১০) বীজক্ষেত্রের চারিদিকে কাঠের ছাই সামান্ত কেরোসিন তৈল মাখাইয়া ছড়াইয়া রাখিলে পোকা মাকড় দূরে থাকে এবং গুটা বেড়ীর মইল ছিটাইয়া দিলে শিঁপড়ার দ্বারা বীজ সরাইয়া নেওয়া বন্ধ হয়।

চারা গাছের যত্ন

(১) বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হইলে রাত্রে যদি বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকে সন্ধ্যার সময় বীজ ক্ষেত্রের ঢাকনা খুলিয়া রাখা উচিত এবং পরের দিন সকাল ৮।৯ টার সময় আবার বীজ ক্ষেত্রের উপর ঢাকনা দেওয়া দরকার।

(২) চারাগাছের বৃদ্ধির পক্ষে রৌদ্র ও বাতাস বিশেষ প্রয়োজন। ইহা না পাইলে গাছগুলি সতেজ হইতে পারিবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রখর উত্তাপ ও বৃষ্টি হইতে উহাদের রক্ষা করার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

(৩) খুব সাবধানতার সহিত চারাগাছগুলিতে জল-সেচন করিতে হইবে যাহাতে সেগুলি নষ্ট হইয়া না যায়। অল্প অল্প বৃষ্টি চারাগাছের বাড়িবার পক্ষে ভালপর। জমির আর্দ্রতার উপরই জল সেচন নির্ভর করে। প্রত্যেক-দিন অল্প করিয়া ২।৩ দিন অন্তর বীজক্ষেত্রকে বেশ করিয়া ভিজাইয়া দিলেই ভাল হয়। জল সেচনের পক্ষে সকাল ও বিকাল বেলাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়। মনে রাখিতে হইবে অতিরিক্ত জলসেচন চারাগাছের পক্ষে খুবই অনিষ্টকর।

চারাগাছকে একস্থান হইতে তুলিয়া অন্যস্থানে রোপণ করা—

(১) চারাগাছগুলি যখন ১॥ ইঞ্চি লম্বা হইবে তখন সেগুলিকে অপর আর একটি বীজক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করিয়া ১ ইঞ্চি অন্তর পুঁতিলে উপকার হইবে। দ্বিতীয় বীজক্ষেত্রটি বর্ষার পূর্ব্বেই প্রস্তুত করিতে হইবে। চারা পুঁতিবার পূর্ব্বে বীজক্ষেত্রটি ভিজাইয়া লওয়া উচিত। বীজক্ষেত্র হইতে চারাগাছগুলিকে যেন কখনই টানিয়া না তোলা হয়—সকল সময়েই এমন ভাবে তুলিতে হইবে যাহাতে শিকড়ের সঙ্গে খানিকটা মাটি উহাতে লাগিয়া থাকে।

(২) চারাগাছগুলিকে স্থানান্তরিত করিবার পক্ষে বিকাল বেলাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়।

(৩) নূতন স্থানান্তরিত চারাগাছগুলিকে সূর্য্যের তাপ ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

(৪) সপ্তাহে দুইবার কি তিনবার জলসেচন করা প্রয়োজন এবং ইহা অতি প্রত্যুষে ও সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে করাই উচিত।

(৫) দশ হইতে চৌদ্দদিনের মধ্যে চারাগাছগুলিকে অপর আর একটি বীজক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করিলে ভাল হয় এবং স্থানান্তরিত করিবার সময় উপরি-উক্ত যত্ন ও সতর্কতা লইতে হইবে। এই সময় উহাদিগকে এক ইঞ্চির বেশী তফাৎ পুঁতিতে হইবে, যাহাতে গাছগুলি বাড়িবার জন্ত উপযুক্ত স্থান পায়। ফুল-কপির চারাগুলিকে এইভাবে দুইবার স্থানান্তরিত করিলে উপকার হইবে। উত্তম ও সারযুক্ত জমির পক্ষে ইহা অত্যন্ত দরকারী।

(৬) পূর্ব্বের ন্যায় জলসেচন করিতে হইবে, তবে এই সময়ে চারাগাছগুলির পক্ষে আরও বেশী সূর্য্যালোক ও বাতাসের প্রয়োজন।

(৭) চারাগাছগুলি যখন ৪" হইতে ৬" দীর্ঘ হইবে তখন যে জমিতে গাছাকারে বসাইবে সেই জমিতে নাড়িয়া পুঁতিতে হইবে। স্থানান্তরিত করিবার সময় পূর্ব্বোক্ত যত্ন লইতে হইবে। চারাগাছের শিকড় ও খানিকটা কাণ্ড প্রবেশ করিতে পারে এইরূপ গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া সোজা লাইনে চারাগাছগুলিকে পোঁতা দরকার এবং তাহাদের পরস্পরের দূরত্ব এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে সহজেই জল সেচনের জন্ত দুই লাইন গাছের মধ্যে নালা তৈয়ারী করিতে পারা যায় এবং গাছ বাড়িবার পক্ষে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়। ওলকপি, ভালাকু, ঘটক-ভাঁটি, বীট ছাড়া আর সকল প্রকার শাক-সব্জীর চারাগাছ সাধারণতঃ ২ হইতে ২॥ ফিট অন্তর পুঁতিলেই চলে।

(৮) স্থানান্তরিত করিবার পর শিকড়গুলিকে মাটির মধ্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিবার জন্য জলসেচের প্রয়োজন এবং জমির অবস্থার উপরই পরবর্তী জলসেচন নির্ভর করে।

(৯) চারাগাছগুলিকে সূর্যের তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রায় এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত উহার উপর কলা-পাতা বা অন্য কোন পাতা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়।

(১০) সর্বদাই দুর্বল চারাগাছ সরাইয়া সেইস্থানে সবল চারাগাছ পোঁতা দরকার।

উপরে যাহা বলা হইল উহা প্রধানতঃ বিলাতী শাক সব্জীর উৎপাদনের বেলায় প্রযোজ্য। অনেক ক্ষেত্রে চারা গাছগুলিকে দুইবার স্থানান্তরিত করা হয় না।

'মানুষের জন্য ধর্ম এবং ধর্মের জন্য মানুষ—দুই-ই সত্য হইতে পারিত যদি ধর্ম বলিতে বিশেষ কোন ধর্ম না বুঝাইয়া সর্বধর্মসমন্বয়ই বুঝাইত। সর্বধর্মসমন্বয়ই মানুষের স্বধর্ম। প্রতি মানুষ এই হিসাবে স্বধর্মী, সর্বধর্মী। .....ইহাও সত্য যে প্রত্যেকটি ধর্মই স্বয়ংপূর্ণ, উহা ঐ সম্প্রদায়ের সকল স্তরেরই আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও তুল্যভাবেই সত্য যে, কোনও বিশেষ দেশ-কাল-পাত্র বা বিশেষ দৃষ্টিকোণের মধ্যে সমগ্র মানবসমাজকে, এমন কি কোনও বিশ্বরূপ ব্যষ্টি মানুষকেও আটকাইয়া রাখা যাইবে না। সব বিশেষত্বকে ছাপাইয়া অখণ্ড বিশ্বরূপ ব্যষ্টি মানব ও মানবসমাজ আগাইয়াই চলিয়াছে, চলিবেও।'

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-কৃত মহাত্মাজীর গঠনকর্ম পদ্ধতি

সবই ভুল ?

।। শ্রীমান ।।

এ কি ! অমল যে ! তুমি এলে কোত্থেকে ?

—কোথাও থেকে নিশ্চয়ই, স্বর্গ থেকে নয় কাছে পিঠে থেকেই এসেছি

—উঃ, অনেকদিন তোমার সাথে দেখা নেই সেই ১৯৪২ সনে তোমার সাথে শেষ দেখা তারপর আট বছর চলে গেল, তোমার কোন খবরই নেই কি ব্যাপার বল ত ?

প্রফেসার দত্ত, মানে শ্রীঅশোকরঞ্জন দত্ত, একটি মফঃস্বল সরকারী কলেজের অধ্যাপক প্রফেসার দত্ত বন্ধুর, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। অকৃতদার কিংবা বিপত্নীক কিংবা পত্নীপরিত্যক্ত তা জানা যায় নি। বিপত্নীক হলেও বহু বছর পূর্বে, অর্থাৎ বোধ হয় বিবাহের পরেই পত্নী বিয়োগ ঘটেছে পত্নী পরিত্যক্ত হলেও, ঐ মর্মান্তিক ঘটনা হয়ত প্রায় ঐ সময়েই ঘটে থাকবে। আর অকৃতদার হলে ত কথাই নেই পূর্বের দু'টি সম্ভাবনার কথা বলা হল, তার কারণ, তাঁর চাকুরী-জীবনের প্রথম হতেই যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁরা প্রফেসার দত্তের জীবনে স্ত্রী-সম্পর্কিত কোন ঘটনাই দেখতে পান নি। অতএব অনেকের মতে তিনি অকৃতদার কেন তিনি অকৃতদার অনেকেই তাঁকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু দত্ত হেসেছেন, কোনও জবাব দেন নি। কলেজের মেয়েরা-ছেলেরা নানাভাবে জিজ্ঞেসবাদ করেছে, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি নির্বাক। সবাইকে বুঝতে দিয়েছেন তিনি অকৃতদার। অনেকের সন্দেহ যায় নি। কিন্তু সন্দেহ নিরসনের উপায়ও ছিল না প্রফেসার দত্তের তিন ভাই ও তিন বোন রয়েছে। ভাইবোনদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ভাইয়েরা কলকাতায় থাকেন, বোনেরা কলকাতার বাইরে। ভাইয়েরা মাসে এক রবিবারে আসেন, কিছুক্ষণ দাদার সাথে বসে গল্প করেন, খান দান, তারপর সন্ধ্যের আগেই চলে যান, অতএব তাঁদের কাছ থেকেও খবর সংগ্রহ করা সুবিধে মাসের অন্য তিন রবিবার প্রফেসার দত্তের খোঁজ থাকে না। তিনি শনিবার বিকেলের আগেই কলকাতার গাড়ী ধরেন। প্রফেসার দত্ত এক এক শনিবার এক এক ভাইয়ের বাড়ী যান। আর সব ভাই, তাঁদের স্ত্রীরা, ছেলেমেয়েরা সেই বাড়ীতে এসে মিলিত হন ভাইয়েরাও দাদার প্রতি খুব অনুরক্ত। কিন্তু ভাইয়ের স্ত্রীরা দাদুরকে দেখতে পারেন না। তাঁদের সন্দেহাকুল মন। ভাবেন তাঁদের দাদুরের জীবনে নিশ্চয়ই কোন ব্যাপার আছে। তাঁরা তাঁদের স্বামীদের জিজ্ঞেস করে কোন সদুত্তর পান নি। ভাইয়েরা তাঁদের প্রশ্নের দাদার সম্বন্ধে নির্বাক। তাতে বউদের সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। দাদুরের চরিত্রগতি সম্বন্ধে তাঁদের আর সন্দেহের অবকাশ নেই। নিঃসন্দেহে তাঁরা ভেবে নিয়েছে যে তাঁদের দাদুরের চরিত্রের ধোঁয়ুনি নেই। তাই তাঁরা তাদের ছেলেমেয়েদের দাদুরের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখে। কিন্তু সব ছেলেমেয়েগুলিই তাদের মায়েদের শাসন এড়িয়ে অ্যাঠামশায়কে ঘিরে থাকে।

প্রফেসার দত্ত কলেজে পড়াশুনা ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে সময় কাটান। এদিকে গৃহে তাঁর একমাত্র সঙ্গী বল, বন্ধু বল, ভৃত্য রামকান্ত। রামকান্ত তাঁর দাদাবাবুকে খুব ভালবাসে। রামকান্ত যা রান্না করে, তৃপ্তিসহকারে তা দাদাবাবু আহার করেন। রামকান্ত কলেজের ছেলে-মেয়েদের মোটেই পছন্দ করত না। কারণ ছেলেমেয়েরা তার রান্নার প্রশংসা কখনো করতই না, নুন হয়নি, ঝাল হয়নি, মিষ্টি হয়নি বলে সর্বদা অনুযোগ করত। প্রফেসার দত্ত প্রায়ই ছাত্রছাত্রীদের ডেকে খাওয়াতেন। এ ব্যাপারে প্রফেসার দত্ত যত খুশী হতেন, তত অখুশী হত রামকান্ত। কিন্তু কিছু বলতে পারত না, কারণ তাতে প্রফেসার দত্ত

হয়ত অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু সে তাঁরই খুশী ছিল অলকার উপর। অলকা রামকান্তর ভাষা, যত অশ্লীলই হোক না কেন, প্রশংসা করেই যেত। কথায় কথায় বলত রামকান্ত, হাঁ। ঝিঝিমণি বটে অলকাটি; কি খানদানী ঘরের মেয়ে! প্রফেসার দত্ত রামকান্তর মুখে 'খানদানী' শব্দ শুনে অবাক হয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'খানদানী' শব্দের অর্থ কি রে? রামকান্ত হেসে বলেছিল 'আমি কি এতই বোকা? এ কথার অর্থও জানি না'। 'বল না অর্থ কি?' বলে ছিলেন প্রফেসার দত্ত।

রামকান্ত বলেছিল 'খানদানী অর্থ যে খুব ভাল জাত তিনিষ সেটে পারে।'

প্রফেসার দত্ত অবাক হয়ে রামকান্তর দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তাঁর ভুল সংশোধন করবার চেষ্টা করে নি।

এই অলকার সঙ্গে প্রফেসার দত্তের দীর্ঘ আট বৎসর পরে দেখা হয়ে গেল। প্রফেসার দত্ত অলকাকে তার ছাত্রীজীবনে খুব পছন্দ করতেন। সমগ্র ছাত্রী-সমাজে এ-নিয়ে কিছুটা আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল, অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দও এ-নিয়ে আলোচনা করতে ছাড়ে নি, বিশেষ করে অধ্যাপিকা সুনন্দিনী ঘোষ। মিস ঘোষ অলকাকে মোটেই দেখতে পারতেন না, সব সময়ই অলকাকে খাটো করতে চেষ্টা করতেন। অধ্যাপক দত্ত এতে খুব বিস্মিত বোধ করতেন। শিক্ষা জগতে থেকেও এতটা অসুদার হতে পারে কেউ এ যেন তাঁর ধারণার মধ্যেই ছিল না। অলকার প্রতি মিস্ ঘোষের ছিল সার্বিক ঈর্ষা। অলকা ছিল সুন্দরী, স্পষ্টবক্তা, তার ব্যক্তিত্ব ছিল খুব। তাই মিস ঘোষ অলকাকে সহ্য করতে পারতেন না। উচ্চ পদে থেকেও তিনি কখনও তাঁর মনের ভাবকে গোপন করতে পারতেন না। পথে, ঘাটে, ক্লাশে যেখানেই অলকাকে মিস ঘোষ দেখতেন, সেখানেই তিনি তাকে নানা বাঁকা কথায় উত্যক্ত করে তুলতেন। কিন্তু অলকা ছিল অত্যন্ত ভদ্র, চটু কথার উত্তরে সে কখনও চটু কথা বলে নি, তবে যতটুকু বলা দরকার, তা বলা থেকেও সে বিরত থাকে নি। ঐ সামান্য কথাও মিস ঘোষকে আরও জ্বলে উঠতে সাহায্য করেছে। মিস ঘোষ অলকার নামে অধ্যক্ষের কাছে নালিশ করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। অন্যান্য অধ্যাপক অধ্যাপিকারা মিস ঘোষের অভিযোগের কথা শুনে হেসেছেন, অলকা নাকি দাম্ভিক। কিন্তু অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, অধ্যাপিকারা অলকার দাম্ভিকতার পরিচয় কখনও পাননি।

অধ্যাপক দত্ত ছিলেন নীরব শ্রোতা। মিস ঘোষই প্রচার করেছিলেন যে অধ্যাপক দত্ত অলকার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান। অথচ মিস ঘোষ অধ্যাপক দত্তের ছাত্রী-ও, কারণ মিস ঘোষ ছিলেন অধ্যাপক দত্তের মেজ ভাইয়ের ছাত্রী। অধ্যাপক দত্ত এর কি প্রতিবাদ করবেন বুঝতে পারেন নি, 'দুর্বুদ্ধি উড়াও হেসে' এই নীতি অবলম্বন করে তিনি চুপ করে থাকতেন। অলকার প্রতি মিস ঘোষের অত্যাচার আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল একটি ঘটনার পর হতে

একদিন অলকা গিয়েছে অধ্যাপক দত্তের বাড়ী, সাথে তার এক আত্মীয়া। আত্মীয়া এসেছেন অলকাকে দেখতে অলকা তাঁকে নিয়ে এসেছে অশোক দার বাড়ীতে অশোকদার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে। এমন সময় শ্রীমতী ঘোষ এসে হাজির। পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন অধ্যাপক দত্তকে কলেজের প্রয়াগারে যেতে। অধ্যাপক দত্ত অলকার আত্মীয়াকে উপেক্ষা করে শ্রীমতী ঘোষের সাথে যান নি। রুষ্ট হলেন শ্রীমতী ঘোষ। রাগ করে চলে গেলেন একলাই। তারপর শুরু করলেন হুলাহুল ছড়াতে। অধ্যাপক দত্ত তবু কিছু বলেন নি। অলকা মন্তব্য করেছিল, কাপুরুষের কাজ। কিন্তু অধ্যাপক দত্ত হেসে অলকাকে শান্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। অলকা কিন্তু শান্ত হতে চায় নি।

সেই অলকার সাথে আজ অধ্যাপক দত্তের দীর্ঘ আট বৎসর পর দেখা হয়ে গেল। আর দেখা হয়ে গেল কোন বাড়ীতে নয়, কোন রেঁস্তোরায় নয়, কোন সাংস্কৃতিক সম্মেলনে নয়, একেবারে মহাত্মা গান্ধী রোডের উপর। সেদিন শনিবার। অধ্যাপক দত্ত এসেছেন কলকাতায়, যাবেন ছোট ভাইয়ের বাড়ী। উদ্দেশ্য রবিবারটা ছোট ভাইয়ের ওখানে কাটাবেন। বেলা

তিনটা বেজে গিয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী রোডের বৈকালিক ভিড় বাড়তে শুরু করছে। অধ্যাপক দত্ত ধীর পদে শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে বের হয়ে সার্কুলার রোড পার হয়ে মহাত্মা গান্ধী রোডের ফুট পাতে পড়েছেন, এমনি সময় দেখতে পেলেন অলকাকে। একখানা আমেরেসেডার গাড়ীর দরজায় সে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার বেহারা ফল কিনছে।

অধ্যাপক দত্ত এগিয়ে গেলেন, বিস্মিত দৃষ্টিতে অলকার দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করলেন অলকাকে। তারপর এক নিমেষে কেবে নিলেন অতীত জীবনের কথাগুলো। দু'জনের মধ্যে আট বৎসরের দীর্ঘ ব্যবধান। অলকা ছাত্রী। কিন্তু সে ছাত্রী অলকা ত আর নেই। অলকা বিবাহিতা, মাথায় স্পষ্ট জল জল করছে সিঁদুর-চিহ্ন।

অলকা বললে, সত্যি আপনার সাথে বহুদিন দেখা হয়নি। আপনি ঐ আগের আয়গায়ই থাকেন ত এখনও?

—হ্যাঁ, তাই আছি।

—আর প্রতি শনিবারে, আগের মতই থাকেন এক এক ভাইয়ের বাড়ী, তাই না?

—ঠিক তাই অলকা।

—দেখুন দেখি, আপনার কত খবর বলে দিলুম। আর আপনি ত আমার কোন খবর রাখেন নি।

—আমি যে জীবনে কত বেশি স্থিতিশীল তা ত তুমি জানতে, তাই আজকের শনিবারের কলকাতায় আসার মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই জেনেই কথাগুলি বলতে পেরেছ, কিন্তু তাই বলে তুমি আমার কোন খবর করতে একথা জোর করেই বলতে পারা যায় না।

—বেশ, কোন খবর নাই বা রাখলুন, তাই বলে ঝগড়া বাধিয়ে দেবেন না যেন। কেমন আছেন বলুন। রামকান্ত আছে ত?

—আছি ভালই। আর রামকান্তও বহাল তবিয়তে আছে। আমার কথা থাক। তোমার কথা বল। বিয়ে হল, না পেলাম তোমার চিঠি, না পেলাম তোমার বাবা মারেব। থাক্, তা নিয়ে আর অনুযোগ করব না। এখন বল তোমার স্বামীর কথা।

—ওঃ মিষ্টার মিত্রের কথা বলছেন? তিনি এখানেই থাকেন। একটি জার্মান ফার্মে চীফ ইঞ্জিনিয়ার। মিথেটার চোদ্দে, মস্ত বড় বাড়ীতে থাকি। আর কি পরিচয় চান বলুন।

—আরও খবর চাইব নিশ্চয়ই তবে ধীরে ধীরে। একদিন তোমাদের বাড়ী গিয়ে মিঃ মিত্রের সাথে আলাপ পরিচয় করে আসব।

অলকা কৌতুক করে হেসে বলল, যাবেন আমাদের বাড়ীতে? আর বলুন, আমার স্বামী যদি এক গরীব মাষ্টারের সাথে আলাপ না করতে চান?

অধ্যাপক দত্ত বললেন, তা হতে পারে না অলকা, তোমার সংস্পর্শে যিনি এসেছেন, তিনি ওরূপ ব্যবহার করতে পারেন না, তা আমি বিশ্বাসই করতে পারব না।

—আপনার বিশ্বাসকে ধন্যবাদ। আপনি একদিন আসুন আমাদের বাড়ীতে। এই রইল কার্ড। এই বলে অলকা ব্যাগ থেকে একটি কার্ড বের করে অধ্যাপক দত্তের হাতে দিল।

অলকার বেহারার ফল কেনা হয়ে গেয়েছিল। তাই দেখে অধ্যাপক দত্ত বললেন, তোমার দেরী হয়ে যাচ্ছে অলকা, তুমি যাও। আমি নিশ্চয়ই একদিন যাব। কোন করেই যাব।

এই বলে অধ্যাপক দত্ত পথ চলতে শুরু করলেন, তার পরে আবার ঘুরে অলকার কাছে এলেন। অলকা তখন গাড়ীর দরজা ধরে দাঁড়িয়েছিল, আর লক্ষ্য করছিল অধ্যাপক দত্তের যাওয়ার দিকে।

অধ্যাপক দত্তকে ফিরে আসতে দেখে অলকা বলল, ফিরে এলেন যে।

অধ্যাপক দত্ত বললেন, আচ্ছা, অলকা তোমার কয়টি ছেলেমেয়ে বললে না ত?

অলকা অধ্যাপক দত্তের প্রশ্ন শুনে অবাক হল, বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই পুনরায় ঐ প্রশ্ন।

অলকা হেসে বলল, দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে। কেন জিজ্ঞেস করছেন, বলুন ত?

অধ্যাপক দত্ত মাথা চুলকে এদিক ওদিক চেয়ে বলল, তোমাকে একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না ত? মনে করো না ও আমি সেই আট বৎসর আগেকার অধ্যোগদা।

অলকার বিস্ময় বেড়ে চলছিল। সে বলল আমি কিছু মনে করব না, আপনি কি বলতে চান সোজা ভাষায় বলুন।

অধ্যাপক দত্ত বললেন, কথাটা তুমি কি ভাবে নেবে জানিনা। কিন্তু একটি কাজ তোমাকে করতে হবে। তোমার ত তিনটি সন্তান রয়েছে। আমাকে তোমার বড় মেয়েটিকে বরং দাও। একেবারে দিয়ে দিতে বলছি না। এমনি আমার কাছে থাকবে। আমি তাকে লেখাপড়া শেখাব। তারপর বড় হলে তুমি তোমার মেয়েকে ফিরে নিয়ে যেও, আমি আপত্তি করব না। আর বেঁচেই বা থাকব কতদিন বল। তারপর ত তোমাদের মেয়ে তোমাদের কাছেই চলে যাবে।

অলকা চুপ করে রইল।

অধ্যাপক দত্ত বললেন, চুপ করে আছ কেন অলকা? দেবে না তোমার মেয়েকে? আমি মোটামুটি ভাল পড়াই। সে কথা ত তোমার অজানা নেই। তবে কেন তোমার মেয়েকে আমার কাছে দিতে ভাবছ?

অলকা বিস্ফারিত চোখে অধ্যাপক দত্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। অধ্যাপক দত্তকে অলকা পাগল বলেই জানত, সে ইঙ্গিত সে কোনকালে করেওছে। কিন্তু ইতিমধ্যে যে তিনি এত বড় পাগল হয়ে গেছেন, তা অলকার জানা ছিল না।

অলকা নিজেকে সম্বরণ করে ধীরে রাগতভাবে বলল, আপনি যে জিনিস আমার কাছে চাইলেন তা দেবার ক্ষমতা আমার আছে কিনা একবার ভেবে দেখলেন না? আমি মেয়ের মা। মায়েরই কি শুধু অধিকার আছে, বাপের কোন অধিকার নেই? তাঁর কাছে জিজ্ঞেস না করে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব কি করে? আর তা ছাড়া আপনি পঁচিশ বৎসর ধরে ছেলেমেয়ে পড়িয়েছেন বটে, কিন্তু মানুষ করেছেন কি? আপনি ভাল শিক্ষক অস্বীকার করছি না, কিন্তু আপনি ছোট ছেলে-মেয়ে মানুষ করতে পারবেন, তার নিশ্চয়তা কি? আপনি কিছু মনে করবেন না! আপনার কথা শুনে আপনার প্রতি কয়েকটি রূঢ় কথা প্রয়োগ করছি। আচ্ছা, ধরা গেল আপনাকে আমার মেয়ে দিলাম লেখাপড়া শেখাবার জন্য। কিন্তু ওকে দেখবে কে?

—কেন আমি ও রামকান্ত?

—যেমন আপনি, তেমনি আপনার রামকান্ত! আপনারা শিশু সম্বন্ধে জানেন কি? অলকা রেগে বলে।

—জানব না কেন, খুব জানি। আমি nursery থেকে আরম্ভ করে শিশু মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু পড়াশুনা করেছি। আর রামকান্ত জানে ভাল-বাসতে, আর চাই কি? আমরা দু'জনে মিলে তোমার মেয়েকে খুব ভাল করে মানুষ করে তুলব।

—ছোট মেয়ে মানুষ করা কি চাট্টিখানি কথা। কে স্নান করাবে, কে খাওয়াবে, কে নিয়ে বেড়াবে, কে তার সাথে খেলা করবে। এসব কিছু ভেবে দেখেছেন কি? না, শুধু খেয়ালের বশে, রাগের আবেগে কথাটা বললেন?

—সব ভেবেছি মানে এক্ষুণি ভেবে নিলাম। আমার সপ্তাহে ১০।১২টি মাত্র ক্লাশ করতে হয়, তারপর ত অফুরন্ত সময়।

—আপনার পড়াশুনা, বই লেখা এ সব?

—ও সব আর করব না ভেবেছি, ও সব আর আমার ভাল লাগে না।

—আট বৎসর পরে নূতন কথা শুনছি যে, আপনার স্থিতিশীল মনের পরিচয় ত পাচ্ছি না।

—না, আমি পড়াশুনা লেখা ইত্যাদি একেবারে ছাড়ব না। এই ধর তোমার মেয়ে যদি আমার কাছে থাকে, তবে সে ত খেলা করবে, ঘুমুবে, তখন আমি পড়া লেখা করব।

—ছাই করবেন, একলা শিশুকে নিয়ে বাড়ীতে থাকলে অত সহজেই পড়ালেখা করে যায়, কিছুই জানেন না আপনি। মিথ্যে আমাকে বলছেন।

ইতি মধ্যে অলকা একটু নরম হয়ে এসেছিল। একটু নরম সুরেই বলল, আচ্ছা বেশ আমার স্বামী ছবিকে আপনার কাছে থাকতে অনুমতি দিলেন, আপনি সারাদিন কি ভাবে চালাবেন তার একটা হিসিবিত দিন ত?

—ও তোমার মেয়ের নাম ছবি? বাঃ সুন্দর নাম ত! দেখ, ছবিকে আমার কাছে দিতে চেষ্টা করো। আমি কোন অযত্ন তার করব না, আমি শপথ করে বলছি। আর সারাদিন কি করে কাটাব তা না হয় একদিন ঐ বাড়ীতে গিয়ে থেকে দেখে এসো। তোমাদের সকলেরই নিমন্ত্রণ রইল। মিঃ মিত্রকে নিয়ে অবশ্য যেও। আমার ঘরটি তোমার জামার খুব নোংরা। কিন্তু তোমাদের আসার খবর পেলে ঘরটাকে খুব পরিষ্কার করে রাখব, কথা দিচ্ছি।

অলকা অধ্যাপক মহাশয়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এমন পাগলও দুনিয়ায় আছে!

অলকাকে চমকে দিয়ে অধ্যাপক বলতে থাকেন, আমার আর একটা plan আছে। তুমি যদি রাজী হও অলকা, তাহলে আর একটি কাজ করব।

অলকা চোখ তুলে বলে, আবার কি plan?

—তুমি রাজী হলেই আমার এক সাত আট বছরের ভাইপো আছে, মানে ছোট ভাইয়ের ছেলে, তাকে আমার কাছে নিয়ে যাব। নাম তার অমল। দুজনকে একসাথে মানুষ করে তুলব। তারপর আরও plan আছে, এখন বলব না।

—আপনার এসব plan রূপায়িত করতে কতদিন সময় লাগবে বলে মনে করেন?

—তা পনের বছর ত নিশ্চয়ই।

—পনের বছর দুই বুড়ো মানে আপনি ও রামকান্ত, যা বয়লেও, বহাল তবিয়তে থাকবেন বলে কি মনে করেন?

—মরে যেতে পারি, কিন্তু বুড়ো আমি হব না। মন আমার সেই পঁচিশ বছর বয়সের মন। আমি এখনও বহু কাজ করতে পারি। মন আমার কাঁচাই থেকে যাবে।

—তা আমার ভাল করেই জানা আছে। কলেজ জীবনের কথা ত ভুলিনি। বইয়ের পাতা উল্টাতে খুব পারেন। সে কথা থাক রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপনার ত্রিবার্ষিক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করব না। আমি মিঃ মিত্রকে জিজ্ঞেস করব মিঃ মিত্র খুব ভাল লোক। তিনি নিশ্চয়ই খুব সহানুভূতির সঙ্গে আপনার প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখবেন। আচ্ছা ধরুন যদি মিঃ মিত্র রাজী হন, তাহলে একজন আয়া ছবির সাথে পাঠিয়ে দেব কেমন?

—না আয়া টায়া চলবে না, আমিই ওদের মা, আমিই ওদের আয়া; আমিই সব করব।

—হ্যাঁ, তা ছাড়া আপনার বাহনটিও ত আছে।

—ঠাট্টা করো না অলকা, রামকান্ত খুব কাজের লোক। আর তোমাকে কত শ্রদ্ধা করে জান ত। তোমার মেয়েকে বুকে করে রাখব।

—হ্যাঁ, রামকান্ত ও তার দাদাবাবু মিলে যে আমার মেয়েটার কি দুর্দশা করবে, তা বুঝতেই পারছি।

—আচ্ছা, কলেন পরিচীয়তে, দেখো কেমন করে রাখি।

—আপনার ভাইয়ের ছেলেকে নেবেন কিনা জানব কেমন করে?

—কালকেই ফোন করে জানিয়ে দেব। আজই কথা বলব। আমার ছোট ভাই নিশ্চয়ই রাজী হবে, কিন্তু ছোট বউ-মা রাজী হবেন কিনা কে জানে? সে যাহোক কালই জানতে পারবে। আজ তা হলে চলি, কেমন অলকা।

অলকা আর কথা বাড়ায় না. সে বলে, আচ্ছা আসুন। মিঃ মিত্র রাজী হলে সোমবার ছবিকে নিয়ে আমি যাব।

প্রৌঢ় অধ্যাপক বড় আর প্রৌঢ় নেই। তিনি এখন যুবকের মতই প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে বেড়ান। আজ তাঁর মুক্ত মন আপন জনে পরিপূর্ণ। বাড়ীঘর সাজাতে অধ্যাপক ব্যস্ত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় অধ্যাপক ছুটে যাইছেন

যাচ্ছেন আর এটা ওটা কিনে আনছেন। আর মাঝেমাঝে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন অমল আর ছবির কাছে। তারা বাড়ীতে খোলা বাতাস পেয়ে খুব খুশী। খুব ছুটাছুটি করে তারা বেড়াচ্ছে। আর তাদের পাশে আছে রামকান্ত। রান্নার জন্য একটি মেয়েছেলে রাখা হয়েছে। সেই রান্না করছে। এদিকে শিশুদের দেখছে রামকান্ত।

ছবি ও অমল দু'জনেই দেখতে খুব সুন্দর। অধ্যাপক দত্ত তাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন আর কত কি ভাবেন কে জানে।

কয়েকদিন যায়। বাড়ীর অবস্থা একটু স্থির হয়ে এসেছে। দিন গড়িয়ে চলে। ঘরে তিনটি খাট পড়েছে, পাশাপাশি। এক সাথেই বিছানা। মধ্যে শুয়ে পড়েন অধ্যাপক দত্ত, আর দু পাশে দু জন। অধ্যাপক দত্তের কোন দিকে কাত হয়ে শোবার উপায় নেই, কার দিকে পক্ষপাতিত্ব করবেন? দু'জনেই রাগ করে। তাই চিৎ হয়ে তাকে শুয়ে থাকতেই হয়, যতক্ষণ তারা না ঘুমায়।

রাতে অধ্যাপক দত্তের ঘুম নেই, কার কোন্ অসুবিধে হবে কে জানে। ছবির আবার রাত হটের সময় ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস। তখন ছবির খিদে পায়। ছবি বিটোনেরা সোল্ডেন পাফ' বিস্কুট খেতে ভালবাসে। তাই জন্য সোল্ডেন পাফ বিস্কুটের বড় টিন মাথার কাছে রাখা। অমলও ঐ সময় জেগে যায়, তার চাই হরলিক্স্ বিস্কুট ও কাজুবাদাম। ছবি কাজুবাদাম খায় না, হরলিক্স্ বিস্কুট খেতেও সে নারাজ। কিন্তু দু'জনের এক বিষয়ে একমত। সেটা হচ্ছে তাদের বিস্কুটের কিছুটা অংশ জোঠুকে খাওয়ান। ছবিও অমলের দেখাদেখি অধ্যাপক দত্তকে জেঠু বলে ডাকে। অধ্যাপক দত্ত জীবনে ৭টার আগে কখনও চা ও খাবার খান নি কিন্তু এখন খুব কম করেও বিস্কুটের কিছু অংশ তাঁকে রাত চারটায় খেতেই হয়। অবশ্য জানতে পারলে কি বলত কে জানে। কিন্তু অধ্যাপক দত্ত নিজের কাজকে সমর্থন করে মনে মনে বলেন, জীবনে পরিবর্তন আনবে বৈকি, প্রয়োজনে মানুষকে সব কাজই করতে হয়। ছেলেমেয়েদের জন্য মানুষ কত কাজই না করে। অধ্যাপক দত্ত অনবরত সম্ভাবিত খোঁটার উত্তরে নিজের মনে মনেই জবাব দেন।

রাত্রি ৭টার পর আর কারো ঘুম হয় না। হয় নানা প্রশ্ন। অধ্যাপক দত্তকে কত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তা যে না শুনেছে সে ধারণাও করতে পারবে না। দুষ্টুমিই নানা প্রশ্ন। আর উত্তর দিতে হয় সটান চিৎ হয়ে শুয়ে। কোনও দিক কাৎ হয়ে কথা বলারও উপায় নেই। কাৎ হলেই হাঙ্গামা। বিশেষ করে ছবি তার মায়ের মতই জেদী হয়েছে। জোঠুর অমলের প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব ছবি সহ্য করতে রাজী নয়।

বিছানা ছেড়ে সবাই উঠে পড়ে ভোর সাড়ে ছ'টায়। শীতকাল। জানুয়ারী মাস। কিন্তু ভাল করে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে। তাই অধ্যাপক দত্ত সাড়ে ছ'টার মধ্যে উঠে পড়েন। ছেলেমেয়েদের প্রাতঃকৃত্য করানর ভারও অধ্যাপক দত্তের উপর। ভাল করে জামা গায়ে দিয়ে দু'জনকে দু'টো বাতকর্মে নিয়ে যান। আগে বাড়ীতে একটি বাতকর্মই ছিল। এখন বাড়ীতে একটি মহিলা এসেছে। আর নয় মহিলা নাই হোল, একদিন ত হবেই। তাই আগে থাকতে বাতকর্ম তৈরি করে রাখতে অসুবিধাই বা কি? যাক, দু' বাতকর্মে দু'জনে হাত মুখ ধোয়া ইত্যাদি প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করে আবার জামা জুতো মোজা ইত্যাদি জোঠুর সাহায্যে বদলে খাবার ঘরে এসে বসে।

খাবার ঘর আর সে খাবার ঘর নেই। মস্ত বড় একটা ডাইনিং টেবিল পড়েছে। চার দিকে ছ'খানা ডাইনিং চেয়ার। এখানেও অধ্যাপক দত্তকে মাঝখানে বসতে হয়, বাঁ দিকে ছবি, ডান দিকে অমল। বাঁ দিকে ছবি তার কারণ মাঝে মাঝে ছবিকে খাবারটা মুখে পুরে দিতে হয়। ছবি জোঠুর হাতে খেতে ভালবাসে, কিন্তু সে বোধ হয় ভেবে নিয়েছে, আত্মমর্যাদার তার আঘাত লাগে। তাছাড়া অমল খায় নিজ হাতে। এ পরাজয় তার কারো ভাল লাগে না।

ছবি বলে আমি নিজ হাতেই খেতে পারি। ফলফাতায়

বাড়ীতে আয়া ও মা মাঝে মাঝে খাইয়ে দিত, কিন্তু এখন ত আমি বড় হয়েছি। মার কাছ থেকে দূরে থাকি। এখন আমি নিজ হাতেই খাব।

খেতে গিয়ে যে ছবির হাত থেকে খাবার পড়ে যায়, ভাল করে ছবি খাবার মুখে পুরতে পারে না, সে কথা অধ্যাপক উল্লেখ করেন না, বললে ছবি হয় ত তাতে কেঁদে কেটে অনর্থ করবে। ঠিক মায়ের স্বভাবটি পেয়েছে ছবি, পার্থক্য ছবি কাঁদে, তার মা কাঁদে না, ছটফট করে। ছবিও বড় হলে কাঁদবে না, মায়ের মতই ভঙ্গি করে কথা বলবে। অমল নিজের খাবার গুছিয়ে খায়। বলে, জোঠু আমি খুব বড় হয়ে গেছি। ছবির মত আমাকে খাইয়ে দিতে হয় না, না? ছবি ত খুব ছোট ভাই না?

ছবি রেগে ওঠে, বলে, হ্যাঁ ছোট না ছাই। তোর চেয়ে বড়ই হব হয় ত। তোকে আর দাদা বলে কখনও ডাকব না। সব সময় আমাকে ছোট ছোট বলছিস কেন? তোকে ত সেদিন রমেশ কাকা কোলে তুলেছিল। আমাকে কোলে তুলতে পেরেছিল? আমি আর ক'দিন পরেই শাড়ী পরব, জানিস। কি রকম সুন্দর দেখাবে আমাকে লাল শাড়ীতে জানিস।

—হ্যাঁ, তোকে আবার লাল শাড়ী দেবে জোঠু। তোকে ত লাল শাড়ীতে পেত্নীর মত লাগবে। তোকে জোঠু দেবে লাল ফ্রক। আর আমাকে? কত ফুল প্যান্ট, সার্ট, কোট, টাই। ঠিক তোর বাবার মত দেখাবে আমাকে।

—বেশী বাজে কথা বলিস না অমলদা, খুড়ি অমল। তুই পরবি প্যান্ট, কোট, টাই? ভূতের মত দেখাবে না? এই ত পরেছিস ফুলপ্যান্ট, কি রকম বানরের মত তোকে দেখাচ্ছে! বল না, জোঠু, কেমন লাগছে ওকে দেখতে? বলে ছবি তাকায় জোঠুর দিকে।

কথা কাটাকাটি বেড়েই চলেছে, এরপর কান্নাকাটি নিশ্চয়ই, তারপর ওরা হয়ত বলে বসবে 'মার কাছে যাব'। তাহলেই ত সুনিশ্চিত পরাজয়। অধ্যাপক দত্ত দু'জনকে সামলাতে ও থামাতে চেষ্টা করেন। অমলকে বলেন, বাবা, তোমাকে কোটপ্যান্টে খুব ভাল মানাবে। ঠিক ছি মিত্রের মত। আর মা ছবি, তোমাকে লাল শাড়ীতে যে কি সুন্দর মানাবে, তা আর কি বলব। তোমার মাকেও তোমার মত এমন সুন্দর মানাত না, আর এখনও মানায় না। আর ছবি তোমার মা আর কি সুন্দরী, তুমি তার চেয়ে ঢের বেশী সুন্দরী। তাই না রে অমল?

অমল জোঠুর কথা খুব শোনে। জোঠুর কথায় সায় দিয়ে বলে, ঠিক বলেছ জোঠু। ছবি দেখতে ভালই, লাল শাড়ীতে মানাবেও বেশ।

ছবির রাগ জল হয়ে যায়।

ছবি বলে, তা যাই বল অমলদা তোমাকে কোট প্যান্ট পরলে সত্যি ভাল দেখায়। তারপর যদি টাই পর, তাহলে বাবার চেয়ে ভাল না দেখালেও প্রায় বাবার মতই দেখাবে।

ছবি বাবাকে খাটো করতে চায় না। অমল এতেই খুব খুশী। বলে, ছবি তুই সত্যি খুব ভাল।

অনেক কথার মধ্য দিয়ে সকাল বেলার খাবার পর্ব শেষ হয়।

হাসকান্ত অমল ও ছবিকে বলে, তোমরা যদি এত কথা বলবে তাহলে পড়তে বসবে কখন?

সকলে উঠে পড়ে। পড়ার ঘরে বড় টেবিল। এখানেও একই ব্যবস্থা। অধ্যাপক দত্ত মাঝখানে বসেন, আর দুজন বসে দুধারে।

অমলের বয়স সাড়ে সাত। সে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। আর ছবির বয়স সাড়ে পাঁচ। সে পড়ে প্রথম শ্রেণীতে। দু'জনেই অধ্যাপক দত্তের কাছে পড়তে বসে যায়। অমল পড়াশুনায় মনোযোগী। কিন্তু ছবির মনোযোগের অভাব, কিন্তু বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, ঠিক মায়ের মত। অল্প পড়েই সে পড়াটা আয়ত্ত করে ফেলে। কিন্তু পড়বার সময় নানা কথায় অবতারণা করে। তার মধ্যে স্কুলের বন্ধুদের কথা, দিদিমণিদের কথা, অধ্যাপক দত্তের কলেজের কথা, আরও কত কি?

অমল নিজে নিজে পড়ে যায়। ছবির কথায় বিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝে অধ্যাপক দত্তের কাছে নালিশ জানায়। নালিশে ছবির ভয় নাই। যেমন ছিল না তার মায়ের।

সে তেড়ে ওঠে অমলের উপর, উল্টো তার বিরুদ্ধে অধ্যাপক দত্তের কাছে নালিশ জানায়। অধ্যাপক দত্ত কোন রকমে দু'জনকে থামিয়ে দেয়। এমনি ভাবে বেলা ৯টা বাজে।

অধ্যাপক দত্ত দু'টিকে নটার পর পড়া থেকে উঠিয়ে আনেন। রামকান্ত খবর দিয়ে যায় গরম জল তৈরি। পরে রামকান্তও আসে। অধ্যাপক দত্ত ও রামকান্ত দু'জনকেই স্নান করিয়ে দেয়। ওদিকে রামকান্ত দু'জনকে জামা কাপড় পরাতে থাকে। ইতিমধ্যে অধ্যাপক দত্ত নিজের স্নান সেরে নেন। তাঁকেও ত ছেলেমেয়েদের সাথে বসে খেতে হবে। তাঁর ক্লাস রয়েছে বেলা দু'টোর সময়। কিন্তু তাহলে কি হয়। অধ্যাপক দত্তকেও তখুনি কলেজে যেতে হবে। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পৌঁছে দিয়ে তিনি বসে থাকবেন কলেজের বাঁধান গাছ তলায়। কখন ওদের দরকার হবে কে জানে। আর বাসায় বসে থেকেই বা কি করবেন! পঁচিশ বৎসর ত বাসায় ছিলেন। তাতে কি তাঁর হাতে পা গজিয়েছে! তার চেয়ে গাছ তলায় বসে থাকলে কাজ দেবে। একজন না হয় আর একজন অধ্যাপককে গাছতলায় পাওয়া যাবে, তারপর গল্প করা যাবে। তবে মধ্যে প্রায় সাড়ে বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত একলা থাকতে হবে। তা হোকগে। স্কুলের দাদা দিদিমণিদের বলা আছে, প্রয়োজন হলে গাছতলা থেকে তাঁকে ডেকে নিয়ে যেতে।

অধ্যাপক দত্ত তাড়াতাড়ি স্নান করে ছেলেমেয়েদের সাথে খেতে বসে যান। নিজের আর ভাল করে খাওয়া হয় না। ছেলেমেয়েদের খাওয়ার তদারক করতে করতে সময় চলে যায়। রামকান্ত রাগ করে। শিশুদের দুএকটা ধমক দিতে যায়, কিন্তু অধ্যাপক দত্তের ভয় পায়ে না।

অধ্যাপক দত্ত বলেন, রামকান্ত, বুঝছিস না কেন ওরা সব শিশু, ছোট ছেলেমেয়ে। ওরা ত তোর আমার মত বড় নয় যে সব বুঝবে।

রামকান্ত বলে, সে কথা ত বুঝলাম। কিন্তু আপনার ত কিছু খাওয়া হল না। আজ্ঞা বেশ নাই খেলেন। ওরা ত স্কুলে যাবে। আমি ওদের দিয়ে আসছি। আপনি বাসায় থাকুন। দু'ঘণ্টা পরে খেয়েদেয়ে কলেজে যাবেন।

অধ্যাপক দত্ত তাতে রাজী হন না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁকেই স্কুলে যেতে হবে। লোকজন, মোটর, রিক্সা, সাইকেল রাস্তায় যা বেড়েছে! রামকান্ত একলা ওদের সামলে নিয়ে যাবে কেমন করে? তাঁকেই ছেলেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে যেতে হবে। আর পারেন? পঞ্চাশ বৎসর পার হয়ে গেছে, এখন একটু কম খেলেই ভাল। বেশি খেলেই যত ব্যামো।

রামকান্ত রাগারাগি করে। কিন্তু অধ্যাপক দত্তের এখন রাগারাগি করবার সময় নয়। তিনি রামকান্তের কথায় কান না দিয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বের হয়ে যান বেলা সোয়া দশটায়। সাড়ে দশটা থেকে স্কুল বসবে।

অমল যেতে যেতে বলে, জ্যেঠু, টিফিনের সময় খাবার নিয়ে রামদা এলে চলবে না। তোমার কাছে গাছতলায় বসে খাব।

ছবি বলে, তা তুমি মন্দ বলনি অমলদা, কিন্তু জ্যেঠুর কষ্ট হবে যে। জ্যেঠুকে যে আবার কলেজে বড় বড় দাদা দিদিদের পড়াতে হবে।

অধ্যাপক ছবির বুড়ীপনা কথায় হেসে বলে বলেন, তা হোক কষ্ট, আমি আসব। আমার ছোট মাটি আমার কষ্টের কথা ভাবছে, এতেই আমি কত খুশী। আমার সব কষ্টই তাতে চলে গিয়েছে।

ছবি গর্বভরে অমলের দিকে তাকায়, হাসে।

অমল বলে, আমি বুঝি জ্যেঠুর কষ্টের কথা ভাবিনি। তা ভেবেছি। কিন্তু জ্যেঠুত কিছু খাননি দেখেছি। আমাদের সাথে টিফিনের সময়েও কিছু খাইয়ে দেব। তাই জ্যেঠুকে আসতে বলেছি।

ছবি বলে, খুব ভাল কথা বলেছ অমলদা, জ্যেঠু সত্যি কিছু খাননি। তুমি যে ঝগড়াটা খাবার টেবিলে করলে, জ্যেঠু খাবে কি? যাক ভালই হল। জ্যেঠু, আমি তোমাকে খাইয়ে দেব, সে কথা বলে রাখছি কিন্তু। অমলদা খাওয়ালে চলবে না।

অমল বলে, বাঃ আমি নিজে জ্যেঠুর খাবার কথা

বললাম, আর তুমি যাওয়াবে কি করে? যাওয়াতে হয় আমি যাওয়াব।

অধ্যাপক দত্ত ওদের ঝগড়া থামিয়ে দেন। বলেন, ভুলে এসে গিয়েছি, এখন আর ঝগড়া করলে চলবে না। দু'জনেই আমাকে খাইয়ে দিও। যা ছোট ও তাই যা আগে যাওয়াবে, তারপর বড়ো যাওয়াবে।

অমল বড়, সোমকে তার আবদারটা আছে। তাই দু'জনেই কথাটা মেনে নিল।

সকলে ভুলে গিয়ে ভুলের দরজায় অধ্যাপক মুখার্জির নামে দেখা।

অধ্যাপক মুখার্জি বললেন, আজ যে staff meeting ছিল, সে কথা কি ভুলে গেছেন? আপনি ত জানতেন, আপনার সই ত নোটিশে ছিল। তাহলে আপনার অসুখ করেছে।

অধ্যাপক দত্ত বললেন, না অসুখ করেনি, তবে ভুলে গিয়েছিলাম। আর ভুলে না গেলেও আসতে পারতাম না। এদের ছেড়ে কি আসা যায়? দু'জনেই যে আমার কাছেপিঠেবাসী।

অধ্যাপক মুখার্জি হাসতে হাসতে চলে গেলেন। অমল বলল, ছোট্ট, কাছেপিঠেবাসী মানে কি? কাছেপিঠে মানে ত সেই সুপ্রীম হসপিটালের দেশ। তাই না? আমাদের আমি কাছেপিঠেবাসী বললে কেন, বল না?

অধ্যাপক দত্ত বিপদে পড়লেন। বললেন, এখন সময় কোথায় সে কথা বোঝাবার? পরে বাপীর মনে করো, বলে দেব। ঐ দেখ দারোয়ান ঘন্টা বাজাতে যাচ্ছে।

ছেলেমেয়েরা দৌড়ে স্কুল ঘরের দিকে চলে গেল।

অধ্যাপক দত্ত ফিরে এলেন। বললেন হেসে গাছতলায়। গাছতলায় বসেছিলেন অধ্যাপক কর্মকার। তিনি অমল আর ছবিকে দেখেছেন। বুড়ো বয়সে ছোট ছেলেমেয়েদের ভালবাসা সম্বন্ধে কিছু কথা বলে অধ্যাপক কর্মকার ঐ স্থান ত্যাগ করলেন।

কিছু পরেই এলেন অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুনালনী ঘোষ। মিস ঘোষ আমাদের পূর্বপরিচিতা।

মিস ঘোষ সব খবর রাখেন। সেদিন অলকা ছবিকে নিয়ে এখানে অধ্যাপক দত্তের কাছে দিতে এসেছিল, সেদিন অলকার সাথে মিস ঘোষের দেখা হয়েছিল। অলকার কাছ থেকে মিস ঘোষ ছবির এখানে থাকবার কথা শুনে নিয়েছেন।

মিস ঘোষ বললেন, দাদা, অলকার মেয়েকে কি পুষ্যি নিলেন?

—না, তা নেব কেন? আর অলকা মেয়েই বা কেন? আমি কিছুদিন লালন পালন করে ওদের বড় করে দেব বলেই ওদের নিয়ে এসেছি।

সাধু আপনার ইচ্ছা। প্রশংসা করছি দাদা। আমার কি মনে হচ্ছিল জানেন, অন্যোপায়।

—কি মনে হচ্ছিল?

—কিছু মনে করবেন না ত?

—মনে করবার মত হলে মনে করব না, এমনি বলব কি করে? তবুও বল কি বলবে।

—জীবনের অসমাপ্তিকে পুষিয়ে নিতে চাইছেন ছবিকে দিয়ে, তাই না? আপনাকে আমি বন্দনা করি।

—আমি তোমার কথার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি, আর বলছি তোমার কথাকে ফিরিয়ে নিতে।

—আমি আমার কথা ফিরিয়ে নেব না। আমি যে কথা বলি, সে কথা চিন্তা করেই বলি। আমি যা বলেছি, যথার্থ বলেই বলেছি।

—আমাকে এখান থেকে উঠে যেতে বাধ্য করছ সুনালনী। তুমি জান আমি ঝগড়া করতে পারি না, ঝগড়া করতে ভালবাসি না।

—উঠে যাবেন না দাদা, বসুন।

—দাদা বলছ অথচ অপমান করতে একটুও দ্বিধা বোধ করছ না?

—না দাদা, অপমান করছি না, অলকার প্রতি আপনার অহেতুক স্নেহকে বাধা করছি মাত্র।

—অলকা আমার কতখানি স্নেহের, তা তুমি বুঝতে পার না, তাই তুমি বাধা করতে পারছ। আমি আশা করছি, তুমি আর ভুল করেও আমাকে আঘাত দেবে না। মনে রেখো, তুমি অধ্যাপিকা হলেও আমার ছাত্রীস্থানীয়।

অধ্যাপক দত্তের কথা শেষ না-হতেই অধ্যাপক ঘোষ চৌধুরী এসে উপস্থিত হলেন। তিনি সেদিন তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে কলেজে চলে এসেছেন। তাঁরও ক্লাশ ২-৪০ এ। এসেই বললেন, কি খবর অশোক বাবু, তারী ব্যস্ত আছেন শুনতে পাচ্ছি। আমরা মশায়, স্ত্রী ছেলেমেয়ের জ্বালায় যতক্ষণ পারি বাইরে থাকি! আর আপনি ছেলেমেয়েদের জন্ত ঘরে বসে থাকেন। এ কি রকম কথা।

সুনলিনী মুচকি মুচকি হাসেন।

অধ্যাপক দত্ত সে কথার উত্তর দেন না। কলেজ সংক্রান্ত অন্য কথা পেড়ে বসেন। অধ্যাপক ঘোষ চৌধুরীর তাতে উৎসাহের অন্ত নেই। তিনি উচ্চকণ্ঠে কলেজের কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করতে থাকেন।

ততক্ষণে একটা বেজে গিয়েছে। টিফিনের সময় হল। রামকান্ত টিফিন ক্যারিয়ার হাতে এসে দাঁড়িয়েছে। অধ্যাপক দত্ত অধ্যাপক ঘোষ চৌধুরী ও অধ্যাপিকা ঘোষের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গিয়ে সাহতলায় বসলেন। বসতে না বসতেই অমল আর ছবি এসে উপস্থিত।

ছবি বললে, জ্যেঠু, আজ আমাদের ছুটি হয়ে গেল। কিসের জন্ত ছুটি হল বলতে পারি না।

অমল গম্ভীরভাবে বললে, তুমি একটি বোকা মেয়ে ছবি। আজ পৌষ সংক্রান্তির জন্ত ছুটি হয়ে গেল, তাও জান না?

—তা যেন ছুটি হল, কিন্তু আমরা এখন কি করব? জ্যেঠু ত বাড়ী যাবে না। আমরাও যাব না। বললে ছবি।

অমল বললে, ঠিক তাই, আমরা বাড়ী যাব না, জ্যেঠুর সাথে বাড়ী যাব।

অধ্যাপক দত্ত বললেন, আচ্ছা বাড়ী যেতে হবে না। তোমরা আমার সাথে ক্লাসে যেও। এক পাশে বসে থেকো। দু'টো ক্লাশ করে বাড়ী যাব, কেমন?

ছবি হাত তালি দিয়ে বলে, আমরা তাহলে কলেজে পড়ব আজ, তাই না জ্যেঠু।

অমলও ছবির কথায় যোগ দেয়।

অধ্যাপক দত্ত বলেন, মা তোমাকে আজ তোমার মা যেখানে বসত সেখানে বসিয়ে দেব। অমলও সাথেই বসবে।

ছবি ও অমল খুশীতে উপচে পড়ে।

সকলে মিলে টিফিন খাওয়া হল। পূর্ব-কথামত ছবি ও অমল জ্যেঠুর মুখে লুচি ও ডিম ভাজা পুরে দেয়!

রামকান্ত বলে, জান ছবি, তোমার মা আমার হাতের ডিমের ওমলেট খেতে খুব ভালবাসত।

ছবি গম্ভীর মুখে বলে, আমিও ভালবাসি রামকাকা।

সকলে হেসে উঠে। অমল ছবির পিঠে একটা কিল লাগিয়ে দেয়। ছবিও হেসে অমলকে একটি চিমটি কেটে দেয়।

কলেজের ঘণ্টা পড়ে। পনের মিনিট বাকী ক্লাসের। রামকান্ত সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে যায়। আর অধ্যাপক দত্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে ক্লাসে চলে গেলেন। তখনও শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রী আসে নি। অধ্যাপক দত্ত ছবিকে ও অমলকে বসিয়ে দিলেন ছবির মা যেখানে বসত সেখানে।

একটু পরেই ছাত্রছাত্রীরা এল। তারা ত ছবি ও অমলকে দেখে অবাক। অধ্যাপক দত্ত অমল ও ছবিকে পরিচয় করিয়ে দিলেন ছাত্রছাত্রীদের সাথে। সকলেই খুশীমনে ওদের গ্রহণ করল।

তারপর আরম্ভ হল শ্রেণীতে পড়ান। যথাসময়ে পড়ান শেষও হল। ঘণ্টা পড়ে গেল। অধ্যাপক দত্ত ছেলেমেয়েকে নিয়ে পরের ক্লাসে চলে গেলেন। সে ক্লাসের কাজও শেষ হল।

প্রায় সাড়ে তিনটা নাগাদ অধ্যাপক ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে গেলেন বাড়ীতে।

এমনি ভাবে প্রায় এক বৎসর কেটে গেল। অধ্যাপক দত্তের কাজ অনেক বেড়ে গিয়েছে। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, কাজও বাড়ছেই। দু'টো বড় বড় বই গেছে। ছেলে-মেয়েদের মায়েরা অমল ও ছবিকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ছেলেমেয়েরা জ্যেঠুকে ছেড়ে যেতে

চায় নি। কিন্তু মায়ের তীব্র চাউনির কাছে ছেলেমেয়েরা কুঁচকে গিয়েছিল।

অমলের মা ও ভাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিল, আমার ছেলেটাকে অযাত্ন করে দিয়েছে।

অমলার মনেও হয়ত সে সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু মুখে সে কিছু বলে নি।

উহার মা-ই ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল। অধ্যাপক দত্তের মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। কিন্তু কি করবেন। ওদের ছেড়ে ত থাকতেই হবে।

বড় শেষ হতে না হতেই ছেলেমেয়েরা হাজির হয়েছে। আবার সেই আনন্দ পরিবেশ, অধ্যাপক দত্তের সেই কর্মবহুল জীবন।

এইভাবে দিন চলেছে। অধ্যাপক দত্ত খুব খুশী। রামকান্তও তাই। তবে রামকান্ত অধ্যাপক দত্তের সব কাজই সমর্থন করে না। নিজের দিকে অধ্যাপক দত্তের লক্ষ্য নাই। কেবল অমল আর ছবি, ছবি আর অমল।

এক শনিবারের কথা।

সন্ধ্যা হয়েছে। ছেলেমেয়েদের পড়তে বসবার কথা। অধ্যাপক দত্ত ছেলেমেয়েদের ডাকতে যাবেন। এমন সময় ছবি এসে জোঠুর ইজি চেয়ারের পাশে উঠে বসল। ছবি এবার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী ও অমল চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র।

ছবি জোঠুকে বলে, জোঠু আজ পড়ব না, কালকে রবিবার আছে। আজকে শুধু তোমার সাথে গল্প করব কেমন জোঠু? এদিকে অমলের সাথে ছবি আগেই পরামর্শ করে এসেছিল। অমলও ইজি চেয়ারের পাশে এসে বসে বলল, জোঠু তাই হোক। আজ পড়া বন্ধ থাক। আজ শুধু গল্প। তুমি গল্প বল।

অধ্যাপক দত্ত বলেন, আচ্ছা বলছি। তোমরা পাশে শুয়ে পড়।

অধ্যাপক দত্ত বেশ চওড়া করে একটি ইজি চেয়ার তৈরি করে নিয়ে ছিলেন, যাতে ওঁর সাথে সাথে ওরা দু'জনেও শুতে পারে। দু'জনেরই নির্দিষ্ট স্থান ছিল। যে যার জায়গা নিয়ে শুয়ে পড়ল।

অধ্যাপক দত্ত বললেন, আচ্ছা অমল তুমি ত বড় হবে, লেখাপড়া শিখবে, বড় চাকরী করবে। তখন আমি ত চাকরী করব না, বুড়ো হয়ে যাব। কাজ করবার ক্ষমতাও থাকবে না। তখন তুমি কি করবে?

ছবি বলল, আমি বলব জোঠু?

—বল মা—বললেন অধ্যাপক দত্ত।

—তুমি—জোঠু, অমলদার বাড়ীতে থাকবে। অমলদা তোমাকে দেখাশুনা করবে।

অধ্যাপক দত্ত বলেন খুব ভাল কথা বলছ মা, খুব খুশী হয়েছি। কিন্তু আমাকে ত কিছু কাজ করতে হবে। এই ধর, অমল যখন মোটরে করে অফিসে যাবে, তখন আমি অমলকে পৌঁছে দিয়ে আসব। ছবি, তুমি তখন কি করবে?

—আমি আর কি করব। আমি অফিসে যেতে পারব না। রামকাকা আমাকে তখন স্কুলে পৌঁছে দেবে। জোঠু, তুমি কিন্তু রোজ রোজ অমলদার অফিসে যেতে পারবে না, একদিন আমাকে স্কুলে পৌঁছে দেবে, একদিন ওকে অফিসে পৌঁছে দেবে। আর আমি স্কুল থেকে এসে একলা একলাই রামকাকার সাথে খেলা করব।

অমল বলে, ছবি কিন্তু ভারী বোকা জোঠু। ও ভাবছে ও বড় হবে না। আরে ও বুকী, আমি হলে তুইও ত বড় হবি।

—বুকী বুকী কর না বলছি অমলদা, খুড়ি অমল। আমি বড় হব না বলছি। আমি জোঠুর কোলের কাছেই থাকব সব সময়।

অমল হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে।

অধ্যাপক দত্ত বলেন, আচ্ছা, আমিই বলছি আমরা কি করব। সকালবেলা উঠে কিছু কাজকর্ম সেরে নিয়ে অমল স্নান করে কিছু খেয়ে নিয়ে অফিসে চলে যাবে। আমি আর ছবি অমলকে অফিসে দিয়ে আসব। তারপর আবার একটার সময় অমলকে গিয়ে নিয়ে আসব, তারপর আমরা খাব। তারপর আমরা গিয়ে আবার অমলকে অফিসে পৌঁছে দেব। বিকেলে আবার যাব অফিসে, নিয়ে আসব অমলকে।

ছবির রাগ তখনো কমে নি।

ছবি বলে, যোজ আসবার করে অমলের অফিসে যাব কেন ? তার পরে আমারও ত অফিস হবে। আমাকে অফিসে পৌঁছে দিও জ্যেঠু।

—আচ্ছা, তাই দেব মা। দত্ত হেসে উঠেন।

নানা কথায় সন্ধ্যাটা কেটে যায়। রামকান্ত এসে ৯টার সময় খাবারের তাগিদ দেয়।

খাবার খেয়ে যথাস্থানে ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়ে।

ছেলেমেয়েরা ঘুমুতেই রামকান্ত এসে দাঁড়ায়। বলে, দাদাবাবু উঠে আসুন, কথা আছে।

অধ্যাপক দত্ত অবাক হন, উঠে এসে ইজিচেয়ারে বসেন। বলেন, কি হয়েছে রে ?

—আজকে অলকাদি ও ছোট বৌমা এসেছিলেন। দাদাটা খুব এখানে ছিলেন। ৪টার আগেই চা খেয়ে বাড়ী চলে গিয়েছেন।

—আমার সঙ্গে দেখা করে গেল না, আর ওদের সাথেও দেখা করে গেল না ? ব্যাপার কি ?

—না, দেখা করে যান নি। তবে তাঁরা ত আবার কালই আসছেন। তাঁরা আর তাঁদের ছেলেমেয়েদের এখানে রাখবেন না। তাঁরা কালকেই ওদের নিয়ে চলে যাবেন।

অধ্যাপক দত্তের চোখ নিষ্প্রভ হয়ে আসে, অতি কষ্টে জিজ্ঞেস করেন, কেন রে ?

তাঁরা বলেছেন, তাঁদের ছেলেমেয়েরা নাকি মানুষ হচ্ছে না। অতএব তাদের তাঁরা নিয়ে চলে যাবেন। আপনাকে ৪টের সময় উপস্থিত থাকতে বলেছেন। ছেলেমেয়েদের জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখতে বলে গেলেন।

অধ্যাপক দত্তের জীবনটা যেন এক মুহূর্তে শুকিয়ে গেল। সমস্ত জগৎটা যেন চোখের সামনে বন-বন করে ঘুরতে লাগল। তিনি আজ পরাজিত। তিনি ছেলে-মেয়েকে মানুষ করতে পারেন নি ! কি অন্যায় তার ! কি ক্ষমতা আছে তাঁর অন্যের জিনিসকে নষ্ট করতে। তাঁর সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। দু'বছর আগেও তিনি কত সুখের পরিকল্পনা করেছিলেন। সব ধোঁয়ার মতই মিলিয়ে গেল।

রামকান্ত বলল, আমি, তাহলে ওদের জিনিষ পত্র গুছিয়ে রাখব, দাদাবাবু !

—তাই রেখো, অতি কষ্টে বললেন অধ্যাপক দত্ত। পরে বললেন, ওদের জানতে দিও না যে, ওরা একেবারে চলে যাচ্ছে। ওরা যেন যাচ্ছে ছুটিতে যেমনি যায় তেমনি ভাবে। তাই ওদের বুঝিয়ে দিও।

রামকান্ত তার ঘরে চলে যায়। অধ্যাপক দত্তের চারদিক অন্ধকার ঘনে আসে। ওদের আসবার পর থেকে সেদিন পর্যন্ত শিশুদের সব কথাগুলি তাঁর মনে পড়ে, আর চোখ দুটো জলে ভরে আসে। জোর করে চোখের জল মুছে ফেলেন। ভাবেন জীবন যার বিরুদ্ধগতিসম্পন্ন, তাকে সাবলীল করতে চেষ্টা করে লাভ কি ? এরূপ যে হবে এ ত তাঁর জানা উচিতই ছিল। অধ্যাপক দত্ত ছেলেমেয়েদের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সমস্ত রাত্রি কেটে যায়। রাত চারটা বাজল। ছবি চোখ মেলে তাকাল। দেখে ঘরে আলো। জ্যেঠু ইজিচেয়ারে।

ছবি উঠে বসল। বলল, জ্যেঠু তোমার কি হয়েছে ? ইজিচেয়ারে বসে কেন ? আমাকে বিস্কুট খাওয়াবে না ?

ছবির কথা শুনে অমলও উঠে বসল। বলল, কি হয়েছে জ্যেঠুমণি ?

—কিছু হয় নি, বাবা মা, এমনি উঠে বসেছিলাম। এই ত তোমাদের পাশে শুচ্ছি।

অধ্যাপক দত্ত উঠে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন, রোজকার মত দুজনকে বিস্কুট দিলেন। ছবি বলতে লাগল, কি হয়েছে তোমার জ্যেঠুমণি বল না। আমরা আর দুষ্টুমি করব না। তুমি রাগ করো না।

—না মা, তোমরা কোন দুষ্টুমি কর নি। আমি এমনি উঠে বসেছিলাম। তোমরা ঘুমিয়ে পড়। কাল একটু দেরীতেই উঠো। কালকে সকালেও তোমাদের ছুটি দেব।

—ওঃ বুঝতে পেরেছি, রাত্রিতে পড়ি নি তাই রাগ করেছ। রাগ করো না জ্যেঠুমণি, আমরা খুব ভাল করে

পড়ব। বলে ছবি কেঁদে ফেলল। অমলও কাঁদতে লাগল। অধ্যাপক দত্ত অনেক কষ্টে তাদের শান্ত করলেন। কাঁদতে কাঁদতে ছেলেমেয়ে দু'টো ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল হতে অধ্যাপক দত্ত নিজেকে অনেকটা দৃঢ় করে ফেললেন। শিশুদের কাছে কোন দুর্বলতা দেখান চলবে না।

শিশুরা ঘুম থেকে উঠল। যথারীতি খেয়ে পড়াশুনা করল। তারপর স্নান করে খেয়েদেয়ে জোঠুর সাথে ইস্কুলে চলে গেল।

অধ্যাপক দত্ত সেদিন ছুটি নিলেন। কলেজে পড়াতে গেলেন না। শিশুদের টিফিন খাইয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলেন অলকা ও ছোট-বৌমার জন্য।

বেলা তিনটায় ওরা এসে পৌঁছাল। দু'জনেই প্রণাম করে চেয়ারে বসল।

অধ্যাপক দত্ত অলকাকে বললেন, আমি সব শুনেছি রামকান্তর কাছে। তোমাদের সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। সত্যি আমি হয়ত ওদের মানুষ করতে পারি নি। আমি তোমাদের কাছে অপরাধ করেছি। তোমরা আমাকে ক্ষমা করো। একটা বছর ওদের খুব ক্ষতি হয়ে গেল।

অলকা চুপ করে রইল।

ছোট বৌমা চুপ করে থাকলেন না; বললেন, বড়দা, আপনি একটি বছরের কথা বলছেন। এই এক বছরের কুঅভ্যাস সারাতে ত চার্ বছর কেটে যাবে। দশ জোড়া জুতা, আর দশটি ঠাণ্ডা ও দশটি গরম সুট আট বছরের ছেলের কি কাজে লাগবে, তা ত বুঝতে পারি না। আর ছবিরও দশ জোড়া জুতা, ঠাণ্ডা গরমে তিনটি ফ্রকও কিসের দরকার তা ত আমাদের বোধগম্য নয়। আর ওর ভাল শাড়ীও এর মধ্যেই হয়েছে পনের খানা। এ সব কি? ছেলেমেয়েদের মাথাখাওয়া নয় কি? ভালবাসা ও আদর দেওয়া এক কথা নয়।

—হ্যাঁ বউমা, তোমরা ঠিক কথাই বলেছ। ওদের তোমরা নিয়ে যাও। কিন্তু এখুনি ওদের বলোনা যে একেবারে নিয়ে যাচ্ছ। বলো কয়েকদিনের ছুটিতে যাচ্ছে। ওরা ছেলেমানুষ, ওরা জোঠুকে শীগ্‌গীরই ভুলে যাবে। নিয়ে ইস্কুলে ভর্তি করে দিও। ওরা ভুলে যাবে। আমি কালই ট্রান্সফার সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেব।

এর মধ্যেই অমল ও ছবি স্কুল থেকে এসে গেল। ছবি মুখ ভার করে বলল, জোঠু, তুমি আমাদের স্কুল থেকে নিয়ে এলে না কেন?

তারপর দেখতে পেল মা ও কাকীমাকে। চুপ করে জোঠুর কোল ঘেঁষে বসল।

অধ্যাপক দত্ত অমল ও ছবিকে দুহাতে বেষ্টন করে বললেন, যাও মা, তোমরা কদিন বাড়ী থেকে ঘুরে এসো। তোমাদের মা তোমাদের নিতে এসেছেন।

ছবি বলে, এই ত সেদিন এসেছি, আবার যাব কেন? তাহলে তুমিও চল জোঠু।

অমলও ছবির কথার প্রতিধ্বনি করে।

অধ্যাপক দত্ত হেসে বলেন, না বাবা মা, তোমরা যাও, আমি পরে যাব।

রামকান্ত সবাইকে খেতে ডাকে। সবাই খাবার ঘরে গিয়ে খেতে বসে। খাওয়া শেষ হয়।

রামকান্ত সব জিনিস গোটিয়ে তুলে দেয়।

অধ্যাপক দত্ত অলকাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে বলেন, আমি হেরে গেছি অলকা। আমায় তুমি ক্ষমা করো, মিঃ মিত্রকে ক্ষমা করতে বলো।

অলকা তবু কথা বলে না।

অমল ও ছবি এসে জোঠুকে প্রণাম করে, তারপর জোঠুকে চুমু খেয়ে গাড়ীতে গিয়ে ওঠে। ছবি ও অমল বলে, আবার আসব জোঠু—যেমনি করে ছোট শিশুরা বলে তেমনি করে। অধ্যাপক দত্ত কথাটা এড়িয়ে যান।

গাড়ী ছেড়ে দেয়। ছেলেমেয়ে দুটোর হাত নড়তে থাকে যতক্ষণ গাড়ী না অদৃশ্য হয়।

পাশের বাড়ীতে কেউ গেয়ে ওঠে—

ভুল, সবই ভুল, এ জীবনের পাতায় পাতায়…

অধ্যাপক দত্তের দুচোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরতে থাকে। পাশেই রামকান্ত। তার চোখেও জল।

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় জন্যই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দ্দেশিত "সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

ব্রহ্ম যদি সমস্তই হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই সমস্তকেই ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু বলা যায় না। তাহা হইলে অবিদ্যাও ত সমস্তের অতিরিক্ত কিছু নহেন। তাহা হইলে অবিদ্যাও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সমস্তই ব্রহ্ম স্বীকৃত হইলে, সেই সমস্তের কিছুই অসত্য নহে। কারণ নানা উপনিষদে, বেদান্তে এবং বেদান্তমতের নানা গ্রন্থে ব্রহ্মকে সত্যই বলা হইয়াছে, ঐ সমস্ত গ্রন্থানুসারে ব্রহ্ম সত্য বলিয়া, সেই ব্রহ্ম যে সমস্ত পদার্থ হইয়াছেন, সেই সমস্ত পদার্থও নিশ্চিকারে—ব্রহ্মই সমস্ত হইয়াছেন বলিয়া সমস্তের কিছুই বিকৃত নহে স্বীকার করিতে হয়।

সপ্তবিংশ সিদ্ধান্ত

'ঘটমপ্যন্তরং কৃত্বা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
ঘটিষ্যতি স মূঢ়াত্মা তদং তস্যাতদাবিতম্' ৫২ ॥

বলায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকানুসারে জীবত্ব যে মিথ্যা ইহা বুঝিবার কোন কারণই নাই। ঐ শ্লোকানুসারে জীবত্বও সত্য বোঝা যায়। কিন্তু

'যথম্ দি ঘটপ্রাপ্তিং শুক্তৌ বা রজতস্থিতিং।
তথং ব্রহ্মণি জীবত্বং বীক্ষ্যমাণে ন পশ্যতি। ৫৯
যথা মৃদি ঘটো নাম কনকে কুণ্ডলাদিবা
শুক্তৌ হি রজতখ্যাতি জীবশব্দস্তথাপরে ॥ ৬০'

বলায় এই দুই শ্লোকে পূর্ব শ্লোকের প্রতিবাদই করা হইয়াছে। মৃত্তিকা ঘটাকার না হইলে কেবল মৃত্তিকাই বলা হয়; তখন মৃত্তিকাকে ঘট বলা হয় না। কিন্তু মৃত্তিকা ঘটাকার হইলে সে মৃত্তিকাকে অঘট বলা যাইবে কি প্রকারে? মৃত্তিকা ঘটাকার হইলে সে মৃত্তিকার ঘট নাম নহেই বা বলা যাইবে কি প্রকারে? ব্রহ্ম জীব হইলে ব্রহ্মকে অজীব কি প্রকারে বলা যাইবে? মৃত্তিকা না থাকিলে ত মৃত্তিকা ঘটাকারে পরিণত হইতে পারে না। মৃত্তিকা আছে বলিয়া মৃত্তিকা ঘটাকারে পরিণত হইতে পারে।

সেই মৃত্তিকা ঘটাকার হইলে ঘটাকার বলাও যায় না। ব্রহ্ম না থাকিলে ব্রহ্ম জীব হইতে পারিতেন না। ব্রহ্ম আছেন বলিয়া ব্রহ্ম জীব হইয়া থাকেন। সেই ব্রহ্ম জীব হইলে জীবাকার বলাও যায় না। সত্য যাহা হন তাহাও সত্য। কনক কুণ্ডল হইলে সেই কুণ্ডলও মিথ্যা নহে কনক সত্য বলিয়া সেই কনক কুণ্ডলাকারে পরিণত হইলে সেই কুণ্ডলকেও সত্য বলিতে হয়। ব্রহ্ম জীব হইলে সেই জীবও মিথ্যা নহে। ব্রহ্ম সত্য বলিয়া সেই ব্রহ্ম জীব হইলে সেই জীবকেও সত্য বলিতে হয় সত্য ব্রহ্ম অসত্যরূপে পরিণত হইতেই পারেন না। বীজ বৃক্ষ রূপে পরিণত হইলে কি বলিতে হইবে বীজই সত্য বৃক্ষ নহে? বীজও সত্য, বৃক্ষও সত্য। ব্রহ্মও সত্য, জীবও সত্য। বীজ এবং বৃক্ষ যে প্রকারে অভেদ, ব্রহ্ম এবং জীবও সেই প্রকারেই অভেদ।

অষ্টবিংশ সিদ্ধান্ত

সুবর্ণ অলঙ্কার হইলে তোমার কি সুবর্ণ এবং অলঙ্কার এই দুই বোধ হয় না? ঐ প্রকার দ্বৈতবোধ কি অজ্ঞান-বশতঃ হইয়া থাকে? আমাদের বিবেচনায় তাহা কখনই নহে। আমাদের বিবেচনায় ঐ প্রকার দ্বৈতবোধ জ্ঞানবশতঃই হইয়া থাকে। বেদান্তমতে আত্মা এবং ব্রহ্ম অভেদ নহে। কিন্তু শঙ্করাচার্য 'সর্বমাত্মেতি' এবং

'ব্রহ্মণঃ সর্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদ্বেতানি ব্রহ্মৈব তবাস্মীত্যবধারয়েৎ। ৪৯

বলায় তাঁহার মতে আত্মা এবং ব্রহ্ম অভেদ ইহাই বুঝিতে হয়। শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন,

'যত্রাজ্ঞানাদ্দ্বৈতমিবেতরস্তত্র পশ্যতি।
আত্মত্বেন যদা সর্বং নেতরস্তত্র চাপরি॥ ৫০
যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি চাত্মত্বেন বিজানতঃ।
নৈব তস্য ভবেন্মোহো ন চ শোকাদ্বিতীয়তঃ॥ ৫১
অয়মাত্মা হি ব্রহ্মৈব সর্বাত্মকতয়া স্থিতঃ।
ইতি নির্ধারিতং প্রজ্ঞা বৃহদারণ্যসংজ্ঞয়া॥ ৫২

উক্ত শ্লোকত্রয়ও শঙ্করাচার্যের পূর্ব কথিত অভিপ্রায়েরই পোষকতা করিতেছে। উক্ত ত্রিপঞ্চাশৎ শ্লোকে 'অজ্ঞানাদ্বৈতম্' বলা হইয়াছে। ঐ শঙ্করাচার্যই ত তাঁহার আত্মানাত্মবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থে আত্মা এবং অনাত্মা-অবিদ্যা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার ঐ দুই স্বীকার করাতে কি তাঁহারও দ্বৈত স্বীকার করা হয় নাই? তিনি তাঁহার আত্মানাত্মবিবেক নামক গ্রন্থে আত্মা এবং অনাত্মা-অবিদ্যা অভেদ বলেন নাই। তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার কেবলমাত্র অদ্বৈতজ্ঞান থাকিলে অনাত্মা-অবিদ্যার বিষয়ে তিনি কিছু উল্লেখই করিতেন না। তাহা হইলে তিনি তাঁহার ঐ আত্মানাত্মবিবেক নামক গ্রন্থে অবিদ্যাকেও অনাদি বলিয়া অবিদ্যাও যে নিত্যা, ইহাও প্রতিপন্ন করিতেন না। ঐ আত্মানাত্মবিবেক নামক গ্রন্থে তিনি অবিদ্যা নিত্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন বলিয়া অবিদ্যাকে অনিত্যা এবং মিথ্যা বলা যায় না।

একোনত্রিংশ সিদ্ধান্ত

বেদান্ত মতে চৈতন্য-বিশিষ্ট সকল প্রকার সকল দেহেই একাত্মা আছেন। চেতনা-বিশিষ্ট সকল প্রকার সকল দেহে একাত্মাই আছেন স্বীকার করিলে আত্মা সর্বব্যাপী ইহাও স্বীকার করিতে হয়। যদি বলা হয় তিনি কেবল চেতনা-বিশিষ্ট সকল প্রকার সকল দেহেই আছেন, অন্য কোথাও নাই, তাহা কখনই হইতে পারে না। কারণ চেতনাবিশিষ্ট সকল প্রকার সকল দেহগুলি অতি ঘনিষ্টভাবে পরস্পর সংলগ্নাবস্থায় এক সঙ্গে অবস্থান করিতেছে না যে সেই একাত্মা অন্য কোথাও না থাকিয়া কেবল চেতনা-বিশিষ্ট সকল প্রকার সকল দেহেই বিদ্যমান আছেন স্বীকার করা যাইবে। শঙ্করাচার্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের পঞ্চপঞ্চাশৎ শ্লোকে বলা হইয়াছে,

'অয়মাত্মা হি ব্রহ্মৈব সর্বাত্মকতয়া স্থিতঃ।
ইতি নির্ধারিতং প্রজ্ঞা বৃহদারণ্যসংজ্ঞয়া॥'

বৃহদারণ্য-শ্রুতিসম্মত উক্ত শ্লোকানুসারে এই আত্মাই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। অনেক শাস্ত্র মতেই ব্রহ্ম সর্বব্যাপী।

ক্রমশঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৩—

(৫৮)

ওগো প্রাণ, মহাপ্রাণ বিশ্বপ্রাণ, পরাণপুতলী শ্রীরাধারাণী আমার, প্রাণ সর্ব্বায়, প্রাণের তোমার স্থান নাই। তুমি সতীর প্রাণ, অসতীরও তুমিই প্রাণ, তুমি কুলীনের প্রাণ, অকুলীনের প্রাণও তুমি। তুমি ধনিকের প্রাণ, নির্ধনেরও প্রাণ। তুমি যুক্ত প্রাণধারা অনাদি অনন্তে বহিয়া চলিয়াছ সকলের সঙ্গ দান করিয়া অথচ নিঃসঙ্গ থাকিয়া। তুমি শুচি অশুচি পঙ্কলিত করিয়া চলিয়াছ, দুকূল ত্যাগিনী, দুকূল প্লাবিনী। আমি তোমার জীবনে জীবন মিলাইয়া বহিয়া চলিব। আমার সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে প্রাণে পরিণত করিয়া তোমার সেবা করিব। তুমি নিত্যগোপালরূপে আমায় আশ্রয় দিয়াছ। তুমি আমার সত্য। বেণু পত্রিকায় বাহির করিবার জন্য ছোট একটী 'নিত্যগোপাল' প্রবন্ধ লেখে, আবেদন লেখে।... —কাঁদিয়া পড়ে; সে আর স্বামীর কাছে থাকিবে না। তাহার অত্যাচার অসহ্য। এখানে থাকিতে পারিবে কি না। তাহার স্বামীপুত্র ছাড়িয়া এখানে থাকা সঙ্গত নয়। সে বরং এখানে প্রথমে যাতায়াত করুক, পরে এখানের আফিসের কাজের ভার লউক। কিছু টাকা দেওয়া যাইতে পারে—ইত্যাদি বিষয় বেণুদের সঙ্গে পরামর্শদাপেক্ষে বলিয়া দিলাম।...মধ্যে রওনা হই। কার্যকরী সমিতির আলোচনা হয়। ৪-১৫তে এক সাধারণ সভা আরম্ভ হয়। এখান হইতে কুসুম উষাদিদী গিয়াছিল। পুরুষ মেয়ে মিলিয়া আমার এক শত হইবে। বেণু তাহার প্রবন্ধ পড়ে। আমি আলোচনা করি। বাহিরের লোকও বিজ্ঞাপন দেখিয়া কিছু আসিয়াছিল।—তাহার 'দুঃখ' লইয়া যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে আমি তাহার সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছি। সে এত ছোট! সহানুভূতিসূচক কত ব্যবহার—মায়ের নিকট হইতে সে পাইয়াছে। অথচ সে বলে যে সহানুভূতি না পাইলে সে কাজ করিতে পারিবে না ইত্যাদি।—এর ব্যবহারও অশোভন এদের নিয়া কি করিয়া চলিবে ঠাকুর? সামাজিক মানুষের সাধারণ শিষ্টাচার ও উদারতা পর্যন্ত ইহাদের নাই। হায় ঠাকুর, আমাকে রক্ষা কর

২১শে নভেম্বর

ঠাকুর, তবে আমি তোমার সঙ্গে এক হইব? আমাকে তোমার করিয়া লও। আমি তুমি বনিয়া যাই। আমার মন বুদ্ধি তুমি লও। আমার মনের খেয়াল ডুবিয়া যাক। ওগো আমার সারথি, আমার মন-প্রগ্রহ তুমি ধারণ কর। আমার মন তোমার হউক—'মন্মনা ভব' বাক্য আমার জীবনে সার্থক হউক। তোমাকে লইয়া যে নোংরামি চলিতেছে, তবে তাহার অবসান হইবে? আর যে আমি পারি না। কোথায় তুমি? কে তোমাকে লইয়া চলিয়াছে? ইহাদের কাছে তুমি নাই। তোমার মঠের শ্রীবৃদ্ধির জন্য কাহার দরদ আছে? যে যাহার ব্যক্তিগত সুখদুঃখ লইয়া বিভোর। তোমাকেই ভোগ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়। তোমার জীবন ও দর্শন ইহাদের কাছে মৃত। ঠাকুর, ইহাদের মধ্যে ঠেলিয়া নিলে, আমাকে বল দেও, বুদ্ধি দেও।...সন্ধ্যার পর ধীরানন্দ আসে—গত শনিবারের বক্তৃতার একটী রিপোর্ট লিখিয়া আনে। ...তারিণীবাবু আসেন, অনেক কথা হয়। বাহিরের লোকের লেখা সংগ্রহের বিপদ আছে। তাঁহারা যদি এমন লেখা দেন, যাহা ঠাকুরের মতবাদের বিরুদ্ধে যায়, তখন তাহা ছাপানও সম্ভব নয়, অথচ না ছাপাইয়াও পারা যায় না। আর নূতন একটী মতবাদ নিয়া অভিযান

করিলে পত্রিকাগুলি বাঁচা যাবে...। নিজেদের প্রচার দ্বারা আগাইয়া যাইতে না পারিলে, জনমত সৃষ্টি না করিতে পারিলে পত্রিকার স্থান পাওয়া সম্ভব নয়। কলিকাতার ধনী পাণ্ডাদের পিছনে ঘুরিলে লাভ হইবে না। আমরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইতাম তবেই শুধু আমরা পত্রিকাগুলিকে চালিয়া যাইতে পারিতাম। কিন্তু তাহাদের মিলা সঙ্ঘবদ্ধ হইবে? তাঁহারীবাবু ৯ টার পর যান।...

২২শে নভেম্বর

রাধারাণী আমার, সব সময়ে তুমি আমাকে পূর্ণ পরিচয় নারীর বন্ধন-মুক্তিই দেখিয়াছে, তোমার জীবনে তাহারা সর্বপ্রথমে নারীর মোক্ষদা মূর্তির প্রকাশ দেখিল। তুমিই মূর্তিমতী ভোগ ও অপর্ণা তোমার জীবনে ভোগাকাঙ্ক্ষা ও মুক্তি সমন্বিত হইয়াছে। তুমি আশ্চর্য মেয়ে; তোমার মত কে আছে? জীবনের সকল মুক্তিকে সফল ও সার্থক করিয়া নারীর মুক্তির খবর কে দিয়াছে? তাই তুমি আমার পরাণ পুতলী। তোমাকে পাইয়া কৃত কৃতার্থ। রেণু সকালে একবার যায় হইয়া বোধে মিটফোর্ড হইতে চেক আনে, পরে আবার ১টার পর বাহির হইয়া প্রেস, কেশব গাঙ্গুলীর ওখানে, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ঘুরিয়া ৪টার পর ফেরে। আমি একা ৪টার মধ্যে যাই। মধ্যে আজ এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। রমাপতি ও নীলরতন তাহাদের সঙ্গে পত্রব্যবিকীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাহাদের কাহারও কোনও আশা নাই! যদি ঠাকুর অবস্থার পরিবর্তন করেন, তবে যদি কিছু হয়। ইতি মধ্যে দেবানন্দ আসিয়া কটির প্রসঙ্গ তোলে। ক্ষিতীশবাবু...চিদানন্দ...। আমি ...প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলি। কে তাহা শোনে? চৈতন্য। এই বেদান্ত লইয়া কি উপায় হইবে ঠাকুর। আমাকে ইহার মধ্যে টানিয়া আনিলে কেন? তোমার কাজ কি কিছু করিতে পারিব? টাকা নাই, লোকজন নাই, প্রাণশক্তিও যে যাহার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অথচ তাহাদের কি অবস্থা। আমি খুব বেদনা লইয়া চলিয়া আসি। একাই চলিয়া আসি। উহারা আমার সঙ্গে আসিতে চাহিয়াছিল, তাহাকেও আমি নাই। মনটা বড় খারাপ হইয়াছিল। তোমার দিন তো কাজে হাত দিয়া ব্যর্থ হই নাই। তোমার পথ? একজন সকলের অমতেই একে নিয়াছিলাম। সে যে এমন তাহা তো বুঝি নাই।

২৩শে নভেম্বর

ঠাকুর, জীবনের ৭০টী বসন্ত তো শেষ হইয়া গেল তোমার জীবন ও দর্শন লইয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম, কই পারিলাম না তো তাহা ছড়াইয়া দিতে। তোমার জীবনে জীবন মিলাইয়া তোমার সঙ্গে এক হইয়া তোমার কথা কইতে দেও। চতুর্দিকে শত্রু প্রাচীর। তোমার বলে বলীয়ান হইয়া তাহা ভাঙিয়া ফেলিয়া পথ করিয়া লইবার সুযোগ দেও। তুমি যোগাচার্য, যোগেশ্বর, সুযোগ দেও। আমার সব তুমি। তোমার দর্শন যে আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। এই দর্শন প্রচারিত না হইলে আত্তি যে মরিয়া যাইবে, শুখাইয়া যাইবে। মিনু ও খুকা এটার এখানে আসে। কালকের উৎসবের জন্য জিনিষপত্র কেনা হয়। সারা দিনে প্রেস হইতে কিছু আসে না। রাত্রি ১০টায় 'স্মৃতি পূজার প্রস্তুতি' পর্যন্ত প্রুফ দিয়া যায়।...রেণু আমার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিবে বলায় শুধু বিরক্ত ক্রুদ্ধ হয়। যেখানে কোনও risk নাই সেখানে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবার কোনও যুক্তি নাই, ইহাই তাহার বক্তব্য। কিন্তু এই স্বাধীনতাই বর্তমান যুগের কাল। শতব্যবিকীর কি যে করিব ভাবিয়া কূল পাই না। মনে হইতেছিল, সমস্ত পত্রিকার কর্তৃপক্ষের নিকট আমি একটী করিয়া চিঠি দেই আমার এই আন্দোলনে সহযোগিতা করিবার জন্য। এইজন্য একটী চিঠি রেণু লেখে। আজ সাময়িকী লেখা শেষ হয়।... জিতেন কুণ্ডারী তাহার ৬১ তম জন্ম দিনে প্রণাম ও তাহার ভাই বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদ জানাইয়া এক চিঠি দিয়াছে। আজ পাইলাম ও উত্তর দিলাম। তাহার মধ্যে লিখিয়াছে, 'আমার ৬১ তম জন্মদিনে তুমি আমাকে আশীর্বাদ করিও কেননা এ দেশে সকলেই সকলকে আশীর্বাদ করিতে পারে জিতেন কুণ্ডারীর মায়ের কাছে মানুষের পাঠাইছে কতদিন তাহার কোলে শুইয়াছি।

২৪শে নভেম্বর

আমার জন্মতিথি কৃষ্ণা পঞ্চমী

ঠাকুর, তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। এই ৭০ বৎসর সযত্নে তোমার মুখ মনে রাখিয়াই চলিয়া আসিয়াছি। কত ঝড়ের ভিতর দিয়া তুমি আমাকে বুকে করিয়া রক্ষা করিয়াছ। কত আদর-অনাদর, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, উপেক্ষা-অপেক্ষা, ব্যর্থতা-সার্থকতা আমার জীবনে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, আজ সব তোমার চরণতলে নিবেদন করিয়া ৭১ তম বর্ষে যাত্রা সুরু করিলাম। বাবা নীলকমল ও মা মুক্তকেশীর কোল হইতে ছওনা হইয়া কত লক্ষ লক্ষ লোকের স্নেহপুষ্ট হইয়া এই ৭০ বৎসর বাঁচিয়া আছি তাহাদের স্নেহ সঙ্গে লইয়া আবার তোমার পথে যাত্রা করিলাম। আগামী এক বৎসরের মধ্যে তোমার শতবার্ষিক জন্মোৎসব। সারা জীবন আমাকে গৌরবের আসনে তুমি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। এবারেও করিবে জানি ও বিশ্বাস করি। ওগো ত্রিভুবনের রাজ রাজেশ্বর, আমার জন্মে তুমি জন্মলাভ কর। তোমার জন্ম হউক বেণু লেকমার্কেট হইতে ফুল ফুলের মালা কিনিয়া আনে। জন্ম আসে ৭টায়। ২টাকা সেবার জন্য দেয়।...সহ্য সম্বরাণী আসিল না, কষ্ট হইতেছিল। সুধাংশু আসে ১২টার পর। ১১টার পর শ্রীগুরুপূজা হয়।...৪টায় ইহারা আলোচনা করে আফসের পাশের ঘরে। প্রথমে বেণু তাহার প্রবন্ধ পাঠ করে, পরে প্রতিভা সুধাংশু ও সুষম আলোচনা করে। আমি আফস ঘরে ছিলাম। আলোচনার মধ্যে বিমলা আসে।...আজ তাহাকে জ্ঞান-পূর্বক তাহা পরিপাক করিতে হইবে। সীতার ঘরে সে ঢুকিতে পারিবে না। রাধারাণীর তাহার জীবনের আদর্শ।...

২৪শে নভেম্বর

ঠাকুর, আমাকে এমন নিরঞ্জন নির্মল সর্বসংস্কার বর্জিত করিয়া দেও যাহাতে তোমার স্বরূপ প্রকাশ আমার জীবনে ফুটিয়া উঠে। 'নির্গুণং পরমং সাক্ষাদুপৈতি'। আমি তোমার বহিয়া বেড়াইব, যাহাতে মানুষ আমার ভিতর তোমাকে দেখিতে পায়। দর্পণ যেমন আলোকে বহিয়া বেড়ায়, আমিও তোমাকে তেমন করিয়া বহিয়া বেড়াইব। তুমি স্বপ্রকাশ, আমি হইব তোমার 'স্ব'। আমাকে তোমার 'স্ব' করিয়া লও। তুমি আমি এক হই।...মিত্র এতদিন পর স্বীকার করিল যে তাহার রোগের মূলে অনেকখানি অন্নার জন্য বেদনা। যে আসক্তি মানুষকে ভবিষ্যতে দাঁড়াইবার পথে বিঘ্ন হয়, সে-আসক্তি তো পাপ। মেয়ে কোলে করিয়া থাকিলেই কি মা মেয়ের ভবিষ্যৎ পথ সহজ হইবে? নিজে পয়সা আনিতে না পারিলে অনন্ত দুঃখ এ সংসারে পাইতে হইবে। যে-আবেষ্টনের মধ্যে হিন্দু বিধবা লালিত পালিত হয়, সে অবস্থায় স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়াই উচিত। বিধবার লাঞ্ছনার সীমা নাই শীলতির বাবা আসেন...। ধীরানন্দ আসে। আমার কাল আসিবে ২টার পর। কর্মসূচীর একটা সংক্ষেপ লিখিয়া আনে। বেণু ঠিক করিয়া দেয়।...

২৬শে নভেম্বর

রাধারাণী আমার, জন্মজন্মান্তরের কর্মের ভিতর দিয়া আমার যে-প্রকৃতি যে-স্বভাব গড়িয়া উঠিয়াছে, তুমিই তাহার মুক্ত রূপ, বিশ্বময় রূপ। তোমার পরশে আমার প্রকৃতির বদল হউক, পুরুষোত্তম-সেবার উপযোগীভাবে গড়িয়া উঠুক, আমার রাধাস্বভাব লাভ হউক, আমি রাধা-প্রকৃতি বনিয়া যাইব। সখা সাথী নিতাগোপাল আমার, তোমার পরশে আমার স্বভাবের বদল হউক, রাধাপ্রকৃতি লাভ হউক। তুমিই তো কৃষ্ণরূপে একদিন রাধা বানাইয়া তোমার বাম পাশে দাঁড় করাইয়াছিলে। তাহা জীবনে বাস্তব হউক।... বেণু-প্রতিভার উপর এখন এখানের সব ভার। অথচ ইহাদের শরীরের অবস্থা তো এইরূপ। ইহারাই তো আজ আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। আজ যে ঠাকুরের কাজের জন্য ছুটছুট করিতে পারিতেছি, তাহাও তো ইহাদের উপর ভর দিয়া। নীলু আমার জন্মদিন উপলক্ষ করিয়া আশীর্বাদ চাহিয়া এক পত্র দেয়।...

২৭শে নভেম্বর

যোগমায়া রাধারাণী আমার, তুমিই লৌকিকী-অলৌকিকী পরাশক্তি, এযেন ওযেন একই মহাযোগিনী মায়াধারা তোমার মায়া বিশ্বতা, তুমিই transcendence-

immanence। ঠাকুর, রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত গৌর আমার, তুমিই সেতু-বিধারণ—এ দেশ ও দেশের যোগসূত্র তুমি। তোমায় ঝিঝিয়া বলিয়াছেন, 'গোপাল, তুই তো আমার ছেলে নস, তোকে দুচিয়ে পেয়েছি' এ তোমারই কাছে শোনা কথা। মনে পড়ে গোপীদের গান, 'ন ধনু গোপিকানন্দনঃ ভবান্'। তুমি আহিরীটোলার বসুদেব কুলেরও নও, পানিহাটির মাতুল বংশেরও নও। অথচ তুমি দুই কুলের, দুই কুলের অতীতও। তোমার জন্ম লৌকিক অলৌকিক মাঝানো। 'বিজ্ঞানম্ অধিজ্ঞানম্'। ...মঠের সংস্কার বিষয়ে আমার উপর নির্ভর করিতে চিদানন্দকে বলি। সুশীলাকে ডাকিয়া আলোচনা করি।... সে ৫০০৲ টাকা দিতে বলিল

২৮শে নভেম্বর

ঠাকুর, তোমার জীবন ও দর্শন লইয়া আমি দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছি। তোমার তো কত আছেন আমার কি একটি দ্বার? আমি যে বড় দুঃখে দিন কাটাই। তুমি আমাকে দ্বার মুক্ত কর। তোমারই— ৫৫ টাকার টাকার মহিমা তুলিবে। তোমার এই দান শুনাইয়া যাইবে? তাহাদের কি দেখা হয় না? আমার যে কিছু নাই। তোমার সুশীলা ৫০০ টাকা দিতে বলিয়াছে। সে তো দেবে। সে আরও কত দিয়াছে। এইরূপ না হইত কিছুটা যদি সরলে করিত, তবে তো কাজ চলিয়া যাইত। তুমি কি তাহাদের বুদ্ধি বদলাইতে পার না? কোথায় টাকার জন্য যাইব? আমাকে তুমি বানাইয়া লও। তোমার শক্তি হইয়া তোমার কাজ করিব।...রাধারমণ বসু পত্রিকাটির জন্য ১০০৲ টাকা দেন। সভায় তাঁহার এই দানের কথা ঘোষণা করা হয়। তাঁহার শ্মশানে যাইবার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। সভার কত খরচ লাগিবে তাহার একটা estimate করার বিষয় আলোচনা হয়। তারিণীবাবু উপস্থিত নাই, অনরঞ্জনবাবু ছিলেন। আমি কার্যের দুরূহতা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেই ...আমরা কাজাল; সঙ্ঘবদ্ধ হইলে রাজাদেরও অনেক কিছু করিতে পারেন। যাহাদের হাতে vested interest আছে, নিত্যগোপাল তাহাদের এড়াইয়াই চলিতেন। তিনি ছিলেন 'man-movement'-এর প্রবর্তক। হিমুখান ষ্টাণ্ডার্ডের রাধারমণবাবু শেষের দিকে আসেন। তাঁহার নিকট ঠাকুর যে কত বড় স্বাধীনতার উপাসক তাহা বলা হয়। আত্মিদর্পণ, সিদ্ধান্তদর্পণের কিছুটা অংশ তাঁহাকে শুনানো হয়। তিনিও বলেন নিত্যগোপাল খুব বড় revolutionery ছিলেন। সত্যই তাই।...

২৯শে নভেম্বর

ঠাকুর, জাগো মহাসমাধি নিদ্রা হইতে আমার জীবনে, বিশ্বের জীবনে। রক্তরঞ্জিত ধরা, সংঘর্ষে সংঘর্ষে ক্লান্ত ধরা তোমায় ডাকে। এস তুমি প্রাণ-সাধনা লইয়া, নবজাতিলক্ষ্য গড়িয়া তুলিবার জন্য। সকল সমস্যার সমাধান তুমি ছাড়া কে এই বিপন্ন বিশ্বকে রক্ষা করিবে? তুমি নিজের পরিচয় নিজেই রাখিয়া গিয়াছ। পুরুষোত্তম-স্তবের ক্রম বিবর্তনের ধারায় কোথায় তোমার স্থান তাহা সবই লিখিয়া গিয়াছ। তোমার লিখিত পূজাবিধিতে 'ধারপূজাম্ আরভেত' (?) বাক্যের পর 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ' ইত্যাদি বাক্যধারা কি ইহাই বুঝায় না যে গৌর-সুন্দরের পরবর্তী তরই তুমি, শ্রীগৌর তোমারই দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া? তুমি নিজ মহিমায়, নিজ সুষমায় ভাস আমার জীবনে। রেণু ১টার পর রাইটার্স বিল্ডিং, নীহার যায়, শ্রীশ দাস, প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করিয়া ফেরে ৩টার পর। কিন্তু পূর্বে অন্নদের রান্না আসে।...অতীতকে বর্তমান যুগের উপযোগী করিবার দিন আজ আসিয়াছে। কম্যুনিজম অতীতকে মুছিয়া ফেলিবার জন্য উদ্যত। ৩টার পর আমি রেণু ও সোমা মঠে যাই।...'তব দ্বারা আসিবেক আমার দুয়ারে'—মহাপ্রভুর এই কথা আমি প্রায়ই বলিতাম। মহাত্মাজী আমার বাসায় দুইবার পদার্পণ করিয়াছেন। ইহাতে তিনিও ধন্য, আমিও ধন্য। তিনি ধন্য যে আমার মত এত ছোটর বাড়ীতে আসেন। আমি ধন্য যে আমার বাড়ীতে তিনি আসেন। দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা হইয়াছে ঘরিশাল কনফারেন্সে। তাঁহাদের নিজ দুয়ার খুলিয়া রাখিয়াছিলেন আমাদের জন্য। 'স্রোত রুদ্ধের উপাখ্যান মঠে বলি। বিধায়ীর দুয়ারে আসিলেই ভগবানের মর্যাদা বাড়ে। আমি লাট সাহেবের বাড়ী

যাইব না। আমরা এমনভাবে জনসাধারণকে লইয়া আন্দোলন করিতে পারি যাহাতে সকলে আসিতে বাধ্য হইতে পারে।...

৩০শে নভেম্বর

ঠাকুর, তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় করিয়াই বিশ্বসভ্যতা বিকশিত হইতেছে কিংবা সারা বিশ্বের ভালোগুলা তোমাকেই তাহারা সকল অঙ্গ নিংড়াইয়া গড়িয়া তুলিতেছে। তুমি বিশ্বদুলাল, বৈশ্বানর। তুমি আত্ম-প্রতিষ্ঠ। যত দিকে যত দেশে যত আন্দোলন বিশ্বকে নাড়াচাড়া দিতেছে, তাহার ভিতর দিয়া তুমিই আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছ ইহা আমি উপলব্ধি করিতেছি। তোমার মত কেহ তো মানুষের এমন ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকার করে নাই। তুমি অলৌকিক, তুমি লৌকিক। তোমার জয় হউক। ঠাকুরের জীবনী অংশ বেণুর সঙ্গে একত্র হইয়া লিখিলে ভাল হইত। আমার ভাষা তো ভাল নয়। সে মিষ্টি করিয়া লিখিতে পারিবে। তবের আলোকেই তো লিখিতে হইবে। বেণু বিজ্ঞাপনের বাকি-পড়া টাকা আদায়ের জন্য কতকগুলি চিঠি লেখে, বাহির হয় না।...বিশ্বনাথ কালীও কিছু করিতে পারে নাই। এখানে আমার সঙ্গে মিলিত হইয়া বেণুর সহযোগিতায় কাজ করিবার জন্য আজিও বলিলাম। বিনয়বাবু (আমহার্ট ষ্ট্রীটের) আসে, তাহাকে 'শ্রীনিতাগোপাল' ছাপাইবার জন্য দেওয়া হয়। ৮পৃষ্ঠা ছাপা খরচ ১ হাজারে ২০টাকা, পরবর্তী হাজারগুলি ৬টাকা করিয়া।

ঠাকুর নিজের সম্বন্ধে যে লেখা লিখিয়াছেন, তাহার আলোচনা করি...'বেদ এই মহাপুরুষকে 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' বলিয়া পূজা করেন'। নিজের 'ব্রহ্মত্ব' এমন স্পষ্টভাবায় কেহ কি শ্রীকৃষ্ণের পর করিয়াছেন? তাঁহাকে পাইয়াও আমরা গর্জন করিতে পারিতেছি না? তিনি নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হইবেন। নিশ্চয়ই সারা পৃথিবী তাঁহাকে স্বীকার করিয়া ধন্য হইবে। যাহা সত্য তাহা বিকাইবেই, নিতাগোপালের প্রকাশ ঠেকাইবে কে? তিনি যে দেবাধিদেব মহাদেব, সত্যং শিবং সুন্দরম্। নলিনী ও মীরার চিঠি আসে। ১লা ডিসেম্বর

ঠাকুর, তোমার লিখিত মন্ত্র যেন তোমাকেই অয়মাত্মা ব্রহ্ম বলিয়া পূজা করিতেছে। তুমিই আমার আত্মা, তুমিই আমার ব্রহ্ম। সত্যই তুমি বেদের 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি'—মহাবাক্যগুলির বাচ্য ও লক্ষ্য। কতদিন তোমাকে দেখি নাই, কত বৎসর তোমার কথা শুনি নাই, কত কাল তোমার স্পর্শ লাভ করি নাই। দেখা দেও, কথা কও, আমাকে স্পর্শ দেও; আমার চক্ষু তোমাকে খুঁজিয়া বেড়ায়, সারা দেহ তোমার স্পর্শ লাভের জন্য কাতর। কত দিন এমন করিয়া কাটাইব? দিন যে গেল। দেখা দেও, কথা কও, আমায় আর একবার তোমার স্পর্শ দিয়া ধন্য কর ...আমি উষাজিনী ও প্রতিভা মঠে যাই।...৪॥টায় 'মাতৃসঙ্ঘ ঔষধালয়' খোলার অনুষ্ঠান ঠাকুরের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে বীরানন্দ স্বস্তিবাচন পাঠ করে, পরে চৈতন্য গান করে। আমি উঠিলে ঠাকুরের শেষ উপদেশ বেণুকে দিয়া দুইবার পড়াইয়া আলোচনা করি। কালিকানন্দের কলেরা হওয়ার পর মঠে স্থান না হওয়া, হাসপাতালে মৃত্যুর কথা বলিয়া বেদনা প্রকাশ করি, ঠাকুর এই সব প্রতিষ্ঠান চান। তিনি যে প্রাণ লইয়া আসিয়াছিলেন। শুধাংশু ডাক্তার উপস্থিত ছিল, তাহাকে প্রধানী ফুল আমি দেই: ঔষধের বাক্স ঠাকুরের কাছেই ছিল। আমরা ও বাহিরের কেউ কেউ ঔষধ নেয়। ঔষধ অফিস ঘরের বারান্দায় বসিয়া বিতরণ করা হয়।... অনিল সমাজবার আগে আমার আসার কিছু পূর্বে। অনেক কথা হয়।...

২রা ডিসেম্বর

ঠাকুর, আমার আবেগটিকে তুমি পরাপ্রকৃতিতে গড়িয়া তোল। উহা অপরা প্রকৃতি বলিয়াই না এমন করিয়া পরাস্ত করিতে পারে? 'যঃ অস্ত্রময় আত্মনঃ সর্বং বেদ সর্বং তং পরাদাৎ'। যে আমার 'অস্ত্র' বলিয়া সর্বকে দেখে, সর্ব তাহাকে পরাস্ত করে। আমি সর্বকে আমার অস্ত্র বলিয়া দেখিব না। কিন্তু প্রকৃতি যদি স্বাধীনকর্তৃকা না হয়, তবে তো উহাকে 'অস্ত্র' বলিয়া দেখা ছাড়া গতিও থাকিবে না। আমার প্রকৃতি মুক্ত হউক, স্বাধীন কর্তৃকা হউক। আমিও কেবল হই,

আমার প্রকৃতিও কেবলা হইত। আমি ও আমার প্রকৃতির সমস্ত বক্রত্ব পরিত্যাগ করিয়া সরলীয় রূপে পরিণত হইত জীবনে ব্রজলীলা আস্বাদিত হইত। ... - তাহার নিজের নামে লিখ করিয়া আনিয়াছে,—ইহা খুব পছন্দ করে নাই। নামের ভক্ত হইলে কি পাগল। এইভাবে নাম থাকে না, রাম-নামে আছে, কৃষ্ণ-নামে আছে, কেননা রাম-জীবন ছিল, কৃষ্ণ-জীবন ছিল। ঠাকুরের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শ্যামসুন্দরানন্দ নাকি আমাদের চলিবার ধারা অনুমোদন করে। ভাল কথা। ঠাকুর কৌশলে আমাকে মহানির্বাণ মঠের মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন কি তাঁহার প্রয়োজন বুঝি না। আমি কি সব দিক দিয়া মানাইয়া চলিতে পারিব? বেণু ১১ টার পর পোষ্টাফিসে দেরী উদ্বোধনের জন্য দিয়া আসে। বিনয়বাবু 'শ্রীনিত্যগোপাল' লেখাটির প্রুফ দিয়া যান....।

৩রা ডিসেম্বর

ঠাকুর, সারা জীবন আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ বলিয়াই আমি আজিও চলিতে পারিতেছি কি বড় ঠেলিয়া না চলিলাম! এত ঝড়েও যে উৎপাটিত হই নাই, মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছি, সে শুধু তোমারই সঙ্গের ফল ওগো আমার মহানির্বাণ, তোমার করুণার মাঝে, তোমার আদরের মাঝে, (?) মাঝে, আমার প্রতি তোমার করুণ নয়নের চাহনির মাঝে আমি ডুবিয়া যাইব, মিলিয়া যাইব। থাকিবে শুধু তুমি, তুমি। যৌবনে তোমার সাক্ষাৎ সেবা করিতে পারিলাম না, আজ এই আধা দেহ লইয়া কেমন করিয়া তোমার কাজ করাইবে তুমিই জান।....বেণু নিত্যগোপাল আখিলীলা লিখিতে আরম্ভ করে, ঠাকুরের জীবনী অংশ বেণু লিখিলেই ভাল হইবে।....বড় লোকের কাছ হইতে প্রবন্ধ সংগ্রহ করাও তাহার মত নয়। ইহার মধ্যে ইহাদের একটা জড়তা থাকিতে পারে—এই দিক দিয়াই হয়তো তাহাদের আপত্তি।....

৪ঠা ডিসেম্বর

ঠাকুর, তুমি আমার জীবনের প্রতি তন্ত্রীর সঙ্গে, প্রতি স্পন্দনের সঙ্গে এমনই জড়াইয়া আছ যে আমি বিশ্ব-রূপের পথে চলিতে বাধা হইতেছি। আমি বাষ্টি সত্তা, তুমি আমার সমষ্টি সত্তা তুমি আমি সম প্রাণ। বন্ধু আমার, কি এক নিবিড় বন্ধন তোমার সঙ্গে আমার প্রতি অণু পরমাণুতে। তুমি ছাড়া 'আমি'-র কোনও অর্থই হয় না। তুমি আমার সার্থকতা। কেমন করিয়া তোমাকে বিশ্বের সামনে প্রকট করিব? ধন নাই, জন নাই, তাহারও আশা-উৎসাহ নাই। তোমার উৎসবের উপযোগী অর্থ সংগৃহীত হইবে, কেহ তো এইরূপ আশা করে না আমি কি উপায় করিব? পথ দেখাও। বেণু 'শ্রীনিত্যগোপাল-আখিলীলা' লেখে। লাইব্রেরীর স্থান সম্বন্ধে কার্যকরী সমিতিতে (মঠের) আলোচনার পর তাহারা যা হয় বলিবেন। আমরা এমন কিছু আরম্ভ করিতে পারি না যাহাতে তাঁহারা অসন্তুষ্ট বিরক্ত হইতে পারেন। উদ্বোধনে ঠাকুরের যে জীবনী অংশ (বেণুর লেখা) বাহির হইয়াছে, তাহাই পুস্তকাকারে ৪ হাজার বিনামূল্যে বিতরণের কথা হয়।...

৫ই ডিসেম্বর

জীবন-বল্লভ নিত্যগোপাল আমার, আমি তোমায় জীবনে জীবন লাভ করিব, তোমার সর্বসময়-মূর্তিকে জীবনে বরণ করিয়া আমিও সর্বসময়-মূর্তি হইব। তুমি বিশ্ব নাগরিক, আমি বিশ্ব নাগরিক হইব। তোমার মত গভীর ও ব্যাপক জীবন আমার হউক। তোমাকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার মত বুকের বল আমার লাভ হউক: তুমি আমায় আমি তোমায়, তুমি আমি আমি তুমি।.....বেণু নিত্যগোপাল আখিলীলা শেষ করে।...৩টায় আমি মঠে যাই।... ৪টায় সভা আরম্ভ হয়। ৭৪ জন উপস্থিত হইয়াছিলেন, বাহিরের লোকও ছিলেন। প্রথমে চৈতন্যের সঙ্কীর্তন, পরে ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিছু বলিতে বলি। তিনি বলেন, নারায়ণ বেদব্যাসের আশ্রমে গিয়া বলিয়াছিলেন, 'এ কি নিবাসালয়? ব্রহ্ম-ঘোষ কোথায়?' মহানির্বাণ মঠ হইতে সেই ব্রহ্ম-নির্ঘোষ তুলিতে হইবে। বিবিধতন্ত্র হইতে 'এই মহাপুরুষ সমুদ্র তুল্য' অংশটী পড়া হয় ও ব্যাখ্যা করা হয়। ধীরেনবাবুকে বেণুর লেখা ও ছাপা

'শ্রীনিত্যগোপাল' পড়িয়া শুনান হয়। উহা বিস্তৃত করাও হয়। 'সমন্বয়মূর্তি' পদ ব্যাখ্যা করি। শ্রীনিত্যগোপাল সকলের গুরু। আমাদের গুরুকে কাহারও উপর চাপাইবার দুর্বুদ্ধি আমাদের নাই। ধীরেনবাবু বলেন, একটী philosophical revolution না হইলে বর্তমানের সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের কোনও মীমাংসা হইবে না। নিত্য-গোপাল সেই revolution নিয়া আসিয়াছেন। আমি ও প্রতিভা পরে আসি, ইহারা আগে আসে। মাখনবাবু আসেন।

৩রা ডিসেম্বর

ঠাকুর, কেমন করিয়া যে তোমায় জন্ম-উৎসবকে বলিদানোৎসব ছড়াইয়া দিব, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কাহারও কোন উৎসাহ নাই সব নিরুৎসাহ... এতে তাহার প্রমাণ মিলে। তাহার জন্মোৎসব উপলক্ষে রূপায় কুপা, রূপায় পাটী দিয়াছে। আর তোমার জন্ম-উৎসব? যে যাহার জন্ম নিয়া থাকুক তোমার আবার জন্ম কি? তুমি তো অজ। তোমার জন্ম থাকিলেই ভাল হইত। জানিয়া শুনিয়া যে-অকূল ভাসাইয়াছ যাহা হয় হউক, কোন দিন আমাকে তো অসহায় করনাই ...আমি ৪টার পর মঠে যাই। মঠে রামপ্রসাদ সাহা নামে একটী যুবকের সঙ্গে আলাপ, সে কালিকার সভায় ছিল ও চাঁদা আদায়ের রসিদ বই নিয়াছিল। সে আজ ৫ টাকা আনিয়া দিয়াছে। ছেলেটী কাজ করিবে বলিয়া মনে হয়। তারাপদবাবু আজ মঠে ফিরিয়াছেন। পেণ্ডাবু, ফিরোজ, রমাপতি, নীলকণ্ঠ, চিরাজদের কাছে আমার জীবনে—ঠাকুরী ভাবের পর কলিকাতায় যোগাড় লিখিবার জন্য টাকা সংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যোদয়িকাল সোসাইটীতে বক্তৃতা দান, সতীশ সেনের আমাকে ধীরেন বস্ত্রের বাড়ীতে নিয়া যাওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে—ঠাকুর কেমন করিয়া কোলে করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা চোখের জলে আলোচনা করি। সুশীলা কি কথায় জন্য আমার এখানে আসিয়াছিল, আমি তখন মঠে।...

৭ই ডিসেম্বর

ঠাকুর, তোমার অনন্ত স্নেহ অনন্ত করুণার সন্ধান করি নাই, অপমানই করিয়াছি, তাই কি তুমি অভিমানে আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছ? কতদিন দেখি নাই, কত দিন তোমার মধুমাখান আহ্বান শুনি নাই। কণ্টকাকীর্ণ এই দুর্গম পথ বাহিয়া চলিয়াছি, তুমি তো আজিও আড়ালিয়া রহিয়াছ। নইলে তোমার ধরার ধূলিতে মিশিয়া যাইতাম। তুমি আমার লক্ষ্মী ঠাকুর, অনন্ত ক্ষমা তোমার। তাই তুমি আজিও আমাদের কোলে করিয়া রাখিয়াছ। তোমার স্নেহ আমাদের জীবনে অফুরন্ত হউক। আমরা তোমার কাছে ধরা দিব, ইহাই আজিকার সঙ্কল্প ...৬টার পর মঠে যাই। অনন্তজন-বাবু..... সুশীলা... ডিসেম্বরে কোনও প্রোগ্রাম হাতে উত্তোলিত না হইতে বলি নিত্যের কাছে আত্মসমর্পণ হইয়া যাইতে পারিলে সকল সম্পদের মীমাংসা হয়। বৃন্দাবন যাইব—পথে মোগলসরাইতে তাহারও সঙ্গে জগন্নাথ করিয়া মাথা কাটাইয়া হাসপাতালে যাইবার ঘটনার মানুষ আমি নই, তারিণীবাবুর এখানে আসার কথা ছিল, আসা হয় নাই এতকাল ঠাকুরের দর্শনই রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে বলিয়াছে ঠাকুরকে গোপনেই রাখিয়াছি। তাঁহার নাম বলিবার সময় ও সুযোগ হয় নাই জীবনের শেষকালে আজ তাকাইয়া থাকিতে হইবে, আমার যা কিছু গৌরব সবই তাঁহার অ নীর্বে [illegible] যাহাকে আড়ালে রাখিয়াছিলাম, শেষ কটা দিন তাঁহার কথা বলিয়া যাইব ও যে গুরু-ভাইদের এতদিন বিদ্যোদয়িকাল সোসাইটীতে গিয়া আমার কলিকাতার প্রতিষ্ঠা গড়িয়া তুলিয়াছিল, আজ আবার তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি। অতীতে যাহারা আমার সহযোগিতা করিয়াছেন, আজ এই যাত্রাপথে তাহাদের সহযোগিতা আবার কামনা করিব। তাহাদের কাছে একটী চিঠি লিখার কথা ভাবিতেছি।

৮ই ডিসেম্বর

পরাণপুতলী রাধারাণী আমার, তোমার জীবনে বিশ্ব-প্রকৃতির পরম রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। প্রকৃতি যে পুরুষের কাছে অবশ, এতদিন এ তত্ত্ব কেহ জানিত না। তুমি না আসিলে আজিও কেহ জানিতে পারিত না।

কুরুক্ষেত্র তোমাকে পান নাই। গৌরবরূপে তিনি কাঁদিয়া আকুল তোমার প্রেমে, পরম পুরুষ তোমাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল। এই ব্যাকুলতারই অভিব্যক্তি ঐ পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র সংগঠন। তোমাকে পাইতে হইলে তোমার প্রতি স্পন্দনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিতে হইবে। এই অনুপ্রবেশের ফলেই পরিবার সমাজ রাষ্ট্র ও বিশ্ব গড়িয়া উঠিবে। তাহার জন্য কুক্ষের উদ্গ্রীবতার ফলই হইল বিশ্ব-লক্ষ্য রচনা।...রামপ্রসাদ আজ ১১ টাকা donation সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। কোনও একটি স্থিতিভূমিতে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া সকলের প্রতি সম ও সহজ ব্যবহার করিয়া যাইলে পথ পরিষ্কার হয়, সকলেই ধীরে ধীরে পথে আসিতে থাকে হয়...। বর্তমান সঙ্কট মুহূর্তে ঠাকুরের যে কত প্রয়োজন, যত দিন যাইতেছে বুঝিতেছি। মহা নির্বাণ মঠ হইতে যাত্রা সুরু করিতে হইবে। ঘরে ঘরে ঠাকুরের দর্শন ও জীবন ছড়াইয়া দিতে হইবে। নূতন করিয়া গীতা ব্যাখ্যা বিলাইতে হইবে।...

১৯ই ডিসেম্বর

বিশ্বের কর্ণধার নিতাগোপাল আমার, দুইটি একান্ত বিরুদ্ধ সভ্যতার সঙ্ঘর্ষের ফলে উদ্ভূত উত্তাল তরঙ্গের মাঝখানে পড়িয়া বিশ্ব-তরণী আজ ডুবিতে বসিয়াছে। এই তরাডুবি হইতে কে রক্ষা করিবে জড়-অজড় সমন্বয়-মূর্তি তুমি ছাড়া? কংগ্রেস ভারতীয় প্রাচীন অজড়ীয় সভ্যতা হইতে অনেকটা কার্যতঃ সরিয়া আসিলেও মূলতঃ সে এখনও অজড়বাদী। তাই তাহার সঙ্ঘের লোকেরা তাহাকে আজ ছাড়িয়া দিতেছে। তাহার সত্যিকার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছে কম্যুনিজম, কিন্তু যে-দর্শন থাকিলে সে কম্যুনিজমকে পরিপাক করিতে পারিত, সে-দর্শনের খোঁজও সে পায় নাই। তোমার কাছে রহিয়াছে সেই দর্শন। তোমার অনুগত না হইলে উহা তো পাওয়া যাইবে না। তোমার দর্শন বুকে লইয়া আমাকে আবার ঝাঁপাইয়া পড়িবার, আলোড়ন তুলিবার শক্তি দেও।

৯টায় তারিণীবাবু মঠ হইতে আসেন। তাঁহাকে ঠাকুরের জীবনী-অংশ শোনানো হয়, আর আমার চিঠিটা। আজ বাগানের মুলকপি ঠাকুরকে দেওয়া হয়। স্থানে স্থিত থাকিয়া উদারতা কর্মকুশলতা ও সহজতা নিয়া চলিলে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেরী হইবে না।...আমি আমার মত ঠাকুরের নামে চালাইতেছি এইরূপ একটা কথা চৈতন্য প্রভৃতি বলিতে চায়। তাহা তো নয়। আসল কথা এই মত প্রচারিত হইলে তাহাদের বলিবার সুযোগ থাকে না, তাহারা ধরা পড়িয়া যায়, জনসাধারণের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হয়। এ যে বড় কঠিন ঠাঁই। নীলুর এক পোষ্ট কার্ড আসে, টেস্ট হইয়া গিয়াছে, পাশ করিবে -- প্রতিভা বালসরা যায় তাহাকে সঙ্গে করিয়া কর্মসূচী ও শ্রীনেতা-গোপাল বিলি করিতে। সন্ধ্যার পর উত্তরে ফেরে।--

১০ই ডিসেম্বর

ওগো প্রাণ, মহাপ্রাণ, বিশ্বপ্রাণ নিতাগোপাল আমার, মন বুদ্ধি অহঙ্কারও যখন ঘুমায়, তখন তুমিই জাগিয়া থাক। 'কো জাগর্তি'—এই প্রশ্ন বিশ্বে বারবার উঠিয়াছে। উত্তর —'প্রাণই জাগে'। তোমার ঘুম নাই, শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই। তুমিই বিশ্বের শেষ অধিষ্ঠান, প্রেম বস্তু। কামের অধিষ্ঠান হইতেছে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি। তুমি তাহারও উপরের বৃহৎ ব্রহ্ম 'প্রাণ-পরীয়ানিত্য'। প্রাণধর্মে আমি ধন্য হইব, প্রাণ দিয়া চলিব, ছুটিব, প্রাণ দিয়া সব কিছু ব্যাপার নির্বাহ করিব। প্রাণের মধ্যে ফাঁকি দিবার কোন প্রবৃত্তি নাই। প্রাণই নিরেট সত্তা। যে-বুদ্ধি বা যে-মনের প্রাণ নাই, সে-বুদ্ধি বা সে-মনই তো বিশ্বে যত কিছু অনর্থ সৃষ্টি করে। তোমার জয় হউক বিশ্বের সব ব্যাপারে। সকালের দিকে সভাগৃহ আসে।...আগামী বুধবার (শুক্লা একাদশী) নীতাজয়ন্তীর সভা মঠে হইবে বলিয়া সোমবার পত্রিকাগুলিতে খবর দিতে বলিয়া আসি।

১১ই ডিসেম্বর

ক্রমশঃ

সাময়িকী

নরনারায়ণ আশ্রম-শোকসংবাদ : শ্রীযুক্তা প্রতিভা রায়ের পরলোক গমন :—বিগত ২রা জানুয়ারী ১৯৬৭ (১৭ই পৌষ ১৩৭৩) সোমবার রাত্রি ৯টায় নরনারায়ণ আশ্রম-সেবিকা শ্রীযুক্তা প্রতিভা রায় তাঁহার সাধনোচিত প্রয়াণ লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় সত্তর হইয়াছিল। চলিয়া যাইবার আগে দুইদিন সর্বক্ষণ তিনি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের নামরূপ ও নামশ্রবণ এবং শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-লিখিত গীতাপাঠ শ্রবণ করিয়াছেন। ক্যান্সার রোগের তীব্র যন্ত্রণাও তাঁহাকে তাঁহার ইষ্টনাম শ্রবণ মনন ও শ্রবণ হইতে বিরত রাখিতে পারে নাই। সোমবার দিনও তিনি বলিয়াছেন, ঠাকুরের নাম মনে করিবার জন্য আমার স্মৃতি এখনও ঠিক আছে, তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার চোখে এখনও দৃষ্টি আছে। শেষের আট নয় ঘণ্টা তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং সেই ঘুমের মধ্যেই তাঁহার জীবন-দীপ নির্বাপিত হইয়া যায়। মৃত্যুর ৮।৯ দিন আগে মাত্র ধরা পড়িয়াছিল যে তাঁহার রোগটী ক্যান্সার। তিনি মাত্র আড়াইমাস মত রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া ইহার হাত হইতে রেহাই পাইয়াছেন।

১৯৩২ এ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ তাঁহার জীবন-দেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের জীবন ও দর্শন মানুষের সামনে তুলিয়া ধরিবার জন্য নরনারায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। জগৎই ব্রহ্ম—জগতের প্রতিটী বস্তু, প্রতিটী সম্পর্ক ব্রহ্মবস্তু—এই কথাটী আয়ত্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিজের জীবনের আচরণদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতেই শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের আবির্ভাব এবং শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের নরনারায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা। প্রতিভাদি এই নর-নারায়ণ আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামিজীর সান্নিধ্যে আসেন ১৯৩২-ই। শ্রীনিত্যগোপালের নাম ও তাঁহার সম্প্রদায়ে আশ্রয় লাভ তিনি ইহার অনেক পূর্বেই করিয়া ছিলেন। কিন্তু জীবন-জিজ্ঞাসা জর্জরিত প্রতিভাদি পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের আশ্রয় লাভ করিয়া শ্রীনিত্যগোপালের জীবন-দর্শনে তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তর পাইয়াছিলেন এবং জীবনে শান্তি পাইয়াছিলেন। অন্তরের সেই শান্তি লইয়া প্রতিভাদি শ্রীনিত্যগোপাল, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ও তথা মানুষের সেবা কাজের জন্য নিজেকে ও আবেষ্টনকে তৈরী করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। দীর্ঘ কয়েক বৎসর নিজের বাড়ীতে থাকিয়াই তিনি শ্রীমৎ স্বামিজীর নিকট যাতায়াত করিয়াছেন, তাঁহার নিকট পড়াশুনা করিয়াছেন, তাঁহার কাজ করিয়াছেন। কখনও কখনও সাময়িকভাবে আশ্রমে থাকিয়াছেন। ইহার পর ১৯৪২ সন হইতে তিনি আশ্রমেই থাকিতে থাকেন—বৎসরে দুইবার তাঁহার মেয়ের নিকট যাইতেন। চলিয়া যাইবার পূর্ব পর্যন্ত এইভাবেই তিনি নরনারায়ণ-আশ্রম দেবতা এবং নর-নারায়ণ আশ্রমের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

স্কুল কলেজের শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ প্রতিভাদির হয় নাই বটে এবং ইংরাজীও তিনি জানিতেন না বটে কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি ছোটবেলা হইতেই তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা এত বেশী ছিল যে তিনি যত বই পড়িয়াছিলেন তাহা বর্তমান সময়ের একটী সাধারণ গ্রাজুয়েট ছেলেমেয়েও পড়ে না। শ্রীমৎ স্বামিজীর নিকট আসার পরে তাঁহার লেখার অভ্যাসও হয়। শ্রীমৎ স্বামিজীর চিন্তাধারা উপস্থিত করিয়া তিনি 'নারীপ্রগতির ভূমিকথা' বলিয়া একখানা চিন্তাশীল বই লিখিয়াছেন এবং শেষে চলিয়া যাইবার বৎসর খানেক আগে শ্রীমৎ স্বামিজীর একখানি জীবন চরিতও লিখিয়া গিয়াছেন।

ইহা ছাড়াও তাঁহার ছোটখাট অনেক লেখাই আছে।

প্রতিভাদি চলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের কাজ করার জন্য লোক এখনো কম, তথাপি তাঁহারা প্রতিভাদিকে লইয়া গেলেন। তাঁহাদের ইচ্ছার জয় হউক, তাঁহাদের জীবন ও দর্শন কি ভাবে মানুষের সেবায় লাগিবে, তাহা তাঁহারাই বুঝিবেন। আমরা যেন সে ইচ্ছাকে শান্ত মনে গ্রহণ করিয়া দেবা কাজে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারি। প্রতিভাদির সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া আমরা বেদনা বোধ করিতেছি। প্রার্থনা করি এই শোক যেন আমাদিগকে শুচিতা প্রদান করে, আমরা যেন শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ইচ্ছাকে জয়যুক্ত করিতে অধিকতর দৃঢ়চেতন হইবার শক্তি অর্জন করি। প্রতিভাদির আত্মা শান্তি লাভ করুক—এরূপ কথা মনে করার প্রয়োজন নাই—তিনি তাঁহার সানন্দোচ্ছল গীত গাহ করিয়া আনন্দের সঙ্গে আনন্দের মধ্যে চলিয়াছেন—আমরা শুধু তাঁহাকে আমাদের প্রীতি ও প্রণতি নিবেদন করিতেছি, তাঁহাকে আনন্দময়ের পথে অগ্রসর হইতে বলিয়া আমাদের প্রাণ তাঁহার সঙ্গে যুক্ত করিয়া নিজেদিগকেই ধন্য করিতেছি। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল জয়যুক্ত হউন, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ জয়যুক্ত হউন, সর্ব মানব জয়যুক্ত হউন!

নবনারায়ণ আশ্রম আরও একটি মৃত্যু-শোক বহন করিতেছে। প্রতিভাদির মৃত্যুর মাত্র পাঁচ মাস আগে গত ১০ই আগস্ট ১৯৬৮-তে নবনারায়ণ আশ্রমের আর একজন কর্মী শ্রীমতী নলিনী বিশ্বাস দুই আড়াই বৎসর মত ক্যান্সার রোগে ভুগিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তিনি তের বৎসর নবনারায়ণ আশ্রমে ছিলেন। কর্মে তিনি খুব দক্ষ ছিলেন। দীর্ঘ রোগের কষ্টে তাঁহাকে হারাইয়া আমরা বেদনা বোধ করিতেছি। শ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহাকে তাঁহাদের ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন ইহাই আমাদের সান্ত্বনা। সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়া শ্রীনিত্যগোপাল শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ জয়যুক্ত হউন!

"...শুধু দুরন্তদের আঘাতের মতো আগুনি বন্যাকে ঘটে করে, ছাই করে ফেলে—সে তো সৃষ্টি করে না। মানুষের অন্তঃকরণ ধৈর্যের সঙ্গে, নৈপুণ্যের সঙ্গে, দৃষ্টির সঙ্গে এই আগুনে কঠিন উপাদানকে গলিয়ে আপনার প্রয়োজনের সামগ্রীকে গড়ে তুলতে থাকে। দেশের এই অন্তঃকরণকে সেদিন জাগানো হল না, সেইজন্য এতদিন একটা দুরন্ত-বেগ থেকে কোনো একটা স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারল না।...নিজের সৃষ্টিশক্তির দ্বারা দেশকে নিজের করে তোলবার যে আহ্বান সে খুব একটা বড়ো আহ্বান।...

বহুদিন ধরে আমাদের পলিটিক্যাল নেতারা ইংরেজি-পড়া দলের বাইরে ফিরে তাকান নি...। তার মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের প্রতি যথার্থ দরদ দেখা যায় নি। এমন সময় মহাত্মা গান্ধী এসে দাঁড়োলেন ভারতের বহুকোটি দরিদ্রের দ্বারে—তাদেরই আপন বেশে এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। এ একটা সত্যকার জিনিস...। সত্যের যে কী শক্তি, মহাত্মার কল্যাণে আজ তা আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি; কিন্তু চাতুরী দ্বন্দ্বে ভীরু ও দুর্বলের সহজ ধর্ম...। সেইজন্য আজকের দিনেও দেশের অনেক বিজ্ঞ লোকই মহাত্মার চেষ্টাকেও নিজেদের পলিটিক্যাল জুয়াখেলার একটা গোপন চালেরই সামিল করে নিতে চান। বিশ্বাস জীর্ণ তাদের মন এই কথাটা কিছুতেই বুঝতে পারে না যে, প্রেমের দ্বারা দেশের হৃদয়ে এই যে প্রেম উদ্বেলিত হয়েছে এটা একটা অবস্থার জিনিস নয়—এইটেই মুক্তি, এইটেই দেশের আপনাকে পাওয়া—ইংরেজ দেশে আছে কি নেই এর মধ্যে সে কথার কোনো জায়গাই নেই। এই প্রেম হল স্বপ্রকাশ, এই হচ্ছে হাঁ।"

—রবীন্দ্রনাথ

সংসার কাহাকেও বাধা দেয় নাই, সংসার সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা, মিথ্যা বিভীষিকাই আমাদের বাধা দিতেছে।...বিশ্বকে ভালবাসাই যে সংযম, ব্রহ্মচর্য; অথচ এ ব্রহ্মচর্যে শুষ্কতা নাই; যে অর্থে "নিরোধ" আমরা বুঝি, সে নিরোধও নাই। উপনিষদ্ বলিয়াছেন—অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিতে হয়, "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা" সংসার বিচরণই মরণ জয়। যারা অবিদ্যার ক্ষেত্র হইতে ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে সরাইয়া লইবার জন্য কাম ক্রোধের সঙ্গে কুস্তি করিল তাহারা লৌকিক চক্ষে ধড় ব্রহ্মচারী হইলেও পুরুষোত্তম-রাজ্যে "মরা" সন্দেহ নাই। সংসারময় জীবন ছড়াইয়া না দিলে লক্ষ বৎসরেও ব্রহ্মচর্য্য বজায় থাকিবে না। চিত্তকে সংসার হইতে গুটাইয়া লইতে চাহিলেই সে বিদ্রোহ করে, তখন তাহাকে নিরোধ করার চেষ্টা ব্যর্থ। খাইতে পরিতে না দিয়া কাহাকেও পোষ মানানো যায় না। ইন্দ্রিয়ের খাদ্য স্বরূপ ও বিশ্বরূপ। তুমি যদি বিশ্বরূপের খাদ্য দিবে না, সে মরিবে বটে কিন্তু তাহার ভূত তোমায় ছাড়িবে না।

কামের ভূত আজ ব্রহ্মচারীদের ঘাড়ে চাপিয়াছে। তাহারা যে মরিয়া আছে তাহা বুঝা কি খুব কঠিন? নরনারায়ণের কাজ তাই গুরুতর, গুরুতম। এই মৃত ব্রহ্মচর্য্যকে জীবন্ত ব্রহ্মচর্য্যে গড়িয়া তোলার জন্যই তোমাদের ব্রহ্মচারিণীরূপে আমি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই। যিনি জীবনচারিণী, তিনিই ব্রহ্মচারিণী; জীবনই ব্রহ্ম। জীবনহীন ব্রহ্ম নরনারায়ণের উপাস্য নয়। ভারতবর্ষ তাইতো ব্রহ্মেরও পর পর-ব্রহ্মের স্তর স্থাপন করিয়াছেন। স্বরূপ ও বিশ্বরূপে প্রেম হইলে কাম নিয়া ঠেলাঠেলি করিতে হয় না। দুই ভাবে সংযম থাকিলে কামের সকল ফাঁক বন্ধ হইয়া যায়। বিশ্বরূপের দিক বন্ধ থাকিলে কাম স্বরূপের দিক দখল করিবে, বিশ্বরূপের দিক খোলা থাকিলে বিশ্বরূপের ক্ষেত্র দখল করিবে। দুই দিক খুলিয়া দিলে কাম দাঁড়াইবার স্থান পায় না। সব জীবন মধুময় হয়। সেই জন্যই বলি "অহং" ছাড়িয়া দাও। অহং দুইটির একটীকে নিয়া দাঁড়াইতে চায়। দুইটীর সমন্বয় "অহং" জানে না। আমির কাছে হয় বিশ্ব সত্য, নয় ঈশ্বর সত্য। আমি যদি হন্ পুরুষোত্তম তখনই বিশ্ব ও ঈশ্বর দুইই সত্য। তখন হয় বাস্তব ব্রহ্মচর্য্য। এ যে কলিযুগ। এখানে "বাস্তবম্ বস্তু বেদ্যম্"—কলি-যুগে যে বাস্তব বস্তু জানিবার যুগ। কোনো তত্ত্ব নিয়া ফাঁকি বা অভিনয় চলিবে না। সব আজ পুরুষোত্তমের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

সূচীপত্র পৌষ, ১৮৮৭, ১৩৭৩

প্রার্থনাকালীন ভাষণ (৬৬) ১২৭
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রভু
শাকসব্জীর বাগান
শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মিত্র
সবই ফুল?
শ্রীধাম
৪। সিদ্ধান্ত দর্শন (পূর্বানুবৃত্তি)
শ্রীনিত্যগোপাল
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (৫৭) ১২৫৩
সাময়িকী
নর নারায়ণ আশ্রম-শোকসংবাদ

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে এক করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার দেখা পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের মুদ্রিত

ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)

	১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	১৷৷০
	২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্য্যন্ত)	৮৲
	৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত)	৬৲
২।	ঈশোপনিষৎ	৸৲
৩।	কেনোপনিষৎ	৸৲
৪।	কঠোপনিষৎ	৬৲
	প্রশ্নোপনিষৎ	
	ঐতরেয়োপনিষৎ	
	মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	
	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ	
	তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	
	মুণ্ডকোপনিষৎ	
৯।	শ্রীনিতাগোপাল—জীবনে ও দর্শনে	
১০।	স্বরাজের পূর্ণরূপ	
১১।	গীতাস্বরূপী	
১২।	উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা)	
১৩।	মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-মূর্তিকল্পিতে আলোচনা (গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)	৸৲

পাণ্ডুলিপি

১।	বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
২।	ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
৪।	দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি

৺প্রতিভা রায়ের

নারী-প্রগতির রূপকথা

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ও শিল্প নিতাগোপাল

ও শিল্পী সুধার কথা

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

১।	সমন্বয়মূর্ত্তি শ্রীনিতাগোপাল	৷৷৵০
২।	রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে	৸৲
৩।	শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন	৬৲
৪।	রবীন্দ্র-স্মরণ	৫৲
৫।	প্রাথমিক শিক্ষা	৫৲

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি পো: অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

প্রতি সংখ্যা ৪৪ পয়সা বার্ষিক পাঁচ টাকা

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পো: অশ্বিনীনগর, ২৪পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।